আন্তন মাকারেঙ্কো

জীবন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান



আন্তন মাকারেঙ্কো

আন্তন মাকারেঙ্কো

জীবন
ও শিক্ষা ক্ষেত্রে
তাঁর অবদান

'কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হলে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ চেনা ও তার উন্নতিসাধন ঘটানো দরকার। ব্যক্তিবিশেষরা যদি আমার মনে যৌথ জীবনের ব্যাপক ত্রিমাত্রিকতা হারিয়ে মটরশুঁটির আলাদা-আলাদা দানার মতো ছড়িয়ে থাকে, যৌথ জীবনযাত্রার এই মাপকাঠি ছাড়া যদি আমি তাদের সম্মুখীন হই, তাহলে কখনই তাদের সঙ্গে এ'টে উঠব না।'

'পেশাগত দক্ষতা এমন একটি জিনিস যা অর্জন করা সম্ভব। চেষ্টা করে যেমন যে-কেউ বিশিষ্ট ও দক্ষ ধাতু-কুন্দকার কিংবা চমৎকার দক্ষ ডাক্তার হতে পারেন, তেমনই শিক্ষক বা শিক্ষিকাও নিজের পেশায় দক্ষ কারিগর হতে পারেন এবং তা হওয়া তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়ও...'

আ. স. মাকারেঙ্কো

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো



আন্তন মাকারেঙ্কো
১৮৮৮-১৯৩৯

আন্তন মাকারেঙ্কো

■

জীবন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অঙ্গসজ্জা: ভাদিম কুলেশোভ

А. С. МАКАРЕНКО

ЖИЗНЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

M $\frac{60300-763}{014(01)-79}$ 748—79 4302000000

সূচিপত্র

১। ভ.কুমারিন। শিক্ষক, লেখক নাগরিক ৭
২। আত্মজীবনের টুকরোটাকরা ৭৭
৩। আন্তন মাকারেঙ্কোর স্মৃতি-আলেখ্য ১২৯
মাক্সিম গোর্কি
'সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক-দিগন্তরে' বইটি থেকে . . ১৩১
লাভ্‌র স্তেপানচেঙ্কো
মাকারেঙ্কোকে যেমনটি দেখেছি ১৪৮
গালিনা মাকারেঙ্কো
স্মৃতিচারণ ১৬৫
নিকলাই ফেরে
আমার শিক্ষক ১৮৫
সেমিওন কালাবালিন
কীভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন মাকারেঙ্কো . . . ২১৪
ভিক্তর ফিঙ্ক্
অস্থিরতার সুখ ২৪০
কর্নেই চুকোভ্‌স্কি
মাকারেঙ্কোর সঙ্গে, বারকয়েক ২৫৩
৪। শিক্ষাব্যাপারে মাকারেঙ্কো ২৭৩

শিশুশিক্ষা-বিষয়ক বক্তৃতাবলী (সংক্ষেপিত) ২৭৫
পরিবার ও শিশুলালন ৩৭৯
শিক্ষাদান: বাড়িতে ও স্কুলে ৪২৫
আমার অভিজ্ঞতা ৪৫২
আমার কাজের অভিজ্ঞতা . ৫১০

শিক্ষক, লেখক, নাগরিক

শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা কর্মরত আছেন এমন সকলেই অসামান্য সোভিয়েত শিক্ষাগুরু আন্তন মাকারেঙ্কোর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং তাঁর নতুন-নতুন আবিষ্কার ও পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষণীয় উদ্ভাবনী দক্ষতার ব্যাপারে আগ্রহী না-হয়ে পারেন না।

সাবালক হয়ে ওঠার পর থেকে জীবনের সবটুকু সময় মাকারেঙ্কো ব্যয় করেছেন তরুণ উত্তরপুরুষের শিক্ষা আর চরিত্রগঠনের কাজে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েকে যৌথ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে লালন করার একটা পদ্ধতির উদ্ভাবনা ঘটান তিনি। নিজের হাতে-কলমে কাজের ক্ষেত্রে নিজেই তিনি এই পদ্ধতিটিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারও করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ সঞ্চয় বহু প্রাণবন্ত রচনায় তাঁকে ভিত্তি যুগিয়েছে। তাঁর 'জীবনজয়ের পথে', 'বাঁচতে শেখা' আর 'বাবা-মা'র জন্যে বই' সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে ও বাইরে — বিদেশেও ব্যাপকভাবে

প্রশংসিত হয়েছে। বইগুলি অনূদিতও হয়েছে বহু ভাষায়।

মাকারেঙ্কোর রচনাবলীতে বিধৃত নানা ধ্যানধারণা ও তার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রচিত্রমালা এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁর নানা রচনা আরও একবার এটা স্পষ্ট করে তুলেছে যে শিক্ষাদানের শিল্পোৎকর্ষ অনেকখানি পরিমাণে ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল, এবং শিক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটাই সর্বদা নির্ভুলভাবে প্রধান হয়ে দেখা দেয়।

মাকারেঙ্কোর জীবন ছিল অনন্যচিত্ত একনিষ্ঠ কর্মময় জীবন, আর সেই কর্মকান্ড এমন একজন মানুষের যাঁর প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি ছিল ভবিষ্যতের দিকে মুখ-ফেরানো।

* * *

খারকভ জেলার বিয়েলোপলিয়ে শহরে ১৮৮৮ সালের ১ মার্চ (নতুন দিনপঞ্জি অনুসারে ১৩ মার্চ) আন্তন মাকারেঙ্কোর জন্ম হয়। বাবা সেমিওন মাকারেঙ্কো ছিলেন বাড়িঘরের রঙমিস্ত্রি পরিবারের ছেলে। বিয়েলোপলিয়েতে বসবাস শুরু করার আগে সেমিওন মাকারেঙ্কো কাজ করতেন ক্রিউকভে। সেখানে তিনি বিয়ে করেন তাতিয়ানা দের্‌গাচোভাকে। দের্‌গাচোভার বাবা ছিলেন সৈনিক, জারের বাহিনীতে পঁচিশ বছর চাকরি করেছিলেন তিনি।

বাবার কথা স্মরণ করে আন্তন মাকারেঙ্কো লিখেছেন: ‘একাধিক দশক ধরে প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ফ্যাক্টরিতে সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠতেন তিনি। এর

পনেরো মিনিট পরেই দেখা যেত দু'ধারের পাঁশুটেরঙের সার-সার বেড়ার মধ্যে দিয়ে বালিতে-ছাওয়া পথ মাড়িয়ে দুপুরের টিফিন-বাঁধা লাল কাপড়ের পুঁটলিটা হাতে নিয়ে তিনি হনহন করে চলেছেন। আর প্রতিদিন সন্ধে ছ'টায় সময় ব্যাজার মুখ আর ধুলোমাখা দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরেই প্রথম যে-কাজটি তিনি করতেন তা হল দুপুরের টিফিন যাতে বেঁধে নিয়ে যেতেন পরিচ্ছন্নভাবে ভাঁজ-করা সেই লাল রুমালখানা এনে রান্নাঘরের একটা টুলের ওপর রেখে দেয়া।'*

স্বামীটি ছিলেন কিছুটা চাপা স্বভাবের, কম কথার মানুষ। বিপরীতে স্ত্রী — অর্থাৎ মাকারেঙ্কোর মা — ছিলেন হাসিখুশি প্রাণখোলা স্বভাবের মহিলা। রস-রসিকতায় ভরপুর চমৎকার গল্প-বলিয়ে ছিলেন তাতিয়ানা মাকারেঙ্কো, তিনি ছিলেন সংসারে আশা-আহ্লাদে ভরা আবহাওয়ার ধাত্রী। তাঁর ছেলে পরে তাঁর গ্রন্থাবলীতে এই আবহাওয়াকেই যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন 'উঁচু পর্দায় বাঁধা' আবহাওয়া বলে।

যদিও রেলওয়ের চাকরি সেকালে একধরনের সুবিধাভোগী চাকরি বলে গণ্য হোত, তবু সেমিওন মাকারেঙ্কোর মাইনেকড়ি মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। একমাত্র স্ত্রী নিপুণ গৃহকর্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে চার-চারটি ছেলেমেয়ের খাওয়া-পরা যোগানো সম্ভব হোত।

আন্তন ছিলেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তানটি ছিলেন মেয়ে। আন্তনের এই দিদির নাম ছিল

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮ (রুশ সংস্করণ)।

আলেক্‌সান্দ্রা। এছাড়া আন্তনের ছিলেন নাতালিয়া নামে একটি ছোট বোন আর ভিতালি নামে ছোট একটি ভাই।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি পড়তে শেখেন। পড়াশুনোয় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচন্ড। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে খেলাধুলোয় বালকসুলভ সাধারণ ঝোঁকের চেয়ে বইপড়া তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ওই অল্প বয়সেই দেখা গেল দুর্লভ পর্যবেক্ষণশক্তি, এবং যে-কোনো সমস্যার একেবারে মর্মে পেঁছনোর ব্যাপারে সর্বদাই তীক্ষ্ন বোধশক্তির পরিচয় দিয়ে আর পাঁচজনের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

১৮৯৫ সালে সাত বছর বয়সে আন্তন মাকারেঙ্কো স্কুলে ভর্‌তি হন। স্কুলে পাঠাবার সময় তাঁর বাবা মিথ্যে ধানাইপানাই না-করে শ্রমজীবী মানুষের চাঁচাছোলা সাফ কথায় তাঁকে জানিয়ে দিলেন: ‘আমাদের মতো লোকজনের ছেলেমেয়ের জন্যে শহরের ইশকুলগুলো বানানো হয় নি। তবে তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে তুমি ওখানে লেখাপড়া করার যোগ্য। পরীক্ষায় খারাপ ফল দেখাতে শুরু করলে তোমাকে কিন্তু পস্তাতে হবে!.. সবচেয়ে সেরা ফল দেখতে চাই আমি, কাজেই তেমন নম্বর পাওয়া চাই, বুঝলে!’

এই উপদেশ মেনে চলা মাকারেঙ্কোর পক্ষে কঠিন হয় নি, কারণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে ছিলেন তিনি। একেবারে গোড়া থেকেই তিনি ক্লাসে প্রথম স্থান দখল করতে শুরু করলেন। এছাড়া ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে বাগান করা, স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গীতদলে গান গাওয়া, ড্রইং করা এবং বেহালা বাজানো শেখা — এসব কাজও খুব ভালো লাগত তাঁর।

১৯০০ সালে আন্তনের মায়ের জন্মস্থানের শহরটিতে বড় একটা রেলওয়ে ওয়র্কশপ খোলা হয়। অল্পদিনের মধ্যে সেমিওন মাকারেঙ্কোও সেই কারখানায় বদলি হয়ে এলেন।

শহর-ক্রিউকভের জনসংখ্যা ছিল ১০ হাজার। যে-কোনো বিচারেই শহরটি ছিল ইউক্রেনের সর্ববৃহৎ নদী নীপারের তীরের শিল্পশহর ক্রেমেন্‌চুগের শহরতলি। ক্রেমেন্‌চুগের সঙ্গে শহরটা জোড়া ছিল লম্বা একটা রেলওয়ে ব্রিজ দিয়ে। ক্রিউকভের বাসিন্দাদের পক্ষে বৃহত্তর শহরটার অপেক্ষাকৃত উন্নত শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রের ভিত্তি ছিল ওই ব্রিজ। ওই সময়ে একটা থিয়েটর, গীতি-নাট্যাভিনয়ের একটা হল ও কয়েকটা সিনেমা-হলের জন্যে ক্রেমেন্‌চুগের বোলবোলা ছিল খুব। দেশের অগ্রগণ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী আর সঙ্গীতজ্ঞরা মাঝে-মাঝে শহরটায় সফরে আসতেন। সঙ্গীতজ্ঞ শালিয়াপিন আর ব্যালে-নর্তকী আন্না পাভ্‌লোভার মতো শিল্পীদের ক্রেমেন্‌চুগের বাসিন্দারা উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানাতে পেরে ধন্য হয়েছিল। মাকারেঙ্কো-পরিবারের তখন অধিকাংশ সময়ই মাথাগোঁজার মতো স্থায়ী আস্তানা ছিল না, কাজেই সে-পরিবারের লোকজনের পক্ষে থিয়েটর দেখার বিলাসিতায় মাতার কোনো প্রশ্নই উঠত না। তবে জ্ঞান আহরণের তৃষ্ণায় পাগল তরুণ মাকারেঙ্কো কালেভদ্রে কমদামি গ্যালারির টিকেট কাটার মতো অল্পস্বল্প পয়সা কোনোরকমে সংগ্রহ করতেন।

ক্রিউকভে সেমিওন মাকারেঙ্কো রঙ্‌মিস্ত্রিদের ফোরম্যান নিযুক্ত হলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় রঙের কাজ দেখাশুনোর ভার পড়ল তাঁর ওপর।

আন্তনও ক্রেমেন্‌চুগের ছ'বছরে শিক্ষার স্কুলে পড়াশুনো শুরু করলেন। এই স্কুলটির পাঠক্রম আপাতদৃষ্টিতে খুবই মনে-ধরার মতো ছিল। ছেলেদের এখানে পড়ানো হোত রুশভাষা, পাটিগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা। এছাড়াও ছিল নকশা আঁকা আর ড্রইংয়ের ক্লাস, গানের ক্লাস, শরীরচর্চা শিক্ষা ইত্যাদি। তবে এই ধরনের স্কুলে বিদেশী কোনো ভাষা শেখানো হোত না, তাছাড়া এখানকার অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে হাইস্কুল কিংবা 'গিম্‌নাজিয়া'গুলির পাঠক্রমের ফারাক থাকত বলে এইসব স্কুলের বাছাই-করা সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের পক্ষেও হাইস্কুলের ওপরের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগই মিলত না। ফলে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকতে হোত তাদের।

আগের মতো এই স্কুলেও আন্তন চমকপ্রদ ফলাফল দেখাতে লাগলেন। নানাবিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনো এবং রুশ ও বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্যে তাঁর বিশদ জ্ঞান তাঁর বয়সী একটি ছেলের পক্ষে রীতিমতো অসামান্যই ছিল বলতে হয়। একই রকম ভালো পড়াশুনো ছিল তাঁর দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানে। পড়াশুনোর নেশা আর জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁর অল্পবয়সী জীবনটাকে এমনভাবে ভরে রেখেছিল যে ওই বয়সের ছেলেদের পক্ষে যা একান্ত স্বাভাবিক সেইসব ব্যাপারে — যথা খেলাধুলো কিংবা বাইরে সময় কাটানোর মতো অন্য নানা রকমের আমোদপ্রমোদে আগ্রহ তাঁর মনে স্থান পেত না। যদিও পড়াশুনোয় এবং সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারে আন্তন সহপাঠীদের চেয়ে সর্বদাই অনেকখানি এগিয়ে থাকতেন, তবু গোরদ্‌কি (একধরনের স্কিট্‌ল্‌স খেলা), কানামাছি

কিংবা চোর-চোর খেলার সময় অন্যদের কাছে হার মানতে হোত তাঁকে।

১৯০৪ সালে ষোল বছর বয়সে তরুণ আন্তন ক্রেমেন্‌চুগের এই স্কুল থেকে সববিষয়ে ডিস্টিংকশন মার্ক পেয়ে পাশ করে বেরুলেন। তাঁর বেশির ভাগ সহপাঠীই এরপর রেলওয়ের নানা কাজ শেখার জন্যে কারিগরি স্কুলগুলোতে ঢুকলেন। কেউ-কেউ আবার সেনাবাহিনীর কাজও বেছে নিলেন। কিন্তু আন্তন নাম লেখালেন প্রাথমিক স্কুল-শিক্ষকের এক-বছরের একটা প্রশিক্ষণ-কোর্সে।

১৯০৫ সালের বসন্তকালে এই পাঠক্রম সম্পূর্ণ করলেন তরুণ মাকারেঙ্কো। তারপর ওই বছরেরই শরৎকালে ক্রিউকভের রেলওয়ে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্যে স্থাপিত একটা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। মাকারেঙ্কোর বাবা যে-রেলওয়ে ওয়র্কশপে কাজ করতেন তারই অন্তর্ভুক্ত চত্বরের মধ্যে ছিল দু'-ক্লাসের এই প্রাথমিক স্কুলের বাড়িটি। আসলে স্কুলটিতে যা পড়ানো হোত তা ছিল পুরো পাঁচ বছরের পাঠক্রম। স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ানো হোত প্রথম তিন বছরের পাঠক্রম। অন্যান্য সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের প্রথম তিনটি ক্লাসে যে-যে পাঠ্যবিষয় যতখানি করে পড়ানো হোত ততখানিই পড়ানো হোত এই স্কুলটির প্রথম শ্রেণীতে। অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে ছাত্রছাত্রীরা আরও দু'বছর পড়াশুনো চালিয়ে যেত। পাঁচ বছরের এই পাঠক্রম শেষ করার পর তবেই ছাত্ররা রেলওয়ে কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত।

অপর চারজন শিক্ষকের শিক্ষণাধীন ক্লাসের মতো মাকারেঙ্কোর ক্লাসেও চল্লিশটির মতো ছাত্রছাত্রী ছিল আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ছেলে।

মাকারেঙ্কো প্রমাণ দিলেন, ভারি চমৎকার শিক্ষক তিনি। শুধু-যে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা-ই নয়, দেখা গেল সেই জ্ঞান অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করাতেও তাঁর জুড়ি নেই। ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তা করতে, যুক্তিবিস্তার করতে উৎসাহ যোগালেন তিনি। তবে শৃঙ্খলাবিধান আর শিক্ষণপদ্ধতি আয়ত্ত করার ব্যাপারে মাকারেঙ্কোকে প্রথম-প্রথম বেশ বেগ পেতে হয়েছে। যেমন তৃতীয় বছর পড়ানোর সময়ে তিনি এমন একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যার জন্যে পরে তাঁকে দারুণ অনুতপ্ত হতে হয়। ওই শিক্ষাবর্ষের শেষে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোর প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করার সময় তাদের শক্তিসামর্থ্য বিচারের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরনের 'পরীক্ষা' চালানোর সিদ্ধান্ত নেন আন্তন মাকারেঙ্কো। তিনি করলেন কী, প্রতিটি ছাত্র ও ছাত্রীর পাওয়া সারা বছরের সব ক'টা পরীক্ষার নম্বরের একটা গড় হিসেব করে ফেললেন আর তারপর ওই গড় নম্বরের ভিত্তিতে ক্লাসের সব ক'টি ছেলেমেয়ের পোজিশন বা পর্যায়ক্রমিক স্থান নিরূপণ করলেন। এই পদ্ধতিতে '৩৭ তম এবং সর্বশেষ' স্থানাধিকারী হল যে-ছেলেটি পরে জানা গেল অলস বলে যে সে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছে তা নয়, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াতেই তার এই অবস্থা হয়েছে। এদিকে ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে পেছনে স্থান পাওয়ায় লজ্জায় ঘেন্নায় সে এতদূর ভেঙে পড়ে যে তার অসুখ দ্রুত খারাপ দিকে মোড় নেয়।

এই ঘটনাটি মাকারেঙ্কোর মনে গভীর ছাপ ফেলে। গভীর মনোকষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সফলকাম শিক্ষক হয়ে উঠতে গেলে কেবল জ্ঞান বিতরণ

করতে পারাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগঠন এবং তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদাপূরণ ও শক্তিসামর্থ্যের মান নিরূপণও শিক্ষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা খুবই সম্ভব যে ওপরের ওই দুঃখজনক ঘটনাটিই মাকারেঙ্কোর মনে এই ধারণাসৃষ্টিতে সাহায্য করে যে শিশুদের মানুষ করা ও তাদের চরিত্রগঠনের কাজ নিছক শিক্ষাদানের প্রকৌশলের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, বরং বিশেষ ধরনের নিজস্ব বিষয় ও নিয়মকানুন সমন্বিত শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের এক সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র সেটা।

ওই যুগের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই নবদীক্ষিত শিক্ষাব্রতীর চেতনার বিকাশে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৫ সালের বিপ্লব রুশদেশের কোণে-কোণে তুমুল আলোড়ন জাগায়, মানুষের মন আর বিবেককে তা নাড়া দেয়, মানুষকে তা আহ্বান জানায় রাশিয়ার জনগণের দুর্মর শত্রু জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতে।

ক্রিউকভে মাকারেঙ্কো ও তাঁর সহকর্মী শিক্ষকরা বলশেভিকদের বৈধ পত্রিকা ‘নোভায়া জিজ্‌ন’ (নবজীবন)-এর গ্রাহক ছিলেন। ক্রমশ মাকারেঙ্কোকে কেন্দ্র করে ও স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। সন্ধেবেলায় এই গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের কারো-না-কারো বাড়িতে জড় হয়ে রাজনৈতিক বিষয় সহ দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক করতেন আর বিপ্লবের গান গাইতেন।

১৯১১ সালে মাকারেঙ্কো দোলিন্‌স্কায়ার রেলওয়ে স্কুলে একটি নতুন পদে বদলি হয়ে এলেন।

মাকারেঙ্কো দ্রুত তাঁর নতুন দায়দায়িত্বের স্বরূপ বুঝে নিলেন এবং নিজের কাজটাকে সৃষ্টিশীল ও আগ্রহোদ্দীপক করে তুললেন। এই তরুণ শিক্ষকটি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অবসর সময়টুকু এমন সব কাজকর্ম দিয়ে ভরে তুললেন যা তাদের প্রথাসিদ্ধ জীবনযাত্রার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে মঞ্চে নাটকের অভিনয় করানো, রকমারি বহুরূপী পোশাকে নাচগানের উৎসব সংগঠিত করা ও আরও নানারকম আমোদপ্রমোদের বন্দোবস্ত করা শুরু করে দিলেন মাকারেঙ্কো। এমন কি ওই অল্প বয়সেও ছাত্রছাত্রীদের কল্পনাশক্তি ও শিল্পপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটানোর ব্যাপারে মাকারেঙ্কোর উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষেত্র আশ্চর্যরকম ব্যাপ্ত ছিল। যেমন, উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ায় নাপলেয়ঁর সেনাবাহিনীকে উৎখাত করার শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের ঘটনাটা উল্লেখ করা যায়। ওই বছর মাকারেঙ্কো এমন একটি বিশেষ ধরনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন যা শুধু স্থানীয় বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরই নয় প্রাপ্তবয়স্ক রেলওয়ে শ্রমিকদেরও মন মজিয়েছিল। তাঁর এই আয়োজনটি ছিল এইরকম: একদিন সারা রাত ধরে স্তেপের প্রান্তরে এখানে-ওখানে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে-রাখা আলকাতরার পিপেগুলোয় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, তারপর অন্ধকার আকাশ ভেদ-করে-ওঠা এইসব অগ্নিশিখার এদিক-ওদিক থেকে চলতে থাকে একাদিক্রমে ‘গুলিচালনা’। পরদিন ভোর পর্যন্ত একদিকে যেমন চলে এই গুলির লড়াই তেমনই অপরদিকে চলতে থাকে থেকে-থেকে প্রবল জয়ধ্বনির চিৎকার। এই ‘সামরিক অভিযান’ চলে পরদিন সকাল পর্যন্ত, তারপর বিজয়ী বাহিনী আর দর্শকদের উল্লসিত হৈচৈয়ের মধ্যে সারবাঁধা মনমরা বন্দী ‘শত্রুদের’ স্কুলের

সামনে দিয়ে শহরের রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ক্লাসরুমেও মাকারেঙ্কোর শিক্ষাদানের কায়দা এর চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আবেগকে সুকৌশলে যুক্ত করায় তাঁর অসামান্য ওস্তাদি।

ওই সব দিনে তরুণ মাকারেঙ্কোর চেহারার বর্ণনা পাই এইরকম: মাঝারির চেয়ে মাথায় একটু বেশি লম্বা, কিছুটা রোগাপাতলা এবং মাথাটা দেহের তুলনায় কিছুটা বড় হওয়া সত্ত্বেও সুগঠিত দেহ, মাথার চুল মুড়িয়ে ছাঁটা, চোখ-নাক-মুখ ইত্যাদিতে কিছুটা সামঞ্জস্যের অভাব, মুখের মধ্যে প্রধান প্রত্যঙ্গ প্রকাণ্ড নাকটা আর তার ওপর চড়ানো স্থায়ী সোনার পাঁশনে। এই পাঁশনের পেছন থেকে ঝিলিক হানত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, অল্প-একটু কোঁচকানো, কটা চোখদুটো। চেহারার এই বাহ্য বিবরণের সঙ্গে তাঁর সমকালীনরা যোগ করে থাকেন তাঁর সংবেদনশীল বুদ্ধি, নিজে রসিকতা করার ও অপরের রসিকতা উপভোগের ক্ষমতা, বন্ধুতায় একনিষ্ঠতা ও উদার মিশুকে স্বভাবের কথা।

দোলিন্স্কায়ায় আসার অল্পদিনের মধ্যে দেখা গেল ক্রিউকভের মতো সেখানেও মাকারেঙ্কো লক্ষণীয়রকম বৈপ্লবিক চরিত্রের এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যাদের মধ্যে তাঁরা বাস করতেন সেইসব লোকের মনে জ্ঞানসঞ্চার ও রাজনৈতিক সচেতনার উন্মেষ ঘটানোই ছিল এই গোষ্ঠীটির উদ্দেশ্য। এই গোষ্ঠীর কিছু সদস্য ছিলেন রেলওয়ে ওয়র্কশপের শ্রমিক। অতএব দেখা যাচ্ছে স্থানীয় লেখাপড়াজানা মানুষ নিয়েই খালি গোষ্ঠীটি গঠিত হয়

নি। রবিবার-রবিবার এই গোষ্ঠীর সভা বসত রেলস্টেশনের ধারেকাছে বনের মধ্যে। এইসব সভায় বক্তৃতা করার সময় আন্তন মাকারেঙ্কো প্রবলভাবে স্বৈরতন্ত্রের সমালোচনা করতেন এবং বড়রকমের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো ও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-যে বিশেষ প্রয়োজন সেকথা জানাতেন।

১৯১৪ সালে মাকারেঙ্কো একটি ছোট গল্প লেখেন। গল্পটি কেমন হয়েছে তা দেখার জন্যে তিনি পাঠিয়ে দেন এমন একজনের কাছে যাঁকে তিনি সে-যুগের নেতৃস্থানীয় সাহিত্যরথীদের অন্যতম বলে গণ্য করতেন। এই মানুষটি হলেন মাক্সিম গোর্কি। গল্পটি পড়ে গোর্কি জানালেন যে গল্পের বিষয়বস্তু কৌতূহল জাগানোর মতো হলেও তার রচনাশৈলী দুর্বল। তবে ওইসঙ্গে গোর্কি মাকারেঙ্কোকে আরও একটি গল্প লেখার পরামর্শ দেন।

এরকম একটা কড়া সমালোচনার একটিমাত্র-যে সান্ত্বনার দিক ছিল তা হল এই যে, অজানা একজন লেখকের কাছে গোর্কির বন্ধুত্বপূর্ণ মনখোলা মতামতপ্রকাশ। ফলে 'বিশেষ কোনো অনুশোচনাকে মনে স্থান না-দিয়েই' মাকারেঙ্কো লেখক হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে পত্রপাঠ জলাঞ্জলি দিলেন।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে একটি শিক্ষা-বিষয়ক ইন্‌স্টিটিউট খোলা হল পোল্‌তাভায়। তখনও পর্যন্ত মাকারেঙ্কোর পড়াশুনোর নেশা সমান অব্যাহত ছিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পোল্‌তাভার ইন্‌স্টিটিউটে ভর্‌তি হওয়ার একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন। ভর্‌তির পরীক্ষায় দারুণ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ায় ইন্‌স্টিটিউটে তাঁকে ভর্‌তি করে নেয়া হল।

এইভাবে ২৬ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন মাকারেঙ্কো। তখনই তিনি একজন অভিজ্ঞ, পোড়-খাওয়া মানুষ। ইন্স্টিটিউটে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও কলাকৌশল, ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে গভীর ও নিয়মানুগ পড়াশুনো শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যেই স্কুলে পড়ানোর ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়ায় তাঁর পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত সমস্যাদিতে ও দর্শনে তীব্র অনুরাগ প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে মাকারেঙ্কো ইন্স্টিটিউট থেকে ডিস্টিংকশন নিয়ে স্নাতক হয়ে বেরুলেন। ওই বছর পরীক্ষায় সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর পান তিনি। এর অর্থ ছিল এই যে তাঁর-যে শুধু শিক্ষকতা করারই অধিকার জন্মাল তা-ই নয়, পরিবর্ধিত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পরিচালনার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ারও যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি। পোল্তাভা ইন্স্টিটিউট থেকে তাঁকে যে-পরিচয়পত্র দেয়া হল তাতে মাকারেঙ্কো সম্বন্ধে বলা হল: ‘স্বাভাবিক প্রবণতা, পড়াশুনা, পরিণত বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ক্ষমতা, শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসবিষয়ে তীব্র আগ্রহ, ইত্যাদির বিচারে ইনি একজন কৃতবিদ্য ছাত্র। শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে এঁর পড়াশুনাও প্রচুর। এ-সমস্ত বিষয়ে চমৎকার-চমৎকার রচনাও লিখেছেন ইনি। সকল বিষয়ে, বিশেষ করে ইতিহাসে ও রুশ ভাষায় তো বটেই, ইনি চমৎকার দক্ষ শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত।’

অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাকারেঙ্কোর জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা ঘটল। বস্তুত, লক্ষ-লক্ষ অন্য মানুষের জীবনে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনই। বিপুল হারে বীরত্বপূর্ণ শ্রম সম্পাদন ও ইতিকথাসদৃশ

পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা পূরণের জন্যে স্মরণীয় ওই প্রথম বছরগুলিতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের মানুষ নিজেরাই নবজন্ম লাভ করল। ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের অসীম শক্তিতে অন্ধবিশ্বাস জন্মের মতো ত্যাগ করল তারা, ইতিমধ্যে পরবর্তী বছরগুলিতে পারস্পরিক সাহায্য ও আস্থা হয়ে দাঁড়াল যৌথভাবে সাফল্য অর্জন ও কীর্তিস্থাপনের গ্যারান্টিস্বরূপ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশের মানুষ ছিল আস্থাবান। বৈপ্লবিক লক্ষ্যপূরণে অগ্রসর হওয়ার জন্যে সমধর্মা নাগরিকদের সঙ্গে মিলে আন্তন মাকারেঙ্কোও নিজের কাজে প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করলেন।

পোল্‌তাভার ইন্‌স্টিটিউট থেকে স্নাতক হয়ে বেরুনোর অল্প পরে ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে মাকারেঙ্কো ফের ফিরে গেলেন সেই স্কুলটিতেই, তেরো বছর আগে শিক্ষক হিসেবে যেখানে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। ওই সময়ের মধ্যে ক্রিউকভের প্রাথমিক স্কুলটি পরিবর্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছিল। আন্তন মাকারেঙ্কো তার নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। তবে ওই সময়টায় তখনও গৃহযুদ্ধ চলছিল, আর মাকারেঙ্কো যে-অঞ্চলে কাজ করছিলেন সে-জায়গাটা থিকথিক করছিল প্রতিবিপ্লবী দস্যু, দখলদার জার্মান সৈন্য আর নৈরাজ্যবাদীতে। ১৯১৯ সালের শেষাশেষির আগে লালফৌজ ক্রেমেন্‌চুগ আর ক্রিউকভ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করতে পারে নি। অবশেষে ১৯২০ সালের সূচনায় গোটা ইউক্রেন জুড়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯১৯ সালের অগস্ট মাসে মাকারেঙ্কো পোল্‌তাভায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর ওপর একটি প্রাথমিক স্কুল চালানোর ভার পড়ে। ১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে কিশোর-

অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট পুনর্গঠিত একটি কলোনির* তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণের অনুরোধ তাঁকে জানানো হয়েছিল। এ কাজটি অবিশ্বাস্যরকমের কঠিন হলেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে মাকারেঙ্কো তা গ্রহণ করেন।

বিপ্লবের আগে যেখানে অপরাধী ছেলেপিলেরা বাস করত সেই বাক্স-প্যাটার্নের পাঁচখানা দালান একেবারে শূন্য অবস্থায় তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। দালানগুলোর সব ক'খানা ঘর ছিল নিরাভরণ, শূন্য। দরজা, জানলা আর চুল্লী সব ক'টাই ছিল হয় ভাঙাচোরা ও টুকরো-টুকরো, আর নয়তো সেগুলো খুলে ফেলে প্রতিবেশী কুলাকদের খামারগুলোয় পাচার করা হয়েছিল। এমন কি বাগানের গাছগুলোও শিকড়সুদ্ধ খুঁড়ে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এর দু'মাস পরে একখানা দালানকে যখন মোটামুটি বাসযোগ্য করে তোলা গেল, কলোনির প্রথম ছ'জন বালক-বাসিন্দা এসে পৌঁছে গেল তখন। এদের সকলেরই বয়স ছিল ষোল থেকে সতেরোর ভেতর। জাঁকালো পোশাক-পরা, উদ্ধতস্বভাব, ভালোমন্দের প্রতি দৃক্‌পাতহীন এইসব কিশোর-অপরাধী তাদের পরিচালকদের এমন কি অপমান পর্যন্ত করল না, বরং যেন তাঁদের অস্তিত্বই নেই এইভাবে তাঁদের উপেক্ষা করে চলতে লাগল। এর অল্প ক'দিন পরেই মাকারেঙ্কোর রক্ষণাধীন ছেলেদের এই প্রথম দলটির একজন খুন আর ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ল আর অকুস্থলে তলব-করা অপরাধ-তদন্ত বাহিনীর এক সদস্যের হাতে গ্রেপ্তার হল।

---

* নিজস্ব উৎপাদন-সংক্রান্ত ইউনিট ও মিশ্র খামার সহ পূর্ণাঙ্গ, নতুন প্রগতিশীল ধাঁচের একটি চরিত্র-সংশোধনী স্কুল। — সম্পাঃ

রক্ষণাধীন ছেলেদের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে চলা দরকার সে-সম্পর্কে প্রায় কোনো ধারণা না-থাকায় মাকারেঙ্কো ও তাঁর সাহায্যকারী ছোট্ট দলটি শিক্ষা-সংক্রান্ত বইপত্রের শরণ নিলেন। কিন্তু জরুরি বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াসে শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা বড়-একটা কাজে এল না। শিগ্‌গিরই মাকারেঙ্কোর কাছে এটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল যে যা তাঁর দরকার তা আর যা-ই হোক অন্তত পুঁথিগত তত্ত্বসূত্র নয়। কেননা, যে-পরিস্থিতির তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে ওইসব সূত্র কোনোক্রমেই প্রযোজ্য ছিল না। বরং যা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল তা হল, দুস্তর যে-সমস্ত সমস্যার তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন নিজেই মাথা খাটিয়ে তার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের পন্থা নেয়া।

জাদোরভ নামে ছোকরা আইনভঙ্গকারীদের একজন মাকারেঙ্কোকে বাধ্য করল অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে শেষ একটা মরিয়া চেষ্টা করতে। ছেলেটিকে একদিন যখন বনে গিয়ে জ্বালানির জন্যে কাঠ চেলা করে আনতে বলা হল, তখন সে গম্ভীর চালে শান্তভাবে জবাব দিল: 'তুমি নিজেই কাঠ চেলা করে আনো-না! তোমরা তো গাদাখানেক লোক রয়েছ এই কাজের জন্যে!' ওর এই কথার মধ্যে উস্কানি আর ঔদ্ধত্যের ভাবটা যে প্রকট হয়ে উঠল তা যেন ওর মোটেই খেয়াল নেই বলে মনে হল। পরে 'জীবনজয়ের পথে' বইটিতে মাকারেঙ্কো এই ঘটনাটা সম্পর্কে লিখছেন: 'এই প্রথম ছেলেদের একজন এতখানি অসম্মান দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল। একেই গত কয়েক মাসের নানা অভিজ্ঞতায় চরম তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম তার ওপর এই কথায় রাগে, ঘৃণায় জ্ঞানহারা হয়ে হাত তুলে জাদোরভের মুখে

সরাসরি একটা ঘুসি বসিয়ে দিলুম। এত জোরে মারলুম যে পা টলে গিয়ে ও উলটে পড়ল চুল্লীর গায়ে। কলার চেপে ধরে মাটি থেকে প্রায় তুলে ফেলে আবার মারলুম ওকে। তারপর তৃতীয়বার ফের মারলুম।'*

এটা অবশ্যই আবেগের এমন একটা প্রবল বহিঃপ্রকাশ ছিল যাকে অনেক তাত্ত্বিকই লড়াইয়ের অনুপযোগী একটা কিম্ভূত কৌশল বলে গণ্য করবেন। অথচ আসলে এই ঘটনাটায় নিহিত আবেগের অভিঘাতই মাকারেঙ্কোর রক্ষণাধীন ছেলেদের ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে জয়ী হল, তাদের তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল। ওইদিনই প্রথম তারা দেখল যে তাদেরই স্বার্থে, তাদের ফের মানুষের পর্যায়ে টেনে তোলার শেষ চেষ্টাতেই, তাদের রক্ষক ও পরিচালক লোকটি তার যা শেষ সম্বল, অর্থাৎ তার নিজের জীবন, তাই-ই বিপন্ন করে তুলতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছে।

একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের জড়িয়ে আবেগের এই বিস্ফোরণ ঘটায় ছোকরা ছেলেগুলি ঠিক সেই কাজটিই করল অপরাধীদের জগতে মানুষেরা এহেন ক্ষেত্রে যেমনটি করে থাকে। অর্থাৎ, তারা আত্মসমর্পণ করল বাহুবলের কাছে। এর ফলে নিজেদের নিগৃহীত বা অপমানিত বোধ করল না তারা, বরং যেন খুশি আর আশ্বস্তই হল। ঘটনাটার ফলে শিক্ষক এবং রক্ষণাধীন ছেলেরা উভয়পক্ষই যেন জয়গৌরব নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিল। তবে এই জয়কে সংহত করে তোলার জন্যে তখনও অনেক কিছু করার ছিল। মাকারেঙ্কোর পক্ষে প্রশ্ন দাঁড়াল, এর পরে তিনি কোন পদক্ষেপ নেবেন?

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'জীবনজয়ের পথে', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২। মস্কো থেকে প্রকাশিত। — সম্পাঃ

জাদোরভের সঙ্গে উপরোক্ত ওই নির্ধারক সংঘর্ষটি মাকারেঙ্কোর মনে চিরকালের মতো এই স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়ে দিল যে অমন পদ্ধতি অবলম্বন করে কিংবা প্রথমে রক্ষণাধীন ছেলেদের মধ্যে একজনের ওপর আর তারপর বাকি সকলের ওপর পালা করে প্রভাববিস্তার করেও তিনি ফল কিছুই পাবেন না। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এই যে ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে অন্য কোনো উপায় বের করতে না পারলে কী করবেন তিনি? এর উত্তর অবশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট: মাকারেঙ্কোর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কার্যক্ষেত্রে হাতের কাছে যাঁদের পাওয়া যায় এমন সব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন-কর্মীর সঙ্গে মিলে অকুস্থলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব নতুন সব পদ্ধতির উদ্ভাবনা।

তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যতসব নতুন পদ্ধতির নিছক আদলটুকু মাকারেঙ্কোর এবং অন্যত্র কর্মরত অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ওরই মধ্যে রূপপরিগ্রহ শুরু করেছিল।

সমগ্রভাবে মাকারেঙ্কোর রক্ষণাধীন সকল ছেলেপিলেকে নিয়ে কোনো কিছু একটা কাজ নিষ্পন্ন করার জন্যে তাঁর পক্ষে দরকার ছিল সকলের পক্ষে বোধগম্য এবং প্রয়োজনীয় একটা চরম লক্ষ্য বা কর্মসূচি মাথা খাটিয়ে বের করা। তখনকার ওই পরিস্থিতিতে কলোনির ‘অর্থনৈতিক অবস্থা’র দ্রুত উন্নতিবিধান এবং কলোনি-বাসিন্দাদের তাৎক্ষণিক বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলো পুরোপুরি মেটানোই এহেন একটা কর্মসূচির করণীয় বিষয় হতে পারত। এর জন্যে সংগঠনটির চরিত্র এমন হওয়ার দরকার ছিল যাতে **ছেলেরা নিজেরাই সবকিছুর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে শেখে** — অর্থাৎ, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ,

উৎপাদন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা ছকা ও তা কার্যকর করা, আয়ের বিলিব্যবস্থা করা, নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা, এই সবকিছুই তারা যাতে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে করতে পারে। **সুস্থ সুন্দর জীবন লাভ করার জন্যে** তাদের নিজেদেরই দরকার ছিল পরস্পরকে গড়েপিটে বদলে নেয়ার। দরকার ছিল দাবি করতে শেখার, অন্য সকলকে অনুসরণ করতে পারার, অন্যদের সম্মান জানানোর, নিজে শ্রদ্ধা অর্জন করতে শেখার, অন্যদের জন্যে চিন্তাভাবনা করার ও তাদের সাহায্য করার। পরিশেষে, এর জন্যে কলোনিটাকে কতগুলি মানুষের এলোমেলো একটা সমষ্টি হলে চলত না, তার পক্ষে দরকার ছিল এমন **একটা সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক ইউনিট** হিসেবে গড়ে ওঠার, যার সদস্য হওয়াটাকে কি শিক্ষক-শিক্ষিকা কি ছেলেপিলে উভয়পক্ষই একটা মর্যাদার ব্যাপার বলে গণ্য করতে শেখেন। অর্থাৎ, এক কথায়, কলোনির পক্ষে খাঁটি একটা **যৌথ সংস্থা** হিসেবে গড়ে ওঠার দরকার ছিল।

হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতায় প্রাথমিক তত্ত্বগত নীতিগুলি সত্য বলে প্রতিপন্ন হল। সবচেয়ে প্রথমে দরকার পড়ল প্রতিদিনকার দৈন্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া। ১৯২১ সালের মার্চ মাস নাগাদ মাকারেঙ্কোর রক্ষণাধীন ছেলেমেয়ের সংখ্যা তিরিশের কাছাকাছি এসে পৌঁছুল। এইসব ছেলেমেয়ের অনেকেই ছিল গৃহহীন নিরাশ্রয়, ধুকড়ি পোশাক-পরা, আধপেটা খেয়ে-থাকা আর খোসপাঁচড়ায়-ভরা। মাকারেঙ্কো ভালো করেই জানতেন যে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এইসব ছেলেপিলে যে-কোনো ছুতোনাতায় প্রায়-প্রায়ই শহরে কেটে পড়ে আর সেখানকার বাজারের দোকানপাটে এটা-ওটা চুরিচামারি করে। তবু,

এই ধরনের ছিঁচকে চুরি বন্ধ করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না বুঝে প্রথম-প্রথম তিনি এমন কি রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের প্রশ্ন পর্যন্ত করতেন না যে হঠাৎ-হঠাৎ কোথা থেকে তারা বোয়েম-ভর্তি টক মাঠা কিংবা দুয়েকটা বুব্লিকের* মালা সংগ্রহ করে থাকে।

এইসব চুরিচামারি চিরতরে যাতে বন্ধ করতে পারেন তার জন্যে তাঁর কথা ছেলেরা যখন কানে তুলবে সেই উপযুক্ত মুহূর্তটির অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে রইলেন মাকারেঙ্কো।

ইতিমধ্যে কলোনির মধ্যেই চুরিচামারি শুরু হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে মাকারেঙ্কোর টেবলের একটা ড্রয়ার থেকে বেশকিছু টাকা গেল উধাও হয়ে। সে-টাকাটা কলোনির সমস্ত শিক্ষক-পরিচালকের ছ'মাসের মাইনে চুকিয়ে দেয়ার জন্যে রাখা ছিল। সকল কলোনি-বাসিন্দাকে এক সভায় সমবেত করিয়ে মাকারেঙ্কো সবার কাছে অনুরোধ জানালেন টাকাটা ফেরত দিতে, বললেন এটা না-করলে তাঁকে নিজেকেই তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে। সভার পরে তারানেত্স আর গুত্ নামে দু'টি ছেলে তাদের মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসে কবুল করল যে কে টাকাটা নিয়েছে তা তারা জানে। কিন্তু কে যে দোষী তা বলতে রাজি হল না তারা। তবে জানাল যে চোরকে তারা টাকাটা ফেরত দেয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে চেষ্টা করবে। এর পরদিন সকালে ঘোড়ার আস্তাবলে টাকার নোটগুলো ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এর দু'দিন পরে দেখা গেল কে যেন মাটির নিচের ভাঁড়ারের তালা ভেঙে সবটুকু খাদ্যের সঞ্চয়

---

* বুবলিক — হাতের বালার আকারের একপ্রকার চক্রাকার বিস্কুট। — সম্পাঃ

আর তার সঙ্গে গাড়ির চাকায় দেবার কয়েক টিন গ্রিজ্ লোপাট করে দিয়েছে। কলোনির কাজকর্ম চালানোর পক্ষে এই গ্রিজটুকু মহামূল্যবান ছিল।

রক্ষণাধীন ছেলেদের মধ্যে এই চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও এ-সম্পর্কে তাদের মতামত খুব সতর্কভাবে মন দিয়ে শুনলেন মাকারেঙ্কো। তখনও পর্যন্ত জনমতে নিন্দেটা তেমন প্রকট হয়ে উঠছিল না, ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা তখনও ছিল মজাদার আর কৌতূহলোদ্দীপক একটা খেলার মতো। সকলের জিজ্ঞাস্য ছিল, আসল চোর কে হতে পারে? বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেরা তো চোরের হাতসাফাইয়ের কৌশলে একেবারে তাজ্জবই বনে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের নিজেদের জিনিসই-যে চুরি যাচ্ছে এটা ওরা তখনও পর্যন্ত যেন ঠিক সমঝে উঠতে পারছিল না।

রক্ষণাধীন দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সরবরাহ দপ্তরগুলোয় ঢুঁ মেরে বেড়াতে লাগলেন মাকারেঙ্কো, খোয়া-যাওয়া খাদ্যসামগ্রীর অভাব ভিক্ষে মেগে নতুন র‍্যাশন দিয়ে যদি পূরণ করা যায় এই আশায়। অবশেষে শুধু চর্বি নয় খানিকটা মিষ্টিও কপালে জুটে গেল ওঁদের। খাবারদাবার কলোনিতে নিয়ে এসে মাটির নিচের ভাঁড়ারঘরে ফের তা তালাবন্ধ করে রাখা হল। কিন্তু সবকিছু ফের সেইরাত্রেই চুরি হয়ে গেল।

শুনতে আশ্চর্য ঠেকলেও ঘটনাটা সত্যি যে এই নির্লজ্জ চুরির ব্যাপারটায় মাকারেঙ্কো মনে কিছুটা ভরসা পেলেন। তিনি ভাবলেন, এইবার বোধহয় অবশেষে যৌথ স্বার্থের ব্যাপারটা সবাই ধরতে পারবে এবং কলোনি-বাসিন্দারা চুরির জন্যে চোরের ওপর খেপে উঠবে। কিন্তু কোথায় কী! দেখা গেল, ফের একবার মাকারেঙ্কোর ঠিকে ভুল হয়েছে। বারবার

এরকম ক্ষতি হওয়ায় ছেলেপিলেরা দুঃখিত হয়েছিল সত্যিই, কিন্তু তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাগ আর ঘেন্নার মনোভাব তাদের মধ্যে মোটেই সংক্রমিত হচ্ছিল না। আগের মতো মজাদার খেলার কৌতূহলটাই তখনও তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ছিল। তাদের প্রশ্ন ছিল: এমন পাকাহাতের চোর কে হতে পারে?

ওই সময়ের মধ্যে চুরিটা কলোনিতে দৈনন্দিন ঘটনায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মাকারেঙ্কো রাত্রে পাহারা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পরপর তিন রাত্রের বেশি রাত জেগে পাহারা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। মাস্টারমশাইকে এমন একটা অসমান লড়াই চালাতে দেখে আর তলায়-তলায় তাঁর প্রতি সমবেদনা বোধ করে ছেলেমেয়েরা মাকারেঙ্কোকে পরামর্শ দিতে লাগল একজন রাতের চৌকিদার বহাল করার জন্যে। তিনি তখন তাদের মোদ্দা কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে চৌকিদার পুষতে গেলে তাকে মাইনে দিতে হবে অথচ তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি এতই যৎসামান্য যে চৌকিদার পোষা ছাড়াই টাকার যথেষ্ট টানাটানি যাচ্ছে। তাছাড়া আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হল, কলোনিটা ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই চালানো দরকার।

অবশেষে একদিন চোর ধরা পড়ল। দেখা গেল, চোর হচ্ছে বুরুন, মাকারেঙ্কোর তত্ত্বাবধানে লালনের জন্যে দেয়া প্রথম ছ'জন কিশোরের একজন। আর ওই সময়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সার্বিক স্বার্থে রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ও পুনর্নবায়ন ঘটানোর কাজে মাকারেঙ্কোর সকল প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। অন্য ছেলেমেয়েদের দোষারোপ আর তিরস্কারের প্রতিবাদে বুরুন যখন বলার চেষ্টা করল যে তাকে দুয়ো দেয়া নিয়ে

ওদের এত মাথাব্যথা কিসের তখন কলোনির সেই প্রথম 'গণ-আদালত'এ 'জনমত' অবশেষে মুখর হয়ে উঠল।

কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি তো সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল। বলল, 'আমাদের এত মাথাব্যথা কিসির মানে? দোস্ত-সব, এডা আমাদের মাথাব্যথার ব্যাপার কি? না, না?'

শুনে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিচ্চয়!' বলে একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল বাকি ছেলেরা। এটা ছিল মাকারেঙ্কোর প্রথম আর সে-কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ। আর এর পর একের-পর-এক বেশি-বেশি করে নতুন-নতুন পদ্ধতি যা নাকি তার আগে 'জামার অস্তিনের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন' তিনি তা-ই প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। সামগ্রিক লক্ষ্যে পেঁছনোর জন্যে 'লড়াই'এর এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ স্তরটিতে বিজয়ী হবার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করলেন তিনি, নিশ্চিত হতে চাইলেন যাতে 'আমার' জায়গায় 'আমাদের' এই চেতনাটি শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং তাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তা পরবর্তী কাজকর্মের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

মাকারেঙ্কোর বিশ্বাস-উৎপাদক জোরালো যুক্তিতর্কের প্রভাবে ছেলেপিলেরা অবশেষে কলোনির সার্বিক পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করল এবং কলোনির ফসলখেতে, টুকরো-টুকরো জমিতে আর ফলবাগানে শুরু করল কাজ করতে। 'এ-সবই আমাদের' — এই যৌথ চেতনা ক্রমেই বিস্তৃততর হয়ে উঠতে লাগল, ছেলেরা শুরু করল তাদের এলাকার আশপাশের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি জঙ্গলগুলো পাহারা দিতে আর কলোনিমুখো যে-

সড়কে প্রায় প্রতিরাত্রেই রাহাজানি আর খুনখারাপি চলছিল সেখানেও খানিক তফাতে-তফাতে তারা পাহারা বসিয়ে দিল। স্থানীয় ধনী কুলাক আর ঘরে-তৈরি ভোদ্‌কা চোলাইকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন পর্যন্ত শুরু করে দিল তারা।

স্কুলে কলোনি-বাসিন্দাদের যে-লেখাপড়া শেখানো হোত, বিশেষ করে নানা বই থেকে তাদের যা পড়ে শোনানো হোত তা তাদের পুনঃশিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রচুর বইপত্র পড়ত ছেলেমেয়েরা, অনেক সময় এজমালি শোবার ঘরগুলোয় তেলের কুপির আলোয় পরস্পরকে জোরে-জোরে বই পড়ে শোনাত পর্যন্ত। কলোনি-জীবনের প্রথম বছর শীতকালে তারা, যাকে বলে, একনিশ্বাসে 'গিলেছিল' পুশকিন, করোলেঙ্কো, মামিন-সিবিরিয়াক, ভেরেসায়েভ ও বিশেষ করে গোর্কির নানা রচনা। গোর্কির আত্মজীবনীমূলক দুটি গল্পগ্রন্থ 'আমার ছেলেবেলা' ও 'পৃথিবীর পথে শিক্ষানবিশি'র পাঠ শুনে ছেলেমেয়েরা ভারি মুগ্ধ হয়েছিল। দুনিয়ার আর সবকিছু ভুলে গিয়ে একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে তারা বই দুখানার পড়া শুনত। ওদের কাছে গোর্কির নিজের জীবনকাহিনীও বলেছিলেন মাকারেঙ্কো। প্রথম তো ওরা সে-কাহিনী বিশ্বাসই করতে পারছিল না, পরে যখন শুনল যে কাহিনীটা যথার্থ তখন আনন্দে বলে উঠেছিল: 'অ, গোর্কি তাইলে আমাদেরই মতন ছেলেন? মাইরি, দারুণ ব্যাপার তো!'

'জীবনজয়ের পথে' বইটিতে মাকারেঙ্কো লিখছেন: 'মাক্সিম গোর্কির জীবন আমাদেরই জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াল যেন। সে-জীবনকথার নানা ঘটনা আমাদের জীবনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে তুলনার উপাদান হয়ে উঠল, হয়ে উঠল

নতুন-নতুন নামকরণের সংগ্রহক্ষেত্র, তর্কবিতর্কের পশ্চাৎপট এবং মানবিক মূল্যবোধ পরিমাপের তুলাদণ্ডস্বরূপ’।*

যৌথ জীবন সংগঠনে ব্যবহৃত নতুন-নতুন ও অত্যন্ত মৌল ধরনের সব পদ্ধতি শিগগিরই অত্যন্ত কার্যকর বলেও প্রমাণিত হল। কলোনির ভিত্তিস্বরূপ তার প্রধান ইউনিট হয়ে দাঁড়াল একেক জন দলপতির নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২টি ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত একেকটি বাহিনী (স্কুলে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে অবশ্য একেকটি ক্লাসই প্রধান কাঠামোগত ইউনিট হিসেবে যে রয়ে গিয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য)। এই যৌথ সংস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ এই ধরনের স্থায়ী বাহিনীগুলি ছাড়াও তথাকথিত মিলিত বা মিশ্র বাহিনী গঠন করেও তাদের কাজে লাগানো হোত। স্বল্প সময়ের নানা কাজের জন্যে গঠিত এই শেষোক্ত বাহিনীগুলি একেকবারে এক সপ্তাহের বেশি সময় স্থায়ী হোত না, বিশেষ-বিশেষ কাজ সমাধা হলেই বাহিনীগুলি ভেঙে দেয়া হোত।

সংগঠন-সংক্রান্ত এই যে-সব নতুন নীতি মাকারেঙ্কো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছিলেন তা তাঁর রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার অন্যান্য সব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধানে হাত লাগানোও সম্ভব করে তুলল।

কলোনির দলপতি-পরিষদ প্রায় সকলকেই পালা করে মিশ্র বাহিনীগুলোর দলপতি নিযুক্ত করত। এই সমস্ত মিশ্র বাহিনীর অস্তিত্ব থাকায় স্থায়ী বাহিনীগুলির

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো — ‘জীবনজয়ের পথে’, মস্কো, পৃষ্ঠা ১৪৭।

দলপতিদের নেতাসুলভ ভূমিকা কখনই মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার সুযোগ পেত না। স্থায়ী বাহিনীর ওই দলপতিরা মিশ্র বাহিনীগুলিতে একেবারে সাধারণ সদস্য হিসেবেই কাজে যোগ দিত এবং নির্দিষ্ট কাজগুলি করার সময়ে তারা মিশ্র বাহিনীর সেইসব দলপতির হুকুম তামিল করত যারা নাকি স্থায়ী বাহিনীগুলিতে তাদেরই অধীনস্থ সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকত। এইরকম নমনীয় একটা সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ফলে এমন কি সবচেয়ে জবরদস্ত ও কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিত্বের পক্ষেও যৌথ সংস্থাটির ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কলোনি হাতে-কলমে যে-সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল সেগুলি এতখানি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষামূলক হয়ে উঠেছিল যে মাত্র বছর-দুয়েকের মধ্যেই মাকারেঙ্কো অনুভব করলেন ওইসব কাজের একটা গুরুতর তত্ত্বগত ভিত্তির যোগান দেয়া একান্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

১৯২২ সালের ২৪ অগস্ট তারিখে 'জনশিক্ষার সংগঠকদের কেন্দ্রীয় ইন্স্টিটিউট সমীপে' পেশ-করা একখানি 'আবেদনপত্র'এ শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্ত্বের মৌল দিকগুলি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যাখ্যা করে বোঝান মাকারেঙ্কো। এই আবেদনপত্রটি ছিল এইরকম: 'আমি মনে করি শিক্ষাবিজ্ঞানের কাঠামোর মৌল দিকগুলি হল নিম্নরূপ:

শিশু ও কিশোরদের যৌথ সংস্থাকে অখণ্ড জীবদেহ গণ্য করে তার প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। এ-উদ্দেশ্যে স্কুল-শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনঃসংগঠিত করা একান্ত আবশ্যিক।

ভালো একটি স্কুল গড়ে তুলতে গেলে ক্লাসে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভালো হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় এই

ধারণাটি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করা দরকার। সকল প্রকার প্রভাবকে অঙ্গীভূত করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত একটি শিক্ষা-ব্যবস্থাই ভালো একটি স্কুলের পক্ষে একেবারে প্রাথমিক ও অপরিহার্য ব্যাপার হওয়া উচিত।'*

শিক্ষাবিজ্ঞানগত তাঁর এইসব মতামত একটি পুরোদস্তুর গবেষণা-প্রবন্ধের আকারে বিস্তারিতভাবে লিখে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন মাকারেঙ্কো এবং এ-উদ্দেশ্যে জনশিক্ষার সংগঠকদের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে নির্দিষ্ট পাঠক্রম নিয়ে পড়াশুনো করতে মনস্থ করেন ও মস্কোয় চলে আসেন। কিন্তু মস্কোয় বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ফিরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ-উপরোধ জানিয়ে কলোনির ছেলেমেয়েরা তাঁকে এত চিঠি লিখতে লাগল যে আক্ষরিক অর্থেই চিঠির বান ডাকল বলা চলে। অবশেষে পোল্‌তাভার সামাজিক শিক্ষা-দপ্তর থেকে মাকারেঙ্কোকে ফিরে যাওয়ার জোর তলব পাঠিয়ে টেলিগ্রাম এসে গেল রাজধানীতে। ফলে তাঁকে ফের কলোনিতে ফিরে পেয়ে ছেলেমেয়েদের আনন্দের সীমা রইল না।

১৯২৫ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ গোর্কি কলোনি বলতে গেলে তার শিক্ষা-সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করল। ওই সময়ের মধ্যে মাকারেঙ্কোর কলোনি একটি সমৃদ্ধিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বৈষয়িক দিক থেকে তার সম্পদ ছিল পর্যাপ্ত এবং কি শিক্ষক-শিক্ষিকা কি ছাত্রছাত্রী উভয়পক্ষেরই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবন ছিল

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২ (রুশ সংস্করণ)।

তার বৈশিষ্ট্য। স্কুলের পড়াশুনোর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চলছিল আবাদে ও কলোনির নিজস্ব শুয়োরের খামারে কাজকর্ম। এছাড়া কলোনির জাঁক দেখাবার মতো ছিল নিজস্ব থিয়েটর ও নাট্যসম্প্রদায়, নানারকমের শৌখিন পেশার আসর আর একটি বাজিয়ের দল যারা পেতলের ব্যান্ড বাজাত। কলোনির বাগানটা ছিল একখানা ফুলের জাজিমের মতো আর ঘরগুলো ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম। তবে সবচেয়ে উৎসাহোদ্দীপক বস্তু ছিল কলোনি-বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা নিজেরাই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর আকর্ষণীয় পোশাক-পরা, প্রসন্ন, হাসিখুশি আর শৃঙ্খলাপরায়ণ এই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এককালের সেই গৃহহীন অনাথদের — অতীতে যাদের থেকে-থেকে এক-আধটি করে কিংবা কখনও ঝাঁকে-ঝাঁকে কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল — তাদের কিছুমাত্র মিল ছিল না।

কলোনির রাজনৈতিক হৃৎকেন্দ্র ছিল কম্‌সমোল সংগঠনটি। মাকারেঙ্কো ও তাঁর বয়স্ক ছাত্ররা দীর্ঘদিন ধরে কঠিন লড়াই চালাবার পর তবেই তাঁরা যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন সেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ মনস্থির করে উঠতে পারলেন যে কলোনি-বাসিন্দা প্রাক্তন আইনভঙ্গকারীদের কম্‌সমোল সংগঠনে নেয়া যেতে পারে। একমাত্র ১৯২৫ সালেই কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হলেন। অতঃপর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ত.ই. কভালকে প্রথম পাঠানো হল কলোনিতে। তাঁর পরিচালনাধীনে কলোনির কম্‌সমোল গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা ফেঁপেফুলে উঠে ১৯২৮ সাল নাগাদ ২৫০ জনে দাঁড়াল। এটা ছিল সেই প্রাণকেন্দ্র যা গোটা যৌথ সংস্থার মতাদর্শ ও সংস্কৃতিগত আসঞ্জনের মূলে শক্তির যোগান দিত।

১৯২৫ সালের শরৎকালে কলোনি তার পঞ্চম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করল। ওই উপলক্ষে মাকারেঙ্কো গোর্কিকে লিখেছিলেন: 'আমাদের খানাপিনা ছিল এক এলাহি ব্যাপার। খার্‌কভ থেকে আমাদের অতিথিরা এসেছিলেন। আটজন শিক্ষক-শিক্ষিতা — কলোনির প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যাঁরা রয়ে গেছেন — তাঁরা ছেলেমেয়েদের নানা উপহার দিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিশারিয়েত আমাকেও 'লাল শ্রমবীর' খেতাব দিলেন। পোল্‌তাভার লোকজন এখন দু'মাসের 'শাস্ত্রীয় কর্মবিরতি' অনুমোদন করে আমাকে মস্কো আর লেনিনগ্রাদে পাঠাচ্ছেন।'*

প্রাণবন্ত, প্রবল অগ্রগতিই ছিল যৌথ সংস্থাটির পথনির্দেশের মূলনীতি। দাঁড়িয়ে-পড়া মানেই ছিল 'নিশ্চিত মৃত্যু'। সমাজ ও শিক্ষার এই মূলনীতিটি মাকারেঙ্কো আবিষ্কার করলেন তখন, যখন মনে হল যে তাঁর পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানটি যে-লক্ষ্য সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিল তার সবকিছুই ইতিমধ্যে সে অর্জন করে ফেলেছে, এবং তখন যা করবার ছিল তা হল ইতিপূর্বে গড়ে-তোলা জীবনযাত্রা-ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলা। মাকারেঙ্কো — যিনি নাকি যৌথ সংস্থাটির মনমেজাজের ও তার দৈনন্দিন জীবনের আবহাওয়ায় সবরকম তারতম্যের দিকে সর্বদা সতর্ক নজর রাখতেন — তিনি একদিন লক্ষ্য করে অবাক হলেন যে কলোনির সদস্যরা বলতে গেলে কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন, ভবিষ্যতে

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩ (রুশ সংস্করণ)।

তাদের জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে না-যাচ্ছে সে-সম্পর্কে যেন আর তেমন তীব্র আগ্রহ বোধ করছে না তারা। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কলাকুশলী মাকারেঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন যে তখনও পর্যন্ত প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে হলেও এই অত্যন্ত বিপজ্জনক লক্ষণটি কী সাংঘাতিক তাৎপর্যের দ্যোতক। তিনি বুঝলেন, শক্তিশালী ব্যায়ামবিদকে শরীরটাকে তৈরি রাখতে হলে যেমন অনবরত ব্যায়াম অভ্যাস করা ও সমকক্ষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া একান্ত দরকার তেমনই যৌথ সংস্থাটির সদস্যদের চোখের সামনেও অবিলম্বে একটি **নতুন, আকর্ষক ও আয়াসসাধ্য লক্ষ্যবস্তু** তুলে ধরা প্রয়োজন।

অতএব কলোনির ভবিষ্যৎ কী হবে ও তার পক্ষে কোন নতুন পথ অনুসরণ করা দরকার এই প্রশ্নটি নিয়ে কলোনির সাধারণ সভায় আলোচনা হল। কিছুদিন কলোনি-বাসিন্দা প্রত্যেকটি লোক ব্যস্ত হয়ে রইল সম্ভাব্য বিকল্পগুলির মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি বেছে নেয়া যায় সেই সমস্যা নিয়ে। প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঠেকছিল উর্বর জাপরোজিয়ের স্তেপভূমির দিগন্তবিস্তৃত খোলা প্রান্তরে কলোনি স্থানান্তরণ। এইমর্মে পরিকল্পনা ছকা হচ্ছিল যে ওখানকার বিশাল-বিশাল আবাদী জমিতে চাষবাস করতে হবে ও ব্যাপক আকারে পশুপালন খামার গড়ে তুলতে হবে। তবু এই সবকিছু আলোচনার শেষ পরিণতি দাঁড়াল ভিন্নরকম, প্রস্তাব এল কলোনিটাকে কুরিয়াজে স্থানান্তরিত করার।

সেকালে ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল খার্‌কভ। আর কুরিয়াজ ছিল এই খার্‌কভ থেকে চার মাইল দূরে। পুরনোকালের একটা মঠের অনেকগুলো দালান জুড়ে বেশ বড় একটি শিশু-উপনিবেশ আগে থেকেই সেখানে

প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সদর শহরের উপকণ্ঠে থাকা সত্ত্বেও এই কলোনিটি অসম্ভবরকম অবহেলিত অবস্থায় ছিল। গোর্কির কাছে লেখা একখানা চিঠিতে মাকারেঙ্কো ওই সময়ে কলোনিটির বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে: 'কলোনিটির পরিচালনা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি সকল দিক থেকেই এর চেয়ে বেশি অবহেলা কল্পনা করাও কঠিন। এখানকার বাসিন্দা দু'শো ছেলেমেয়ে কখনও স্নান করে না বা হাতমুখ ধোয় না, সত্যি কথা বলতে কী সাবান আর তোয়ালে-যে কেন সৃষ্টি হয়েছে সে-সম্পর্কেই ওদের কোনো বোধ আছে বলে মনে হয় না। কলোনিতে কোনো পায়খানা পর্যন্ত নেই, ফলে জায়গাটাকে একেবারে নোংরা শুয়োরের খোঁয়াড় বানিয়ে রেখেছে ওরা। তাছাড়া বহুদিনই ওদের সঙ্গে যে-কোনোরকম কাজকর্ম কিংবা শৃঙ্খলার সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে।'*

এই নোংরা আবর্জনার স্তূপটাকে স্বাভাবিক একটি শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ওখানকার বাসিন্দা ছেলেমেয়েদের নোংরা নরকে কিলবিল করার হাত থেকে উদ্ধার করা এবং খারকভ শহরের একেবারে দোরগোড়ায় চোরডাকাতের এই সযত্নপোষিত আস্তানাটাকে ভেঙে দেয়ার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়াই মাকারেঙ্কোর পরিচালিত যৌথ সংস্থাটির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এই-যে সিদ্ধান্তটি গোর্কি কলোনি গ্রহণ করেছিল এতেই প্রমাণ হয় গোর্কি কলোনির ছেলেরা কতখানি উঁচু মাত্রার সামাজিক সচেতনা-অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫ (রুশ সংস্করণ)।

‘কুরিয়াজের ভারগ্রহণ’এর বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ছকে ফেলেছিলেন মাকারেঙ্কো। ১৯২৬ সালের ৯ মে তারিখে চারজন শিক্ষক আর এগারোটি ছেলে সঙ্গে নিয়ে তিনি কুরিয়াজ যাত্রা করলেন। আর এই ছোট্ট বাহিনীটি সেখানে পেঁাছে একটা সপ্তাহও কাটতে-না-কাটতে বেশ কয়েকখানা ঘর মেরামত করে ফেলল এবং প্রাথমিক যে-কাজকর্মগুলো করার দরকার ছিল তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সবচেয়ে বেশি করে মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত সৃষ্টির কাজটি, নিষ্পন্ন করল। অতঃপর ১৫ মে তারিখে গোটা পোল্‌তাভা কলোনি পুরোদস্তুর কুচকাওয়াজ করে সার বেঁধে কলোনিতে এসে পেঁাছল। দৃঢ়বদ্ধ, একাত্ম একটি ইউনিটে সংঘবদ্ধ গোর্কি কলোনি-থেকে-আসা এক শো কুড়িটি ছেলেমেয়ে, অনেকখানি পরিমাণে তাদের জটিল অথচ অত্যন্ত কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামোর দৌলতে, কুরিয়াজের জীবনে চমকপ্রদ পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটাল।

‘কুরিয়াজের ভারগ্রহণ’এর ব্যাপারে সেদিন উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল কভালের নেতৃত্বাধীন গোর্কি কলোনির কম্‌সমোল সদস্যরা। তাদের মধ্যে থেকেই সেদিন তৈরি করা হয়েছিল আদর্শস্থানীয় একটি মিশ্র বাহিনী আর এই বাহিনীটিই একীভূত এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিচালন-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল যে যে-সমস্ত ছেলেপিলে এ-ঘটনার সামান্য কিছুদিন আগেও ছিল নিছক আইনভঙ্গকারী, যাদের স্বভাবে ছিল হিংস্রতা ও পুরোপুরি আত্মসর্বস্বতা এবং যাদের ছিল জীবন সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তারা আচমকা কোন অলৌকিক উপায়ে সমবয়সী অন্য ছেলেপিলের সামনে এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন শুরু করে

দিল? যে-নতুন সমাজতান্ত্রিক জগতে ওরা জীবনধারণ শুরু করেছিল এই আচমকা ডিগবাজির পেছনে সেটা নিশ্চয়ই একটা নির্ধারক কারণ ছিল। সেইসঙ্গে গোটা দেশকে যা অধিকার করে ছিল নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির সেই পুলক-শিহরণ এবং উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রয়াসের সর্বব্যাপী মেজাজও এর মূলে ছিল। তবে ওই একই সঙ্গে আবার আদি কুরিয়াজ কলোনির মতো কিছু-কিছু প্রতিষ্ঠানও থেকে গিয়েছিল দেশে। আবার এটাও অনস্বীকার্য যে পোল্‌তাভা কলোনিতে অবস্থা যা ছিল কুরিয়াজের পরিস্থিতি ছিল তার তুলনায় অনেক গুণে ভালো। কেননা কুরিয়াজ ছিল বড় একটা শহরের কাছাকাছি, আর্থিক-বৈষয়িক নানা সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে বেশি সম্ভব ছিল, শহরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে ছেলেপিলেদের সংযোগ ঘটানোও ছিল সহজসাধ্য। কুরিয়াজ-কলোনির আদি শিক্ষকদের হাতের কাছে এই সবক'টি সুযোগসুবিধেই ছিল, কেবল মাকারেঙ্কো গোর্কি কলোনির যৌথ সমাজের প্রশিক্ষণ যে-সমস্ত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন ওই শিক্ষকদের সেগুলি আয়ত্তে ছিল না।

মাকারেঙ্কোর শিক্ষাদানের সাফল্য অবশ্য কার্যক্ষেত্রে কারও পক্ষে অস্বীকার করার উপায় ছিল না, তবু তখনও পর্যন্ত প্রায়ই তাঁর পদ্ধতিগুলির কড়া সমালোচনা করা হচ্ছিল। এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল তাঁর সংগঠনগত উদ্‌ভাবনাগুলি সম্পর্কে। ক্লাসের বদলে কেন তিনি 'বাহিনী'কে সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন? চিরাচরিত মনিটরের বদলে কেন তিনি 'দলপতি'দের খাড়া করেছিলেন? ছাত্রছাত্রীদের কমিটি না-গড়ে কেন গড়েছিলেন 'দলপতিদের' পরিষদ? শিক্ষাবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকদের কথা

তো বাদই দিলুম, শিক্ষাদপ্তরের সরকারি কর্মচারিরা, এমন কি কম্‌সমোল সংগঠনের কিছু-কিছু নেতা পর্যন্ত মাকারেঙ্কোর মুখের ওপর এই ধরনের সমস্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছিলেন। ধৈর্যসহকারে মাকারেঙ্কো তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন নিজের অনুসৃত পদ্ধতিগুলির সুবিধের কথা, তবে বেশির ভাগ সময়েই এতে ফল হোত উল্‌টো।

সেই সময়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাকারেঙ্কোর উদ্‌ভাবিত ও সূত্রবদ্ধ সমস্ত তত্ত্ব ও প্রয়োগকে মূল্য দিতেন ও তাদের কার্যকরতা বুঝতেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইউক্রেনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের এক পদস্থ মহিলা-কর্মচারি। তাঁর নাম গালিনা সাল্‌কো। আগ বাড়িয়ে মাকারেঙ্কোকে সাহায্য করতেন তিনি, তাঁর ধ্যানধারণাকে প্রবল উৎসাহউদ্দীপনা নিয়ে সমর্থন জানাতেন, সত্যিকার বন্ধুর মতো উৎসাহ যোগাতেন তাঁকে। ১৯২৭ সালে তিনি মাকারেঙ্কোর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

কুরিয়াজ 'অভিযান'এ লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করায় মাকারেঙ্কো শেষপর্যন্ত এই স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পোল্‌তাভা কলোনিতে তিনি যে-সমস্ত পদ্ধতির উদ্‌ভাবনা ঘটিয়েছিলেন সেগুলি অত্যন্ত কার্যকর এবং সেগুলির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। নিজের উদ্‌ভাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্যকরতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েই ১৯২৭ সালে মাকারেঙ্কো প্রস্তাব করলেন যে, খার্‌কভ অঞ্চলের ১৮টি শিশু ও কিশোর কলোনিকে একত্র করে একটিমাত্র সংহত সংগঠনের কাঠামোভুক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবটি ছিল অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তাৎপর্যের দ্যোতক সামাজিক পুনঃশিক্ষাদান-সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা।

তবে এই লক্ষ্য সম্পূর্ণ পূরণ করার সুযোগ মাকারেঙ্কোর মিলল না।

১৯২৭ সালেরই গ্রীষ্মকাল থেকে দ্জের্জিন্স্কির নামাঙ্কিত নবগঠিত খার্কভের উৎপাদনী কমিউনটিরও প্রধান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন মাকারেঙ্কো। এই প্রধানের পদে তাঁর চরম নিয়োগকে অল্প কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখলেন তিনি একমাত্র এই কারণে যে তাঁর পরিচালিত প্রাক্তন গোর্কি কলোনিতে তখন গোর্কির পরিদর্শনে আসার কথা ছিল। দীর্ঘপ্রতীক্ষিত এই প্রিয়তম অতিথিকে কলোনির পক্ষ থেকে স্বাগত জানানোর অধিকারটুকু কয়েকটা দিনের জন্যে খোয়াতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না তিনি।

১৯২৮ সালের ৮ জুন গোর্কি কলোনি-পরিদর্শনে এলেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, এমন কি স্বয়ং মাকারেঙ্কোর জীবনেও এটি ছিল সবচেয়ে স্মরণযোগ্য, সবচেয়ে দুর্লভ একটি ঘটনা। আর একমাত্র 'জীবনজয়ের পথে'র লেখক ছাড়া আর কার পক্ষেই-বা ওই স্মরণীয় দিনটির এমন চমৎকার বর্ণনা দেয়া সম্ভব?.. মাকারেঙ্কো লিখেছেন, 'আর তখন দিনগুলো হয়ে উঠেছিল চমৎকার, ভারি সুখের দিন ছিল সে-সব। সপ্তাহের কাজের দিনগুলো আমাদের যেন সাজানো ছিল ফুল দিয়ে, দিনগুলো ভরে ছিল শ্রমে আর হাসিখুশিতে, আমাদের স্পষ্ট পরিষ্কার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার আশ্বস্তিতে, প্রাণভরা বন্ধুত্বে-নিবিড় কথাবার্তায়। দায়দায়িত্বের ভাবনাচিন্তা আমাদের ওপর যেন পেখম মেলে ছিল রামধনুর মতো, আর আমাদের কল্পনা আর স্বপ্ন সার্চলাইটের মতো আকাশ চিরে-চিরে ফিরছিল।

'আর আসন্ন উৎসবের আগে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমনই পরিপূর্ণ আনন্দ আর আশা নিয়েই আমরা এগিয়ে চললুম উৎসবের দিকে, আমাদের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মহোৎসবের দিকে।

'অবশেষে বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি এসে পড়ল।

'সেদিন খুব ভোরবেলা থেকেই কলোনি ঘিরে যেন এক-ধরনের মেলা বসে গেল — ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ল মোটরগাড়ি আর দলে-দলে এলেন শহরের লোক, শাসন-কর্তৃপক্ষ আর রীতিমতো এক-ব্যাটালিয়ন সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার আর ফিল্‌মের লোক। কলোনির দালানগুলো সাজানো হয়েছিল পতাকা আর মালা দিয়ে, গোটা জায়গাটা ছেয়ে দেয়া হয়েছিল ফুলে-ফুলে। বেশ কিছুটা ফাঁক দিয়ে-দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছিল ছেলেদের, আখ্‌তিরের বড়রাস্তায় অতিথিকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্যে পাঠানো হয়েছিল ঘোড়সওয়ারদের আর কলোনির উঠোনে মজুত রাখা হয়েছিল অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে কুচকাওয়াজের দলটিকে।

'দীর্ঘদেহী, মাথায় শাদা ক্যাপ-চড়ানো গোর্কি এসে মোটরগাড়ি থেকে নামলেন, চারদিকে তাকালেন একবার, ঝাঁপালো, শ্রমজীবীশোভন গোঁফজোড়ায় কাঁপা-কাঁপা হাতে আঙুল বোলালেন, তারপর হাসলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল উনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন — সন্তশোভন একখানি মুখ আর বন্ধুর চোখ নিয়ে সামনে-দাঁড়ানো ওই মানুষটি।

''কী খবর, কেমন আছ? এরা সব তোমারই ছেলেপিলে নাকি? বটে? আচ্ছা, চল, যাওয়া যাক তাহলে!'

'পতাকা-অভিবাদন, ছেলেদের হাতের স্যালুট ঠোকার আওয়াজ, তাদের উৎসাহ-প্রদীপ্ত চোখ, তাদের উন্মোচিত

হৃদয় — আমাদের অতিথির পায়ের নিচে গালিচার মতো এ-সবই মেলে ধরা হল পায়ে দলে যাবার জন্যে।

'সার-সার ছেলেমেয়ের সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন গোর্কি...'

কলোনিতে তিনটে দিন কাটালেন গোর্কি, আর ওই গোটা সময়টাই কাটালেন অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সংসর্গে। আর সন্ধেবেলাগুলোয় গোর্কি আর মাকারেঙ্কো উভয়ের পক্ষে আগ্রহোদ্দীপক নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনায় ব্যয় করলেন।

১৯২৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে মাকারেঙ্কো দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি উৎপাদনী কমিউনে পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করলেন।

তন্নিষ্ঠ বিপ্লবী ফেলিক্স দ্‌জের্‌জিন্‌স্কির স্মরণে উৎসর্গ করার জন্যে এই নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছিল। দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি ছিলেন 'চেকা'র* প্রথম অধিকর্তা। দেশের সমস্ত গৃহহীন অনাথ ছেলেপিলেকে আশ্রয় ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনার যে-বিপুল রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তারও উদ্যোক্তা ছিলেন তিনিই। খার্‌কভের উপকণ্ঠে বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই বেশ কয়েকখানি বাড়ি তৈরি করা হয় আর ওই বাড়িগুলিতেই গড়ে ওঠে কমিউন। বাড়িগুলিতে ছিল আলো-হাওয়ায় ভরা বড়-বড় ক্লাসরুম, স্নানের ঘরে ধারাস্নানের ব্যবস্থা আর ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ও

---

* চেকা — প্রতিবিপ্লব, অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম ও ফাটকা খেলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিশেষ অতিরিক্ত কমিশনের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

পড়াশুনোর কাজে লাগে এমন সবকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে-ঠাসা বেশ কয়েকটা ভাঁড়ারঘর। এই সবকিছু তুলে দেয়া হল গোর্কি কলোনির ষাটজন প্রাক্তন বালসদস্যের হাতে। মাকারেঙ্কোর সঙ্গে তারাও এই কলোনিতে বদলি হয়ে এসে নতুন পটভূমিতে সেই প্রাক্তন যৌথের জীবনই যাপন করতে লাগল।

মাকারেঙ্কো কিন্তু ভারি অবাক হয়ে গেলেন এই দেখে যে, যাঁরা এই নতুন কমিউনটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের জীবন যাতে ফলপ্রদভাবে ও সুখেস্বচ্ছন্দে কাটে তার জন্যে আগ বাড়িয়ে সবকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু কমিউনের উৎপাদন-সংক্রান্ত সঞ্জীবনী ভিত্তিটি যোগাতেই ভুলে গিয়েছিলেন। কমিউনের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তৈরি আদিম ধরনের কয়েকটা ওয়র্কশপই ছিল একমাত্র কলঘর যেখানে কমিউনের সদস্যরা হাতে-কলমে কিছুটা কাজ করতে পারত। কিন্তু দেখা গেল এ-সমস্যারও একটা সমাধান জুটে গেছে। চাওয়ামাত্র মাকারেঙ্কো কলোনির জন্যে এমন একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতি-সংক্রান্ত পরিচালক পেয়ে গেলেন যিনি দ্রুত ওইসব ছোটখাট ওয়র্কশপে জোড়াতাড়া-দেয়া কিছু-কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়ে বাজারে তখন কম মিলছিল এমন কিছু-কিছু জিনিসপত্র তৈরি শুরু করে দিলেন। আর এই প্রচেষ্টার বাণিজ্যিক সাফল্য এমন মাত্রায় গিয়ে পেঁছিল যে ১৯৩০ সালের জুন মাস থেকে কমিউনটি পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াল।

এর পরের বছর ব্যাঙ্ক থেকে দাদন হিসেবে টাকা পেয়ে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই কমিউন বৈদ্যুতিক ড্রিল বানানোর জলজ্যান্ত আস্ত একটা ফ্যাক্টরিই তৈরি করে

ফেলল। এইসব নতুন ধরনের এবং সেকালের দিনের পক্ষে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি তার আগে চিরকালই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে আসছিল, অথচ এই ড্রিল তৈরির কারিগরি কৌশল কমিউনের বালসদস্যরা মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলল। যে-ছেলেপিলেরা ড্রিল তৈরির যন্ত্রপাতিগুলো চালাচ্ছিল তাদের বয়স ১৩-১৪ বছরের বেশি ছিল না।

আবার এর পরের বছরই কমিউনের সদস্যরা ৩৬ মিলিমিটার ফিল্‌মের 'ফেদ' ক্যামেরা উৎপাদনের উপযোগী বড় একটা নতুন কারখানা বানিয়ে ফেলল। আর ১৯৩২ সালের ২৮ ডিসেম্বর কমিউনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পূর্বাহ্নে প্রথম ঝাঁক ক্যামেরা গেল তৈরি হয়ে।

উপরোক্ত ওই ফ্যাক্টরিগুলি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কমিউনটিতে শ্রমের মধ্যে দিয়ে পুনঃশিক্ষার ব্যাপারটা উৎপাদনী কাজের মধ্যে দিয়ে পুনঃশিক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ, শিক্ষাদানের একেবারে উচ্চতম স্তরে উঠে গেল কমিউনটি। স্কুলের পড়াশুনো আর উৎপাদনের কাজ পালাক্রমে করার ফলে (দৈনিক চারঘণ্টা সময় ফ্যাক্টরিতে আর পাঁচঘণ্টা ক্লাসরুমে কাটানোর ফলে) কমিউনের সদস্যরা কেবল-যে লেখাপড়াতেই ভালো ফল দেখাল ও নিজেদের সেরা শিল্প-শ্রমিক হিসেবে প্রমাণ দিল তাই নয়, প্রচুর বইপত্র পড়ার ও খেলাধুলো করার মতো সময়ও পেল তারা এবং ক্রমে উঁচু স্তরের রাজনৈতিক সচেতনতার অধিকারীও হয়ে উঠল।

কমিউনটি যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেইভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করার ফলে তার সদস্যরা শুধু-যে

কৌতূহলোদ্দীপক জীবনযাপনেই সমর্থ হচ্ছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৈষয়িক সম্পদও সৃষ্টি করছিল। ওদের কাজের দরুন রাষ্ট্রের বাৎসরিক নিট লাভ হচ্ছিল ৫০ লক্ষ রুব্‌ল। এছাড়াও এই লাভের টাকাতেই স্কুল চালানোর যাবতীয় খরচখরচা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, খাওয়া-থাকার খরচা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কমিউনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিদান এবং খোদ ফ্যাক্টরিগুলোকে চালু রাখার খরচ ইত্যাদি সবকিছুই কুলিয়ে যাচ্ছিল।

কমিউনের ছেলেপিলেরা পরিচ্ছন্ন ফিটফাট পোশাক-আশাক পরত। গোটা ইউক্রেনের মধ্যে সবচেয়ে সেরা পেতলের ব্যান্ডের সাজ-সরঞ্জাম ছিল তাদের। অপেশাদার শিল্পীচক্রগুলির পরিচালনার কাজে পরামর্শ লাভের জন্যে তারা প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাত প্রথম শ্রেণীর যতসব অভিনেতা-অভিনেত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পীদের। আর প্রতিবছর গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপন ও সফর ইত্যাদির বন্দোবস্ত বাবদ দুলক্ষ রুব্‌ল এবং থিয়েটরের টিকেট কেনা বাবদ চল্লিশ হাজার রুব্‌ল ব্যয় করত।

গোর্কি কলোনির মতো এখানেও, দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনেও, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল কম্‌সমোল সংগঠন। ১৯২৮ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে কমিউনে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালের মার্চ মাস নাগাদ কম্‌সমোলটির সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তরে। ওই সময়ে মাকারেঙ্কো লেখেন যে কম্‌সমোল সংগঠনটি কমিউনের যৌথ জীবনে সত্যিকার পথনির্দেশক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।*

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৪ (রুশ সংস্করণ)।

সে-সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অঞ্চল ও এমন কি বিদেশ থেকেও যে-অসংখ্য অতিথি কমিউন পরিদর্শনে আসতেন তাঁরাও ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাদের স্বায়ত্তশাসনের অত্যন্ত উন্নত ব্যবস্থা, গোটা যৌথ সংস্থার হয়ে নির্দেশদানের যোগ্যতা, বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরও ব্যক্তিস্বার্থের ওপর যৌথ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষমতা, তাদের মর্যাদাবোধ, যৌথ জীবন সম্পর্কে তাদের মনে গর্বের ভাব, তাদের ফলপ্রসূ সংগঠন এবং তাদের আশাবাদ। এই সমস্ত এবং আরও নানা বৈশিষ্ট্য প্রমাণ দিচ্ছিল যে কলোনিটির সামাজিক পরিপক্বতার মাত্রা যুগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। বস্তুত, মাকারেঙ্কোর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের কলাকৌশল দেশের তৎকালপ্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে বেশ কয়েক দশক এগিয়ে ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গোর্কি কলোনি ও দ্জের্জিন্স্কি কমিউন দুই জায়গাতেই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাকারেঙ্কোর অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে ধারণা ও তার সঠিক মূল্যায়নের চাবিকাঠি নিঃসন্দেহেই যৌথ জীবন সম্বন্ধে মাকারেঙ্কোর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নিহিত। বিশেষ করে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে মাকারেঙ্কো তাঁর এই তত্ত্বটি বিকশিত করে তোলেন। এই তত্ত্বের কিছু-কিছু মূল পূর্বানুমান বিস্তারিতভাবে আলোচনার যোগ্য।

ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে আবশ্যিকভাবেই একটি অন্তর্বর্তী যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যোগসূত্র হিসেবে সংযোগের এই কাজটা চালাবে বিশেষভাবে তৈরি একটি সামাজিক কোষকেন্দ্র, অর্থাৎ

একটি যৌথ সংস্থা। আর এই সামাজিক কোষকেন্দ্রেই আমরা পাব বীজাকারে সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য মূল লক্ষণগুলি। এর অর্থ, যৌথ সংস্থাটিই সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট বাস্তব উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সংস্থাটির সদস্যদের মনে এই চেতনার জন্ম দেবে যে সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ অভিন্ন। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, এই যৌথ সংস্থা সমষ্টির স্বার্থের পরিপোষক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পথ সুগম করবে।

মাকারেঙ্কোর ধারণায় যেমন খোদ সমাজতান্ত্রিক সমাজ তেমনই এই যৌথ জীবনযাপনও ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়ার আগে এ-ধরনের যৌথ জীবনের অস্তিত্ব ছিল না এবং তা থাকা সম্ভবও ছিল না। দুনিয়ার ইতিহাসে নানা ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে একমাত্র ১৯৩২ সালেই এই সিদ্ধান্তে আসেন মাকারেঙ্কো।

আবার এ-থেকেই মাকারেঙ্কো এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সমাজে তার সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু-কিছু ধরনের পারস্পরিক পরমুখাপেক্ষিতাই ওই সমাজে যে ঠিক কোন ধরনের শিক্ষাদান প্রয়োজন তার প্রকৃতি নিরূপণ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল সমষ্টির স্বার্থের পরিপোষক এই নীতির ভিত্তিতে, যে-নীতি অনুযায়ী সমাজে প্রতিটি সদস্যের সুখসৌভাগ্য ছিল প্রত্যক্ষত অন্য সকলের সুখসৌভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল, আবার সমষ্টির সুখসৌভাগ্য প্রতিটি ব্যক্তির সুখসৌভাগ্যের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্থিরীকৃত। এই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ও পরস্পরনির্ভরতা গড়ে তোলার প্রস্তুতি প্রথমত ও প্রধানত

যৌথ সংস্থায় মিলিত জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়েই কার্যকর হয়ে ওঠে।

যৌথ সংস্থাকে মাকারেঙ্কো গোটা সমাজ-কাঠামোর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে দেখছিলেন যার মধ্যে বৃহত্তর সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক সকল প্রকার সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটছিল। অতঃপর তিনি সমাজ ও যৌথ সংস্থা এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বললেন, সমগ্রভাবে সমাজের সঙ্গে যৌথ সংস্থার পার্থক্য হল এইখানে যে যৌথ সংস্থা হল প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা একটি ইউনিট। অর্থাৎ, যৌথ সংস্থার সদস্যরা প্রত্যক্ষ সম্পর্কস্থাপন ও পরস্পরনির্ভরতার সূত্রে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মনোযোগ দেয়া ও প্রত্যেকের কাছে পৌঁছনোর নীতিকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে যৌথ সংস্থা প্রবল যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে।

হাতে-কলমে কাজ দেখিয়ে মাকারেঙ্কো প্রমাণ দিলেন যে, যৌথ সংস্থাকে একমাত্র গড়ে তোলা যেতে পারে সমাজের পক্ষে অবিসংবাদীরূপে যা প্রয়োজনীয় সেই কাজকর্মকে ভিত্তি করে। সমাজবিরোধী কাজকর্ম চালানোর উদ্দেশ্যে খাড়া-করা এহেন ইউনিটকে কখনই যৌথ সংস্থা আখ্যা দেয়া চলে না।

মানুষ নিজেই ঘটনা ও পরিস্থিতিকে গড়ে আর তারই প্রভাবে আবার নিজেকেও ঢেলে সাজায় — এই মার্কসবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাকারেঙ্কো যৌথ সংস্থাকে এমন একটা কোষকেন্দ্র হিসেবে গণ্য করতেন যা নাকি আপনা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপ পরিগ্রহ করে না, বরং স্বেচ্ছাধীন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ যা গড়ে ওঠে।

যৌথ সংস্থার অপর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল তার সমষ্টিগত অধিকারগুলিকে রক্ষা করার যোগ্যতা। এই অধিকারকেই মাকারেঙ্কো যৌথ জীবনের সার্বভৌমত্ব আখ্যা দিয়েছেন। এই সার্বভৌমত্ব কায়েম করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি বনাম যৌথের সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে।

মাকারেঙ্কোর কাছে যৌথ জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও স্বাধীন বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। 'ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হলে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ চেনা ও তার উন্নতিসাধন ঘটানো দরকার। ব্যক্তিবিশেষরা যদি আমার মনে যৌথ জীবনের ব্যাপক ত্রিমাত্রিকতা হারিয়ে মটরশুঁটির আলাদা-আলাদা দানার মতো ছড়িয়ে থাকে, যৌথ জীবনযাত্রার এই মাপকাঠি ছাড়া যদি আমি তাদের সম্মুখীন হই, তাহলে কখনই তাদের সঙ্গে এঁটে উঠব না',* লেখেন মাকারেঙ্কো।

ইশ্‌কুলের বয়সী ছেলেমেয়েদের অনবরত এক যৌথ সংস্থা থেকে আরেক সংস্থায় তাঁর ভাষায় 'টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে বেড়িয়ে' শিক্ষাদানের যে-ব্যবস্থার চল ছিল দেশে তাতে মাকারেঙ্কো বিভ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়তেন। এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে কোনো একটি ছেলেকে হয়তো লেখাপড়া শিখতে হোত একটি যৌথ সংস্থায়, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হোত তার দ্বিতীয় একটি সংস্থায়, খেলাধুলো করতে ছেলেটিকে যেতে হোত তৃতীয় একটি সংস্থায় আর পাইওনিয়র প্রাসাদে যোগ দিতে যেতে হোত অপর বা চতুর্থ একটি সংস্থায়। 'এই সমস্ত যৌথ সংস্থার মধ্যে ছেলেটি

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪ (রুশ সংস্করণ)।

চরকির পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, এদের কোনো একটিকে সে বেছে নিচ্ছে সকালবেলা, কোনো একটিকে সন্ধেয় আবার অপর কোনো একটিকে দুপুরের খাওয়ার সময়।'* এর ফলে কোনো ছেলেই কোনো একটি বিশেষ যৌথ সংস্থার কাছে জবাবদিহি করার জন্যে দায়ী বলে নিজেকে মনে করত না এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোনো বৃহত্তম স্বার্থ তার চোখে পড়ত না বা সে তা গ্রাহ্যও করত না। আর এই ব্যাপারটা সমষ্টির স্বার্থের পরিপোষক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ গড়ে তোলার পথে একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো ব্যক্তিবিশেষ যদি সর্বদা সবচেয়ে সুবিধেজনক জায়গার সন্ধানে ফিরতে থাকে, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো বুনিয়াদি যৌথ সংস্থার অংশবিশেষ যদি না হয় সে, তাহলে সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থের কথা তো বাদই দিলুম, এমন কি কোনো যৌথ সংস্থার স্বার্থের সঙ্গেও তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সামঞ্জস্য ঘটানো সঠিকভাবে শিক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে।

যে-কোনো ধরনের দায়িত্বশীল কাজের মতো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও চরম নির্ধারক কথা বলার অধিকার ন্যস্ত থাকা উচিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর। এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এই অধিকার প্রয়োগ করার পক্ষে স্কুলই হল সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। স্কুলগুলিতেই নিযুক্ত আছেন শিক্ষা-ব্যাপারে যতসব উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ এবং সামাজিক শিক্ষার ধারণাটি অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে স্কুলের কাজকর্মের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩ (রুশ সংস্করণ)।

পূর্ণাঙ্গরূপে অঙ্গীকৃত। পূর্বোক্ত সার্বভৌমত্বের নীতির ধারকবাহক হিসেবে একটি বুনিয়াদি যৌথ সংস্থার অস্তিত্ব নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষাদানের বিপদ চিরতরে দূর করে দিতে সমর্থ।

মাকারেঙ্কো যখন স্কুলের যৌথগুলির অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়োজনের স্বপক্ষে তথ্যপ্রমাণাদি উপস্থাপিত করলেন তখন তা করলেন কমিউনিস্টশোভন শিক্ষা ও চারিত্র্যগঠনের মূল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই। এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে-ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিবারের সঙ্গে থাকলেও শিশুদের লালনের ব্যাপারে স্কুলের প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের অধিকার থাকবে এবং অমনোযোগী বাপ-মাকে শাস্তি দেবারও অধিকার থাকবে তার।

মাকারেঙ্কোর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থির ছিল যে স্কুলের যৌথগুলি ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাকে সাহায্য যোগাবে এইভাবে: যথা, শিক্ষাদান-সম্পর্কিত বইপত্র ও পুস্তিকা যুগিয়ে, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করে, নিয়মিতভাবে এ-সবের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে, সন্তান লালনপালনে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে যথাক্রমে পুরস্কার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এবং ছেলেপিলের বাপ-মায়েদের বাসস্থলে বিশেষ-বিশেষ বাড়ির সমস্ত ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ছেলেমেয়েদের লালনের জন্যে উপযুক্ত নির্দেশদানের ব্যাপারে তাঁদের যৌথভাবে দায়িত্ব দিয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছেলেপিলের বাবা-মা'র মধ্যে অনবরত সংযোগরক্ষার ব্যবস্থা করে।

মাকারেঙ্কো পরামর্শ দেন যে, পাইওনিয়র প্রাসাদগুলিতে পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে শিক্ষাদানের

ক্ষেত্রেও স্কুল-কর্তৃপক্ষের পরিচালনক্ষমতা সম্প্রসারিত হওয়া দরকার, এবং এই তত্ত্বাবধান একই রকম সম্প্রসারিত হওয়া উচিত অপেশাদার শিল্পীগোষ্ঠী, খেলাধুলোর ক্লাব ও পাইওনিয়রদের ছুটি কাটানোর শিবিরগুলিতে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে। স্কুলগুলিকে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার অধিকার অর্পণ করলে এবং স্কুলগুলি সে-অধিকার বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে প্রয়োগ করলে যুক্তিসিদ্ধভাবে সংহত নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন সুনিশ্চিত এবং সেই পদ্ধতিটি ক্লাসরুমের ভেতরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সহজ হয়ে উঠবে।

যৌথ সংস্থার একটি আদর্শ নমুনা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাজ করার সময় মাকারেঙ্কো এই নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হন যে, স্কুলের ক্লাসরুমের পটভূমিতে শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি যা ও যে-পরিমাণে তা গড়ে ওঠে সোভিয়েত স্কুলশিক্ষকদের উদ্দিষ্ট শিক্ষার সবক'টি লক্ষ্য সর্বাঙ্গীণভাবে পূরণের পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

আগেই বলেছি, ক্লাসরুমের মধ্যে গড়ে-ওঠা ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বৃহত্তর পরিপূরক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপযোগী সাংগঠনিক নানা ধাঁচের সন্ধান গোর্কি কলোনিতে থাকতে ইতিপূর্বেই মাকারেঙ্কো শুরু করে দিয়েছিলেন। ওখানেই এগুলি রূপ পেয়েছিল স্থায়ী ও মিশ্র নানা ধরনের বাহিনী ও দলপতি-পরিষদের মধ্যে দিয়ে। তবে গোর্কি কলোনির দুটি অবধারিত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেখানকার বাসিন্দা

ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়সের তফাত ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং সামগ্রিক কর্মসূচিতে পুথিগত পাঠ্য বিষয়ের ভূমিকা ছিল সম্পূরক মাত্র। অপরপক্ষে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের অঙ্গীভূত ছিল পূর্ণাঙ্গ একটি দশবছুরে স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে তরুণ কর্মীদের তৈরি করে তোলার উপযোগী বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা ('রাবফাক')। এছাড়া কমিউনটিতে ছেলেমেয়েদের বয়সের তারতম্য যে-কোনো সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলের উঁচু থেকে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বয়সের পাল্লার অনুরূপই ছিল। এইসব পরিবর্তন যৌথ সংস্থার কাঠামোর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। আগের কলোনির আদি 'বাহিনীগুলি' থেকে প্রাথমিক যৌথের কাজকর্ম হস্তান্তরিত হয়েছিল নানা বয়সের ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত নতুন যতসব বাহিনীর পরিচালনায়। এইসব নতুন-গড়া বাহিনী ছিল দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে মাকারেঙ্কোর সংগঠন-সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কাজের মানসসন্তান।

এই সমস্ত নতুন বাহিনীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং এদের সংগঠন-সংক্রান্ত নীতিগুলির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ একটি পরিবারের জীবনযাপন ও তার যে-সব আচারবিধির সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলির অনেকখানি মিল লক্ষ্য করা যেত। বাহিনীগুলির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সদস্যরা অল্পবয়সীদের দেখাশোনার ভার নিত, ক্লাসের পড়াশুনোর ব্যাপারে বাড়ির টাস্ক করতে সাহায্য করত, কীভাবে নিজেদের কাজকর্ম করতে হয় তা শেখাত আর অল্পবয়সী দেখে অন্য যে-সব বড় ছেলেপিলে তাদের পীড়ন করার চেষ্টা করত তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াত এই বয়স্ক সদস্যরা। এভাবে বাহিনীগুলির অল্পবয়সী সদস্যরাও বড়

ছেলেমেয়েদের আদর্শ অনুসরণ করে তাদের সমকক্ষ হওয়ার প্রয়াস পেত। বড়দের সাহায্যে তারা নিজেদের পড়াশুনোর পরিধিবিস্তার ঘটাত এবং প্রয়াস পেত সামাজিক আচরণের ঐতিহ্যসিদ্ধ ধরন আত্মস্থ করতে।

প্রাথমিক যৌথ সংগঠনগুলির, অর্থাৎ নানা বয়সের ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত বাহিনীগুলির সাহায্যে কমিউনের পুনর্গঠন সংগঠিত করার ফলে **শিক্ষা-সংক্রান্ত সমান্তরাল অভিঘাত** সৃষ্টির সুযোগসুবিধের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হয়ে উঠল। নতুন এই ব্যবস্থার মর্মকথাটুকু হল এই যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অমুক বা তমুক ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে জনমত গড়ে না-উঠে প্রথমত ও প্রধানত তা গড়ে উঠত পূর্বোক্ত ওই প্রাথমিক যৌথ সংগঠনগুলি সম্পর্কেই।

কলোনি বা কমিউনের মতো যৌথ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে বয়সের ব্যাপক তারতম্যসুদ্ধ একেকটা বাহিনীর পার্থক্য ছিল এই যে সাধারণ অর্থে যাকে বলা হয় অবসরকালীন যৌথ ক্রিয়াকলাপ বাহিনীর তরফ থেকে তা সংগঠিত করা হোত না। যেমন, একসঙ্গে সিনেমা দেখা, গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাওয়া কিংবা এমনকি খেলাধুলো পর্যন্ত সংগঠিত করত না বাহিনী। বরং এর প্রতিটি সদস্যের স্বাধীনতা ছিল তার অবসরসময় যেমন খুশি তেমনভাবে কাটানোর, তবে তার আগে বাহিনীর দলপতিকে তার জানাতে হোত যে বাড়ির সমস্ত পড়া সে শেষ করেছে ও তার ওপর আরোপিত সবক'টি দায়দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে সে।

যেমন গোর্কি কলোনিতে তেমনই দ্জের্জিন্স্কি কমিউনেও স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কার্যনির্বাহী সংস্থা ছিল দলপতি-পরিষদ।

সর্বপ্রথম মাকারেঙ্কোর উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থাটির কর্তৃত্বের অধিকার ও প্রভাবের ব্যাখ্যা নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বলেন যে তাঁর এই ব্যবস্থাপনার 'রহস্য' নিহিত আসলে তাঁরই রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের শক্তির আকস্মিক স্ফুরণের মধ্যে, আবার অন্যদের মতে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হল বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের রোমাণ্টিক প্রেরণা, 'দলপতি' শব্দটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ এবং শিক্ষক হিসেবে মাকারেঙ্কোর উচ্চস্তরের দক্ষতা। তাঁর হাতে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার উপযোগী যে-কোনো ধরনের সংস্থাই নাকি একই রকম কার্যকর হোত।

এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিতর্কের অন্তরালে নিহিত সত্যটিকে খুঁজে বের করতে হলে আরও অনেক গভীরে তল্লাস চালানো দরকার। দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে মাকারেঙ্কোর তৈরি দলপতি-পরিষদ ছাত্র-সমিতি, শিশু-সমিতি, মনিটরদের পরিষদের সঙ্গে এবং স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার উপযোগী অন্যান্য ধরনের সংগঠনের তফাত ছিল এই দিক থেকে যে, দলপতি-পরিষদটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েকে তার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত প্রাথমিক যৌথ সংগঠন বা বাহিনীগুলি প্রায়শই যেহেতু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা পরিচালনা করত এবং তারাই আবার দলপতি-পরিষদের সদস্য হোত, সেইহেতু গোটা যৌথ সংস্থাটিই সত্যিকার নেতৃত্ব পেত, অপরপক্ষে এটিই আবার স্বাভাবিকভাবে দলপতিদের কর্তৃত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াত।

যৌথ জীবন নিয়ে সংগঠন শুরুই হয় সম্মিলিত লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে তোলা থেকে। এ-প্রসঙ্গে মাকারেঙ্কো

লিখেছেন, ‘এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে যদি কোনো যৌথ সংস্থা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে না-নেয় তাহলে তার পক্ষে সংগঠন পরিচালনার উপযুক্ত নীতিও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি যৌথ সংস্থাকে কাজ করে যেতে হবে একটি সাধারণ যৌথ লক্ষ্য অর্জনে — আর এই সাধারণ লক্ষ্যটি সুনির্দিষ্ট কোনো একটি ক্লাসের উদ্দিষ্ট হলে চলবে না, তা হওয়া চাই গোটা স্কুলেরই সাধারণ উদ্দিষ্ট।’*

গোটা যৌথ সংস্থার বিকাশের তিনটি স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সাধারণ যৌথ লক্ষ্যকেও তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে বিশদ করে তোলা হয়েছে।

একটি যৌথ সংস্থা যখন প্রথম গড়ে তোলা হচ্ছে সেই একেবারে প্রাথমিক স্তরে সাধারণ লক্ষ্যের সাংগঠনিক দিকটি অনুভূত হবে প্রধানত নানারকম লক্ষ্যবস্তুর — **স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যৎ উদ্দিষ্টের** — প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। স্কুলের একদল ছেলেমেয়ের পক্ষে এই স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের একটা উদাহরণ হতে পারে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বা চড়ুইভাতিতে যাওয়া, দল বেঁধে সিনেমা বা থিয়েটর দেখা কিংবা শৌখিন পেশার নানা গোষ্ঠীতে মজাদার খেলাধুলো ও কাজকর্ম চালানোর জন্যে একটা সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ‘তবে স্বল্পমেয়াদী এইসব লক্ষ্যকে কেবলমাত্র খেলাধুলো ও মজাদার কাজকর্মভিত্তিক করে তোলার কথা ভাবলে গুরুতর ভুল করা হবে — তা সে আনন্দের মধ্যে যতই চারিত্র্যগঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপাদান থাকুক-না কেন। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে রক্ষণাধীন

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, ‘রচনাসমগ্র’, মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬ (রুশ সংস্করণ)।

ছেলেপিলের মধ্যে আমরা শুধু ক্ষমার অযোগ্য সেই মনোভাবটিকেই উৎসাহ যুগিয়ে চলেছি যাকে বলা চলে নিছক আমোদ-আহ্লাদের, ভোগবাদের মনোভাব।'* স্বল্পমেয়াদী উদ্দিষ্টের মধ্যে কিছু পরিমাণে পরিশ্রম, কিছু পরিমাণে শ্রম-বিনিয়োগের ব্যাপারও থাকা একান্ত দরকার।

কোনো একটি যৌথ সংস্থা একবার তৈরি ও সংহত হয়ে উঠলে, একবার তার অভ্যন্তরীণ জনমত আগের চেয়ে বেশি পরিণত ও সব ব্যাপারে বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠলে তবেই বুঝতে হবে যে **অন্তর্বর্তী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রাগুলি** পুরোপুরি প্রবর্তনের সময় উপস্থিত হয়েছে। যৌথ সংস্থাটিকে তখন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে সেইসব কাজকর্মের জন্যে যেগুলি তার অন্তর্বর্তী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কোষকেন্দ্র হিসেবে গণ্য। এরই সূচনা হিসেবে বেশকিছু পরিপূরক কাজকর্মও শুরু করে দেয়া যেতে পারে, যেমন, চলতি কাজকর্মের আলোকচিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা, সাফল্য সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করা, কাজের পরিদর্শক অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঘরগুলোকে বিশেষভাবে সাজানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ-বিশেষ সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (এ-ধরনের উৎসব বছরে দুই কি তিন বারের বেশি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়) স্কুলযৌথের জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত এবং এ-উপলক্ষে স্কুলের প্রায় সব ক'জন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রবল সৃষ্টিশীল কাজকর্মের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা দরকার।

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬ (রুশ সংস্করণ)।

দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রাগুলির প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত একাধারে স্কুলযৌথ ও সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্কুলের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় মনস্কতা। 'আমাদের গোটা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও তার অগ্রগতিই একটি যৌথ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সংগঠনের কাজে চূড়ান্ত স্তর হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতে যে কী আছে শুধু তা-ই যে আমাদের জানতে হবে ও তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে ও পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হবে তা-ই নয়, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দিয়ে দেশের অগ্রগতি, তার কাজকর্ম ও তার সাফল্যগুলিকেও পূর্বানুমানের গোচর করতে হবে। আজকের দিনে সোভিয়েতের শিশু ও কিশোর-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অল্পবয়সী যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে লালিত হচ্ছে তাদের ভালো করে জানতে হবে আমাদের পিতৃভূমির বিপদ আসছে কোন দিক থেকে এবং কারা তার বন্ধু, কারাই-বা শত্রু। আমাদের সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অংশবিশেষ হিসেবে ভাবা ছাড়া তারা যেন নিজেদের জীবনকে কল্পনা করতেও না-শেখে।'*

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তার প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতাই মাকারেঙ্কোর মতে সেই ব্যক্তি জীবনযাপনের পক্ষে উপযুক্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণ লাভ করেছে কিনা তা বিচারের একটি অপরিহার্য শর্ত।

'মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-গুণগুলিকে আমরা সচরাচর মূল্য দিয়ে থাকি তা হল তার শক্তি ও সৌন্দর্য।

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১ (রুশ সংস্করণ)।

এই দুটি গুণই নির্ধারিত হয় জীবনের যে চরম লক্ষ্যের দিকে মানুষটি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সে-সম্পর্কে তার বিশেষ মনোভঙ্গি দিয়ে। যে-মানুষ স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অনুযায়ী নিজের আচার-আচরণকে পরিচালিত করে সে হল দুর্বলতম মানুষ। আর লোকটি যদি বৃহত্তর স্বার্থের দিকে না-তাকিয়ে ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্যপূরণেই নিজের প্রয়াসকে নিয়োজিক করে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার সে লক্ষ্য যতই দীর্ঘমেয়াদী হোক ও তাকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী বলে মনে হোক, তার চমৎকার ব্যক্তিত্ব ও সেই ব্যক্তিত্বের সত্যিকার মূল্য সম্পর্কে চারপাশের মানুষের প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয় সে। কিন্তু যদি সে এমন কোনো যৌথ জীবনের অংশীদার হয় যে-জীবনের সামগ্রিক লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের পৃথক-পৃথক লক্ষ্যগুলিও অঙ্গীকৃত, তাহলে সেই যৌথ জীবনযাত্রা যত ব্যাপকতর হয় সেই বিশেষ ব্যক্তিটিও তত চমৎকার ও শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়।'*

বলা বাহুল্য, শিক্ষাদানের উপরোক্ত এই ফলাফল নিশ্চয়ই কেবলমাত্র সামাজিক বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ ও মহৎ লক্ষ্যনির্দেশ কিংবা কর্মকৌশলের দিক থেকে ওই ধরনের লক্ষ্যগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দিলেই অর্জন করা সম্ভব হয় না। যৌথ সংস্থার মধ্যে সঞ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবেই এমন সব মানুষ তৈরি হয় যাদের কাছে সমষ্টির ও ব্যষ্টির স্বার্থ ও লক্ষ্য অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রয়োজন দেখা দিলে যারা তাদের

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪ (রুশ সংস্করণ)।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে যৌথ স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে। সেইসঙ্গে, এই মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে যৌথ যে-কোনো সংস্থার পক্ষে সঠিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হওয়া, সমৃদ্ধ ও আগ্রহোদ্দীপক জীবন যাপন করা এবং বিকাশের অব্যাহত ধারার অঙ্গীভূত হওয়াও একান্তই আবশ্যিক।

নিজের আরব্ধ কাজে বহুবিধ সাফল্য অর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাকারেঙ্কো লিখেছেন: 'এ-কথাটা ভুলবেন না যে যে-পরিস্থিতিতে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল তার সঙ্গে সাধারণ একটি স্কুলের অবস্থার আকাশপাতাল পার্থক্য। এর কারণ আমার ছেলেপিলেরা জীবনযাপন করত যৌথ ভিত্তিতে, যুক্ত ছিল উৎপাদনী কাজের সঙ্গে এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই পরিবার বলতে কিছু ছিল না — অর্থাৎ, অন্য কোনো যৌথ জীবনের অংশী ছিল না তারা। ফলে স্বভাবতই যে-কোনো স্কুলের চেয়ে আমার পক্ষে ছেলেপিলেদের যৌথ জীবনযাপনে শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ ছিল অনেক বেশি।'* অবশ্য মাকারেঙ্কো পরে এটাও প্রমাণ করেছিলেন যে সঠিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করে তুলতে পারলে শুধুমাত্র কোনো কলোনি বা কমিউনের পরিবেশে নয় অতি-সাধারণ একটি স্কুলেও শিক্ষা ও জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ মারফত যথাযোগ্য একটি যৌথ জীবন গড়ে তোলা সম্ভব।

যৌথ একটি সংস্থায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সংস্থাটির অগ্রগতি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মাকারেঙ্কো বিশেষ ও নির্ধারক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ওপর-থেকে-চাপানো

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০-১২১ (রুশ সংস্করণ)।

শাসন ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে কড়াকড়িভাবে একটি দ্বান্দ্বিক ভারসাম্য রক্ষা করার ওপর। তাঁর মতে, এই ভারসাম্য কোনোরকমে বিচলিত হলে তার ফলাফল খুবই দুর্ভাগ্যজনক হতে বাধ্য। স্বায়ত্তশাসনের তাৎপর্যকে খাটো করে দেখলে কিংবা স্বাস্থ্যবর্ধক অবাধ জনমতের অভাব ঘটলে ওপর-থেকে-চাপানো শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাপ্রয়োগের বাড়াবাড়ি, অর্থাৎ ক্ষতিকর আধিক্য ঘটতে পারে এবং তা যৌথ জীবনকেই ব্যক্তিসত্তার অবদমনের হাতিয়ার করে তুলতে পারে। আবার অপরদিকে যৌথ সংস্থার পরিচালন-কেন্দ্র ও নেতৃত্ব যদি বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে তার ফলে ব্যক্তিকেন্দ্র নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যৌথ জীবনের অভ্যন্তরীণ সঞ্জীবনী যোগসূত্রগুলি ছিন্ন হয়ে যেতে পারে ও যৌথ জীবনদেহেই ঘনিয়ে আসতে পারে 'ক্ষয়'।

কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করার নীতিকে সমর্থন করেন মাকারেঙ্কো। তিনি বলেন, একমাত্র ডিরেক্টরই কোনো স্কুলের বৈধ নেতা হতে পারেন। এছাড়া অন্য সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে 'একইরকম, অভিন্ন ভূমিকা পালন করা ও পরস্পরের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখা'* একান্ত দরকার।

স্কুল যৌথকে খেলার মেজাজে 'আক্রান্ত' করা দরকার। শিশুদের যৌথ জীবনে খেলাধুলো শুধু-যে ছাত্রছাত্রীদের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুবিবেচনাপ্রসূত প্রভাববিস্তারের একটি মাধ্যম তা-ই নয়, শিশুদের সংগঠিত

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯১ (রুশ সংস্করণ)।

করতেও কাজে লাগে তা। প্রতিটি খেলারই নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, আর শিশুরা এমন কি বড়দের চেয়েও বেশি করে এইসব নিয়মকানুনকে মর্যাদা দেয় আর মেনে চলে। দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে এই ধরনের বহুতর নিয়মকানুন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে টিকে গিয়েছিল। কমিউনটির সদস্যরা যা-কিছু করত, যে-কোনো ফন্দি আঁটত বা মাথা খাটিয়ে যে-কোনো কৌশল উদ্ভাবন করত, তার সবকিছুই প্রকাশ পেত ভারি মজাদার, আকর্ষক খেলাচ্ছলে। অথচ একই সঙ্গে তাদের এইসব খেলায় সর্বদাই সত্যিকার আন্তরিকতার সাক্ষাৎ মিলত, বিশেষ-বিশেষ কাজের সঙ্গে জড়িত পরিশ্রমের প্রতি দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত নিঃসন্দেহে।

'যৌথ একটি সংস্থায় ঐতিহ্যের মতো আর কোনো কিছুই সবাইকে অমন একসঙ্গে বেঁধে রাখে না।' মাকারেঙ্কোর এই উক্তিটি যৌথ সংস্থা সংগঠনের ও তার কাজের সবচেয়ে মূলগত নীতির একটিকে ভাষা দিয়েছে। নানা ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার অন্তঃসারটি মূর্ত হয়ে ওঠে, আর এইসব ঐতিহ্য লালনের মধ্যে দিয়েই যৌথ সংস্থার অতীতকে যেমন জীবন্ত করে তোলা চলে তেমনই সঠিক আচার-আচরণের নিয়মকানুনগুলিও গড়ে ওঠে।

নতুন সমাজতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে শিশুপালনের ব্যাপারটির দিকেও মনোযোগ দেন মাকারেঙ্কো। এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব মতাদর্শ তিনি ব্যাখ্যা করেন 'বাবা-মা'র জন্যে বই' (১৯৩৭) ও 'শিশুদের শিক্ষা-সম্পর্কিত বক্তৃতাবলী' (১৯৩৮) নামের বইদুটিতে।

এক্ষেত্রে, প্রথমত ও প্রধানত, মাকারেঙ্কো সোভিয়েত

জনশিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পরিবারের ভূমিকা যথাযথভাবে নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, শিশু তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নানা ধরনের যে-সমস্ত প্রভাবের অধীনে আসে এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাদের সে নিজেই ক্রমশ আরও জটিল করে তোলে পরিবারের কর্তব্য ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা হল সেই প্রভাবসমষ্টিকে নিয়মিত ও সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

সোভিয়েত পরিবারের শিক্ষাদান-সম্পর্কিত ভূমিকাকে মাকারেঙ্কো সমাজের সংশ্লিষ্ট ভূমিকার সম্প্রসারণ হিসেবে দেখেছিলেন।

সমাজের প্রতি তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা এবং নিজেদের ও শিশুসন্তানদের সুখী জীবনের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে বাপ-মায়েদের প্রথমেই উচিত ছেলেমেয়েদের চাহিদাগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। বাচ্চার প্রতিটি আবদারকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা বলে মনে করা ভুল। এ ভুল করলে তা খেয়ালখুশিকে প্রশ্রয় দেয়া ও সবরকম শোচনীয় পরিণতি সহ বায়না ও বদমেজাজের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলার সামিল হবে।

সাধারণত বাপ-মায়ের একটিমাত্র সন্তানই তার সবরকম চাহিদা, এমন কি অত্যন্ত বাড়াবাড়িরকমের দাবিদাওয়া পূরণের শিকার হয়ে থাকে। 'এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের "স্নেহ"ঘটিত অস্বাভাবিক দুর্বলতাই বিপদের সম্ভাবনাকে কিছুপরিমাণে হ্রাস করতে পারে।'*

পরিবারের মধ্যে শিশুসন্তানদের সার্থকভাবে মানুষ করে তোলার পক্ষে একটি নির্ধারক শর্ত হল পারিবারিক

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১ (রুশ সংস্করণ)।

জীবনের গোটা আবহাওয়া। শিক্ষাদানের পদ্ধতি যতই সঠিক ও সুবুদ্ধিপ্রসূত হোক না কেন তা শক্তিহীন ও অক্রিয় হয়ে পড়ে যদি বাবা-মা'র সম্পর্কের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধার অভাব ঘটে, কিংবা পারস্পরিক আকর্ষণ, সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও বিবেচনার ঘাটতি দেখা যায় সেই সম্পর্কের মধ্যে। বস্তুত, ছেলেমেয়ের ওপর বাপ-মায়ের অধিকারের মাত্রা কতখানি হবে সে-প্রশ্নের মূল নিহিত তাঁদেরই আচার-আচরণ ও পরিবারের জীবনযাপনের শৈলীতে — যার সঙ্গে নাকি বাবা-মা'র কাজকর্ম, ধ্যানধারণা, অভ্যাস, আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত। ছেলেমেয়ের ওপর অধিকার বজায় রাখতে হলে বাবা-মাকে অবশ্যই 'সোভিয়েতভূমির নাগরিকশোভন পূর্ণ, সচেতন ও সৎ জীবন যাপন করতে হবে। এর অর্থ, এমন কি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাঁদের আচার-আচরণে কিছুটা উন্নত নৈতিক মান বজায় রাখতে হবে। তবে এই উন্নত মান অবশ্যই স্বাভাবিক ও মানবিক হওয়া চাই, বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে তা কৃত্রিম, বানানো কোনো ভঙ্গি হলে চলবে না।'*

সুস্থ, স্বাভাবিক শিশুপালনের অপর সকল অনুকূল পূর্বশর্তের সঙ্গে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন, তাদের আবেগ-অনুভূতির জগৎ ও আন্তর অভিজ্ঞতার সঙ্গেও বাপ-মায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাটা একান্ত অপরিহার্য। বাপ-মায়ের অধিকার ও কর্তৃত্ব যদি 'মিশরের মমির মতো শিশুর জীবনের একটা অলঙ্কার ও অনড় অংশমাত্র হয়, শিশুর মুখাবয়ব, তার অঙ্গভঙ্গি, হাসি, ভাবনাচিন্তা আর চোখের

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো ১৯৫৭-১৯৫৮ চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১, (রুশ সংস্করণ)।

জল যদি আপনার চোখ এড়িয়ে যায়, শিশু যদি তার বাবার মধ্যে সমাজ-সচেতন নাগরিকটিকে চিনে উঠতে না-পারে — তাহলে যে-কোনোরকম ক্রোধপ্রকাশ বা চাবুকের হাতিয়ারে সুসজ্জিত হোক না কেন বাপের কর্তৃত্বফলানো তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে।'*

মাকারেঙ্কোর মতে, একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই শিশুদের একটি সুন্দর ও যথাযথভাবে সংগঠিত সময়সূচি মেনে চলতে শেখানো উচিত। আগে-থেকে-ঠিক-করা একটি কর্মসূচি অনুযায়ী জীবনধারণের অভ্যাস মানুষের মধ্যে নিজের কাছ থেকে কাজ আদায়ের মনোভাবকেই বাড়িয়ে তোলে। 'প্রতিদিন যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা ইচ্ছাশক্তিকে জোরদার করে তোলার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এতে নিজেকে নিয়ে সোহাগ করা, কম্বলের তলায় শুয়ে দিবাস্বপ্ন দেখার পথ বন্ধ হয়। খাবার সময় ঘড়ি ধরে টেবিলে হাজিরা দেয়া সন্তানের মায়ের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি ও অন্যান্য লোকজনের প্রতি সম্মান দেখানোর লক্ষণ। আত্মসম্মানবোধেরও লক্ষণ এটি। বস্তুত সকল প্রকারের সময়নিষ্ঠার অর্থই শৃঙ্খলারক্ষা এবং বাপ-মায়ের অধিকারবোধের প্রতিও সম্মানজ্ঞাপন। অতএব এটি যৌন-বিষয়ক শিক্ষাও বটে।'**

পারিবারিক শিক্ষা সহ সকল প্রকার শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হল সঠিক নৈতিক ধ্যানধারণা ও সদাচারকে উৎসাহ যোগানো। আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রেই এগুলিকে আবার কমিউনিস্ট নৈতিকতার ধরনধারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে

---

* ওই, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২।

** ওই, পৃষ্ঠা ২৪৯।

হয়। এই লক্ষ্যপূরণ যে-কোনো পরিবারেরই করায়ত্ত হতে পারে যদি সে-পরিবারে বাবা-মা তাঁদের শিক্ষাদান-ব্রতের মহৎ দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকেন, এই কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রেও তাঁদের কাজ যদি প্রথমত ও প্রধানত যথাযথ জ্ঞাননির্ভর হয়।

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাকারেঙ্কো কিয়েভ শহরে বদলি হলেন ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় জন-কমিশারিয়েতের উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত কমিউনগুলির ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের সহকারী প্রধান হিসেবে। এখানে এসে মাকারেঙ্কো নিজের বাঁধা কাজের গণ্ডি ডিঙিয়ে প্রাণপণে প্রয়াস পেলেন গোর্কি কলোনি ও দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে থাকতে সঞ্চিত তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে যথাযোগ্য কাজে লাগাতে এবং অন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির মতো অনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ও পুনর্বাসনের কাজে ব্যাপৃত ছিল তাদের কাছে উপরোক্ত অভিজ্ঞতাকে পুরনো নজির হিসেবে তুলে ধরতে। এই নতুন পদে বহাল থাকার সময়েই গুরুত্বপূর্ণ নজির-সম্পর্কিত গ্রন্থ হিসেবে তিনি বিখ্যাত 'শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠনের পদ্ধতিসমূহ' নামের বইখানি লেখেন।

কিয়েভে থাকার সময়েও মাকারেঙ্কো দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান নি। স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় জন-কমিশারিয়েতের অধীন উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত কলোনিগুলির অপেশাদার শিল্প-সমিতিসমূহের সারা-ইউক্রেন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি বিশেষ কুচকাওয়াজে যোগ দেবার জন্যে কমিউনটির ছেলেমেয়েদের যে-বাহিনীটি কিয়েভে আসে তার নেতৃত্ব দেন তিনি স্বয়ং।

যে-বছরগুলি তিনি ওই কমিউনে কাটান তা এই মহান শিক্ষাবিদের জীবনে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা-সম্পর্কিত প্রবল কর্মানুষ্ঠানের এক বিশেষ যুগ হয়ে দেখা দেয়।

১৯৩০ সালের গোটা শরৎ ও শীতকাল জুড়ে তিনি '১৯৩০-এর জয়যাত্রা' নামে একখানি বই লেখেন। বইখানি ছিল দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের জীবন সম্বন্ধে টুকরো-টুকরো চিত্রের একখানি সংগ্রহ। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। মর্মস্পর্শী ভাষায় বইখানির সমালোচনা করেন গোর্কি। সুদূর সোরেন্তো থেকে তিনি লেখেন: 'প্রিয় আন্তন সেমিওনভিচ, গতকাল আমি তোমার '১৯৩০-এর জয়যাত্রা' বইখানা পড়ে ফেলেছি। বইখানা আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে, আনন্দে ভরে তুলেছে আমার মন। কমিউন ও সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছ তুমি। বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা বাচ্চাদের প্রতি তোমার ভালোবাসায়, তাদের কল্যাণসাধনে তোমার অক্লান্ত প্রয়াসে এবং বাচ্চাদের হৃদয়মন সম্পর্কে তোমার সূক্ষ্ম অনুভবনক্ষমতায় প্রাণ পেয়েছে যেন। বইখানা লেখার জন্যে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে অভিনন্দন না-জানিয়ে পারছি না।'*

১৯৩২ সালে মাকারেঙ্কো তাঁর 'ফেদ-১' নামের গল্পটি লেখা শেষ করেন। এ-গল্পে কমিউনটির পরবর্তী একটি পর্যায়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর ১৯৩৩ সালে 'উদাত্ত গম্ভীর স্বরগ্রামে' নাম দিয়ে একখানি নাটক লেখেন মাকারেঙ্কো এবং সারা-ইউনিয়ন নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী নাটকের তালিকাভুক্ত করান সেটিকে। নাটকখানি

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, 'রচনাসমগ্র', মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩ (রুশ সংস্করণ)।

বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশংসিত হয়। ১৯৩৫ সালে ছাপাও হয় সেটি। ওই সময়টায় এই সমস্ত রচনার পাশাপাশি মাকারেঙ্কো তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'জীবনজয়ের পথে' রচনার কাজও একটানা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোর্কি'র কাছ থেকে তিনি একখানি চিঠি পান। চিঠিখানি ছিল প্রকৃত বন্ধুর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় ভরা। গোর্কি তাতে লেখেন: 'প্রিয় আন্তন সেমিওনভিচ, আমার কাছে খবর আসছে যে তোমার নাকি স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে এবং কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম তোমার স্বাস্থ্যোদ্ধারের পক্ষে একান্ত দরকার। আসলে এটা আমার নিজেরই আগে বোঝা উচিত ছিল, কেননা একদিক থেকে আমি তো বাপের মতোই তোমার দিকে নজর রেখেছি। ফলে কিছু-কিছু সহজ-সরল ঘটনা আমারও খেয়াল রাখা উচিত ছিল। গত বারো বছর ধরে এমন একটা ব্যাপারে তুমি কাজ করে চলেছ যে-কাজের ফলাফল একেবারে অমূল্য। তোমার সে-কাজ যে কতখানি মূল্যবান সে-সম্বন্ধে লোকের কোনো ধারণাই নেই, আর তোমার সে-কাহিনী তুমি যদি নিজে লিখে না-যাও তাহলে কেউ কোনোদিনই সে-সম্বন্ধে কিছু জানবে না।

'অতএব প্রিয় বন্ধু, তুমি অবশ্যই গরম আবহাওয়ার কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থেকে এস আর বই লিখে ফেল একখানা, বুঝেছ!'*

শুধুমাত্র নৈতিক সমর্থন যুগিয়েই ক্ষান্ত হলেন না গোর্কি, মাকারেঙ্কোর নামে বেশ মোটা একটা টাকার অঙ্ক — পাঁচ হাজার রুব্‌লও — পাঠিয়ে দিলেন। বারবার তিনি

---

* ওই, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

লিখতে লাগলেন যে অন্য কোনো কাজ হাতে নিয়ে মাকারেঙ্কো যেন নিজের মনকে বিক্ষিপ্ত করে না-তোলেন, তাঁর কর্তব্য হবে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে অবিলম্বে একখানা বই লিখে ফেলা।

১৯৩৩ সালের শেষাশেষি 'জীবনজয়ের পথে'র প্রথম খণ্ডটি লেখার কাজ শেষ হল। ওই বছরই '১৯১৭ সাল' নামের একখানি বাৎসরিক সংকলনগ্রন্থে বইখানি ছেপে বেরুল। এই সংকলনগ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন গোর্কি। ১৯৩৪ সালের শরৎকালে বইখানির দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ করলেন মাকারেঙ্কো। '১৯১৮ সাল' নামের সংকলনগ্রন্থে সেটি ছাপা হল।

বইখানির তৃতীয় খণ্ডটি লেখা হল মাত্র আট মাসে, ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই খণ্ডটি পড়বার পর গোর্কি তাঁর অনুজ বন্ধুকে লিখলেন: '...'জীবনজয়ের পথে'র তৃতীয় খণ্ডটি আমার কাছে প্রথম দুই খণ্ডের চেয়েও মূল্যবান ঠেকেছে। কলোনি ও কমিউনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিলনের দৃশ্যটি আমার মন মজিয়েছে একেবারে। সত্যি কথা বলতে কি, গোটা বইখানাই একনিশ্বাসে না-পড়ে ফেলে নামিয়ে রাখা অসম্ভব।

'আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর তুমি।'*

গোর্কি ছাড়া অন্য বহু পাঠক-পাঠিকাও মাকারেঙ্কোকে অভিনন্দন জানালেন। দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে বয়স্ক আর বাচ্চাদের লেখা অজস্র চিঠি বন্যার স্রোতের মতো আসতে লাগল, লেখকের প্রতি গভীর সহানুভূতি আর শ্রদ্ধায় ভরা চিঠি সে-সব।

---

* ওই, পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১।

মাকারেঙ্কোর সাহিত্যকৃতি এতদিনে তার যথাযোগ্য মর্যাদা পেল। ১৯৩৪ সালের ১ জুলাই তিনি সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের সদস্য মনোনীত হলেন।

মাকারেঙ্কো জীবনের শেষ ক'টা বছর কাটান মস্কোয়। এখানে বসে অবশেষে তিনি তাঁর পুরো সময়টা শিক্ষা ও সাহিত্য-বিষয়ক রচনার কাজে নিয়োজিত করতে সমর্থ হলেন। সোভিয়েত স্কুল ও শিক্ষাদানের প্রয়োগকৌশলের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে লেখা তাঁর প্রাণবন্ত ও আগ্রহোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি একের-পর-এক 'প্রাভ্‌দা', 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল। এছাড়া পাঠকদের অসংখ্য অনুরোধে সাড়া দিয়ে নানা জায়গায় বক্তৃতাও দিতে হচ্ছিল মাকারেঙ্কোকে। একমাত্র ১৯৩৭ সালেই তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল নিচের জায়গাগুলিতে: মস্কোর ৩১০ নম্বর স্কুলের সবচেয়ে উঁচু তিনটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সামনে, মস্কোর আঞ্চলিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে, মস্কো শহরের লেখক-ক্লাবে পাঠক, লেখক ও সমালোচকদের সামনে এবং কমিউনিস্ট শিক্ষা-সংক্রান্ত ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের কাছে।

১৯৩৭ সালের শরৎকালে মস্কো রেডিও থেকে পরিবারের মধ্যে শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে মাকারেঙ্কোর আটটি বক্তৃতা পর্যায়ক্রমে সম্প্রচারিত হয়। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে রুশ ফেডারেশনের শিক্ষা-বিষয়ক জন-কমিশারিয়েতের প্রতিনিধিদের সামনেও তাঁকে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়।

১৯৩৭ সালে মাকারেঙ্কোর 'বাবা-মা'র জন্যে বই' ছেপে বেরোয় 'ক্রাস্‌নায়া নোভ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। মাকারেঙ্কোর

অন্যান্য বহু রচনার মতোই সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে লেখা এই মৌল, সৃষ্টিশীল রচনাটিতে নতুন সমাজতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে শিক্ষাদানের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক এবং ওইসব সমস্যার সমাধান কীভাবে খুঁজতে হবে তার উপায়গুলিও নির্দেশ করেছেন।

ওই সময়ে মাকারেঙ্কোর আরও একটি প্রধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়। এটি হল তাঁর 'বাঁচতে শেখা' নামের বইটি। এই বইখানিকে 'জীবনজয়ের পথে'র পরিশিষ্ট গণ্য করা চলে। এতে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। কমিউনটিকে উল্লেখ্য উন্নত নৈতিক মানে বিশিষ্ট দৃঢ়বদ্ধ একটি যৌথ সংস্থা হিসেবে দেখতে পাই এই বইটিতে — যার দৃষ্টি নিয়ত নিবদ্ধ নতুন থেকে নতুনতর লক্ষ্যে।

১৯৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারি 'সোভিয়েত সাহিত্যের বিকাশে অসামান্য প্রয়াস ও সাফল্যের' পুরস্কারস্বরূপ মাকারেঙ্কোকে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবর'এ ভূষিত করা হয়।

শেষের এই ক'টা বছর মাকারেঙ্কো এক তীব্র, প্রবল সৃষ্টিশীল জীবন যাপন করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে 'কমিউনিস্ট নীতিশাস্ত্র বিষয়ে' ও 'সাহিত্য ও সমাজ' নামের প্রবন্ধ দুটি সহ শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন তিনি। এছাড়াও তিনি চাইছিলেন 'বাবা-মা'র জন্যে বই'টিকে আরও বাড়িয়ে বড় করা, 'এক-পুরুষের পথ-পথান্তর' নামের উপন্যাসটি লেখা সম্পূর্ণ করা ও কয়েকখানি ফিল্ম-কাহিনী লেখা এবং ভাবছিলেন কমিউনিস্ট শিক্ষা সম্পর্কে একখানি মূলগ্রন্থ লেখার জন্যে তিন বছর সময় ব্যয় করবেন।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত পেশ করলেন মাকারেঙ্কো। সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের পার্টি-সদস্যদের সভায় তাঁর সদস্যপদের প্রশ্নটি আলোচনার জন্যে নির্ধারিত বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্তও হল। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৩৯ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের শুরুতে মাকারেঙ্কো খার্‌কভ গেলেন। সেখানকার শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটে 'শিক্ষা-ব্যাপারে আমার মতামত' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন এবং দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনের প্রাক্তন বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন তিনি। এইটিই ছিল জনসমক্ষে তাঁর শেষ আবির্ভাব।

১৯৩৯ সালের ১ এপ্রিল মস্কোর কাছাকাছি গলিত্‌সিনো গ্রাম থেকে সুবারবন ট্রেনে মস্কো ফেরার পথে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মাকারেঙ্কো মারা যান।

* * *

আমাদের সমাজের চিন্তাক্ষম প্রতিটি ব্যক্তি উঠতি পুরুষের ভালোমন্দের ব্যাপারে আজ যতখানি দায়িত্ববোধ করে থাকেন এমন আর তাঁরা কখনও করেন নি। মাকারেঙ্কোর জীবন ও কর্মের দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই এবং তাঁর রচনাবলীর পৃষ্ঠা ওল্‌টাই তাহলে আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক এমন বহু প্রশ্নের জবাব সেখান থেকে আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আন্তন মাকারেঙ্কোর পরিচালনায় যারা শৈশব ও কৈশোরের অংশবিশেষ কাটিয়েছে এমন প্রতিটি ছেলেমেয়েকেই

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল করে তুলতে সমর্থ, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সম্ভাব্য স্রষ্টা এবং নৈতিক চারিত্র্যশক্তি ও সুখ অর্জনে সক্ষম মানুষ বলে গণ্য করতেন এই মহান শিক্ষক। বস্তুত সুখী হওয়ার কলাকৌশল মাকারেঙ্কো আগ বাড়িয়ে তাদের শিখিয়ে গেছেন। বলেছেন: ‘আগামীকাল সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার মতো শক্তি নিজেদের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ কর।’*

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মাকারেঙ্কো স্বয়ং জীবনযাপনে ও সৃষ্টিকর্মে মেতে থেকেছেন। আর আজকেরও যে-ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি সেই সেকালে দেখে গেছেন তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে একালের স্ত্রী-পুরুষ আমরাও তাঁর মহৎ ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও অতুলনীয় কীর্তির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

ভ. কুমারিন

---

* আ. স. মাকারেঙ্কো, ‘রচনাসমগ্র’, মস্কো, ১৯৫৭-১৯৫৮, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩১ (রুশ সংস্করণ)।

আত্মজীবনের টুকরোটাকরা

বহুকাল আগে তরুণবয়সে একবার আমার ডাক পড়েছিল সম্ভ্রান্তবংশীয় এক সামন্তের পরিবারে ফেল-করা একটি ছোট ছেলেকে পড়ানোর জন্যে। গ্রীষ্মশেষের বাৎসরিক পরীক্ষার জন্যে ফের একবার যাতে সে তৈরি হতে পারে সে-কারণে আমাকে তখন গিয়ে থাকতে হয়েছিল তাদের পরিবারে। পরিবারটি গ্রীষ্ম কাটাচ্ছিল তখন আমাদের প্রদেশের সদর শহরের কাছাকাছি একটা জায়গায়, তাদের জমিদারিতে। ভালো মাইনেকড়ি আর সামন্তকর্তার পরিবারে লোকজন তাদের দৈনন্দিন জীবন কাটায় কীভাবে কাছ থেকে তা দেখার সুযোগ পাওয়া — এই দুটো ব্যাপার আমায় মনস্থির করতে সাহায্য করল। জনশূন্য, উত্তপ্ত স্টেশনটায় আমাকে নিতে এসেছিল লম্বাটে ধাঁচের প্রশস্ত ঝকঝকে একখানা ফিটনগাড়ি। কালোরঙের একজোড়া তেজিয়ান ঘোড়াকে গাড়ি টানতে দেখে আর কোচম্যানের চওড়া পিঠখানার দিকে তাকিয়ে তাক লেগে যাচ্ছিল আমার। সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের যে-জগতের কথা তার আগে কেবল বইয়ের মধ্যে দিয়েই জানা ছিল সেদিন সেই জগতে সশরীরে হাজির হতে যাচ্ছি ভেবে আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল।

যাওয়ার পথে গাড়ির মেঝের ওপর আমার পুরনো ছোট্ট স্যুটকেসটা বেহায়ার মতো লাফালাফি জুড়ে দিয়েছিল। কেমন একটা বিষণ্ণ মনখারাপের ভাব পেয়ে বসেছিল আমাকে। ভাবছিলুম, কেন মরতে-যে সামন্তদের জগতে মাথা গলানোর দুর্মতি হয়েছিল! না-জানি সে-জগতের নিজস্ব আইনকানুন, না-চিনি তাদের ফিটনগাড়ি আর মুখ-বুজিয়ে-থাকা বোবা কোচম্যানদের ধরনধারণ! এমন কি গাড়িতে-জোতা ঘোড়াগুলোর মতো কোচম্যানটাও কেমন অভিজাতসুলভ ভাবভঙ্গি প্রকাশ করছিল!

সামন্তকর্তার জমিদারিতে সেবার মাস দুই কেটেছিল আমার। তবু সেই প্রথম দিন জমিদারিতে যাওয়ার পথে যে-বিষণ্ণতা পেয়ে বসেছিল আমায়, ফিরে আসার দিনটির আগে পর্যন্ত তা আমি মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি নি। একমাত্র যখন আমি ওই একই গাড়িতে চেপে বাড়িমুখো রওনা দিলুম আর আমার পুরনো স্যুটকেসটা গাড়ির মেঝেয় এবার আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিল তখনই মনের ভার হালকা হয়ে গেল আমার। গাড়ি, কোচম্যান, দারুণ ঝলমলে আর একেবারেই আমার নাগালের বাইরেকার সামন্তকর্তার অসম্ভব বড়লোকি জীবনযাত্রা কিছুই আর তখন আমাকে পীড়ন করতে পারছিল না।

আমার কাছে ওই জগতের সত্যিই কোনো আকর্ষণ ছিল না। জারের দেহরক্ষী বাহিনীর একজন মেজর-জেনারেল আমাদের সামন্তকর্তাটি তখন দরবারে কোথায় যেন 'কর্মরত' ছিলেন, আর আমি যতদিন ওখানে ছিলুম তার মধ্যে একবারের জন্যেও নিজের জমিদারিতে উঁকি দেন নি তিনি। একমাত্র লম্বা নাকওয়ালা তাঁর ঢ্যাঙা রোগাটে স্ত্রী, লম্বানাকী দুই কিশোরী মেয়ে আর বলতে গেলে

নিয়মমাফিক আমার রক্ষণাধীন একই রকম লম্বা নাকওয়ালা তাঁর বারো-বছর-বয়সী ছোট ছেলেটি জমিদারিতে গ্রীষ্ম কাটাচ্ছিল। ওরা ছাড়া সাধারণত আরও প্রায় জনা কুড়ি লোক দু'বেলা টেবিলে খেতে বসত, কিন্তু তারা-যে কারা তা সত্যিই আমি জেনে উঠতে পারি নি। ওদের মধ্যে কিছু লোক জমিদারির মধ্যেই বসবাস করত আর বাকিরা বেড়াতে এসে দু'তিন দিন করে থেকে যেত অতিথি হিসেবে। এই শেষোক্ত লোকজনেরা সাধারণত ছিল জমিদারের পড়শী, তাদের মধ্যে কিছু-কিছু ছিল খেতাবধারীও। এইসব লোকজনকে দেখার আগে আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি যে আমাদের প্রদেশে মানুষরূপী অতখানি আবর্জনা জমে আছে।

এই গোটা দলবলের, ওদের মধ্যে প্রতিটি লোকের আত্মিক দারিদ্র্যের মাত্রা দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে জীবনে কখনও আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ঝড়তিপড়তি লোকের এমন একটা সমাবেশ দেখি নি। সম্ভবত এই কারণে ওদের কারও মধ্যে যে সম্ভাব্য অল্পবিস্তর গুণাগুণ থাকতে পারে তা লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাই ছিল না আমার।

ওদের রকমসকম দেখতে-দেখতে আমার বাবার কথা মনে না-পড়ে পারে নি। বেশ কয়েক দশ-বিশ বছর ধরে প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ফ্যাক্টরির সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়তেন তিনি। আর তার পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা যেত হাতে দুপুরের টিফিন-বাঁধা লালরঙের একটা পুঁটলি নিয়ে দু'ধারের পাঁশুটেরঙের বেড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের বালির রাস্তাটা ধরে হনহন করে হেঁটে চলেছেন। প্রতিদিন সন্ধে ছটার সময় ফ্যাক্টরি থেকে গম্ভীর মুখ আর ধুলোভরা দেহ নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরতেন, আর

বাড়ি ফিরে প্রথম যে-কাজটি তিনি করতেন তা হচ্ছে টিফিন বাঁধার লাল রুমালখানা সুন্দরভাবে পাট করে রান্নাঘরের একটা টুলের ওপর সযত্নে রেখে দেয়া। যতসব সামন্তকর্তা আর কাউন্ট, জারের দেহরক্ষী বাহিনীর যতসব মেজর-জেনারেল আর তাদের অভ্যাগত আর মোসাহেবদের থেকে কত বহু-বহু দূরের ছিল আমাদের ওই সংসার! পূর্বোক্ত ওই ব্যক্তিরা কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও মনের কোণে এ-কথাটাকে ঠাঁই দিত কিনা সন্দেহ যে সাধারণ একটা লালরঙের সুতীর রুমালও মানুষের কাছে কতখানি মূল্যবান ঠেকতে পারে, সেটাকে আস্ত আর অক্ষত রাখার জন্যে কতখানি যত্ন নেয়ার দরকার করে, টিফিন খাওয়ার পর কতখানি মনোযোগ দিয়ে রুমালটাকে ঝেড়েঝুড়ে প্রথমে চারভাঁজ ও পরে তিনপাট করে রাখতে হয়।

সেবারের সেই অভিজ্ঞতার কথা এখন যখনই আমার মনে পড়ে তখনই সামন্তকর্তার সেই পরিবারটিকে বিকট একটা পরিহাস বলে মনে হয়। মনে হয় ওরা যেন একদল অপরাধী, সর্দারকে ঘিরে ওখানে যেন জড় হয়েছিল একপাল কুঁড়ের বাদশা। ওদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি কেমন একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে আমি তখন লক্ষ্য করে যেতুম: নির্বোধ, অর্থহীন, সম্পূর্ণ অসার একটা ছিমছাম ভাব, দুপুরের আর রাত্রের ঢালাও ভূরিভোজ, সর্বত্র দামি পলতোলা কাচের বাসন আর ছুরিকাঁটার অন্তহীন সারি আর মানবজাতির পক্ষে অবমাননাসূচক বিনয়াবনত চাপরাসির দল।

এমন কি এখনও আমি ভেবে উঠতে পারি না নিছক জন্তু বনে না-গিয়ে কতকাল অমন আত্মতৃপ্ত নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করা চলে। বছরখানেক, দু'বছর কিংবা বড়জোর পাঁচ বছর? তবে নিশ্চয়ই পুরুষানুক্রমে নয়?

অথচ ওরা কিন্তু ওইভাবেই জীবন কাটিয়ে চলেছিল বংশানুক্রমে, এমন কি শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে। দিনের-পর-দিন ওরা অবিশ্রান্ত বকবক করে চলত অন্য লোকের সফল প্রচেষ্টা কিংবা ষড়্যন্ত্র নিয়ে, বিয়ে আর মৃত্যুর ঘটনা, আশাপূরণ আর আশাভঙ্গ নিয়ে, ওদের মতো অন্য আলসেদের রুচি আর তাজ্জব ধরনধারণ, তাদের জমিজিরেত কেনাবেচার কাহিনী নিয়ে।

আমার রক্ষণাধীন ছেলেটি ছিল মানসিক দিক থেকে অপরিণত। তবে আমার মনে হোত যেন ছেলেটির দিদিরা ও তার মা সামন্তগিন্নিও স্বয়ং প্রায় ছেলেটির মতোই মানসিক অপুষ্টিতে ভুগছেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, ওদের কারোই সত্যিকার মানসিক বিকাশের কিংবা এমন কি সাধারণ যোগ-বিয়োগের অঙ্ক জানারও কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন কিছু ছিল না। অর্থসম্পদ, পারিবারিক খেতাব, দরবারীদের জগতে একধরনের একটা প্রতিষ্ঠা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে বহুকালের প্রস্তরীভূত যতসব নৈতিক আর নন্দনতাত্ত্বিক অনুশাসন এবং পারিবারিক লালনের মূলসূত্রগুলো একেবারে শুরু থেকেই সেই বাচ্চা সামন্তপ্রভুটির ভবিষ্যৎও নির্ধারিত করে রেখেছিল।

অথচ এ-সমস্ত সত্ত্বেও ওই সমাজের মানুষজনের জীবনের সত্যিকার অন্তঃসার বলতে লোভ, অর্থসঞ্চয়ের জন্যে অবিরাম সদাব্যস্ত প্রয়াস এবং কেতাদুরস্ত আর ফিটফাট-ছিমছাম ভাবের পাতলা একটা আবরণের আব্রু-দেয়া সবচেয়ে আদিম ধরনের কুৎসিত ও বিতৃষ্ণা-জাগানো অর্থলিপ্সা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের যা ছিল তাতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না তারা! জায়গায়-জায়গায় রেলওয়ে লাইন পাতা হচ্ছে, চিনেমাটির বাসনের কয়েকটা ফ্যাক্টরি তৈরির জন্যে একটা

কোম্পানি গড়া হচ্ছে, বিশেষ একটা লাভজনক মুহূর্তে কেউ একজন কিছু শেয়ার বিক্রি করেছে — এ-সমস্ত খবর ওদের আগ্রহ দারুণভাবে জাগিয়ে তুলত, নিস্পৃহ ভাব কাটিয়ে উত্তেজিত করে তুলত ওদের, প্রলুব্ধ করে তুলত। অভাবিত সুযোগের কিংবা ঝুঁকি নেয়ার সম্ভাবনা অনবরত ওদের ফুসলাত কিংবা বিচলিত করে রাখত, মনস্থির করতে না-পারার জন্যে কষ্ট পেত ওরা, আবার ওদের সব কষ্টের মূলে যে দ্বিধা আর ইতস্তত ভাব ছিল তা কাটিয়ে ওঠাও ওদের ক্ষমতায় কুলোত না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ছিল এই যে সামন্ত-পরিবারটি এমন কি কিছু-কিছু ত্যাগস্বীকারেও কুণ্ঠিত ছিল না! সামন্তগিন্নি সবিস্তারে আর অশেষ হা-হুতাশ সহকারে প্রায়ই একটা ঘটনার কথা বলতেন। তা হচ্ছে এই যে একবার তাঁর কর্তার একটা বিশেষ 'কাজে' টাকার দরকার পড়ায় টানাটানির জন্যে তাঁকে প্যারিসে চিঠি লিখে পোশাকের একটা অর্ডার বাতিল পর্যন্ত করাতে হয়। আমার রক্ষণাধীন ছেলেটিও মাঝে-মাঝে খুবই দুঃখ করে বলত যে আগের বছর তাদের একখানা ইয়ট-নৌকো কেনার কথা হয়েও নৌকোখানা শেষপর্যন্ত আর কেনা হয়ে ওঠে নি।

সেবার নিজেদের শ্রমজীবী পরিবারে ফিরে আসার পর আমার দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে আমি একটা সম্পূর্ণ বিপরীত জগতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এসেছি। আর সেই জগতের লোকজন আমার পক্ষে এত দূরের আর এতই বিসদৃশ ছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর জগতের কারও সঙ্গেই ওদের কারও তুলনা করাটা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। শ্রমিক শ্রেণীর জগৎ ছিল তুলনার অতীত, বহু-বহুগুণে

সমৃদ্ধতর ও প্রাণবন্ত। আমাদের সমাজে আমি ছিলুম মানব-সংস্কৃতির সত্যিকার স্রষ্টাদের মধ্যিখানে — শ্রমিক, শিক্ষক, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র ও ছাত্রয় পরিবেষ্টিত হয়ে। সেখানে আমি ছিলুম দৃঢ় প্রত্যয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা সত্যিকার মানব-ব্যক্তিত্বে পরিবৃত হয়ে, অবিরাম আলোচনা ও সংগ্রামের জগতে ডুবে। আমার বাবার বন্ধুরা, তাঁর মতোই নিজ-নিজ পেশায় প্রবীণ, ঝানু 'ওস্তাদরা', পূর্বোক্ত ওইসব অভিজাতদের চেয়ে হাজারগুণে বেশি বুদ্ধিমান, রস-রসিকতায় ভরপুর ও মানবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন। আমাদের পরিবারের জনেক বন্ধু, খুদিয়াকভ নামে জনেক রঙ্‌মিস্ত্রি আমি বাড়ি ফেরার অল্প কয়েকদিন পরে এক রবিবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার মুখোমুখি বসে মুখখানাকে ব্যঙ্গের হাসিতে বিকৃত করে তুলে আর সামনের একটা ফোকলা দাঁত দেখিয়ে তিনি সেদিন আমায় বললেন: 'আর যদি আমারে জিজ্ঞেসা কর যে ওদের নিয়ি আমার কামটা কী, তাইলে বলি — ঝাড়ে-বংশে গোল্লায় যাউক ওয়ারা! এমন কি ওই নরখাদকগুলানের একটা যদি সারা গায়ি মধু মাখ্যে আর দুই পকেট সোনার ট্যাকায় ভরি নিয়ি আসে, তাইলেও আমি বরং পেরানটা দিব তবু তার সাথে একগেলাস ভোদকার দোস্তালিও পাতাব্য না। আমি যখন তোমার বাপের সাথে দেখা করতি আসি তখন দুই জনায় মিলি গপ্পোগুজব করি আর দুনিয়াটার দিকি এক-নজর ঠাহর করি তাকাই। তা, কী দেখি আমরা কও দেখি? আমরা দেখি, মানুষে ওসব রাজা-জমিদার বাদ দিয়ি দিব্যি চলতি পারে, কিন্তু আমাদের মতন রঙ্‌মিস্তিরিরে বাদ দিয়ি কাজ চলে কী? হুঁহুঁ বাবা, সেটি চলতিছে না! চুলায় যাউক সব! কিন্তু রঙ্‌মিস্তিরিরে বাদ দিয়ি মানুষের জেবনটা

চলব্যে কেমনে? বে-রঙ, বিরস হয়্যে যাবে-নে সবকিছু তাইলে!'

আরও পরে যখন আমি আরেকটু বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠলুম আর আরেকটু খুঁটিয়ে আমার চারপাশের জীবন লক্ষ্য করতে শিখলুম তখন — বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লবের পরে — আমি ধরতে পারলুম যে পূর্বোক্ত ওই সামন্তকর্তার পরিবার ও আমাদের বন্ধুদের পরিবারের জীবনযাপনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলও আছে। আমাদের গ্রামে সম্ভবত একমাত্র স্বয়ং স্টেশন-মাস্টার ছাড়া আর কেউই সিনিয়র ট্রেন-কন্ডাক্টর নোভাকের সমকক্ষ ছিল না। অবশ্য স্টেশনমাস্টারটির মাতব্বরির মূলে তাঁর পয়সাকড়ির জন্যে নামডাক যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ছিল তাঁর চকচকে চেহারা, ঝকঝকে ইউনিফর্ম ও তাঁর সরকারি বাসভবনের সাধারণ্যে-অজানা আড়ম্বরের খ্যাতি। তাঁর এই বাসভবনের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর যে কতখানি ছিল তা কেবল আমাদের কল্পনার বিষয় হয়েই ছিল।

অপরদিকে নোভাক অবশ্য নিঃসন্দেহে ধনীলোকই ছিলেন। তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রা এবং বাড়ির সংলগ্ন প্রকান্ড বাগানে ওই পরিবারের লোকজনের আসা-যাওয়া আর ঘোরাফেরা উঁচু পাঁচিল তুলে বাইরের জগতের চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল। নোভাকের দোতলা বাড়ির ওপরের দিকটা বাগানের পাঁচিলের ওপর ইঁটের তৈরি বেঢপ ভুঁড়ির মতো ঝুঁকে পড়েছিল। বাড়িখানার একতলায় একটা দোকানঘরে মুদিখানার ব্যাবসা চলত। এই দোকানেরও মালিক ছিলেন নোভাক। নোভাকের এই ব্যাবসার সঙ্গে

আমরা ভাইবোনেরাও অল্পস্বল্প পরিচিত ছিলুম, কারণ খুব ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা আমাদের ওখানে পাঠাতেন কেরোসিন, সূর্যমুখীর তেল, শস্তা তামাক, এইসব কিনে আনতে। দোকানটায় সাজানো এছাড়া অন্যান্য ঐশ্বর্য জালিকাজ-করা রেশমী পর্দার দৌলতে আমার বিনীত চোখের আড়ালেই থেকে গিয়েছিল। আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্য ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা সেকালে ওই 'জালিকাজ-করা রেশমী' কাপড় কথাটাই ব্যবহার করতুম।

উচ্চপদস্থ সিনিয়র ট্রেন-কন্ডাক্টর নোভাক ছিলেন রোগা চেহারার লোক আর সযত্নে একেবারে নিখুঁত-করে-ছাঁটা ছোট্ট একটুখানি পাকা দাড়ি রেখে মুখখানাকে কঠোর করে তুলেছিলেন তিনি। সপ্তাহে দু'দিন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভালোরকম স্প্রিং-লাগানো হালকা একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কোথায় যেন যেতেন তিনি। আর তখন দেখতুম তাঁর পায়ের কাছে, ঝকঝকে পালিশ-করা বুটজোড়ার পাশে একই রকম ঝকঝকে বাদামি চামড়ার একটা ভ্রমণসাথী ব্যাগ রাখা থাকত। লোকে বলত, বিনাটিকিটে ট্রেনে চেপে ধরা পড়ত যে-সমস্ত যাত্রী তাদের কাছ থেকে আদায়-করা টাকা নাকি নোভাক রাখতেন ওই ব্যাগটায়। খুব ছোটবেলায় এই বিনাটিকিটের যাত্রীদের আমার পাতালের ঐশ্বর্যরক্ষী বামন-ভুতদের মতো রহস্যময় এমন কিছু প্রাণী বলে মনে হোত যাদের ধরতে পারলে নোভাকের মতো সুখের সন্ধান পাওয়া যায়।

নোভাকের বেশ কয়েকটি সাজপোশাক-করা স্বাস্থ্যবান ছেলেপিলে ছিল। তারা যেন আমাদের বাবা-মা'র অক্ষমতাটা চোখে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দিত। সর্বদাই তারা পরে থাকত স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের ধপধপে পরিষ্কার

ইউনিফর্ম, কিছুকাল পরে তাদের কাঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিসূচক আদ্যক্ষরের ব্যাজও দেখা গেল। আমাদের গাঁয়ের রাস্তায়-রাস্তায় তারা হেঁটে বেড়াত মুরুব্বিয়ানা চালে, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে। আর তাদের ঘিরে থাকত তাদের মতোই অন্যান্য ধনী পরিবারের ছেলেপিলেরা। যেমন, গ্রামের যাজকের ছেলেপিলে এবং প্রধান হিসাবরক্ষক, স্থানীয় পুলিশম্যান, স্থানীয় আমিন ও রাস্তা-পরিদর্শকের ছেলেরা।

এই তথাকথিত 'অভিজাত সম্প্রদায়'এর ধারেকাছে ঘেঁষা সম্পূর্ণ অসম্ভব হওয়া এবং একে ঘিরে রহস্যের জ্যোতির্বলয় থাকা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছ থেকেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আদর্শ ও ধরনধারণ আমাদের শ্রমিক-পরিবারগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। এমন কি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সময়ও এই সমস্ত উঁচু সমাজের মান আমাদের পরিবারগুলিতে চালু হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে ওই সমাজের ধরনধারণটা যে কী রকম ছিল তা অস্বাভাবিকভাবে সেবারের সেই গ্রীষ্মকালে দৈবাৎ আমার জানার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। সামন্ত ভূস্বামীর প্রাসাদ থেকে রঙ্‌মিস্ত্রি খুদিয়াকভের সামান্য কুঁড়েঘরখানা পর্যন্ত এমন একখানা আস্ত মই অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছিল যে-মইখানা বেয়ে পারিবারিক জীবনযাত্রার ধাঁচ, অথবা যাকে বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুন, তা-ই আমাদের হস্তগত হয়েছিল। অবশ্য, বলা বাহুল্য, ওই দুই সমাজের মধ্যে শুধু পরিমাণগত নয় গুণগত এমন একটা বিরাট ফারাক ছিল যাকে বলা চলে শ্রেণীগত ফারাক। শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত সম্পূর্ণ পৃথক এমন একটা চারিত্রিক

ও নীতিশাস্ত্র-সম্পর্কিত আচার-আচরণের দ্বারা চালিত হোত যার অন্তঃসার ছিল মূলগতভাবে মানবিক। তবু সামন্তকর্তাটির লম্বানাকী মেয়েরা যেমন জানত যে উত্তরাধিকারসূত্রে তারা খেতাব, জমিদারি, হীরেজড়োয়া ইত্যাদি পাবে এবং ব্যক্তিগত ইয়ট-নৌকো পোষার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে পারবে, তেমনই দরিদ্র কারিগর খুদিয়াকভের মেয়ে দুনিয়াও জানত যে উত্তরাধিকারসূত্রে সে-ও কিছু সম্পত্তি পেতে যাচ্ছে: যেমন, 'এক-আলমারি' পোশাক, একটা সেলাই-কল, নিকেলের জল-করা মুণ্ডিওয়ালা একখানা খাট আর একটা গ্রামোফোন কেনার স্বপ্ন।

কারুশিল্পী ও নিচুপদের সরকারি কর্মচারিদের পরিবার সহ বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলো পূর্বোক্ত ওই নিয়মকানুন অনুযায়ী ছিল বৈষয়িক সঞ্চয়ের একেকটা কেন্দ্র। অবশ্য এই কেন্দ্রগুলো যা সঞ্চয় করত আর তাদের সঞ্চয়ের ফলাফল যা ঘটত তা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। নোভাকের বিত্ত সঞ্চিত হয়েছিল বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে আদায়-করা জরিমানা আত্মসাৎ করে, মজুরসর্দার পয়সা করত ওপর থেকে কোনো নিয়ন্ত্রণ না-থাকায় শ্রমিকদের বেতনে অ-ন্যায্য ভাগ বসিয়ে, আর রঙ্‌মিস্ত্রি খুদিয়াকভের উপার্জন ছিল দৈনিক পনেরো ঘণ্টা কাজ করার দৌলতে। ওয়র্কশপে নিজের কাজের শিফ্‌ট শেষ হবার পর খুদিয়াকভ বড়লোকদের বাড়ির মেঝেয় বার্নিশ লাগাতেন কিংবা কবরখানায় কবরের শিয়রে-বসানো লোহার তৈরি যিশুর মূর্তিতে গিল্টি করার কাজ করতেন। এই বাড়তি উপার্জনের দরকার ছিল তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে, মেয়ের বিয়ের পণ যোগাতে, 'শান্তিতে বুড়োবয়স কাটানো'র ব্যাপারটা নিশ্চিত করে তুলতে আর

পারিবারিক চালচলনে একটা সচ্ছল ভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। এইভাবে কিছু-কিছু অর্থসঞ্চয়ের দৌলতে কোনো-কোনো পরিবার সেই সামাজিক স্তরে উঠে যেতে সক্ষম হোত যেখানে সবসময়ে দারিদ্র্যে নাভিশ্বাস ওঠা থেকে রেহাই পেত তারা, এমন কি এ-ধরনের সুযোগও জুটে যেত তাদের যাতে অন্যের কাছে নিজেদের 'মানুষের মতো মানুষ' বলে জাহির করতেও পারত।

'জনশিক্ষার সংগঠকদের কেন্দ্রীয় ইন্‌স্টিটিউট'এ মাকারেঙ্কোর 'দরখাস্ত' থেকে

ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান বিভাগে ছাত্র হিসেবে আমাকে ভরতি করে নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার জন্ম ১৮৮৮ সালে, রেলওয়ে শ্রমিকের ছেলে আমি। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুলে দু'বছরের পাঠক্রম সাঙ্গ করার পর ১৯০৫ সালে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে আমি কাজ শুরু করি। ১৯১৪ সালে আমি পোল্‌তাভার শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে ভরতি হই এবং ১৯১৭ সালে সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক হয়ে বেরোই। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ক্রিউকভ রেলওয়ে ওয়র্কশপগুলির সঙ্গে যুক্ত রেলকর্মীদের ছেলেপিলেদের একটি স্কুল পরিচালনার ভার পড়ে আমার ওপর (এই স্কুলে এক হাজার পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর স্থান-সঙ্কুলান হোত)। ১৯২০ সালে পোল্‌তাভার প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আমার ওপর কিশোর অপরাধীদের একটি কলোনি সংগঠন ও তার পরিচালনার ভারার্পণ করেন।

প্রকান্ড একটা পাইনবনের মধ্যে অবস্থিত উপরোক্ত কলোনিতে পাঁচ জন শিক্ষক ও পরিচালন-কর্মী এবং আশিটি

ছেলে নিয়ে যে দ্বটো বছর আমি কাটাই তার ফলে আমার স্বযোগ ঘটে অবিশ্বাস্যরকম কঠিন পরিস্থিতিতে একটি অশেষ আগ্রহোদ্দীপক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার।

বর্তমানে এই কলোনিটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। তবে গত দ্ব'বছরে আমার যে-বিপ্বল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বেশকিছ্ব বড়-বড় প্রশ্নও উঠেছে আমার মনে, আর তাই ওই অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে আমি উৎস্বক। যে-কোনো শিক্ষাদান-কেন্দ্র থেকে বহ্ব দ্বরে এখানে বসে দৈনিক নিয়মিতভাবে ষোল ঘণ্টা করে কাজ করতে হওয়ায় কলোনিতে থেকে আমার পক্ষে ওই বিশ্লেষণে নিয্বক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এইসঙ্গে পাঠানো কাগজপত্র থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে কয়েকটি জায়গা থেকে এ-ব্যাপারে খ্ববই লোভনীয় কয়েকটি প্রস্তাব আমি পেয়েছি, কিন্তু একমাত্র মস্কোয় বসে শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণায় নিরত হওয়ার স্বযোগ পেলে তবেই তা আমি কলোনি ছাড়ার পক্ষে উপয্বক্ত ও যথেষ্ট গ্বর্বত্বপ্বর্ণ কাজ বলে গণ্য করতে রাজি আছি।

দ্বঃখের বিষয়, ভর্তি হওয়ার জন্যে মৌখিক পরীক্ষার সম্ম্বখীন হওয়ার উপয্বক্ত বলে আমি নিজেকে মনে করি না। ওই পরীক্ষায় কোন-কোন বিষয়ে কী ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে তা অবশ্য আমি জানি না, তবে সম্প্রতি কয়েক বছর প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার যে-সমস্ত বিচিত্র তথ্যাদি সম্পর্কে অতীতে আমার পড়াশ্বনো ছিল সেগ্বলি মনে-মনে ফিরেফিরতি ঝালিয়ে নেবার সবরকম স্বযোগ থেকে স্বভাবতই আমি বঞ্চিত হয়েছি। বিশেষ করে সম্প্রতি কিছ্ব-কিছ্ব বিষয় ক্লাসে পড়ানো ও তার ফলে সে-সব বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা

সঞ্চয়ের বাস্তব সুযোগ তো আমার খুবই কম ঘটেছে। ফলে এটা খুবই সম্ভব যে পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসলে নির্বাচক বোর্ডের বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ হব। আর মস্কো থেকে এইভাবে বিফল হয়ে ফিরলে সেটা আমার পক্ষে এক মারাত্মক ঘা খাওয়ার সামিল হবে: সে-আঘাত শুধু যে আমার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করবে তা-ই নয়, ভবিষ্যতে আমার পক্ষে অপরিহার্য যে-কর্মশক্তি তাতেও ভাঁটা পড়বে, এমন কি অন্য কিছু না-করে আমি যদি শুধু এই কলোনিতে কাজ করে যাই, তবুও। তদুপরি মস্কো পর্যন্ত গাড়িভাড়া যোগানোর মতো টাকা-পয়সাও নেই আমার, এই কারণেও নির্বাচক বোর্ডের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই আমায় ভর্তি করে নিন। স্কুল-কলেজে আমার শিক্ষার মান সম্পর্কে বোর্ড যাতে সামগ্রিকভাবে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারেন তার জন্যে যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি লেখাপড়া করেছি সে-সম্পর্কে 'মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে' এই শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি পুঁথিগত বিদ্যা সম্পর্কে বলতে গেলে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে আমি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মমাফিক শিক্ষালাভ করেছি।

'গণিতে' আমার কখনই তেমন আগ্রহ ছিল না, একারণে বিপ্লবের আগে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে পাঠক্রমের মধ্যে পাটীগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও পদার্থবিদ্যার যতটুকু অন্তর্ভুক্ত ছিল মাত্র ততটুকুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে বর্তমানে খালি ত্রিকোণমিতির মূল সূত্রগুলো আমার মনে আছে, বীজগণিতের বহু

উপপাদ্য আর পদার্থবিদ্যার বহু সূত্র ভুলে বসে আছি; এবং মনে হয় লগ্যারিদ্মের সারণি খুব সম্ভব ব্যবহারই করতে পারব না এখন।

'জীববৃত্তান্ত' — প্রাণী ও উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত-সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। তবে অ্যানাটমিতে আমি কাঁচা। ভূ-বিদ্যার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারও আমি ভুলে গেছি। জ্যোতির্বিদ্যা অবশ্য আমার ভালোই জানা, পোল্তাভা মিউজিয়মে এই বিজ্ঞানটি নিয়ে হাতে-কলমে আমি কাজও করেছি কিছুকাল। জ্যোতির্বিদ্যা ও সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব-ব্যাপারে আমার জ্ঞান ওই দুটি বিষয়ে আমার বালকবয়সের আগ্রহের ফল।

'জীববিজ্ঞানে' আমার ভালো পড়াশুনো আছে। ডার্উইনের সমস্ত বই আমি বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়েছি, স্মিড্ট ও তিমিরিয়াজেভের রচনাবলী এবং ডারউইনবাদের আংশিক নানা রূপান্তরের নতুন-নতুন তত্ত্বের সঙ্গেও পরিচয় আছে আমার। এই বিশেষ ক্ষেত্রে মেচ্নিকভ ও অন্যান্য লেখকের রচনার সঙ্গেও আমি পরিচিত।

'রসায়ন-বিজ্ঞানে' আমার জ্ঞান যৎসামান্য। বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফর্মুলা ভুলে গেছি আমি, তবে মোটের ওপর সূত্রগুলি ও রসায়নের সাম্প্রতিকতম দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ভালোরকম। মেন্দেলেয়েভ, মরোজভ ও র্যামসের রচনাবলী আমি পড়েছি। তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানতে আমি আগ্রহী।

'ভূগোল' সম্পর্কে আমার জ্ঞান একেবারে প্রথমশ্রেণীর, বিশেষ করে বিশ্ব শ্রমশিল্প সম্পর্কে ও তুলনামূলক ভূগোলের জ্ঞান। অর্থনৈতিক নীতি-বিষয়ক ক্ষেত্রে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি, এবং এই নীতির ক্রমবিকাশের

ইতিহাস ও এর ভবিষ্যৎ ভ্রূণাবস্থা সম্পর্কে নানা ধারণার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞান আমি পাঠ্যবই থেকে সংগ্রহ করি নি। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ভূগোল সম্পর্কে আমি আগ্রহী।

'ইতিহাস' আমার প্রিয় বিষয়। ক্লিউচেভ্স্কি ও পক্রোভ্স্কির বই প্রায়-মুখস্থ আমার। সলোভিয়েভ আমি আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়েছি। কস্তমারোভ ও পাভলোভ-সিল্ভান্স্কির গ্রন্থাবলীর সঙ্গে আমি ভালোরকমই পরিচিত। বিদেশের ইতিহাস আমি পড়েছি ভিপ্পের, আলান্দ্স্কি, পেত্রুশেভ্স্কি ও কারেয়েভের বইয়ের মারফত। মোট কথা, রুশভাষায় যত ইতিহাসের বই আছে সবই আমি পড়েছি। বিশেষ করে আমার আগ্রহ সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসে, ওই সমাজব্যবস্থার সব ক'টি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে। ফরাসি বিপ্লবের যুগও আমার ভালোই জানা। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' পড়ে আমি হোমারের কালের গ্রীসকে চিনেছি...

রাজনীতি-সম্পর্কিত অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমি তুগান-বারানোভ্স্কি ও জেলেজ্নোভের রচনাবলী পড়েছি। মার্কসেরও কিছু-কিছু বই পড়েছি আমি, তবে 'পুঁজি' পড়ি নি — কেবল তার একটি সারসংক্ষেপ ছাড়া। মিখাইলোভ্স্কি, লাফার্গ, মাস্লভ ও লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে আমি কিন্তু ভালোরকমই পরিচিত।

'যুক্তিশাস্ত্র' আমি ভালোই জানি। এক্ষেত্রে আমার জ্ঞানের ভিত্তি হল চেল্পানোভ, মিণ্টো ও ৱোইত্স্কির রচনাবলী।

'মনস্তত্ত্ব' বিষয়ে রুশভাষায় যা কিছু বই বেরিয়েছে সবই আমি পড়েছি। মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে কলোনিতে আমি একটি ল্যাবরেটরি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক অধ্যয়নের কাজ একেবারে শুরু থেকে সংগঠিত করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে এ-পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান অবদান যুগিয়েছেন পেত্রাজিত্স্কি। এঁর অনেক বই-ই আমি পড়ে ফেলেছি, তবে দুঃখের বিষয় 'আইনশাস্ত্রের তত্ত্বের রূপরেখা' বইখানি এখনও পড়ে উঠতে পারি নি। নিজেও আমি মনে করি যে 'মনস্তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে বেঁধে ফেলা' একেবারেই অ-কার্যকর একটা ব্যাপার... বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক হিসেবে স্বয়ং লাজুর্স্কির ভবিতব্য দেখে বিশেষ করে এটাই আমার মনে হয়েছে। এর আগে আমি যা কিছু বলেছি সে-সমস্ত সত্ত্বেও আমি মনে করি যে ভবিষ্যৎ এই মনোবিজ্ঞানের বিকাশের ওপরই নির্ভরশীল।

'দর্শনশাস্ত্রে' আমার জ্ঞান একেবারেই নিয়মিত রীতিমাফিক গড়ে ওঠে নি। আমি লক-এর 'বিশুদ্ধ বা পুথিগত যুক্তির সমালোচনা' বইখানি পড়েছি, তাছাড়া পড়েছি শোপেনহাওয়েরের, স্টিরনের, নিয়েট্সে ও বের্গসঁর বই। রুশ দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ করে পুঙখানুপুঙখভাবে পড়েছি আমি সলোভিয়েভের রচনা। আর পড়েছি হেগেল-এর রচনাবলীর মাত্র সারসংক্ষেপ।

'সাহিত্যের' আমি বড়ই ভক্ত। শেক্স্পিয়র, পুশকিন, দস্তয়েভ্স্কি ও হাম্সুনের রচনাবলীকে আমি সবচেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দিই। তলস্তোয়ের প্রচন্ড শক্তি সম্বন্ধেও আমি খুবই অবহিত, তবে ডিকেন্সকে কেন যেন আমার সহ্য হয় না। সম্প্রতিকালের সাহিত্যের কথা উঠলে বলতে হয়,

বর্তমানে আমি ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে শিখেছি গোর্কি ও আলেক্সেই তলস্তোয়কে। সাহিত্যের পাত্রপাত্রীদের কথায় বলতে পারি, এই বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক মাথা ঘামিয়েছি, ফলে এখন আমি ওইসব চরিত্র সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মূল্যবিচারে সমর্থ এবং ওদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিতুলনাও করতে পারি। পোল্‌তাভায় থাকতে আমাকে সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক রচনা সম্পর্কে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে বলা হোত আর প্রশ্নপত্রগুলো মোটের ওপর ভালো হোত বলেই সবাই মনে করতেন। আমি মনে করি যে সাহিত্য-সমালোচনার ব্যাপারে আমার কিছুটা (খুব একটা মস্ত কিছু নয়, তবু) সহজাত বিচারবুদ্ধি আছে...

শিক্ষাদান-সংক্রান্ত আমার নিজস্ব ক্ষেত্রে আমি বহু পড়াশুনো আর চিন্তাভাবনা করেছি। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে পড়ার সময় 'আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সংকট' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার জন্যে আমাকে একখানি স্বর্ণপদক উপহার দেয়া হয়। প্রবন্ধটি আমি ছ'মাস সময় নিয়ে লিখেছিলুম।

আ. প. সুগাককে লেখা চিঠি থেকে

গোর্কি কলোনি
২৪ মার্চ, ১৯২৩

প্রিয়বরাসু,

আন্তনিনা পাভলোভ্‌না, আপনার ১৩ মার্চের চিঠিখানি আমার মনে টাট্‌কা থাকতে-থাকতে তাড়াতাড়ি আপনাকে চিঠির জবাব দিতে বসেছি।

ক্রিউকভে থাকতে আমি কীভাবে কাজ করতুম মনে পড়ে আপনার? গত গ্রীষ্মকালটা আমি কীভাবে কাজ করেছি তাহলে তা-ও হয়ত আপনি অনুমান করতে পারবেন। আমার ওই কাজ ক্রমশ বেশি-বেশি কঠিন আর আমার পক্ষে পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমি উত্তেজনার এমন একটা চুড়োয় পৌঁছেছি যে গত প্রায় ছ'সপ্তাহ ধরে প্রতি দু'রাত্রে একরাত্রি ঘুমোচ্ছি এবং এমন কি না-ঘুমোতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। এই যে আমি এমন অশোভনভাবে আপনাকে চিঠি লিখছি, অর্থাৎ চিঠি লিখতে টাইপরাইটরের সাহায্য নিয়েছি, জানবেন এরও কারণ হল আমার ওই বর্তমান অবস্থা। এ-সবই হল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার মরণ-পণ দৌড়ের ব্যাপার। একই সঙ্গে তিনটে কি চারটে কাজ যেভাবে করতে শিখেছি তাতে আমি নিজেই ভারি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আপনার চিঠিখানি যেন আমার প্রতি স্নেহমমতার এক উচ্ছ্বসিত গানের ঝর্ণা। সাধারণ চিঠির সঙ্গে এর মিল খুব সামান্যই। চিঠিখানি এই অর্থে উচ্ছ্বাসে-ভরা বলছি যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন, মাকারেঙ্কো লোকটি বড়ই বিপত্তিতে পড়েছে আর এর একমাত্র কারণ এই যে সে সুখের ক্রিউকভ ছেড়ে কোথায় একটা কলোনিতে না কিসে যেন বনবাসে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি...

ক্রিউকভের মানুষজন যে অনবরত ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করে আসছেন এতে আমি খুবই অভিভূত। ক্রিউকভে ফের ফিরে যাওয়া আর মা-কে সাহায্য করার একটা সম্ভাবনা যে এখনও আমার সামনে উন্মুক্ত এটা ভেবেও আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু যদি বলেন আর কতদিন আমি কলোনিতে বসবাস করব ও আপনাদের সবার

মতে দুর্দশায় মুখ গুঁজে থাকব, তাহলে বলতে পারি মানুষের পক্ষে জীবনটার কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুশকিল এই যে এ-ব্যাপারটার মীমাংসা নিছক আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপরই নির্ভরশীল নয়। এখানে আসার পর নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছি আমি। আর তা যতখানি পরিমাণে সম্ভব বলে আপনারা কল্পনা করতে পারেন তার চেয়ে বহুগুণে বেশিই। এজন্যে আমায় কলোনিকেই ধন্যবাদ জানাতে হয়। ভদ্রমহোদয়া, আপনি নাটকীয় ভঙ্গিতে শুধিয়েছেন: 'কিন্তু কলোনি আপনার জন্যে কী করেছে?' বুঝলেন আন্তনিনা পাভ্‌লোভনা, আমার জন্যে যা করেছে কলোনি তা আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। আমি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছি, সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হয়ে গেছি আমি। আমার জন্মেছে পথের নিশানার বোধ, লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায়, সাহস এবং পরিশেষে, আত্মবিশ্বাস।

কলোনিতে আমার এই তিন বছরের জীবন ভবিষ্যৎ কাজে আমার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর পর আমি যে-কাজই করি না কেন, প্রথম পদক্ষেপগুলো নেবার সময়ে আমাকে সর্বদাই কলোনি-জীবনের অভিজ্ঞতার জের টেনে চলতে হবে। এটা শুধু এইজন্যেই নয় যে আমি এখান থেকে অল্পবিস্তর কিছু শিখেছি এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছি, বরং নিজেকে নিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি বলেও বটে...

এখানে আসার অর্থ দুর্দশায় পড়া — আপনার এই প্রধান বক্তব্যটি কিন্তু সম্পূর্ণতই ভ্রান্ত। আমি মনে করি শহরের বহু লোকের জীবনযাত্রার থেকে আমাদের এখানকার

জীবন অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য ও সুখের। তদুপরি, এখানে আমরা অনেক বেশি মুক্ত আর অপেক্ষাকৃত বেশি স্বনির্ভর জীবন যাপন করে থাকি। তবু বলব, এমন কি এটাও আসল কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল এটাই যে আমরা এমনভাবে কাজ করতে পারি এখানে যাতে কাজের সাফল্য নিশ্চিত হয়, কাজ করে আমরা তৃপ্তি পাই।

একথাও আপনার মনে করা উচিত হবে না যে আমার কর্মশক্তির অপব্যয় ঘটছে এখানে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এখানে আমরা এমন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত আছি যা ভবিষ্যতে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে, এবং তা যে শুধু কিশোর-অপরাধীদের এই বিশেষ কলোনি সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা নয়। আমাদের এই সংগঠনটি ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্ততপক্ষে আমাদের কলোনি-যে ইউক্রেনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি পেয়েছে এতে কোনো ভুল নেই। কলোনিতে এখন লালিত হচ্ছে ১২০টি ছেলেমেয়ে, শিক্ষা-সংক্রান্ত জন-কমিশারিয়েতের আমরা এখন সরাসরি তত্ত্বাবধানের অধীন। খবরের কাগজে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চলেছে এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যতখুশি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর — প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানোর আগে যাতে তাঁরা এখান থেকেই কাজ শিখে যেতে পারেন। ইতিমধ্যেই আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে নিজের পছন্দমতো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এখানে কাজ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর। আর বছরখানেক সময়ের মধ্যে কলোনি-যে আরও অনেক গুরুত্ব লাভ করবে এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আর এটা ঘটবে ঠিক এইজন্যেই যে কলোনি দ্রুত উন্নতি করে চলেছে। অথচ আপনি এমনভাবে কলোনির কথা উল্লেখ করেছেন যেন আমরা নিষ্কর্মা হয়ে জীবন কাটানো ছাড়া আর কিছুই করছি না এখানে।

আপনি বলেছেন, কলোনির পেছনে কর্মপ্রতিভার এতখানি 'ঐশ্বর্য' নষ্ট করার কোনো মানে নেই, বরং সে-প্রতিভা ব্যয় করা উচিত ক্রিউকভে গিয়ে... কিন্তু প্রশ্নটা তো কোথায় আমি কাজ করব — ক্রিউকভে না কলোনিতে — তা নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ধরনের একটা পরীক্ষা চালানোর ব্যাপার নিয়ে।

আপনাকে সব কথা খুলে লিখলুম। ব্যাপারটা হল গিয়ে এই। ক্রিউকভে নতুন একটা চাকরি নিয়ে আমার চলে যাওয়ার অর্থ হবে ইচ্ছে করে কলোনিটাকে ভেঙে দেয়া, ছাত্রছাত্রীদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া চারদিকে, তাদের উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের জীবন-মরুভূমিতে ফের ঠেলে পাঠিয়ে দেয়া, ঠেলে দেয়া চুরি-চামারি আর লুটপাটের উঞ্ছবৃত্তিতে। তাহলে আন্তনিনা পাভলোভনা, এবার আমায় সমস্যাটার সমাধানে সাহায্য করুন দেখি — আর যাই হোক, মেয়েমানুষের দয়ার্দ্র মনটুকু তো আপনার আছে!

আমাদের জমিতে ফসলবোনার অভিযান নিয়ে অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সত্যিই কোনো কারণ নেই। কাজটা-যে কতখানি কবিতার মতো সে-সম্পর্কে ক্রিউকভের আপনাদের বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই। ওহ্, কী-যে জলহাওয়া এখানে, কী কাজ, কতটা পরিশ্রমী বাচ্চাদের হাত, কী গান আর কী সব ঘোড়া, কেমন করে বোঝাই! এখন আমাদের প্রশিক্ষণ-পাওয়া একজন কৃষিবিৎ পর্যন্ত আছেন, আর আছে আমাদের নিজস্ব বীজ আর বীজবোনার যন্ত্র, নিজস্ব

পরিকল্পনা — আর আমরা যা বলি, যা চাই পোল্‌তাভায় প্রত্যেকেই তা কান পেতে শোনে।

যদি আমি চিঠিখানা টাইপ না-করতুম তাহলে কখনও এত বড় চিঠি লিখতুম না। আর এই বড় চিঠি লেখার কারণে পরস্পর-যোগাযোগের এই মার্কিনী ধাঁচ সত্ত্বেও আপনার আরও বেশি করে আমায় মাপ করে দেয়া উচিত।

চিঠি দেবেন। শুভেচ্ছা সহ —

আপনাদের

আ. মাকারেঙ্কো

গালিনা মাকারেঙ্কোর কাছে আন্তন মাকারেঙ্কোর চিঠি

গোর্কি কলোনি, কুরিয়াজ,

জুলাই, ১৯২৭

এখন রাত এগারোটা। মাস্টার হিসেবে আমার মস্তিষ্কের খোপে জমা সবটুকু বিদ্যেবুদ্ধি শুষে নেয়ার জন্যে অতিশয় ব্যগ্র শেষ লোকটিকে এইমাত্র আমি ঘর থেকে খেদিয়ে দিয়েছি। আর এখন আমি একা, ভাবনাচিন্তার একটুকু অবসর এখন। আমার চিন্তার বিষয় — কর্মব্যস্ত সাত বছরের চেষ্টায় সৃষ্ট আমার জগৎ।

ভেবো না এ বড় ছোট জগৎ। ফ্লামারিয়োঁর* ব্রহ্মাণ্ডের থেকেও এ কিন্তু হাজার গুণে বড়, তদুপরি ফ্লামারিয়োঁর ব্রহ্মাণ্ডে লুব্ধক নক্ষত্রের মতো প্রয়োজনাতিরিক্ত যা-কিছু

---

* ফ্লামারিয়োঁ, নিকোলাস কামিল (১৮৪২-১৯২৫) — ফরাসি জ্যোতির্বিৎ ও লেখক। — অনুঃ

আছে এখানে তা নেই। উলটো, আমার জগতে এমন অসংখ্য বস্তু আছে যা কোনো জ্যোতির্বিদের সাধ্য নেই যে পরিমাপ করে, তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আর আয়নার সাহায্য সত্ত্বেও।

আমার এই জগৎ মানুষ নিয়ে তৈরি। আমার ইচ্ছাশক্তির দৌলতে মানুষেরই জন্যে সৃষ্ট এই সুশৃঙ্খল জীবন ও গড়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বগুলির নানা উপাদানের সঙ্গে অন্তহীন, জটিল ও সূক্ষ্ম লড়াইয়ের সাক্ষাৎ মিলবে এই কলোনিতে।

আমার জগৎ হল এমন একটা বিশ্বভুবন যেখানে মানুষের সংগঠিত সৃষ্টিশীল প্রয়াসেরই রাজত্ব। এমন এক জগৎ এটা যা পরিচালিত হয় লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী। এ এক অনন্য জগৎ, এ আমার জগৎ...

চিরকালই আমি বাস্তববাদী আর তাই এই মুহূর্তে আমি এই সংযত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এবার আমার 'কলোনি'-যুগের অবসান ঘটাতে হয়। এর কারণ আমি এখানে নতুন ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছি আর তাই জীবনটাকে আমার নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত করা দরকার। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার ভেতরে যে-সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেগুলোকে আমার নিজেরই ভালো করে বোঝা দরকার আর নতুন যা-কিছুর উদ্ভব ঘটেছে তাদের সযত্নে ফুটিয়ে তোলা উচিত, তবু বর্তমানের এই মোহ, এই নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতেও মন চায় না। জীবন এখানে এই মুহূর্তে ভারি চমৎকার, আর এ-পর্যন্ত যে-জীবন কাটিয়ে এসেছি তাও ভারি মনোরম এইজন্যে যে ওই জীবনই আমাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে এই জীবনে, আজকের দিনে।

আ. মাকারেঙ্কো

আমার জীবনে মাক্সিম গোর্কি'র ভূমিকা

যে-পশ্চাৎপদ শহরে আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে সাহিত্যের উল্লেখ্য ঘটনার খবর সেখানে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে ঘটনাটাই বহুদিনের বাসি হয়ে যেত।

আর ঠিক এই কারণেই মাক্সিম গোর্কি-র সরল-সহজ অথচ ঘুমকাড়া নামটি অত বেশি জোরালো আর অবিস্মরণীয়রকমে আমাদের নজর কেড়েছিল।

প্রচণ্ড চেষ্টাচরিত্র করে তবেই আমরা গোর্কি'র বই পড়তে পেতুম। তাঁর লেখা-যে কখনও-সখনও আমরা পড়তে পেয়েছি এটা ছিল একেবারেই বিরল ঘটনা। অথচ আমাদের পাঁশুটে আকাশ চিরে তাঁর রচনার জ্বলন্ত তীরটি ঝলমলিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দিগন্তটাকে যেন আগের চেয়েও কেমন অন্ধকার ঠেকত। তবু আমরা ভালো করেই চিনেছিলাম যে মাক্সিম গোর্কি আর পাঁচজন লেখকের মতো যে-কোনো একজন লেখক ছিলেন না যিনি আমাদের আমোদ দেয়ার জন্যে কিংবা যাকে বলা হয়ে থাকে শিক্ষা দেয়া — তার জন্যে লিখতেন না, গোর্কি'র রচনাবলী মানুষ হিসেবে ও সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে বড় বেশিরকম প্রাসঙ্গিক ছিল।

তাঁর 'নিচের তলা' নাটকটি ছিল আমাদের কাছে অসামান্য তাৎপর্যের দ্যোতক। এখনও পর্যন্ত এই নাটকটিকে আমি গোর্কি'র সকল সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে সেরা সাফল্যের নিদর্শন বলে গণ্য করি। আজও আমার মনে হয় গোটা বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এটি আধুনিক কালের সবচেয়ে নিখুঁত নাটক। নাটক হিসেবে এটিকে আমি ট্র্যাজেডি বলে গণ্য

করি, আজ পর্যন্ত আমার সে-ধারণা বদলায় নি। অথচ অভিনয়ের সময় মঞ্চের ওপর নাটকটির বিয়োগান্ত মুহূর্তগুলো সাধারণত সোচ্চার হতে পারে নি, খুব সম্ভব পাত্রপাত্রীরা সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার কারণেই। চতুর বুড়ো লুকা সান্ত্বনার একটা নামমাত্র পাতলা পর্দায় সবকিছু ঢেকে দেয়ার চেষ্টা পায়, কিন্তু নেহাত নিরীহ ভালোমানুষ আর শক্তিহীন বলেই তার এই সান্ত্বনাবাক্যে বরং গরিবদের সরাইখানার গোটা জগৎটার মরীয়া অসহায়তা সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য লুকা নিজেও এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। অন্তর্নিহিত নাটকীয় আতিতিতে পূর্ণ এক চরিত্র লুকা, আর তার এই আতিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে একদিকে প্রাজ্ঞ ও নির্মম 'সচেতনা' এবং অপরদিকে কোনো অংশে কম যায় না এমন প্রাজ্ঞ, মমতাময় নিরীহতার মধ্যেকার আশ্চর্য দুর্লভ পরস্পরবিরোধে। এই পরস্পরবিরোধ এমনই ট্র্যাজিক যে এটি নাটকটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চিরকালীন মর্মবাণীর অধিকারী করেছে। তবে নাটকটিতে এর চেয়েও ট্র্যাজিক অপর একটি নাট্যবস্তুও লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে একদিকে মরীয়া হতাশা ও অন্যদিকে তথাকথিত 'সমাজ' যাদের 'ভুলে গেছে' ও বাইরে ঠেলে দিয়েছে সেইসব স্ত্রী-পুরুষের মর্মস্পর্শী মানবিক সম্ভাবনার মধ্যে ব্যবধানটি। এই নাটকে মাক্সিম গোর্কির শিল্প-প্রতিভার নানা দিককে পরিণত হয়ে উঠতে দেখি আমরা, আর সেই গুণগুলিকে আগাগোড়াই নাটকটিতে একরকমভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখি। বস্তুত প্রতিটি কথাতেই এখানে লেখকের প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরোতে দেখি, প্রতিটি শব্দই এখানে একেকটি শিল্পকর্ম, প্রতিটি শব্দই নতুন-নতুন ধ্যানধারণা

আর আবেগের জনক। গোর্কি-যে তাঁর গরিব সরাইখানাটিকে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিয়েছেন তাতে ওই ‘জগৎ’ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই আমার সুবিধে হয়েছে। এর ফলে গরিবখানার দেয়ালের ওধারকার তথাকথিত জগতের অস্তিত্ব সর্বদা টের পেয়েছি আমি, ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যস্তসমস্ত হৈচৈ আমার কানে পৌঁছেছে, মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছি অতিরিক্ত সাজপোশাক-করা অবস্থাপন্ন কুলীনসমাজ আর শূন্যকুম্ভ বক্তৃতাবাগীশ বুদ্ধিজীবীদের, দেখেছি তাদের প্রাসাদ আর ‘অ্যাপার্টমেণ্ট’গুলো আর গরিবখানার বাসিন্দারা তাদের নিয়ে যত কম আলোচনা করেছে তাদের সম্পর্কে ততই আমার ঘৃণা উঠেছে প্রবল হয়ে।

‘নিচের তলা’ এমন একখানি নাটক যা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে দায়িত্ববোধ কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, বিপ্লবের ওপর। আরও অনেকের চেয়ে আমার কাছে এটা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সম্ভবত এই কারণে যে বিপ্লবের পর আমার বাকি জীবনের গোটা সময়টাই সেইসব লোকের জন্যে ব্যয়িত হয়েছে পুরনো দুনিয়া টিকে থাকলে যাদের নাকি গরিবখানায় জীবন শেষ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকত না। অপরদিকে আমাদের এই নতুন দুনিয়ার... কী বলব, পুরনোর সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। আমাদের এই নতুন দুনিয়ায় কোনো-কোনো প্রধান জাতীয় নেতা, লক্ষ-লক্ষ জনগণমনের অধিনায়ক মাঝে-মাঝে আমাদের দ্জের্জিন্স্কি কমিউন পরিদর্শনে আসেন আর আগেকার কালে যাদের অবধারিত ভবিতব্য ছিল গরিবখানার বাসিন্দা হওয়া তারাই নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় তাদের কাজের জায়গা বা উৎপাদন

প্রাসাদগুলো, সূর্যালোক আর সুখে ভরপুর শোবার ঘরগুলো, বিঘের-পর-বিঘে ফুলবাগান আর হটহাউস।

বিপ্লবের রায়ের মধ্যে দিয়ে 'সমাজ'এর দায়দায়িত্ব যখন পূরণ হয়ে গেছে তখনকার অবস্থা হল গিয়ে এই-ই। আগের কালে অবশ্য ব্যাপারস্যাপার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। বিপ্লবের আগে পেটিবুর্জোয়ারা নাটকটিতে 'খালি-পা' একদল ভবঘুরে আর তারা যেভাবে জীবনযাপন করে তার একটা স্থূল স্বভাববাদী দৃশ্য দেখা এবং দয়া দেখানোর আর জাগতিক বুদ্ধিতে নিজেরা-যে কত তফাত তার প্রমাণ দাখিলের একটা সুযোগ পাওয়ার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাইত না। নাটক দেখতে-দেখতে মনে-মনে এইটুকু বলতে পারলেই তারা খুশি হোত: 'ভগবান তোমাকে এই বলে ধন্যবাদ জানাই যে আমি অন্তত ওই লোকগুলোর জীবন নিয়ে জন্মাই নি'। 'খালি-পা' এই বাক্যাংশটি গোর্কির ট্র্যাজেডির সত্যিকার অন্তঃসারটুকু আড়াল করে রাখার উপযোগী সুবিধেজনক একটা বর্ম ছিল, যেন এই কথাটাতে নিহিত ছিল উত্তেজনা প্রশমনের ওষুধ, যেন-বা কথাটা বললেই নিন্দা আর দুই জগতের সীমারেখাটা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

মাক্সিম গোর্কি আমার কাছে নিছক লেখকমাত্র ছিলেন না, কীভাবে জীবনযাপন করব তার পথের দিশারীও করেছিলুম তাঁকে। এদিকে ওই সমস্ত দিনে প্রাথমিক শিক্ষকদের যে-নামে উল্লেখ করা হোত আমি ছিলুম তা-ই, অর্থাৎ যাকে বলে 'জনগণের শিক্ষক', আর মাক্সিম গোর্কির যা বলার ছিল আমার কাজকর্মে তাকে উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব। রেলওয়ে স্কুলে, যেখানে আমি বাঁধা ছিলুম ব্ল্যাকবোর্ডের সঙ্গে, সেখানকার আবহাওয়া ছিল অন্য সব

জায়গার চেয়ে অনেকগুণে বেশি তাজা। শ্রমিকদের খাঁটি প্রলেতারীয় সমাজ স্কুলটা যাতে তাঁদের একান্ত আয়ত্তে থাকে এ-ব্যাপারটা নিশ্চিত করে তুলেছিলেন আর 'রুশ জনগণের ইউনিয়ন'* স্কুলটার গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে পর্যন্ত ভয় পেত। পরবর্তী কালে এই স্কুলের অনেক ছাত্রই বল্‌শেভিক হয়েছিল।

মাক্সিম গোর্কিই আমাকে ও আমার ছাত্রদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিতে দীক্ষিত করেছিলেন। যদিও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মাতে পারত অন্য পথেও — যথা, বলশেভিক প্রচার ও বিপ্লবের অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে এবং বিশেষ করে যে-পরিস্থিতিতে আমরা বাঁচছিলুম তার প্রভাবেও, তবু গোর্কিই আমাদের ইতিহাস-চেতনা অর্জন করতে শেখালেন, তাঁর প্রচণ্ড ভালোবাসা আর ঘৃণা সংক্রমিত করে দিলেন আমাদের মধ্যে আর আমাদের পরিচালিত করলেন যাতে আরও বেশি আস্থার সঙ্গে ভরসা আর আনন্দ নিয়ে আমরা দাবি জানাতে পারি: 'ঝড়ের মাতন জাগুক জাগুক তীব্র তীব্র তীব্রভাবে!'

মানুষ ও লেখক হিসেবে নিজের জীবনে গোর্কি যে-পথ পরিক্রমণ করেছিলেন আমাদের কাছে তা আচরণের আদর্শ নমুনা হিসেবে গণ্য ছিল। গোর্কির মধ্যে আমরা নিজেদেরই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সহস্র প্রতিরূপ দেখতে পাচ্ছিলুম, হয়তো মনের অ-সচেতন কোনো স্তরে এমনকি এই চিন্তাটাও

---

* 'রুশ জনগণের ইউনিয়ন' — রুশদেশে বিপ্লব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে এই রাজতন্ত্রী, কৃষ্ণশত-র সংগঠনটা গঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া বিপ্লব অনুষ্ঠানের সময় এই ইউনিয়নকে উৎখাত করে দেয়া হয়। — সম্পাঃ

স্থান পাচ্ছিল যে আমাদেরই একজন বাঁধ ভেঙে আগে যা দুরভিগম্য ছিল খাঁটি সংস্কৃতির সেই রাজ্যপাটে বুঝি ঢুকে পড়েছেন। আর সবাই আমরা অনুভব করছিলুম যে এই জয়গৌরবকে আরও সংহত আর প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত ওঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বস্তুত অনেকেই সেদিন এইভাবে গোর্কির অনুসরণ ও তাঁকে সাহায্য করেন।

বলা বাহুল্য আমিও এই দলভুক্ত ছিলুম। কিছুকাল এই ধারণার বশে চলেছিলুম যে একমাত্র সাহিত্য-রচনার মধ্যে দিয়েই এই কাজটা করতে পারি আমি। ১৯১৪ সালে 'বোকামির দিন' নামে একটা গল্প লিখে গোর্কির কাছে তা পাঠিয়ে দিই। গল্পটার বিষয়বস্তু ছিল একটা সত্যি ঘটনা। স্থানীয় স্কুল-মাস্টারের প্রতি পাদ্রির স্ত্রীর ভালোবাসায় পাদ্রির ঈর্ষা আর পাদ্রি সম্পর্কে প্রেমিকযুগলের ভয় — এই ছিল গল্পের বিষয়। গল্পটা পড়ে গোর্কি নিজের হাতে আমায় একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানার প্রতিটি শব্দ আজও আমার স্মরণ আছে। গোর্কি লিখেছিলেন:

'যদিও গল্পের বিষয়টি আগ্রহোদ্দীপক, তবু লেখার স্টাইল এখনও দুর্বল, নানা অভিজ্ঞতার নাটকীয় যে-বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অকাট্যতা আছে সামান্যই। তাছাড়া গল্পটিতে কোনো পটভূমি বা পূর্ব-ইতিহাস দেয়া হয় নি, সংলাপও বেশ আলগা। আরও একটা গল্প লেখ।

— ম. গোর্কি'

গল্পের বিষয়টা আগ্রহোদ্দীপক এই মন্তব্যে আমি সান্ত্বনা পেলুম সামান্যই। বরং এটাই বুঝলুম যে লিখতে গেলে রীতিমতো রচনাশৈলী আয়ত্ত করা দরকার, গল্পের

পটভূমিকাটা জানাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংলাপ নিয়ে খাটা ও তাতে পালিশ চড়ানোর প্রয়োজন আছে। পরিশেষে, এক্ষেত্রে খাঁটি সহজাত শক্তি একেবারে অপরিহার্য। স্পষ্টতই এ-ব্যাপারে আমার ক্ষমতায় ঘাটতি ছিল। অথচ গর্ববোধের গুরুত্ব কতখানি গোর্কি তা আমায় শিখিয়েছিলেন, আর তাই এই বোধকে ক্রমে-ক্রমে আমার মন জুড়ে বসতে দিলুম। মনে-মনে ভাবলুম, 'আরও একটা গল্প লেখা' আমার পক্ষে অবশ্যই সম্ভব, তবু এটাও তো জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে লেখার চেষ্টা করে উল্লেখ্য কোনো ফল হবে না। আর তাই সত্যিকার কোনো মনোবেদনা ভোগ না-করেই সাহিত্যসাধনার স্বপ্নকে আমি বিদায় জানালুম। বিশেষ করে এটা করলুম এইজন্যে যে শিক্ষকতার পেশাকে আমি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দিতে শুরু করেছিলুম। মনে হয়েছিল, শিক্ষকের পেশা বরণ করেও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। বস্তুত, বন্ধুত্বপূর্ণ খোলাখুলি কথা বলার মধ্যে দিয়ে গোর্কি আমাকে উৎসাহিত করেই তুলেছিলেন। এই গুণটি আয়ত্ত করার জন্যে আমাকেও চেষ্টা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

শিক্ষক হিসেবে মোটের ওপর আমি সফলই হয়েছিলুম। অক্টোবর বিপ্লবের পরে আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল অদৃষ্টপূর্ব সম্ভাবনার দরজা। এইসব সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে আমাদের, শিক্ষকদের, এতদূর মাথা খারাপ হয়ে গেল যে প্রায়ই আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়তে লাগলুম। সত্যি কথা বলতে কি, নানারকম নতুন আর উদ্ভট শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠলুম আমরা। তবে ভাগ্যক্রমে ১৯২০ সালে আমার ওপর কিশোর-অপরাধীদের একটা কলোনি পরিচালনার ভার দেয়া হল, আর এই কাজের

দায়দায়িত্ব এত কঠিন ও এত জরুরি ছিল যে আমার পক্ষে আত্মহারা হওয়ার কোনো সুযোগই জুটল না। অথচ মেনে চলবার মতো কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিও আমার জানা ছিল না। কিশোর-অপরাধীদের মানুষ করার যে-সমস্ত পদ্ধতি আদ্যিকাল থেকে চালু ছিল সেগুলো আমার কোনো কাজে লাগছিল না, আবার নতুন অভিজ্ঞতার পুঁজির ঘরে তখনও পর্যন্ত ছিল শূন্য, এমন কোনো বই পর্যন্ত ছিল না যার সাহায্য নেয়া চলতে পারত। আমার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত সঙ্গিন, প্রায় শোচনীয়ই বলা চলে।

সমস্যাটার কোনো 'বৈজ্ঞানিক' সমাধান আমি খুঁজে পেলুম না। অতএব আমাকে নির্ভর করতে হল মানুষ সম্পর্কে আমার সাধারণ ধ্যানধারণার ওপর, আর আমার কাছে এর অর্থ ছিল গোর্কির শরণ নেয়া। এ-উদ্দেশ্যে তাঁর বইগুলো ফিরেফিরতি পড়ার অবশ্য দরকার ছিল না, হাতের পাঁচ আঙুলের মতোই জানা ছিল বইগুলো, তবু তা সত্ত্বেও ফের একবার সব ক'খানা বই আগাগোড়া পড়ে ফেললুম। আজও যারা ছেলেমেয়ে পড়ানোর পেশা নিতে যাচ্ছে তাদের আমি পরামর্শ দেব গোর্কির রচনাবলী পড়তে। বলা বাহুল্য, ওই বইগুলিতে ধরাবাঁধা কোনো শিক্ষাদান-পদ্ধতি ছকে দেয়া নেই, সুনির্দিষ্ট দৈনন্দিন কোনো সমস্যার সমাধানও দেয়া নেই তাতে, বইগুলিতে আছে শুধু মানুষ ও তার প্রচণ্ড ব্যাপ্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয়। সেই সঙ্গে মানুষকে-যে ওপর-ওপর স্বভাববাদী পদ্ধতিতে চিত্রিত করা হয়েছে তা-ও নয়। মানব-পরিস্থিতি সম্পর্কেই গোর্কি-সাহিত্যে টানা হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ নানা সিদ্ধান্ত, আর যা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সব সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে।

গোর্কির চরিত্রগুলিকে সর্বদাই সমাজের অঙ্গীভূত করে দেখানো হয়েছে, তাদের শিকড়-যে কোথা থেকে কোথায় গেছে, কতদূর পর্যন্ত তা যে সঞ্চারিত তা ধরাও যায় সর্বদা। গোর্কি-সাহিত্যে মানুষ প্রথমত ও প্রধানত সামাজিক জীব, তাই তারা যখন কষ্টভোগ করে কিংবা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয় তখন তার জন্যে কে বা কারা-যে দায়ী তা সর্বদাই জানা যেতে পারে। আবার এই কষ্টভোগটাই কিন্তু সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমার মনে হয় এটা বললে বোধহয় ভুল হয় না যে গোর্কির নায়ক-চরিত্ররা তাদের সহজপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে কষ্ট পায়। আমাদের — শিক্ষকদের পক্ষে এই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত জরুরি। এ-ব্যাপারের সবকিছু খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন, এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের গবেষণা। এক্ষেত্রে নির্ধারক উপাদানটি হল গোর্কির আশাবাদ। অবশ্য গোর্কি আশাবাদী কেবলমাত্র এই অর্থে নন যে মানুষের সুখী ভবিষ্যতের একটা যুগপর্যায়ের দিকে তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারেন, শুধুমাত্র এই অর্থেও নন যে ঝড়ে তিনি সুখের সন্ধান পান, গোর্কিকে আশাবাদী বলতে পারি এই অর্থেও যে প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তিনি শুভকে খুঁজে পান। আর এই শুভ নৈতিক কিংবা সামাজিক অর্থে নয়, সৌন্দর্য ও শক্তিসামর্থ্যের বিচারে। এমন কি শত্রুশিবিরের লোকজনের, সবচেয়ে হিংস্র ‘শত্রুদের’ও, চরিত্রচিত্রণ করেছেন গোর্কি এমনভাবে যাতে তাদের মানবিক সামর্থ্য ও তাদের সূক্ষ্মতম মানবচারিত্র্য-সম্ভাবনা একেবারে নির্ভুলভাবে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত কার্যকরভাবে গোর্কি দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ বলতে শুধু-যে প্রলেতারিয়েতের সর্বনাশ বোঝায় তা নয়,

অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরও সর্বনাশ বোঝায় তা, পুঁজিবাদী সমাজ বলতে সকলের, বস্তুত গোটা মানবসমাজেরই মূলে হাভাত বোঝায়। আর্তামোনভ পরিবারের লোকজন, ভাস্সা জেলেজ্নোভা, ফোমা গর্দেয়েভ আর ইয়েগর বুলিচোভের মতো চরিত্ররা পুঁজিবাদের অভিশাপে চিহ্নিত, কলঙ্কিত। এই চমৎকার মানুষগুলোকে মুনাফা আর লাভের পেছনে নাকে-দড়ি-দিয়ে ছুটিয়ে, যোগ্য হয়ে না উঠতেই তাদের হাতে ক্ষমতা আর সামাজিক প্রতিপত্তির লাগাম তুলে দিয়ে, নিজেরা অলসভাবে জীবন কাটাচ্ছে আর অন্যেরা তাদের হয়ে কাজ করে দিচ্ছে — এই অভিজ্ঞতার শরিক করে পুঁজিবাদ তাদের করে তোলে দুর্নীতিগ্রস্ত আর বিকৃতচরিত্র।

মানুষের মধ্যে ভালো দিকটিকে আবিষ্কার করা সর্বদাই কঠিন ব্যাপার। তার প্রতিদিনের চলাফেরায়, কাজেকর্মে, এবং আরও বেশি করে কোনো-না-কোনো দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত এমন একটা গোষ্ঠীর মধ্যে তার গতায়াতে, ভালোত্বের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কারণ, তখন তা চাপা পড়ে যায় দৈনন্দিনের 'লড়াই'এর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাদ-বিসম্বাদের নিচে, হারিয়ে যায় তাৎক্ষণিক সংঘর্ষের ঊর্ণাজালে। মানুষের মধ্যে শুভকে সর্বদাই 'ফুটিয়ে তোলা'র দরকার করে, আর শিক্ষকের পক্ষে এটাই অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষককে ছাত্র বা ছাত্রীর সম্মুখীন হতে হয় প্রমাণসাপেক্ষে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এটা করতে হয় কিছু পরিমাণে ভুল ঘটার ঝুঁকি সত্ত্বেও। আর মানুষের মধ্যে এই সবচেয়ে চমৎকার বস্তু যেটি, সবচেয়ে শক্তিমান আর সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক যে-জিনিস, তাকে 'ফুটিয়ে তোলা' আর টেনে বের করার এই ক্ষমতাটাই গোর্কির কাছ থেকে আমাদের অর্জন করা দরকার। বিশেষ করে

খেয়াল করার মতো ব্যাপার হল এই যে গোর্কি এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন যে-উপায়ে তা মোটেই সহজ-সরল নয়। মানুষের মধ্যে তিনি ইতিবাচক গুণের সন্ধান পান ঠিকই, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান হারাবার মতো করে তার উচ্চপ্রশংসায় মেতে ওঠেন না। মানুষ-বিচারের মানকে নিচু করেন না কখনও, বরং প্রয়োজন পড়লে সবচেয়ে কড়া সমালোচনার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেন না।

মানুষ সম্পর্কে গোর্কির এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে খাঁটি মার্কসবাদী দৃষ্টি। আমাদের সমাজতন্ত্র অল্পদিনের বলেই তা অন্য সবকিছুর চেয়ে এটাকে ভালোভাবে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে একজন সোভিয়েত নাগরিক নৈতিক ও রাজনৈতিক সচেতনার যে গড়পড়তা মান অর্জন করেছেন তা জারতন্ত্রী রাশিয়ার একজন প্রজার কিংবা পশ্চিম ইউরোপে তার সমকক্ষ একজন মানুষের সচেতনার গড়পড়তা মানের চেয়ে এত উঁচু যে তাদের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এ-ব্যাপারের কারণ খুঁজতে হবে সমাজের কাঠামো ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, আর এটা আরও বেশি লক্ষণীয় এই কারণে যে আমাদের দেশে শিক্ষাদানের কোনো বিশেষ প্রয়োগকৌশল বা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নি। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় এদেশের উত্তরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটেছে ব্যাপ্ত জাতীয় গুরুত্বের সমস্যাবলীর দিকে ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার মতো দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিবিশেষ আজ আর প্রতিদিনের সংঘর্ষে ও স্বার্থের সংঘাতে শক্তির অপচয় ঘটায় না, আর এর অর্থ সবচেয়ে সুন্দর মানবিক গুণগুলি আরও বেশি স্পষ্টভাবে স্ফূর্তি

পায়। মোদ্দা কথা হল এই যে ইতিবাচক মানবিক সম্ভাবনার পক্ষে বাস্তবে পরিণত হওয়াটা সহজতর হয়েছে, এবং আগের চেয়ে এখন তার বাধামুক্তির সুযোগসুবিধেও ঘটেছে বহুগুণে বেশি পরিমাণে। আমাদের বিপ্লবের পরম তাৎপর্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির চরম সাফল্য নিহিত এইখানেই।

আজ অবশ্য এই সবকিছুই বোধগম্য ও জলের মতোই পরিষ্কার, কিন্তু সেই ১৯২০ সালে আমি সবেমাত্র এ-ব্যাপারে সচেতন হতে শুরু করেছিলুম, এবং যেহেতু আমাদের জীবনযাত্রায় তখনও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করে নি, মাক্সিম গোর্কির প্রাজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী রচনাবলীতে সেইহেতু ওই শিক্ষার উপাদানগুলি আমি সন্ধান করে ফিরেছিলুম।

ওই সময়ে গোর্কির রচনাবলীর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করে অনেক সময় কাটিয়েছি আমি। তবে এমন ঘটনা তখন ঘটেছে ক্বচিৎ-কখনও যখন আমার ওই মাথা-ঘামানো স্পষ্ট সূত্রবদ্ধ ধারণার আকার নিয়ে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে। বই থেকে নোট নেয়া কিংবা সংজ্ঞা ছকে ফেলা এসব কিছুই করি নি, আমি তখন সবকিছু চোখ মেলে দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি শুধু।

আমি বুঝেছিলুম যাকে বলে 'জীবনবোধ' তা সংগ্রহ করতে হবে গোর্কির আশাবাদ আর বিচারের উঁচু মানের যোগফল থেকে। গোর্কি-যে কতখানি তীব্র আবেগ নিয়ে মানুষের মধ্যে নিহিত বীরোচিত গুণ খুঁজে বের করেছিলেন, মানুষের বীরত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত বিনয়কে-যে কতখানি প্রশংসা করতেন তিনি এবং মানবসমাজে নতুন ধরনের বীরোচিত গুণপনার জন্ম ও বিকাশ ঘটে কীভাবে (তাঁর 'মা' উপন্যাসটির কথা স্মর্তব্য) তা দেখানোয় তাঁর-

যে কতখানি অক্লান্ত প্রয়াস ছিল তা আমি অনুভব করতে পারছিলুম। আমি বুঝেছিলুম, সব রকম মিথ্যে ভানকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা যদি কোনো মানুষসোদরকে সঙ্গ দিই তাহলে তাকে সাহায্য করা কঠিন হয় না, বুঝেছিলুম জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে তখনই যখন 'মনুষ্যত্ব' বস্তুটা লোপ পায়।

অতঃপর আমি মনোযোগ দিলুম আমার রক্ষণাধীন ছেলেদের প্রথম দলটির দিকে। গোর্কির চোখ দিয়ে তাদের দেখার চেষ্টা করলুম আমি। তবে অকপটে স্বীকার করতে হয় যে গোড়াতেই এ-কাজে আমি সফল হই নি, আমার চারপাশের জীবনের গতিবিজ্ঞান থেকে সরাসরি সাধারণীকরণে সক্ষম হই নি, তখনও পর্যন্ত শিখি নি মানবিক আচরণের অক্ষদন্ড আর চালক-স্প্রিংগুলোকে চিনতে। আসলে তখনও পর্যন্ত কাজকর্মে আর আচরণে আমি গোর্কির যথার্থ অনুগামী হয়ে উঠতে পারি নি, কেবল আমার সাধ আর আকাঙ্ক্ষাগুলোই ছিল গোর্কির ছাঁচে ঢালাই-করা এই যা।

অবশ্য তখনই আমি এমন সব ব্যবস্থা নিচ্ছিলুম যাতে আমার কলোনিকে গোর্কির নামের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শেষপর্যন্ত এ-ব্যাপারে সফলও হয়েছিলুম আমি। ওই সময়ে আমি-যে কেবল মানুষসোদরদের সম্পর্কে গোর্কির মনোভঙ্গিতে নিহিত পর্যালোচনার পদ্ধতিগুলির বশীভূত হয়ে ছিলুম তা-ই নয়, একটা ঐতিহাসিক সাদৃশ্যের অংশীদার হওয়াতেও ভারি তাজ্জব বনে ছিলুম। সেটা হচ্ছে এই যে, বিপ্লব আমার ওপর 'নিচের তলা'য় কাজ করার ভার ন্যস্ত করেছিল আর তাই, স্বভাবতই, গোর্কির 'নিচের তলা' নাটকটির কথা অনবরত না-মনে

করে পারছিলুম না। তবে এই সাদৃশ্যটি অবশ্য অল্প কিছুদিনের জন্যেই প্রাসঙ্গিক ছিল মাত্র। কেননা গোর্কি যে-ধরনের 'নিচের তলা'র বর্ণনা দিয়েছিলেন সোভিয়েত ভূমিতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকা ছিল অসম্ভব, আর তাই গোর্কি কলোনিতে আমার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েরা অতি দ্রুত ওই নিচের তলা থেকে ওপরে ভেসে-ওঠার দৃঢ় সিদ্ধান্তই-যে নিল তা-ই নয়, ওখানেই থেমে থাকার বদলে বরং তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করল একবারে পাহাড়ের চুড়োয়। গোর্কি-সাহিত্যের সকল নায়ক-চরিত্রের মধ্যে আমার ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল 'বাজপাখি' চরিত্রটি। 'নিচের তলা'র অস্তিত্ব কালক্রমে অবশ্যই ছিল না, কিন্তু সবার চোখের সামনে থেকে গিয়েছিল গোর্কির ব্যক্তিগত সাফল্যের উদাহরণ, তাঁর 'ছেলেবেলা' নামের বইখানি আর সেই মহৎ লেখক আর আমাদের এককালের আইন-ভাঙার দলের মধ্যেকার গভীর প্রলেতারীয় আত্মীয়তা।

১৯২৫ সালেই আমরা প্রথমবার চিঠি লিখি সোরেন্তোয়। চিঠির উত্তর পাওয়ার আশা বড়-একটা করি নি। কারণ আমরা জানতুম, সে-সময়ে গোর্কির কাছে চিঠি লেখার লোকের সংখ্যা ছিল অগুন্তি। গোর্কি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দিকে এবং আমাকে ছেলেমেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন যে তারা ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটা পর্বে বাস করছে।

অতঃপর শিগ্‌গিরই নিয়মিত চিঠি-লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। চিঠিলেখার এই পালা বিনা বাধায় চলেছিল ১৯২৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। গোর্কি ঠিক ওই সময়ে

সোভিয়েত ইউনিয়নে আসেন এবং দেশে এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কলোনি পরিদর্শনে আসা অবশ্যকর্তব্য জ্ঞান করেন।

১৯২৫ থেকে ১৯২৮ -- এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের কলোনি খাঁটি সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন দৃঢ়বদ্ধ একটা যৌথ সংস্থায় পরিণত হয়েছিল আর তার সাংস্কৃতিক মান আর সামাজিক তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল কল্পনাতীতরকম বেশি। কলোনি একটার-পর-একটা সাফল্য অর্জন করে চলায় গোর্কির আন্তরিক আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ছেলেদের চিঠিগুলো ইতালিতে পাঠানো হোত তখন প্রকান্ড-প্রকান্ড খামে ভরে, কারণ প্রতিটি বাহিনী গোর্কিকে আলাদাভাবে চিঠি লিখত, প্রত্যেকেরই গোর্কিকে জানানোর মতো নিজ-নিজ দায়দায়িত্ব আর চিন্তাভাবনা থাকত আর তখনকার দিনে আমাদের বাহিনীর সংখ্যাই ছিল তিরিশটির মতো। জবাবী চিঠিগুলিতে গোর্কি বাহিনীগুলির চিঠি থেকে বহু খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করতেন আর আমাকে লিখতেন যে কলোনির বাচ্চাদের কাছ-থেকে-পাওয়া মর্মস্পর্শী চিঠিগুলি তাঁকে দারুণ আগ্রহী করে তোলে।

ওই তিন বছর ধরে নতুন আরেকটা জায়গায় কলোনি স্থানান্তরণের অনুমতি আদায়ের কাজে কলোনিকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আর আমাদের নানারকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন গোর্কি, সর্বদাই আমাদের সাহায্যের ইচ্ছে জানাতেন। কিন্তু আমরা কখনও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিই নি, কেননা গোর্কিরই নায়ক-চরিত্রদের উপযুক্ত মনোভাবের বশবর্তী হয়ে থেকেছি বলে আমরা কখনও চাই নি যে অত বড় একজন লেখক আমাদের

যতসব তুচ্ছ সমস্যার শরিক হয়ে সর্বত্র আবেদন-নিবেদন করে বেড়ান। তাছাড়া কলোনির ছেলেরা তাদের নিজেদের যৌথ সংস্থার শক্তিসামর্থ্যের ওপর নির্ভর করতে শিখুক, এটাও অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার ছিল। কুরিয়াজে আমাদের স্থানান্তরণ কঠিন আর বিপজ্জনক একটা ব্যাপার ছিল, তাই কাজটা সফলভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার খবর পেয়ে গোর্কি আন্তরিকভাবেই আমাদের সুখে সুখী হয়েছিলেন। 'কুরিয়াজ ভারগ্রহণ'-এর দিন-কুড়ি পরে তিনি আমাদের যে চিঠিখানা লিখেছিলেন নিচে সেখানা পুরোপুরি উদ্ধার করে দিচ্ছি:

'নতুন জায়গায় তোমাদের স্থানান্তরণ উপলক্ষে আমি তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং অনুরোধ করি আমার হয়ে কলোনির বাচ্চাদের অভিনন্দন জানিয়ে দাও।

'আমি তোমাদের সকলের নতুন শক্তিসামর্থ্য, মনের জোর আর কর্মপ্রয়াসে আস্থা কামনা করি।

'সত্যিকার মহৎ কাজ করছ তোমরা। এর ফলাফল চমৎকার হওয়া উচিত।

'আমাদের জন্মভূমি এখন সত্যিসত্যিই আমাদের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাই ওই দেশের মাটিকে উর্বর করে তুলেছি, শহরের পর শহর গড়ে সাজিয়েছি, ওর বিশাল-বিশাল প্রান্তরকে জুড়ে দিয়েছি রাস্তা বানিয়ে আর যত রকমের অলৌকিক কার্যকলাপ আছে তা-ই ঘটিয়েছি ওখানে। আমরাই সেই মানুষ — যারা অতীতকালে গোড়ার দিকে অবয়বহীন বোবা জড়পদার্থের অপদার্থ টুকরোটাকরামাত্র ছিলুম, পরে ছিলুম জানোয়ারের চেয়ে সামান্যই উন্নত, আর এখন আমরাই হয়ে দাঁড়িয়েছি নতুন এক জীবনের সাহসী পথিকৃৎ।

‘সুস্বাস্থ্যে থাকো আর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হও। মনে রেখো প্রতিটি মানুষের মধ্যে সত্যিকার নির্মাতার শক্তিসামর্থ্য নিহিত, আর এই শক্তিকে বিকশিত, পুষ্পিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগসুবিধে দেয়া দরকার যাতে তা আরও রকমারি, আরও মনোহারী বিস্ময়ের সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সমর্থ হয়।

অভিনন্দন সহ —

সোরেন্তো, ৩ জুন, ১৯২৬ মাক্সিম গোর্কি’

ওই সময়ে গোর্কির কাছ-থেকে-পাওয়া আরও অনেক চিঠির মতো এই চিঠিখানিও শিক্ষক হিসেবে আমার কাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোর্কি কলোনি কীভাবে চালানো হবে তার মূল নীতিপদ্ধতি নিয়ে সে-সময়ে আমি যে-অসম লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলুম, চিঠিখানি সে-লড়াইয়ে আমায় শক্তি যুগিয়েছিল। এই বিতর্ক-যে কেবল আমার বিশেষ কলোনিকে উপলক্ষ করেই ঘনিয়ে উঠেছিল তা নয়, তবু গোর্কি কলোনিকে কেন্দ্র করে তা বিশেষরকম তীব্র হয়ে উঠেছিল। এর কারণ শিক্ষাদান-সম্পর্কিত সমাজতান্ত্রিক ও শিক্ষা-মুরুব্বিয়ানার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার পরস্পরবিরোধগুলি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে বিশেষ লক্ষণীয়রকম প্রকট হয়ে ওঠে। এই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে তখন খাঁটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে জাহির করা হচ্ছিল। কাজেই একে প্রত্যাখ্যান করে তথাকথিত ‘সর্বগ্রাহ্য’ এই তত্ত্বটির ধারকবাহক ভীতি-উৎপাদক সব পণ্ডিতের বিরুদ্ধে আমার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জোর করে দাঁড়াতে আমার পক্ষে

অনেকখানি মনোবলের দরকার পড়ছিল। যেহেতু আমার মানুষ গড়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল নীরস একঘেয়ে খাটুনির সঙ্গে মিলিয়ে-জুলিয়ে, সেইহেতু নিজের তাত্ত্বিক সংশ্লেষণগুলির সত্যমিথ্যে নিরূপণ করা আমার পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। তাঁর পক্ষে যা ছিল স্বভাবসিদ্ধ সেই সত্যিকার উদার মন নিয়ে গোর্কি আমায় উৎসাহ যোগালেন আমার ধ্যানধারণাগুলোকে সমর্থন যোগানোর উপযোগী ব্যাপ্ত সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক সাধারণীকরণে ব্রতী হতে। তাঁর চিঠিগুলো আমার কর্মশক্তি ও আস্থাকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলল, আর যখন সেগুলি পড়া হল কলোনির ছেলেদের সামনে তখন তা আক্ষরিক অর্থেই-যে অলৌকিক কান্ডকারখানা ঘটাল তা বলা বাহুল্য। কেননা, এ তো জানা কথাই যে কোনো লোকের পক্ষে নিজের মধ্যে 'সত্যিকার নির্মাতার শক্তিসামর্থ্য' আবিষ্কার করা মোটেই সহজ কাজ নয়।

মহৎ লেখক মাক্সিম গোর্কি আমাদের লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন, আমাদের বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলা চলে। তার আগে যা আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলুম একমাত্র ওই সময়টাতেই তা আমার চেতনার আলোয় পুরোপুরি ধরা দিয়েছিল, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমার মতাদর্শকে যথাযথ ভাষায় সূত্রবদ্ধ করে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল আমার পক্ষে। তবু গোর্কির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার উদ্বেগ, শিক্ষা-জগতে আমার শত্রুদের সঙ্গে এইসব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে তাঁকে টেনে নামানোর ব্যাপারে আমার হাত চেপে ধরেছিল। ক্রমশ বেশি-বেশি করে আমি অতিরিক্তরকম সতর্ক হচ্ছিলুম

যাতে এইসব বাদ-বিসম্বাদ গোর্কির অতিরিক্ত স্নায়বিক পীড়নের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায়। তবু আশ্চর্য এই যে তাঁর প্রতি আমার মনোভঙ্গিতে এই নতুন প্রবণতাটি তিনি ঠিক টের পেয়ে গিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ১৭ মার্চ তারিখে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন:

'নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার এটা কিন্তু মোটেই সঠিক ধরন নয়! অন্য যারা আমায় চিঠিপত্র লিখে থাকে তারা তোমার এইসব বিবেচনাকে-যে কত সামান্য মূল্য দেয়, আর কত রকমের-যে অনুরোধ-উপরোধ আমাকে জানায় তা যদি তুমি জানতে! যেমন ধর, একজন আমায় লিখেছে মাঞ্চুরিয়ার হার্‌বিনে তাকে একটা পিয়ানো পাঠাতে, আরেকজন জানতে চেয়েছে ইতালির কোন ফ্যাক্টরি সবচেয়ে সেরা রঙ তৈরি করে থাকে, তির্‌রেনিয়ান সাগরে শাদা স্টার্জন মাছ পাওয়া যায় কিনা, কমলালেবু পাকতে কত সময় নেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি...'

এরপর ১৯২৮ সালের ৯ মে আরেকখানা চিঠিতে তিনি লেখেন:

'বন্ধুভাবে তোমাকে একটু তিরস্কার করতে দাও আমায়। কীভাবে আমি তোমাকে এবং কলোনিকে সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে সাহায্য করতে পারি আমাকে তা না-জানানো তোমার পক্ষে ভারি অন্যায় হয়েছে। লক্ষ্যসাধনে সত্যিকার যোদ্ধা হিসেবে তোমার গর্ববোধ আমি বুঝি, ভালো করেই বুঝি! তবু একদিক থেকে আমিও তো তোমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত আর তাই ঠিক এই সময়ে যখন তোমাদের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন তখন নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করছি, এমন কি লজ্জা পর্যন্ত পাচ্ছি।'

১৯২৮ সালে গোর্কি যখন কলোনিতে এলেন আর দিন-তিনেক কাটালেন সেখানে তখন আমি-যে কলোনি ছেড়ে যাচ্ছি সেটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তার ফলস্বরূপ কলোনিতে-যে 'শিক্ষা-মুরুব্বিয়ানা' বিষয়ক সংস্কারসাধন আসন্ন এটা জেনেও আমাদের অতিথিকে তার বিন্দুবিসর্গও জানতে দিলুম না। গোর্কি যখন আমাদের কাছে ছিলেন সেই সময়ে শিক্ষা-সংক্রান্ত জন-কমিশারিয়েতের জনেক বিশিষ্ট প্রতিনিধি এসে হাজির হলেন আর আমার শিক্ষাব্যবস্থায় নামমাত্র অল্পস্বল্প কিছু পরিবর্তন ঘটানোর প্রস্তাব করলেন। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে গোর্কির পরিচয় করিয়ে দিলুম। বাচ্চাদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে তাঁরা আলাপ করলেন বেশ ধীরস্থিরভাবেই, একসঙ্গে বসে চা-ও খেলেন, তারপর সদ্য-আগত অতিথিটি বিদায় নিলেন। তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে গিয়ে একলা পেয়ে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলুম — না, আমার শিক্ষা-ব্যবস্থায় নামমাত্র পরিবর্তন ঘটানোও সম্ভব হবে না।

কলোনিতে থাকার সময়ে আমার জীবনে এবং ছেলেমেয়েদের জীবনেও সবচেয়ে সুখের দিন বলতে যা কিছু তা ছিল আমাদের কাছে গোর্কির থাকার ওই ক'টা দিন। সত্যি বলতে কী, গোর্কিকে আমি আমার নয় ছেলেমেয়েদেরই অতিথি হিসেবে দেখেছিলুম, আর তাই বাচ্চাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা যাতে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ আর আনন্দময় হয়ে ওঠে তার জন্যে যা আমার করার নয় তাও করেছি। অবশ্য প্রতিদিন একটু-রাত্রে ছেলেমেয়েরা শুতে যাবার পর গোর্কির সঙ্গে একা-একা কথা বলার একটু সুযোগ ঘটত আমার। স্বভাবতই প্রধানত আমরা আলাপ

করতুম শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। আমাদের যৌথ সংস্থার সবক'টা আবিষ্কার, এমন কি আমার শত্রুরা যাকে কলোনির 'সামরিকীকরণ' আখ্যা দিয়েছিল এবং যার জন্যে আজও পর্যন্ত কোনো-কোনো সমালোচক আমাকে তিরস্কার করে থাকেন, সেসবই গোর্কি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন। আর এতে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। মাত্র দিন-দুয়েক কলোনিতে থেকেই গোর্কি কিন্তু ধরতে পেরেছিলেন যে তথাকথিত এই 'সামরিকীকরণ' ব্যাপারটা আসলে একটা নির্দোষ মজাদার খেলা কিংবা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন কাজের রুটিনে তা একটুখানি নন্দনতাত্ত্বিক রঙের ছোঁয়া লাগাত মাত্র। কেননা যতই যা-ই হোক ছেলেমেয়েদের কাজের ওই রুটিন বেশ শ্রমসাধ্য আর কিছুটা নীরসই ছিল। গোর্কি ঠিকই বুঝেছিলেন যে আলোচ্য ব্যাপারটি ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রায় নেহাত উৎসাহ যোগাত মাত্র, এতে আপত্তিকর কিছুই নেই।

গোর্কি বিদায় নেয়ার পরদিন আমিও কলোনি ছাড়লুম। এই আঘাত আমার পক্ষে এমন মারাত্মক ছিল না যা নাকি কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। কেননা অন্তরের অন্তস্তলে আমি নিশ্চিতভাবেই অনুভব করছিলুম যে আমার সপক্ষে আছে গোর্কির নৈতিক সমর্থন, এখন যখন আমার শিক্ষানীতির হাতে-কলমে প্রয়োগের ব্যাপারটা তাঁকে আমি দেখাতে পেরেছি এবং পুরো কাজটায় তাঁর নিঃশর্ত সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি তখন আর পরোয়া কিসের। তাছাড়া তাঁর এই সমর্থন শুধুমাত্র কথায়ই ব্যক্ত হয় নি, তা প্রতিফলিত হয়েছিল গোর্কি যেরকম একাত্মতার ভাব নিয়ে একেবারে অকুস্থলে দাঁড়িয়ে কলোনির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করছিলেন

তার মধ্যে দিয়েও। তাঁর উপস্থিতির ওই ক'টা দিন ছিল সত্যিকার প্রাণমাতানো উৎসবের দিন, যাকে আমাদের নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎসবের দিন ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতেই পারি না। বস্তুত গোর্কি একাই আমাদের কাজকর্ম অনুমোদন করেন নি, নিরাপত্তা রক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির যে-সব সাহসী সদস্য শিক্ষাবিজ্ঞানের ধার ধারতেন না তাঁরাও গৃহহীন অনাথ কিশোরকিশোরীদের পুনর্বাসন-সংক্রান্ত আমার প্রবর্তিত পদ্ধতিগুলির শুধু-যে 'পুনরুদ্ধার' ঘটালেন তা-ই নয় সেগুলি যাতে ক্রমশ বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে তা-ও নিশ্চিত করে তুললেন। দ্জের্জিন্স্কি উৎপাদন কমিউনকে সফলভাবে সংগঠিত করার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আমার শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকে তাঁরা ফের একবার যাচাই করে নেয়ার সুযোগ দিলেন।

এই সময়েই 'জীবনজয়ের পথে' বইখানা লেখার কাজ শুরু করি আমি আর আমার সাহিত্যকর্ম-সম্পর্কিত পরিকল্পনার কথা ভয়ে-ভয়ে গোর্কিকে জানাই। উনিও আমার মন যুগিয়ে এই নতুন কাজে আমায় উৎসাহ দেন। বইখানা লেখা হয়ে যায় ১৯২৮ সালে আর তারপর আমার টেবিলের ড্রয়ারে পাণ্ডুলিপিখানা পড়ে থাকে পাঁচ-পাঁচটা বছর, গোর্কির সামনে তাঁর মতামতের জন্যে বইখানা ধরে দিতে এতই ভয় ছিল আমার। কারণ, প্রথমত, আমার 'বোকামির দিন' গল্পটা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া আর তাঁর 'পটভূমিকার অভাব' মন্তব্যটি তখনও আমার মনে ছিল। দ্বিতীয়ত, আমি চাই নি যে, গোর্কি আমায় ঝানু মাস্টারের বদলে ব্যর্থ লেখক বলে ভাবতে শুরু করুন। ওই পাঁচ বছরের মধ্যে দ্জের্জিন্স্কি উৎপাদন কমিউন সম্বন্ধে আমি আরও একখানা ছোট বই লিখে ফেলেছিলুম আর

বইখানা দেখে দেয়ার জন্যে আমার মহদাশয় বন্ধুর কাছে তা সাহস করে পাঠাতে না-পেরে পাণ্ডুলিপিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম রাষ্ট্রীয় সাহিত্য প্রকাশানালয়ে। প্রকাশন ভবনটি পাণ্ডুলিপিখানা ফেলে রাখল বছর-দুয়েকের ওপর, তারপর হঠাৎই একদিন আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই ছেপে বের করল বইখানা। আমি কিন্তু বইখানা কোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি হতে দেখি নি, কোনো পত্রিকা কিংবা সংবাদপত্রে সে-সম্পর্কে এক লাইনেরও উল্লেখ দেখি নি, এমন কি কাউকে কোনোদিন পড়তে পর্যন্ত দেখি নি বইখানা। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে বইখানা বেমালুম চুপচাপ বুঝি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আর তাই রীতিমতো তাজ্জব আর চমৎকৃত বনে গিয়েছিলুম আমি যখন ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোরেন্তো থেকে একখানা চিঠি পেলুম, যার প্রথম বাক্যটি শুরু হয়েছিল এইভাবে: 'গতকাল তোমার '১৯৩০এর কুচকাওয়াজ' পড়লুম।... রীতিমতো উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর হয়ে বইখানা পড়ে ফেলেছি।'

ব্যস, এরপর আর গোর্কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি হলেন না। তবু আরও প্রায় বছরখানেক চেপে রইলুম আমি। 'জীবনজয়ের পথে' বইখানা — আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তি আর আমার অল্পবিস্তর সংগ্রামের কাহিনী — তাঁকে দেখতে দিতে তখনও ভরসা পাচ্ছিলুম না। কিন্তু গোর্কি বারবার তাগিদ দিতে শুরু করলেন। লিখলেন: 'কোনো একটা গরম জায়গায় চলে যাও আর বইখানা লিখে ফেল দেখি...'

আমি কোনো গরম জায়গায় যাই নি, কারণ হাতে তখন তেমন সময় ছিল না। তবে গোর্কির উৎসাহদান ও অনবরত

তাগিদের ফলে অবশেষে আমি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলুম। ১৯৩৩ সালের শরৎকালে তাঁকে আমার বইখানা, বা বইয়ের প্রথম খন্ডটা দেখতে দিলুম। বইখানা হাতে পাওয়ার পরদিনই বই ছাপা সম্পর্কে তিনি প্রাণখোলা অনুমোদন জানালেন। ফলে '১৯১৭ সাল' নামের বার্ষিক গ্রন্থতালিকার পরের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে বইখানা দাখিল করা হল। আমার বইয়ের বাকি অংশও গোর্কির হাত দিয়ে অনুমোদিত হয়ে গেল। বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডটা পড়ে গোর্কি কিন্তু ততটা সন্তুষ্ট হন নি। কিছু-কিছু দুর্বল অংশের জন্যে আমায় বকাবকি করলেন এবং জিদ ধরে বলতে লাগলেন বইখানায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বিতর্কের যে-আভাস দেয়া হয়েছে সে-ব্যাপারটা খোলাখুলি প্রকাশ করে লিখতে। কিন্তু পাছে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে এর বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখনও পর্যন্ত এই ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে ছিলুম। সত্যি কথা বলতে কী, বইখানায় সর্বত্র শিক্ষামুরুব্বি এই শব্দবিশেষের উল্লেখ আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। বইয়ের শেষ বা তৃতীয় খন্ডটা যখন আমি গোর্কির কাছে ক্রিমিয়ায় পাঠাই, তখন তাঁকে এপর্যন্তও অনুরোধ জানাই যে 'ওলিম্পাসের পাদদেশে' নামের অধ্যায়টা তিনি যেন বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু গোর্কি আমার কাছে উত্তরে সংক্ষেপে লিখলেন: 'কোনো কারণেই 'ওলিম্পাসের পাদদেশে' বাদ দেয়া চলে না...'

এ-সমস্তই সেই ১৯৩৫ সালের ঘটনা। বস্তুত, তাঁর জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলি পর্যন্ত মাক্সিম গোর্কি ছিলেন আমার শিক্ষক। বহু-বহু বছর ধরে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের অসংখ্য খুদকুঁড়ো সংগ্রহ করা সত্ত্বেও সব সময়েই — এমনকি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও — আমার কিছু-

না-কিছু শেখার থাকত তাঁর কাছে। তাঁর ব্যাপ্ত সংস্কৃতিচেতনা ও মহৎ মানবিক গুণাবলী, জীবনের সকল সংগ্রামে তাঁর আপসহীন মনোভাব, কথাবার্তায় আচরণে যা কিছু মেকি সুর, যা কিছু শস্তা, তুচ্ছ-নগণ্য, পরকীয় কিংবা নিছক হাস্যকর নকলনবিশির গন্ধমাখা তা ধরে ফেলার ব্যাপারে তাঁর আশ্চর্য বিচক্ষণতা, পুরনো দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সেই 'জীবনের প্রাজ্ঞ নির্মাতা' স্বয়ং আজকের দিনে এবং ভবিষ্যতে লক্ষ-লক্ষ মানুষের কাছে সর্বদাই অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস হয়ে থাকবেন-যে এ-বিষয়ে কোনো ভুল নেই।

আন্তন মাকারেঙ্কোর স্মৃতি-আলেখ্য

মাক্সিম গোর্কি

'সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক-দিগন্তরে' বইটি থেকে*

১৮৯১ সালের গ্রীষ্মে আমি একবার কুরিয়াজ মঠে যাই ও তৎকালখ্যাত ক্রোন্‌স্টাড্‌ট্‌-এর ইয়োয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কিন্তু পরের বার সে-মঠে থাকার সময়ে আমি যে সেখানে তার আগে আরও একবার এসেছি তা তৃতীয় দিনের আগে আমার মনেই পড়ে নি। এবারে আমি ছিলুম ওখানকার চার শো বাসিন্দা — পূর্বতন 'রাস্তার বাউণ্ডুলে' আর 'সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক' সব ছেলেমেয়ের মধ্যে তাদের অতিথি হয়ে। ওরা এখন আমার চিঠি-চালাচালির বন্ধু...

গত চার বছর ধরে এই উপনিবেশের বাচ্চাদের সঙ্গে আমার চিঠি-লেখালেখি চলেছে। আমি লক্ষ্য করে চলেছি ওদের ব্যাকরণ আর বানান-জ্ঞানের নিয়ত-পরিবর্তন, সমাজ-

---

* আলোচ্য প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯২৮ সাল।

চেতনার শ্রীবৃদ্ধি, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ওদের সচেতনা...

কলোনিটার বয়স হল সাত বছর, তার মধ্যে চার বছর ওটা ছিল পোল্‌তাভা জেলায়। এই সাত বছরে শ্রমিক ফ্যাকাল্টি (বা, 'রাব্‌ফাক') আর কৃষি ও সামরিক বিদ্যালয়গুলিতে এই কলোনি যুগিয়েছে বেশ কয়েক কুড়ি মানুষ। আর অন্যান্য উপনিবেশে 'শিক্ষক-শিক্ষিকার' পদে আরও কিছু লোক। কিন্তু সরকারি অপরাধ-তদন্ত দপ্তর মারফত পাঠানো আর মিলিত্‌শিয়া রাস্তা থেকে যাদের কুড়িয়ে পেয়েছে এমন সব ছেলেপিলে দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া বেশ কিছু বাচ্চা-বাউণ্ডুলেও মাঝে-মাঝেই এসে স্বেচ্ছায় জুটে যায় ওখানে। ফলে উপনিবেশটার বাসিন্দার সংখ্যা কখনই চার শো-র নিচে নামে না। গত অক্টোবর মাসে ন. দেনিসেঙ্কো নামে উপনিবেশের এক বাসিন্দা ওখানকার 'দলপতিদের' পক্ষ থেকে আমায় লিখে জানিয়েছে:

'আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর সবকিছু কত-যে পালটে গেছে তা যদি দেখতেন! আমাদের উপনিবেশের বহু পুরনো বাসিন্দা নিজে থেকেই গিয়ে যোগ দিয়েছে কলকারখানায়, শ্রমিক ফ্যাকাল্টিতে আর শিল্প-বিদ্যালয়ে। পুরনো বাসিন্দা এখন আর বড় একটা নেই, বেশির ভাগই এখন নবাগত। অবিশ্যি, যারা এখানকার যৌথ শ্রম-জীবনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত তাদের চেয়ে নতুনদের নিয়ে জীবনযাত্রা সংগঠিত করা বেশি কঠিন, সন্দেহ নেই। পুরনো বাসিন্দারা চলে যাওয়ায় কলোনির নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হতে শুরু করেছে। তবে পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে আমরা যারা এখনও আছি, এমনটা হতে দেয়া তাদের উচিত নয়; আমরা তা হতে দেবও না। কলোনির ইশ্‌কুলটাকে

পুরোপুরি ঢেলে সাজা হয়েছে। নতুন একটা সপ্তম-বর্ষ পাঠক্রমের ইশ্‌কুল বসিয়েছি আমরা, আর যারা এই ইশ্‌কুলে ভরতি হতে পারে নি তাদের জন্যে বসিয়েছি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের আরও একটা ইশ্‌কুল। জ্ঞানতৃষ্ণা-যে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুব প্রবল তা নয়, তবে কিনা চার শো বাসিন্দার একজনও ইশ্‌কুল পালাচ্ছে না।'

বর্তমানে এই কলোনিতে কম্‌সমোল-সদস্যের সংখ্যা হল বাষট্টি। এদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক পড়াশুনো করে খার্‌কভ শহরে, একজন তো ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মেডিক্যাল ছাত্র। কিন্তু এরা সবাই শহর থেকে আট ভের্স্তা (মাইল পাঁচেক) দূরের এই কলোনিতেই থাকে। সকলেই ওরা কলোনির সঙ্গীদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের অংশীদার।

কলোনির চার শো বাসিন্দা চব্বিশটি শ্রম-বাহিনীতে সংগঠিত। কাঠ-মিস্ত্রি, ফিটার-মিস্ত্রি, খেত ও সব্‌জি-বাগানের জনমজুর, গোরুর রাখাল, শূকরপালক, ট্র্যাক্টর-চালক, স্বাস্থ্যকর্মী, চৌকিদার, জুতো-বানানো মজুর, ইত্যাদি নিয়ে ওই সব বাহিনী তৈরি। যতদূর জানি, ৪৩ হেক্টর আবাদযোগ্য ও সব্‌জি-বাগান জমি আর ২৭ হেক্টর বন-জমি নিয়ে উপনিবেশটার খামার গড়ে উঠেছে। খামারে আছে বেশ কিছু গোরু, ঘোড়া আর ৭০টা ভালোজাতের শুয়োর। আশপাশের চাষীরা তো ওগুলো কিনতে পেলেই লুফে নেয়। খামারের আছে নিজস্ব কৃষি-যন্ত্রপাতি, দুটো ট্র্যাক্টর আর নিজস্ব বিজলি সরবরাহ কেন্দ্র। (একটা বারুদের কারখানার কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে কলোনির কাঠ-মিস্ত্রিরা এখন বারো হাজার প্যাকিং বাক্স বানানোয় ব্যস্ত।)

উপরোক্ত শ্রম-বাহিনীগুলোর চব্বিশ জন নির্বাচিত কর্মকর্তা মিলেই কার্যত কলোনির যাবতীয় কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার রুটিন পরিচালনা করে থাকে। ওদের হাতে থাকে সবক'টা ভাঁড়ারের চাবি, কী কী কাজ করতে হবে তার ছক তৈরি করে ওরাই, কাজকর্মের তদারকি করে আর বাহিনীর অন্যান্যদের সঙ্গে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে নিজেরাও কাজে হাত লাগায় সমান তালে। আপনা থেকে যারা এসে জুটেছে সেই নবাগতদের কলোনিতে নেয়া হবে কি হবে না, এ-ধরনের সমস্যার মীমাংসা করে দলপতিদের এই পরিষদ; কলোনির অপর বাসিন্দারা গুছিয়ে কাজ না-করলে কিংবা নিয়মশৃঙ্খলা ও 'ঐতিহ্য' ভঙ্গ করলে সেই অন্যায়ের বিচারও পরিষদ করে থাকে। এক্ষেত্রে দলপতি-পরিষদের সিদ্ধান্ত — যেমন, ভর্ৎসনা বা অতিরিক্ত কায়িক শ্রমের শাস্তি বরাদ্দ করা হলে কলোনির ডিরেক্টর আ. স. মাকারেঙ্কো জমায়েত বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে দোষীকে তা জানিয়ে দেন। এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ কিংবা বারে বারে অপরাধ করলে, যেমন কুঁড়েমি করলে, কঠিন পরিশ্রমের কাজে ফাঁকি দিয়ে চললে, কোনো সঙ্গীকে অপমান কিংবা কলোনির সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কাজ করলে তার শাস্তি হল কলোনি থেকে বহিষ্কার। এ-রকম ঘটনা অবশ্য খুবই কম ঘটে থাকে। দলপতি-পরিষদের প্রতিটি সদস্য যেমন মনে রাখে 'বাইরে' তার নিজের জীবন একসময়ে কেমন কেটেছে, তেমনই তা মনে রাখে দোষী ব্যক্তিটিও। কেননা, তখন তার জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায় কোনো শিশু-সদনে আশ্রয় নেয়া। আর ওই সদনগুলোকে 'নিরাশ্রয়, অনাথ-সমাজ' একেবারে বিষ-নজরে দেখে থাকে।

কলোনির নানা ঐতিহ্যের একটি হল এই রকম: যখন

কোনো ছেলে বা মেয়েকে সরকারি অপরাধ-তদন্ত দপ্তর কলোনিতে আনে, তখন তার পরিচয়, কীভাবে সে আগে জীবন কাটিয়েছে, কিংবা কী করেই-বা তদন্ত দপ্তরের খপ্পরে পড়ল, এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একদম নিষিদ্ধ। আর যদি কোনো 'আনাড়ি' আপনা থেকেই নিজের সম্বন্ধে বকবকানি শুরু করে তাহলে তার কথায় কান না-দেয়াই রেওয়াজ। যদি সে নিজের পূর্ব-কীর্তিকলাপ সাতখানা করে বলতে শুরু করে, তবে তার কথা কেউ তো বিশ্বাস করেই না, উপরন্তু তা-ই নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। এর ফল কিন্তু সব সময়েই ভালো হয়। আগন্তুক ছেলেটিকে সবাই মিলে সমঝে দেয়, 'বুঝেচ, বাপু, এটা কিন্তু জেলখানা নয়। এখানা আমরাই কত্তা। তুমিও তাই। চুপটি মেরে থাক এখানে, শেখো আর আমাদের সাথে মিলেমিশে কাজ কর দেখি। আর যদি এ-সব পছন্দ না-হয়, তাহলে তুমি, বাপু, পথ দেখতে পার।'

নবাগত শিগ্গিরই বুঝতে পারে, এ-সব কথা কত খাঁটি। দেখা যায়, সহজেই সে কলোনির সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। যতদূর মনে পড়ছে, কলোনির সাত বছরের জীবনে মোটমাট দশ বারের বেশি বাচ্চাদের কলোনি 'ছেড়ে যাওয়া'র মতো ব্যাপার ঘটে নি।

দ. নামে 'দলপতি'দের একজন কলোনিতে ঢুকেছিল তেরো বছর বয়সে। এখন তার বয়স সতেরো। পনেরো বছর বয়স থেকেই সে পঞ্চাশ জন কলোনি-বাসিন্দার একটা বাহিনী পরিচালনা করে আসছে। এই বাহিনীর বেশির ভাগই আবার দ.-র চেয়ে বয়সে বড়। শুনেছি, ছেলেটি নাকি ভালো একজন কমরেড, আর খুবই কড়া আর সু-বিচারক দলপতি। সরকারি আত্মজীবনীতে ও লিখেছে:

'কম্‌সমোল-এর সদস্য থাকা অবস্থায় হৈ-হল্লার দিকে বেশি ঝোঁকায় আমাকে বহিষ্কার করা হয়।' 'বাঁচতে আমার ভারি ভালো লাগে, আর সবচেয়ে ভালো লাগে গান-বাজনা আর বই।' 'গান-বাজনার আমি দারুণ ভক্ত।'

দ.-র উদ্যোগে কলোনির ছেলেমেয়েরা আমায় এক চমৎকার উপহার দিয়েছে। দু-শো চুরাশি জন সদস্য তাদের আত্মজীবনী লিখে উপহার দিয়েছে আমায়। দ. নিজে একজন কবি। ইউক্রেনীয় ভাষায় গীতি-কবিতা লেখে সে। কলোনিতে আরও বেশ কয়েক জন কবি আছে। কলোনি থেকে 'প্রমিন' (ঝলক) নামে একখানা সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিন জন বাসিন্দা মিলে কাগজটির সম্পাদনা করে, ছবি এঁকে অলঙ্করণ করে চ. নামে অপর একজন 'দলপতি' ছেলে। চ. নিশ্চিতভাবে প্রতিভাবান ও একনিষ্ঠ ছেলে। তবে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে ও সন্দিহান, আর সে-প্রতিভা কাজেও লাগায় খুব সাবধানে।

পোল্যান্ড-থেকে-আসা বাস্তুহারা ছেলে চ.। আট বছর বয়স থেকে রাস্তার অনাথ ছেলে হিসেবে ওর জীবন শুরু। ইয়ারস্লাভ্‌ল শহরে এক শিশু-উপনিবেশে কিছুদিন ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ট্রামগাড়িতে পকেটমারের পেশা নেয়। এর পরে ও কিছুদিন এক দাঁতের ডাক্তারের কাছে থাকে। ডাক্তারের সঙ্গে থেকে ও পায় 'বই-পড়া আর ছবি-আঁকার নেশা'। কিন্তু 'রাস্তার ডাকে' ডাক্তারকে ছেড়ে আবার পালায় ও, সঙ্গে নেয় 'জারের আমলের কয়েকটা সোনার টাকা'। এই পয়সা ও খরচা করে বই, কাগজ আর রঙ কেনায়। শ্বেত সাগরে জাহাজের বয়লারে কয়লা-ঠেলা খালাসির সহকারী হিসেবে ও সাগর পাড়ি দেয়, কিন্তু 'চোখ খারাপ থাকায় সে-কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য' হয়।

অতঃপর পেচোরা নদীর ধারে জিরিয়ানদের মধ্যে 'ফসলে খাজনা আদায়ের পেয়াদা'র কাজ করে কিছুদিন। এই সময়ে জিরিয়ান ভাষাটাও শিখে নেয়। তারপর কিছুদিন থাকে সাময়েদদের মধ্যে। কুকুরে-টানা গাড়িতে চেপে চ. এরপর উরাল পর্বতমালা পেরিয়ে এসে হাজির হয় অব্দোর্স্কে, তারপর পাড়ি দেয় আর্খাঙ্গেল্স্ক। চুরিচামারি করে আর রাতে সরাইখানায় ঘুমিয়ে ওর দিন কাটতে লাগল সেখানে। এরপর ওখানে থাকতেই ও শুরু করল দোকানের সাইনবোর্ড আর নিসর্গদৃশ্য আঁকার কাজ। আর নিতে লাগল শিল্পশিক্ষার পাঠ। এদিকে একই সঙ্গে তৈরি হতে লাগল সপ্তম-বর্ষ পাঠক্রমের ইশ্‌কুলে ঢোকার জন্যে। সার্টিফিকেট জাল করে এরপর চ. ঢুকে পড়ল ভিয়াত্‌কা চারু ও কারুশিল্প ইশ্‌কুলে। 'অন্য অনেকের থেকে ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করলাম আমি। ছবি আঁকায় আর ড্রইং-এ আমার নাকি ওস্তাদের হাত, সবাই বললেন। কিন্তু ও-কথা আমার বিশ্বাস হয় নি।' এরপর চ. নির্বাচিত হল ছাত্র-সমিতিতে, সাংস্কৃতিক কাজকর্মও চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শীতকালে, ছুটির মধ্যে, ও গ্রেপ্তার হল — 'জাল দলিলপত্রের জন্যেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম আর-কি। এরপর বসন্তকাল পর্যন্ত একটা স্বভাব-সংশোধনী জেলে কাটালাম'। জেলে বসেও ও প্রচুর পড়াশুনো আর সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করল। এরপর ও 'সেভের্‌নায়া প্রাভ্‌দা' কাগজের রিপোর্টার হল।

এতসব কথা ও লিখেছে এতটুকু বড়াই না-করে, আর, বলা বাহুল্য, অন্যের সহানুভূতি আকর্ষণের বিন্দুমাত্র বাসনা মনে স্থান না-দিয়েই। এ এক সরল, অকপট বিবরণমাত্র, যেন কেউ লিখছে: আমি একটা জলার মধ্যে দিয়ে গেলুম,

তারপর ঢুকলুম বনে, পথ হারিয়ে এসে উঠলুম একটা বালির রাস্তায় আর পথচলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

চ.-এর গোটা জীবনকথার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। তবে ওপরে যে-কাহিনী বলা হল তা হচ্ছে ওর স্বেচ্ছায় কুরিয়াজ কলোনিতে এসে হাজির হয়ে যাওয়ার মুহূর্তটি পর্যন্ত। অতঃপর ও বাস করতে শুরু করল কুরিয়াজে, প্রচণ্ড উৎসাহে কাজকর্ম শুরু করল, পড়াশুনো চালাতে লাগল। অবশেষে অপেক্ষাকৃত বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিল। চ. লিখছে, 'আগের মতো এখানেও আমি সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে চাইলাম। বই পড়া আর ড্রইং আঁকা আমার ভারি পছন্দ'। চশমা-চোখে, সুদর্শন, সুগঠিতদেহ তরুণ চ. — আত্মমর্যাদাবোধের চিহ্ন ওর চোখেমুখে, কথাবার্তার ধরন সংক্ষিপ্ত ও সুমিত। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রতি ওর আচরণ আশ্চর্যরকম বিবেচনাপূর্ণ ও সমনোযোগ, সমবয়সী কমরেডদের সঙ্গে ব্যবহারও ভারি মিষ্টি, মৃদু। আর্খাঙ্গেল্স্কে থাকতে ওর নিজের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে সম্ভবত ওর আচরণ এমনতরো হয়ে উঠেছে। ঘটনাটা হচ্ছে এই: ওখানে 'এমন একটি ছেলের সঙ্গে' ওর 'পরিচয় হয় যে নিজেও ছিল শিল্পী, তদুপরি সাহিত্য সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ছেলেটার নাম ছিল ভাস্কা। তবে খুব অল্পসময়ই আমরা একসঙ্গে ছিলাম, কেননা হঠাৎ একদিন সে গলায় দড়ি দিল। মরার পর দেখা গেল তার বুকে জামার সঙ্গে পিন দিয়ে একখানা চিরকুট আঁটা আর চিরকুটখানায় লেখা: 'বাড়িউলি গিন্নির কাছে আমার আট কোপেক ধার আছে। পয়সাটা যদি যোগাড় করতে পারিস তাহলে সেটা ওকে দিয়ে ধার শোধ করিস।''

নিঃসন্দেহে চ. অত্যন্ত প্রতিভাবান তরুণ। আর, আমার ধারণা, এরপর ও আর খারাপ পথে যাবে না। ওর জীবনকথা একান্তভাবে ওরই কাহিনী নয়। আরও যে-সব জীবনকথা আমি পড়েছি বা শুনেছি তার প্রায় সবই ওর জীবনের প্রতিরূপ।

কিন্তু এই সব 'রাস্তার বাউণ্ডুলের দল' এল কোথা থেকে? — যুদ্ধের ঘূর্ণিবাত্যা সারা দেশে যাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের জেলাগুলোর বাসিন্দা সেই সব বাস্তুহারার ছেলেপিলে এরা, গৃহ-বিসংবাদ, মহামারী আর দুর্ভিক্ষের বছরগুলোয় যারা দলে-দলে মারা পড়েছিল সেই সব লোকের অনাথ কাচ্চাবাচ্চা এরা সব। কলঙ্কিত উত্তরাধিকারের অভিশাপ নিয়ে জন্মেছে এই শিশুরা — এদের মধ্যে রাস্তার প্রলোভনে মজেছে যারা তারাই ডুবেছে, আর যারা অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজেদের সামলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে তারা গেছে বেঁচে। স্বেচ্ছায় তারা যে-কোনো চাকরিবাকরিতে ঢুকে পড়েছে, মানবার মতো হলে এবং তাদের আত্মসম্মান তাকে ক্ষুণ্ণ না-হলে কাজের নিয়মশৃঙ্খলাও মেনে নিয়েছে সহজে। এরা সবকিছু শিখতে চায়, লেখাপড়া করেও মন দিয়ে। সম্মিলিতভাবে কাজ করার গুরুত্ব এরা উপলব্ধি করে, এরা বোঝে এই ধরনের কাজ কত সুবিধাজনক। আমি বরং বলব, আমাদের মধ্যে যারা সবল তাদের কাছে চমৎকার অথচ কঠোর শিক্ষক আমাদের এই জীবন ওইসব ছেলেমেয়েকে 'আত্মিক দিক থেকে' যৌথশ্রমের উপযুক্ত কর্মী হিসেবে গড়েপিটে তৈরি করে নিয়েছে। অথচ, একই সঙ্গে, ওই ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে কমবেশি স্পষ্টভাবে নির্ণীত একেকটি বিশিষ্ট সত্তা, প্রত্যেকেই 'মুখের নিজস্ব আদল'

সহ একেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কুরিয়াজ শ্রম-উপনিবেশের সদস্যদের দেখলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যে তারা বুঝি 'ভদ্র পরিবারে লালিত'। যারা সবেমাত্র কলোনিতে এসে পেঁছেছে কিংবা যাদের ওখানে পাঠানো হয়েছে এমন সব 'বাচ্চা ছেলেমেয়ে' আর 'আনাড়ি'দের সঙ্গে কলোনির উপরোক্ত ছেলেমেয়েরা যে-রকম আচরণ করে বিশেষ করে তা দেখেই এমন ধারণা জন্মায়। নবাগত বাচ্চারা একেবারে আচমকা কিশোর-কিশোরীদের আদরযত্নের এক অকল্পনীয় পরিবেশে এসে পড়ে। অথচ কলোনিতে আসার আগে রাস্তার জগতে ওই বয়সের কিশোর-কিশোরীরা বাচ্চাদের কাছে বিভীষিকার বস্তু হিসেবে গণ্য। সেখানে বাচ্চাদের ওরা মারধর করে, নানাভাবে উৎপীড়ন করে, চুরি করতে, ভোদ্‌কা খেতে আর নানারকম অপকর্ম করতে শেখায়।

কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে আমি খুবই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি, অথচ বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমানোর মানুষ আমি নই। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ভয় হয়, পাছে যা বলার নয় তাই বলে ফেলি, আর এই ভয়েই মুখ বুজিয়ে থাকি। কিন্তু কুরিয়াজ উপনিবেশের বাচ্চাদের মধ্যে গিয়ে এই ভয় আমাকে পেয়ে বসে নি। তাছাড়া ওদের সঙ্গে কথা বলার দরকারও ছিল না। নিজেরাই ওরা খুব ভালো বলিয়ে-কইয়ে, আর প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু বক্তব্যও ছিল।

ওই ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে যে-সাথিত্বের বোধটি অতি-বিকশিত তার অস্তিত্ব কলোনির মেয়েদের মধ্যেও অনুভব করা যায় (কলোনিতে এই মেয়ের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি)। ওদের মধ্যে একজন, বছর ষোল বয়সের হাসিখুশি একটি মেয়ে — মাথায় তার লাল চুল আর চোখদুটি

বুদ্ধিমত্তায় ভরা। কী কী বই সে পড়েছে তা-ই নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন-যেন চিন্তাভারাক্রান্ত গলায় বলে উঠল: 'এই দেখুন, এখানে তো আপনার সঙ্গে কথা কইচি, অথচ একসময় এই আমিই পুরো দুটো বছর বেশ্যাবৃত্তি করেচি।'

অন্যকে বিচলিত করে তোলার মতো এই কথাগুলো সে এমনভাবে বলল যেন কোনো একসময়ে দেখা একটা দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে তার। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলুম যে ওর এই কথাগুলো বাক্যের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রক্ষিপ্ত একটা অংশ ছাড়া কিছু নয়, যা নাকি তার কাহিনীর প্রাণবন্ত বর্ণনার তোড়ে দৈবক্রমে ঢুকে পড়েছিল।

ছেলেদের মতোই কলোনির মেয়েরাও ছিল স্বাস্থ্যে ভরপুর, মনে হচ্ছিল একই রকম 'সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে লালিত' তারাও। মেয়েরাও কাজ করে যাচ্ছিল প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য আর উদ্দীপনা নিয়ে, যার ফলে কঠিনতম কর্তব্যকর্মও হাল্‌কা খেলার মতো ঠেকছিল ওদের কাছে। মেয়েরা ছিল কলোনির যতসব 'গৃহকর্ত্রী', তবে তারাও বাহিনীতে-বাহিনীতে বিভক্ত ছিল আর প্রত্যেক বাহিনীর ছিল একজন করে 'দলপতি'। কাপড়-জামা কাচা, সেলাইফোঁড়াই, রিফুকর্ম, আবাদে আর সব্‌জিবাগানে গতরখাটা — এইসব ছিল ওদের কাজ। কলোনির ক্যাণ্টিন আর এজমালি শোবার ঘরগুলো সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখেছি, যদিও শাদাসিধেভাবে সামান্য আসবাবে সাজানো ছিল ঘরগুলো তবু কেমন একটা গৃহস্থ-সংসারের আবহাওয়া ছিল সেগুলোয়। মেয়েরাই ওইসব ঘরের কোণে-কোণে আর দেয়ালের এখানে-সেখানে এক-আধটুকু সবুজের ছোঁয়া লাগিয়ে দিত, অন্ততপক্ষে বুনো ফুলের একেক গোছা কিংবা মিষ্টি গন্ধওয়ালা

শুকনো গাছগাছালির ডালপালা দিয়েই সাজিয়ে রাখত ঘরগুলো। সত্যিকার সযত্ন হাতের ছোঁয়া অনুভব করা যেত সর্বত্র। চার শো ছেলেমেয়ের জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্যে ওই মেয়েরা সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে যেত।

কিন্তু জীবন যাদের প্রতি অমন নির্মম ও হীন আচরণ করেছে সেই রকম কয়েক শো শিশুকে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলে তাদের মধ্যে এমন অলৌকিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল কে?—লোকটি আর কেউ নন, কলোনির সংগঠক ও ডিরেক্টর আ. স. মাকারেঙ্কো স্বয়ং। মাকারেঙ্কো নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান শিক্ষাদাতা। কলোনির খুদে বাসিন্দারা সত্যিই ওঁকে ভালোবাসে। ওঁর সম্পর্কে এমন একটা গর্বের ভাব নিয়ে ওরা কথা বলে যেন মনে হয় ওরাই বুঝি ওঁকে তৈরি করেছে। লম্বা নাক, তীক্ষ্ন বিচক্ষণ দুটো চোখ, রুক্ষ-চেহারার স্বল্পবাক, চল্লিশোধ্বর্ মানুষ মাকারেঙ্কো — যাঁকে দেখলে একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর লোক ও 'উন্নত আদর্শ' মানা গ্রাম্য ইশ্‌কুল-মাস্টার বলে মনে হবে। যেন গলা ভেঙে গেছে এমনি ধরাগলায় কথা বলেন উনি, হাঁটেন ধীরেসুস্থে, অথচ সময়ের সদ্‌ব্যবহারে পাকাপোক্ত, সবদিকে নজর আর কলোনির প্রতিটি বাসিন্দা ওঁর নখদর্পণে। বাসিন্দাদের কারো সম্পর্কে কিছু বলতে হলে উনি মাত্র গুটি পাঁচেক শব্দে যেন তার চরিত্রের একটা ফোটোগ্রাফ চোখের সামনে তুলে ধরেন। স্পষ্টতই, বাচ্চাদের প্রতি এক-আধটুকু স্নেহ বর্ষণ করা ওঁর পক্ষে দরকার হয়ে পড়ে, আর উনি তা করেও থাকেন — কাউকে দুটো মিষ্টি কথা বলে, কারো দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে, আবার কাউকে-বা মাথায় আস্তে একটু থাবড়া দিয়ে।

মাঝে-মাঝে সভায় মিলিত হয়ে দলপতিরা কলোনির কাজকর্ম, খাবার সরবরাহের সমস্যা, ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে চুটিয়ে আলোচনা করে থাকে, কিংবা কর্মী-বাহিনীগুলোর কাজকর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি, অবহেলা ও ভুলভ্রান্তির নানা নমুনা পরস্পরের সামনে তুলে ধরে। ওই সব সভায় আন্তন মাকারেঙ্কো কিন্তু চুপচাপ একপাশে বসে থাকেন, কখনো-সখনো এক-আধটা কথা বলেন মাত্র। ওই দু-একটা কথা মানে প্রায়ই ওঁর ধমক আর-কি; তবে কথাগুলো বলেন উনি বয়স্ক বন্ধুর উপদেশের ঢঙে। দলপতিরা ওঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তর্ক করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ভাবখানা এমন যেন এই পঁচিশতম কমরেডকে বাকি চব্বিশ জন তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর অভিজ্ঞ বলে ধরে নিয়েই আলোচনা করছে।

কলোনির জীবনযাত্রায় সামরিক বিদ্যালয়ের দৈনিক রুটিনের খানিক-খানিক চালু করে দিয়েছেন মাকারেঙ্কো। ইউক্রেনীয় জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটাই তাঁর মতদ্বৈধের কারণ। মাকারেঙ্কোর প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন ভোর ছ-টায় কলোনি-প্রাঙ্গণে বিউগ্‌ল বাজিয়ে জাগরণী সংকেত জানানো হয়। সকালবেলার জলখাবারের পর সাতটার সময় ফের একবার বিউগ্‌ল-সংকেত জানালে কলোনির বাসিন্দারা প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা সম-চতুর্ভুজের আকারে দাঁড়িয়ে পড়ে। কলোনির প্রতীক পতাকা থাকে ওই সম-চতুর্ভুজের মাঝখানে। আর পতাকা-বাহকের দু-পাশে দাঁড়ায় রাইফেল হাতে কলোনির দুই কমরেড। মাকারেঙ্কো তখন সেদিনের কাজ কী কী করতে হবে তা তাদের উদ্দেশ করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন, আর যদি সেদিন অপরাধী কেউ থাকে তো দলপতি-পরিষদে গৃহীত তার শাস্তির সিদ্ধান্তও সকলের

সামনে ঘোষণা করেন। এরপর দলপতিরা তাদের নিজ-নিজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কাজে বেরোয়। এই 'সাড়ম্বর অনুষ্ঠান' কিন্তু বাচ্চাদের খুব পছন্দ।

তবে এর চেয়েও বেশি সাড়ম্বর, এমন কি বলতে পারি গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল সেদিন, যেদিন কলোনি থেকে পাঁচ-গাড়িবোঝাই প্যাকিং বাক্স ফ্যাক্টরির খরিদ্দারকে যোগান দেয়া হল। কলোনির ব্যান্ড-পার্টি সেদিন প্রাণপণে, প্রচণ্ড জোরে ব্যান্ড বাজিয়েছিল, আর তারপর দেয়া হল পর-পর অনেকগুলো বক্তৃতা — সংস্কৃতির স্রষ্টা শ্রমের অসামান্য তাৎপর্য সম্পর্কে; স্বাধীন যৌথশ্রমই-যে একমাত্র বস্তু যা মানুষকে দেবে ন্যায়নির্ভর জীবন, সে-সম্পর্কে; এবং ব্যক্তি-মালিকানার বিলোপসাধনই-যে একমাত্র মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবে আর জীবনের যত কিছু অমঙ্গল ও দুঃসহ ভবিতব্যের অবসান ঘটাবে, সে-বিষয়েও। সেদিন সেই সারি-সারি গম্ভীর, মিষ্টি, কচি মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর আবেগে উদ্বেল না-হওয়া ছিল অসম্ভব। কলোনির নিজস্ব ছুতোরশালে বানানো কাঠের বাক্সে বোঝাই গাড়িগুলোর দিকে গর্বোজ্জ্বল, হাসি-ফুটফুট চোখে তাকিয়ে ছিল যে নীল-কটা-বাদামি নানারঙা চার শো জোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আমিও হয়ে পড়েছিলুম বিচলিত। চার শো গলায় উঠল সেদিন প্রাণভরা. উচ্ছল জয়োল্লাস-ধ্বনি। বাচ্চাদের কাছে আ. স. মাকারেঙ্কো শ্রম সম্পর্কে এমন একটা শান্ত, নিগূঢ় প্রাণশক্তি নিয়ে কথা বলতে পারেন যা অনেক সুন্দর, সাজানো কথার চেয়ে অনেক বেশি বোধগম্য ও স্পষ্ট হয়। আমার তো মনে হয়, তাঁর হাতে-গড়া কলোনি-বাসিন্দাদের জীবনকথার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-প্রসঙ্গে তিনি নিজে যা লিখেছেন মাকারেঙ্কো নামের

মানুষটিকে তার চেয়ে আর ভালোভাবে বর্ণনা করা যায় না। ওই ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখছেন:

'শততম জীবনকথাটি টাইপরাইটারে টাইপ করতে-করতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর বইটি পড়ছি আমি। কত সহজ, কী নির্মম সব শব্দ গেঁথে-গেঁথে একটি শিশুর দুঃখদুর্ভাগ্যের সংহত রূপ নিয়েছে গল্পটা। এর প্রতিটি শব্দে আমি অনুভব করছি, এ-গল্প কারো অনুকম্পা জাগানোর উদ্দেশ্যে বানানো নয়, কারো মনে প্রভাববিস্তার উদ্দেশ্য নয় এর। এটা হল গিয়ে একদম একা, নিঃস্ব, রিক্ত এক মাণবকের সরল, আন্তরিক একটি কাহিনী, কারো দয়ার উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত নয় যে-মানবশিশু, যে কেবল প্রতিকূল দুনিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে, নির্ভয়ে নিজের অবস্থাকে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। এটা অবশ্য আমাদের এই যুগকালের ট্র্যাজেডি। তবে এ-ট্র্যাজেডি কেবল আমাদেরই নজরে পড়ে; কলোনির খুদে বাসিন্দাদের কাছে এটা কোনো ট্র্যাজেডিই নয়, ওদের ও দুনিয়ার মধ্যে এটা একটা প্রথাসিদ্ধ সম্পর্ক হিসেবে ওদের কাছে গণ্য।

'সম্ভবত আর কারো চেয়ে আমার কাছে এ-ট্র্যাজেডি অনেক বেশি দুঃখবহ। গত আট বছর ধরে আঁস্তাকুড়ে-ফেলে-দেয়া শিশুদের ভয়াবহ দুঃখযন্ত্রণাই শুধু নয়, তাদের আতঙ্কজনক নৈতিক বিকৃতিও চোখ মেলে দেখতে বাধ্য হয়েছি। তাই ওদের প্রতি শুধুমাত্র সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো অধিকার নেই আমার। বহুদিন থেকে এ-উপলব্ধি আমার জন্মেছে যে এই মানব-সন্তানদের বাঁচাতে হলে আমাকে নির্মমভাবে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হবে, কঠিন ও অনমনীয় হতে হবে। নিজেদের সম্পর্কে ওরা যেমন ভ্রূক্ষেপহীন,

আমাকেও ওদের সম্পর্কে তেমনই উদাসীন দার্শনিক হতে হবে।

'আমার জীবনের ট্র্যাজেডি হল এই। আর এই টুকরো লেখাগুলো পড়তে-পড়তে সে-ট্র্যাজেডি আরও তীক্ষ্ন হয়ে আমাকে বাজল। আমাদের সকলের জীবনেরই ট্র্যাজেডি এটা, একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই আমাদের। যারা কেবলমাত্র মিষ্টি-মিষ্টি অনুকম্পা অনুভবের ও এইসব শিশুকে খুশি করার মোলায়েম ইচ্ছা জাহিরের কণ্ঠস্বীকারটুকু করতে চায়, তারা এই শিশুদের সুপ্রচুর ও তাদের কাছে যা সুলভ সেই দুঃখকষ্টের আড়ালে নিজেদের ভণ্ডামিকেই ঢাকতে চায় মাত্র।'

কুরিয়াজের উপনিবেশ ছাড়াও খার্কভের কাছে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনটি দেখেছি আমি। এই কমিউনে আছে বড়জোর একশো কি একশো কুড়ি জনের মতো ছেলেমেয়ে। 'শিশু অপরাধী' ও 'সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক'দের জন্যে আদর্শ শিশু শ্রম-উপনিবেশ কী রকমটা হওয়া উচিত স্পষ্টত সেটা প্রমাণ করার জন্যেই এর প্রতিষ্ঠা। সামনে সদরের দিকে উনিশটি জানলাওয়ালা বিশেষভাবে-তৈরি একটা বাড়ির দুটো তলা জুড়ে কমিউনটির অধিষ্ঠান। এখানে কাঠের কাজ, জুতো তৈরি ও যন্ত্রপাতি বানানোর উপযোগী তিনটে কারখানা-ঘর সাজানো হয়েছে একেবারে আধুনিকতম যন্ত্র আর বহুতর বাছাই হাতিয়ার দিয়ে। বাড়িটায় আছে হাওয়া-চলাচলের চমৎকার ব্যবস্থা, বড়-বড় জানলা আর প্রচুর আলো। বাচ্চাদের পরনে পোশাকের উপর আরামদায়ক আঙরাখা, তাদের শোবার ঘরগুলো বড়-বড়, ভালো বিছানাপত্র, আর আছে স্নানের ঘর, ধারাস্নানের উপযোগী ঝাঁঝরি-কল, পড়াশুনোর জন্যে পরিচ্ছন্ন

আলোহাওয়াযুক্ত ঘর, একটা অ্যাসেম্ব্লি হল, প্রচুর বই সহ লাইব্রেরি ও লেখাপড়ার অঢেল সরঞ্জাম। আর এ-সবকিছুই ফিটফাট, ঝকঝকে। এক কথায়, লোককে 'দেখানোর মতো' একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান এটি। এমন কি, শিশুদেরও যেন ওখানে 'প্রদর্শনীর জন্যে' বেছে নেয়া হয়েছে — বাচ্চারা সবাই এমন স্বাস্থ্যে ভরপুর। এ-ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

লাভ্‌র্‌ স্তেপানচেঙ্কো।*

মাকারেঙ্কোকে যেমনটি দেখেছি

১. 'তিন হরিহর-আত্মা'

...সময়টা ছিল ১৯১২ সালের শরৎকাল। ওই সময়ে আমি ছিলুম নভবুগ্‌স্কি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে সদ্য পাশ-করে-বেরুনো বছর কুড়ি বয়সের সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ। রাষ্ট্রায়ত্ত স্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টরের কাছে আমার নামে একখানা সুপারিশপত্র ছিল, যাতে লেখা ছিল আমাকে কোনো স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যেতে পারে। আমার প্রথম চাকরি জুটল দক্ষিণ রেলপথের দলিন্‌স্কায়া স্টেশনের সংলগ্ন একটি গ্রামে এক-ক্লাসওয়ালা একটি স্কুলে।

একখানা ভাড়াটে বাড়িতে স্কুলটি বসত। স্কুল বলতে ছিল প্রকাণ্ড একখানা ঘরে খান-পনেরো ডেস্‌কো আর

---

* লাভ্‌র তিমফেয়েভিচ স্তেপান্‌চেঙ্কো (জন্ম ১৮৯১ সালে) — দলিন্‌স্কায়ার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও সে-সময়ে মাকারেঙ্কোর সহকর্মী (১৯১২-১৯১৪ সালে)। বর্তমানে ইনি ক্রিভোই রোগ-এর বাসিন্দা। — সম্পাঃ

তার পাশে ছোট্ট একটা ঘর আমার বা অধ্যক্ষের ব্যবহারের জন্যে। ওখানেই এমন একজন লোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল যাঁর মাথার চুল ছিল মুড়িয়ে ছোট করে ছাঁটা। আমার চেয়ে মাথায় খাটো এই লোকটির তীক্ষ্ন, অল্প-একটু সরু চোখদুটো তাঁর খাড়া নাকের-ওপর-বসানো পাঁশনের আড়াল থেকে জ্বলজ্বল করতে থাকত আর ঠোঁটে সর্বদা মাখানো থাকত বিদ্রূপের মুচকি হাসি। যে হুল-ফোটানো সুরে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন তার সঙ্গে তাঁর 'শজারু'সদৃশ ছাঁটা চুল ভারি খাপ খেয়ে যেত... নাঃ, ব্যাপারটা দেখছি গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়...

আমি ছিলুম গাঁয়ের খেতমজুরের ছেলে, যাকে বলে বিলকুল গেঁয়ো। লাজুক ছিলুম একেবারে আনাড়ির মতো। নিজের জ্ঞানগম্যির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভালোরকম সচেতন ছিলুম বলে বিদ্যের মারপ্যাঁচে আমাকে হারিয়ে দিয়ে যারা আমার অত্যন্ত ঠুন্‌কো আত্মাভিমানে ঘা দিতে পারত এমন লোকজনকে আমি সযত্নে এড়িয়ে চলতুম। এজন্যেই রেলের বড় ইশ্‌কুলটার মাস্টারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার জন্যে আমি তেমন ব্যস্ত ছিলুম না।

একদিন সন্ধেবেলা বেহালা বাজানোর চর্চায় মগ্ন হয়ে ছিলুম। হয় দরজায় কোনো ধাক্কার আওয়াজ আমার কানে যায় নি অথবা ঢোকার আগে ওরা দরজায় ধাক্কা দেয় নি — তা সে যে-কারণেই হোক হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড হাসির শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে তিন মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। সামনের দিকে কালো চুলওয়ালা দৈত্যের মতো চেহারার যে-ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল সে আমাকে যেন বিঁধে রেখেছিল দুই চোখের সম্মোহনী দৃষ্টিতে। হো-হো করে হাসতে-হাসতে সঙ্গীদের দিকে ফিরে

সে বললে: 'এমনধারা লোক দেখেছিস কখনও? আরে, উনি দেখি আবার বেহালাবাজিয়েও! এটা একটা আবিষ্কার, কী বলিস! আরে মশাই, এমন প্রতিভা নিয়ে আপনি তো দেখছি আমাদের কুপোকাত করে দেবেন! তা, এমনধারা লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন, বলুন দেখি?'

একথার কোনো জবাব না-দিয়ে যেমন ছিলুম তেমনই দাঁড়িয়ে থেকে খালি সলজ্জভাবে একবার কাঁধঝাঁকানি দিলুম। এতে দলের অপর একজন, মুড়িয়ে-ছাঁটা চুল আর মুখে তেতো হাসি নিয়ে বেঁটেমতো একজন এমন একটা মন্তব্য করল যা তখন আমার কাছে নেহাত করুণাপ্রকাশের সামিল বলে মনে হয়েছিল। সে বলল: 'বেশ বোঝা যাচ্ছে ইঁদুরদের সঙ্গ ওঁর ভারি পছন্দ। এই 'দুর্গে' ইঁদুরের সংখ্যা তো বড় কম নয়। আর ওদের কান যা সূক্ষ্ম তাতে ওঁর বাজনা শুনে তারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাচ্ছে।'

এরপর লোকটি আমায় আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার খাড়া নাকখানা দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা অদৃশ্য আর অত্যন্ত অস্বস্তিকর সরলরেখা টানতে লাগল যেন। তারপর করমর্দনের জন্যে হাতখানা বাড়িয়ে দিল। অবশেষে অবজ্ঞাসূচক একটা 'হুঃ' আওয়াজ করে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার প্রতি সাংঘাতিক বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠল আমার। মনে-মনে ভাবলুম, 'লোকের গায়ে জোঁকের মতো লেপটে থাকার অদ্ভুত স্বভাব তোমার দেখছি তো বাপু! ভাবখানা এমন করছ যেন আমি তোমায় যেচে বাড়িতে ডেকে এনেছি আলাপ করার জন্যে! যত্তোসব! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়বে বাপু ততই মঙ্গল।'

'অবাক হবেন না ওর কথায়, দোষ নেবেন না কিন্তু।

ও হল আমাদের সরষের প্রলটিশ আন্তন। জানেন তো, সরষের প্রলটিশ দেহে যেমন জ্বালা ধরায় তেমনি উপকারও করে,' কথাগুলো বলল এবার আগন্তুকদের দলের তৃতীয় ব্যক্তিটি। ওর সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হলুম। মনে হচ্ছিল দয়ামায়া যেন ছেলেটির সারা মুখেচোখে মাখানো। ওর প্রকান্ড লম্বা একজোড়া গোঁফ দেখেও অবাক লাগল। দেখা গেল, ওর ওই গোঁফজোড়াও 'সরষের প্রলটিশ'এর ঠাট্টার বস্তু।

'প্রলটিশ' ওইদিনও গোঁফ নিয়ে ছেলেটিকে ঠাট্টা করার সুযোগ ছাড়ল না। বলল:

'সাবধান কিন্তু আরশোলা! তোর ওই 'শুঁড়গুলো' এমন উপড়ে ফেলব-না যে কোথায়-যে যাচ্ছিস তুই তা-ই টের পাবি না!'

ক্রমশ জানলুম যে ওই ত্রিমূর্তি হচ্ছে হাসিমুখ দৈত্যাকার মিখাইল কাম্পানত্সেভ, 'সরষের প্রলটিশ' আন্তন মাকারেঙ্কো ও 'আরশোলা' গেওর্গি অর্লভ। পরে ওই তিনজনই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২। 'অঘটনঘটন-পটীয়ান্'

একদিন মাকারেঙ্কোর সঙ্গে বাড়ির বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি এমন সময় জীর্ণ উলিঢুলি পোশাকপরা একজন লোক কাছে এগিয়ে এল। বলল: 'একটুকরা রুটি দিবেন, সাহেব!' শুনে মাকারেঙ্কো বললেন, 'তুমি তো বাপু রুটি চাও না, ভোদ্কা চাও।' 'ঠিক কথা কয়েচেন, সাহেব! তা, কেমনে আমার মনের কথা বোঝলেন আপনে?' ভিখিরিটি শুধোল। এবার উত্তর এল, 'এই নাও তিন

রুব্‌ল। যাও, যত খুশি মদ কেনো গিয়ে, তবে মনে করে বাকি খুচরো পয়সাটা আমায় ফেরত দিয়ে যেও।'

লোকটি হাত পেতে তিন রুব্‌লের নোটখানা নিল বটে, তবে তার চোখে কেমন একটা অন্যমনস্কের চাহনি ফুটে উঠল। যেন জীবনে এই প্রথম অমন একখানা নোট দেখছে সে। ভালো করে উলটেপালটে নোটখানা দেখে, তারপর আড়চোখে একবার সেই আজব 'সাহেববাবু'টির দিকে তাকিয়ে নিয়ে সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল না সে, বরং মনে হল যেন কোনোরকমে পা টেনে-টেনে চলছে, পাদুটো যেন বড় বেশি ভারি হয়ে উঠেছে ওর। নোটখানাও ওকে পকেটস্থ করতে দেখা গেল না, একখানা হাত লম্বা করে বাড়িয়ে তাতে নোটখানা ধরে হাঁটতে লাগল লোকটি। লোকটি চোখের আড়ালে চলে গেলে পর আমি মাকারেঙ্কোকে বললুম যে তিনি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মাকারেঙ্কো হেসে জবাব দিলেন: 'শাস্ত্রের বচন জানা আছে কিছু? মনে পড়ে শাস্ত্রে লেখা আছে যে বিশ্বাসে মানুষ পাহাড় পর্যন্ত টলাতে পারে? আমিও তেমনি পাহাড় টলাতে চাই, বুঝেছ!'

কথাগুলো সাময়িক রসিকতামাত্র ছিল না, তাদের তাৎপর্য ছিল অনেক বেশি গভীর। সৃষ্টিশীল এই শিক্ষকের সমগ্র জীবন, মানবহৃদয় সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞ, এবং আমার মতে শুধু সূক্ষ্ম নয় অপ্রতিদ্বন্দ্বীও এই মনস্তত্ত্ববিদের জীবন সত্যিসত্যিই ব্যয়িত হয়েছিল পাহাড় টলানোর কাজে, কমিউনিস্টশোভন শিক্ষার একটি অভিনব পদ্ধতির উদ্‌ভাবনায়।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেদিন ওইখানে বসে অতঃপর আমরা যখন এই সমস্যাটি নিয়েই

আলোচনা করছি এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে, পূর্বোক্ত ভিক্ষুকটি ফের ফিরে আসছে।

লোকটি কাছে এসে হাতের নোটখানা বাড়িয়ে ধরে কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আপনের ট্যাকাডা ফিরত নেন, সাহেব...

'কিন্তু তুমি মদ কিনলে না কেন?' বোকা বনে যাওয়ার ভাব করে আন্তন শুধোলেন।

'কিনি কী কর্‍্যে?.. আপনে আমারে আচ্ছা জব্দ করি দেছেন, সাহেব! ধন্যবাদ! যতদিন বাঁচব্য মনে রাখব্য একথা! নেন, ধরেন।' লোকটি কিছুতেই ছাড়তে চায় না, সে টাকা ফেরত দেবেই।

আমি আন্তনের মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম, ওঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!..

উনি বললেন, 'না, আমি টাকা ফেরত নেব না। টাকাটা তোমার খুবই দরকার বুঝতে পারছি। ভয় নেই, আমার আরও পয়সাকড়ি আছে।'

'তা যা বল্যেচেন, ট্যাকাডা আমার খুবই দরকার,' মাথা নিচু করে করুণভাবে বলল লোকটি। তারপর একমুহূর্ত থেমে ফের বলল, 'এস্টেশানে আমার এট্টা বাচ্চারে রেখ্যে এয়্যেচি।'

শুনে তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ বের করে আন্তন ওর হাতে আরও একখানা নোট গুঁজে দিলেন। আমিও সামান্য কিছু দিলুম লোকটিকে। এতে লোকটি এতখানি ঘাবড়ে গেল যে 'ধন্যবাদ'টুকুও বলার ক্ষমতা রইল না ওর। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে সেলামের একটা ভঙ্গি করে স্টেশন-বাড়িটার দিকে হেঁটে চলে গেল।

'কেমন? দেখলে তো?' 'অঘটনঘটন-পটীয়ান্' মানুষটি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন।

বললুম, 'তা তো দেখলুম। কিন্তু লোকটার সত্যি বাচ্চা আছে কিনা সেটা তোমার একবার খোঁজ করে দেখা উচিত ছিল বোধহয়।'

'কী করে বলছ তুমি এমন কথা? তবে হ্যাঁ, বাচ্চাদের অবশ্য উচিত সবরকমের তথ্য কতটা ঠিক বা বেঠিক তা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা,' বলে হেসে উঠলেন আন্তন।

বাচ্চাদের সঙ্গে এইভাবে তুলনা করায় আমি কিছু মনে করলুম না বটে, তবে তা সত্ত্বেও ব্যাপারটার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে না-দেখেও থাকতে পারলুম না। সাংঘাতিক কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলুম আমি।

স্টেশন-বাড়িটায় গিয়ে খোঁজ করে-করে আমাদের সেদিনকার সকালবেলার বন্ধুটিকে ঠিক আবিষ্কার করে ফেললুম। দেখলুম সত্যিই লোকটির সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ও একটি বাচ্চা রয়েছে। বয়স্ক দু'জন তখন পেটুকের মতো খানিকটা রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছিল আর মাঝে-মাঝে গরম জল খেয়ে গলা ভেজাচ্ছিল, আর বাচ্চাটা একহাতে খানিকটা স্যসেজ আর অন্যহাতে ডোরাকাটা মোড়কে-মোড়া লম্বামতন একটা কোনোজাতীয় মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল...

৩। আঠা আবিষ্কার

বাচ্চারা সবাই ওঁকে ভারি ভালোবাসত, পুজো করত যেন। এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। এতে আশ্চর্য হওয়ারও বিশেষ কিছু ছিল না, কেননা সবটুকু সময় মাকারেঙ্কো

বাচ্চাদের সঙ্গেই কাটাতেন। শরতে আর বসন্তকালে প্রতি বছরই বাচ্চাদের নিয়ে ফুটবল, স্কিট্‌ল আর দড়ি-টানাটানির খেলা জমে উঠত। হাসিখুশি আর আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। আর শীতকালের সন্ধেবেলাগুলোয় উৎসবের পার্টি আর নাচগানের আসর উঠত জমে। এই সমস্ত পার্টি ইত্যাদিতেও সর্বদা বহু ছেলেমেয়ে যোগ দিত এবং অনুষ্ঠানগুলিও ভারি আগ্রহোদ্দীপক ও জমকালো হয়ে উঠত। আর সর্বদাই মাকারেঙ্কো থাকতেন এইসব অনুষ্ঠানের একেবারে মধ্যমনি হিসেবে — রসিকতায়, অক্লান্ত ব্যবস্থাপনায় ও জীবনীশক্তিতে ভরপুর হয়ে।

একবার স্কুলের একটা পার্টি উপলক্ষে প্রস্তুতির কাজ পুরোদমে চলার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। সেখানে তখন কাপড়চোপড় কাটছাঁট করা আর কাগজ কাটার কাজ চলছিল। ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত ছিল উৎসবের পোশাক সেলাইয়ে, আঠা দিয়ে কাগজ সেঁটে মালা শেকল ইত্যাদি বানানোয় আর তার দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার আর মজার-মজার মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করায়। কাজের গোটা আবহাওয়াই ছিল হাসিখুশিতে ভরা, কী অখণ্ড মনোযোগ নিয়েই-না কাজ করছিল সবাই! হঠাৎ-হঠাৎ চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছিল চর্মবর্ম, যুদ্ধের কুড়ুল, ইত্যাদি, এমন সময় আচমকা... আফিসে-ব্যবহার্য যে-আঠার টিউবটা দিয়ে কাজ চলছিল সেটা গেল উধাও হয়ে। ফলে কাজকর্মও বন্ধ হয়ে গেল। অতএব কী করা? একজন ছাত্র পরামর্শ দিল, সকলের দেহ তল্লাসি করা হোক। আরও অনেকে নানারকম পরামর্শ দিল, কিন্তু আন্তন যেন জিদ ধরে অনড় হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। ফলে ক্রমে-ক্রমে গোটা দলটার ওপর বুকচাপা একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

অবশেষে আন্তন সরাসরি জানিয়ে দিলেন, 'তল্লাসি চালানো মানে মানুষের মর্যাদাবোধে আঘাত করা, তাকে অপমান করা। অন্য কোনো পরামর্শও এক্ষেত্রে ঠিক যুতসই নয়। আমাদের মাথা খাটিয়ে আর কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

এ-ব্যাপারে উনি কী সিদ্ধান্ত নেন তা-ই জানার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। অবশেষে তা জানাও গেল।

যে-ক্লাসরুমে এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা ছিল বেশ বড়সড় একখানা ঘর। তাছাড়া আরও সুবিধে হয়ে গিয়েছিল এইজন্যে যে ঘরখানা থেকে বেশ খানকয়েক ডেস্ক বার করে দিয়ে তার জায়গায় অনেকগুলো চেয়ার ঢোকানো হয়েছিল ঘরে। অতঃপর হুকুম হল — অনুরোধ নয় রীতিমতো হুকুম — চেয়ারগুলো একটা জায়গায় বৃত্তাকারে সাজানো হোক আর উপস্থিত প্রত্যেকে একেকখানা চেয়ারে বসুক। এই নির্দেশে সকলে যেন একটু ভয় পেয়ে গেল বলে মনে হল, কিংবা অন্ততপক্ষে ওই মুহূর্তে ও তার পরে যা ঘটতে যাচ্ছে তার তাৎপর্যের গুরুত্ব যেন কিছুটা বেড়ে গেল। যাই হোক, সকলে তো চেয়ারে বসে পড়ল। এরপর প্রতিটি ছেলেমেয়েকে বলা হল যে এক-এক করে প্রত্যেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়াক এবং ঘুরে-ঘুরে চেয়ারে-বসা প্রতিটি ছেলেমেয়ের চোখের দিকে তাকাক।

প্রথমটায় কিছু ছেলেমেয়ে অবশ্য নিশ্চিন্তে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে চেয়ারে-বসা অন্যদের চোখের দিকে হাসিমুখেই তাকাল। এরপর একটি ছেলেকে যেন দীর্ঘনিশ্বাস চেপে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখা গেল। কেমন মনমরাভাবে ছেলেটি

বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রাণভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার এই আনাড়ির মতো চালাকি খাটানোর তাৎপর্য আমি বুঝে ফেললুম: আসলে ওদের মাঝখানে আমি একমাত্র অপরিচিত নতুন লোক ছিলাম বলে ওর পক্ষে সহজ হচ্ছিল আমার দিকে তাকানো। অবশেষে ওর ওপর হুকুম হল ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যদের দিকে তাকানোর। আর ঘুরে দাঁড়াতেই খোদ মাকারেঙ্কোর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল ছেলেটি। আর পরমুহূর্তেই পকেট থেকে সে বের করে ফেলল যত-নষ্টের-গোড়া আঠার সেই টিউবটা। তবু অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে রেহাই দিল না, পুরো বৃত্তের দিকে একে-একে ঘুরতে তাকে বাধ্য করল আর সবাই। এইভাবে ঘুরতে গিয়ে বেচারা চোর শেষপর্যন্ত কেঁদেই ফেলল। আর আমি বসে রইলুম থ' বনে গিয়ে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল আমার... এখনও মনে পড়ে, মাকারেঙ্কো যখন ছেলেটির দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে ছিলেন তখন সে-চোখে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছিল বিষণ্নতা আর বিজয়ের উল্লাস।

এরপর যা হয়ে থাকে আর-কি, সেই ঘেন্না আর রাগ প্রকাশের পালা চলল কিছুক্ষণ। তারপর সে-পালা চুকলে দোষীকে কীভাবে শাস্তি দেয়া যায় তা-ই নিয়ে অনুরোধ-উপরোধের বান ডাকল। কিন্তু একটি মেয়ে প্রতিবাদ জানাল এ-সবের। বলল, ছেলেটা এমনিতেই যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছে, শাস্তি দেয়া নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। মাকারেঙ্কো বললেন, মেয়েটি তো ভারি বুদ্ধিমতী। বলা বাহুল্য, তিনিও ওর সঙ্গে একমত হলেন।

৪। আমুদে মাস্টারমশাই

পরদিনের ক্লাসে বর্ণমালার নতুন কোন বর্ণটি আমি ছেলেমেয়েদের শেখাতে যাচ্ছি সে-খবরটা জেনে নিয়ে মাকারেঙ্কো সেদিন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন সকালে ক্লাস শুরু হবার আগে আবার তাঁকে আসতে দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়লুম। তিনি এসে আমার জায়গায় ক্লাস নেয়ার অনুমতি চাইলেন।

বললেন, 'আমি তোমার বদলি হিসেবে ক্লাস নিতে পারি কি?'

আমারও কৌতূহল হল — যে-লোক আগে কখনও একটা ক্লাসরুমে একসঙ্গে তিনটে গ্রুপের ক্লাস করে নি, দেখিই-না সে কেমন করে ব্যাপারটার সামাল দেয়।

প্রথমে বড় ছেলেমেয়েদের দুটি গ্রুপকে নিজে-নিজে করার মতো কিছুটা কাজ দিয়ে তারপর প্রাণখোলা একগাল হাসি নিয়ে প্রথম শ্রেণীর বাচ্চাদের সম্মুখীন হলেন মাকারেঙ্কো।

'তারপর, বন্ধুরা ('ছেলেমেয়েরা' বা 'আমার বাচ্চারা' এসব কিছু নয়, সরাসরি একেবারে 'বন্ধুরা'), এপর্যন্ত কী-কী পড়েছ আর কেমন শিখেছ সব, বল দেখি।'

বলা বাহুল্য, খুদে 'বন্ধুরা' সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পেরেছিল যে তাদের এই মাস্টারমশাইটি রাগী লোক নন। ফলে তারাও একগাল হেসে আর একে-অপরকে বাধা দিয়ে ঘরের সবাই যাতে শুনতে পায় এমনভাবে চেঁচিয়ে কতদূর কী পড়া হয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করল।

'শ্-শ্-শ্!..' বলে দুই ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলেন আন্তন আর ইঙ্গিতে বড় ছেলেমেয়েদের গ্রুপদুটিকে

দেখিয়ে দিলেন। যেন বাচ্চাদের সাবধান করতে চাইলেন বড়দের বিরক্ত না-করার জন্যে।

আশ্চর্য এই যে বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। যে-কোনো কারণেই হোক আন্তন ক্লাসের একেবারে পেছনের ডেস্ক পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখানে একটি মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'আনেচ্‌কা, তুমি আমাদের কিছু পড়ে শোনাও দেখি।'

'কিন্তু আমার নাম তো আনেচ্‌কা না — সোনিয়া,' দাঁড়িয়ে উঠে মাস্টারমশাইয়ের দিকে আস্থাভরা চোখে তাকিয়ে মেয়েটি বলল।

'ও, তাই বুঝি? ভারি দুঃখিত সোনিয়া! আমার কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। তোমার পাশে বসে আছে যে-মেয়েটি ওরই নাম আনেচ্‌কা, তাই না?'

পাশের ডেস্কের মেয়েটি অমনি কিচমিচ করে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কই না তো, আমার নাম তো ভেরা।'

'ও, তাই বুঝি? তাই তো, তাই তো, সব কেমন গুলিয়ে ফেলেছি দেখছি। ঠিক আছে, এখন থেকে মনে থাকবে আমার, তুমি হচ্ছ সোনিয়া আর তুমি ভেরা। আচ্ছা, সোনিয়া আর ভেরা, তোমরা দু'জন ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াও দেখি। আমার ইচ্ছে, তোমরা জোরে-জোরে বইখানা পড় আর আমাদের বাকি সবাইকে শোনাও।'

এরপর একে-একে বাকি সবকটি ছাত্রছাত্রীকে চেঁচিয়ে পড়ার জন্যে ডাকা হল। তারাও ভারি খুশি হয়ে উৎসাহভরে স্বেচ্ছায় বই পড়ে শোনাল। অবাক হয়ে দেখলুম, স্পষ্ট করে কথা উচ্চারণ করতে যথেষ্ট অসুবিধে বোধ করে এমন একটি বাচ্চা ছেলেকেও মাকারেঙ্কো ওইভাবে পড়তে ডাকলেন আর ছেলেটিও চেষ্টাচরিত্র করে মোটামুটি উত্‌রে গেল।

ছেলেমেয়েদের পড়া শুনতে-শুনতে এদিকে আমি মনে-মনে ভাবছিলুম, নতুন বর্ণটি শেখানো আজ আর ওঁর দ্বারা হয়ে উঠবে না। কিন্তু দেখা গেল আমার ধারণা ভুল।

হঠাৎ শুনলুম উনি বলছেন, 'তা, বন্ধুরা, তোমরা তো দিব্যি পড়তে পার দেখছি! হা-হা-হা!' হেসে উঠেই একটুক্ষণ থেকে ফের শুধোলেন, 'আচ্ছা, বল দেখি, শেষ শব্দটা আমি যে উচ্চারণ করলুম সেটা কী?'

'হা-হা-হা,' একসঙ্গে ঝমঝমিয়ে সব ক'টা কচি গলায় জবাব এল।

'ঠিক! ঠিক বলেছ! আমি 'হা' শব্দটা তিনবার উচ্চারণ করেছি। আচ্ছা, এবার সবাই মিলে একসঙ্গে শব্দটা বলি কেমন?'

মাস্টারমশাইয়ের হাততালির তালে-তালে ছেলেমেয়েরা বার-কয়েক এবার 'হা-হা-হা'র পুনরাবৃত্তি করলে।

'বাঃ, এই তো চাই! আচ্ছা, আমি এবার একা-একাই শব্দটা ফের উচ্চারণ করব। তোমরা সবাই মন দিয়ে শুনো কিন্তু।' এবার মাকারেঙ্কো টেনে-টেনে খালি উচ্চারণ করলেন, 'আ-আ-আ...'

'কিন্তু আপনে তো সবটুক কলেন না!'

'ঠিকমতন কলেন না তো আপনে!'

'আপনে 'হ্'ডা তো বাদ দেলেন!'

একগাদা প্রতিবাদ উঠল ক্লাস থেকে।

'আচ্ছা, ঠিক কোন জিনিসটা আমি উচ্চারণ করি নি বল দেখি?'

'হ্'ডা!' বলে একবাক্যে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা।

'বুঝলে না 'হ্'টা এমন একটা গালভরা শব্দ যে ওটা

আমার গলায় নিশ্চয়ই বেধে গিয়েছিল, 'আ' শব্দটার সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারে নি।'

এ-কথায় ছেলেমেয়েরা ভারি খুশি হয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। মাস্টারমশাইও তাদের সঙ্গে হাসতে লাগলেন। তবে তিনি হাসির সময় প্রত্যেক বার 'হা' শব্দটা উচ্চারণের গোড়ায় 'হ্' বর্ণটার ওপর বিশেষ জোর দিতে লাগলেন।

তারপর বললেন, 'আচ্ছা, বন্ধুরা, এবার আমরা 'হা' শব্দটা বোর্ডে লিখে জোরে-জোরে পড়তে পারি, তাই না?.. তা, 'আ' অক্ষরটা তোমরা তো জানোই, আর এই হল 'হ্' বর্ণ। ভানিয়া, বোর্ডে এস দেখি। বর্ণদুটো পাশে-পাশে লেখ আর আমরা জোরে-জোরে পড়ি।' দারুণ মজা পেয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েরা এবার মাস্টারমশাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে 'হা-হা হা-হা' শুরু করে দিল।

'তাহলে দেখছ তো কেমন মজা? তোমরা হাসছ আর তোমাদের হাসিটা আমরা কেমন লিখে ফেলছি আবার ফিরে-ফিরতি সেটা পড়ছিও। আবার দ্যাখো, একেক জন লোক একেক রকম করে হাসে। যেমন, হা-হা-হা, হি-হি-হি, হো-হো-হো...'

ব্যস, হরেক রকম আওয়াজ তুলে ছেলেমেয়েদের হাসির শব্দ তখন থামায় কার সাধ্য...

'ঠিক! ঠিক হচ্ছে! তবে বোর্ডে এপর্যন্ত আমরা 'হা-হা-হা'টুকুই লিখতে পেরেছি। আপাতত এটুকুই যথেষ্ট, বুঝলে!' মাকারেঙ্কো বললেন, তারপর ক্লাসকে শুনিয়ে ফের একবার 'হা-হা-হা'র আওয়াজ তুললেন। অবশেষে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শুধোলেন তাদের মধ্যে কেউ এই নতুন শব্দটি বোর্ডে লিখতে চায় কিনা।
অবশ্যই, কেন নয়? দেখা গেল শব্দটি লেখার জন্যে বহু

স্বেচ্ছাব্রতীই একপায়ে খাড়া। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের ওপর ফের একচোট 'হা-হা-হা' লেখার পালা চলল। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও আকুল হল হেসে। আর, বলা বাহুল্য, নতুন এই অক্ষরটি তারা যে-যার কপিবুকে টুকেও নিল।

বাচ্চাদের সঙ্গে মাকারেঙ্কো সেদিন মিনিট তিরিশেকের মতো সময় কাটালেন (সেকালের দিনে প্রতিটি ক্লাস বসত পঞ্চাশ মিনিট করে)। অবশেষে মাস্টারমশাইকে বাচ্চারা বন্ধুভাবে বিদায় জানাল আর সবাই সমস্বরে বারবার জানতে চাইল তিনি আবার ওদের ক্লাসে আসবেন কিনা কিংবা এর পর থেকে ওদের পড়াবেন কিনা।

পরে যখন আমি মাকারেঙ্কোকে জিজ্ঞাসা করলুম যে সব ক'জন ছেলেমেয়েকে তিনি পড়তে ডাকলেন কেন আর তা-ও আবার গোটা ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে (কেননা প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় যেমন আমাকে শেখানো হয়েছিল সেই অনুযায়ী আমি মাত্র অল্প কয়েকজনকেই ক্লাসে পড়তে বলতুম), তখন মাকারেঙ্কো অবাক হয়ে বলে উঠলেন: 'বাঃ, তাই-ই তো করা উচিত! বাচ্চাদের কেউ একজনও যাতে মনে কষ্ট পায় এমন কাজ করতে যাবে কিসের জন্যে? দেখলে না, পড়তে বলায় ওরা কত খুশি হল?'

'হ্যাঁ, তা দেখলুম বই-কি।'

'তবে! সারা ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে যেভাবেই হোক কাজটার আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব কিছুটা বেড়ে যায়, ব্যাপারটা বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে, তাছাড়া এতে বাচ্চাদের মধ্যে দায়িত্বের বোধও যেন কিছুটা বাড়িয়ে তোলে। আর দায়িত্ববোধ হচ্ছে এমন একটা বস্তু যা একেবারে কাঁথায় শোওয়ার বয়স থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা উচিত।'

একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এই ঘটনার আগে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে এ-সমস্ত জিনিস নিয়ে আমি বড় একটা মাথা ঘামাই নি। সত্যি কথা বলতে কী, প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় এ-সমস্ত ব্যাপারে আমাদের কোনোরকম উৎসাহই দেয়া হোত না। সে-সময়ে আমাদের সব ক'টা পাঠই সাজানো হোত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আর সেই পরিকল্পনা পূরণ করা হল কিনা সেটাই ছিল একমাত্র দ্রষ্টব্য বিষয়। পাঠ্যবিষয় কিংবা শিক্ষার্থী বাচ্চাদের নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে কখনই বলা হোত না আমাদের। এর কারণ — হয় আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই এ-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, আর নয়তো এ-কাজে আমাদের উৎসাহ যোগাতে তাঁরা গররাজি ছিলেন এই কারণে যে (ঈশ্বর না-করুন!) কে বলতে পারে এর ফলে নানা ধরনের রাজদ্রোহমূলক ধ্যানধারণার জন্ম হবে না!

ফলে আমি জিজ্ঞাসা না-করে পারলুম না যে, শিক্ষাবিজ্ঞানের কোন-কোন বইতে মাকারেঙ্কো এহেন শিক্ষাপদ্ধতির সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

'এই বইয়ে আর এই বইয়ে,' নিজের কপালে আর বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে হাসতে-হাসতে জবাব দিলেন মাকারেঙ্কো। 'আমাদের এই পেশা মস্ত একটা সৃষ্টিশীল পেশা, বুঝলে! আমাদের ভাবতে হয়, অনুভব করতে হয় গভীরভাবে, রীতিমতো দায়িত্ব নিয়ে। কেননা আমরা যা তৈরি করার চেষ্টা করি তা আর কিছু না, খোদ **মানুষ**!' কথাগুলো এত নতুন, এত স্বাদু ঠেকল আমার কাছে যে গোটা ব্যাপারটা যেন একটা দৈব প্রত্যাদেশ বলে মনে হল।

আন্তনের পড়ানোর কায়দা সেদিন আমি বিশ্লেষণ করতে বসি নি, কড়াকড়িভাবে আমাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

কায়দাটা সত্যিসত্যিই ভালো না মন্দ তা নিয়েও মাথা ঘামাই নি। আসলে যা আমার মনকে সেদিন অধিকার করেছিল তা হল এই কায়দাটার নতুনত্ব আর মৌলিকতা। আন্তনের পড়ানোর কায়দা বিশ্লেষণের দায়িত্ব ছেলেমেয়েরা নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। আর তাই আন্তন পড়িয়ে চলে যাওয়ার পরে ক্লাসরুমে আমি যখন একা ঢুকলুম, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওরা আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলল — সেই 'আমুদে মানুষটি' ফের ক্লাসে এলেন না কেন, তিনি কি আর কোনোদিন আসবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'দূর, ওনি শুধু 'আমুদে মানুষ' নাকি, ওনি তো রেলের ইশ্কুলের মাস্টারমশাই আন্তন। ওঁরে সব্বাই চেনে,' তৃতীয় শ্রেণীর একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে কথাগুলো বলল। আর বলতে-বলতে তার গলায় একটু শ্রদ্ধার, এমন কি একটু যেন গর্বেরও ছোঁয়া লাগল।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই, প্রায় সকলেই ওঁকে তখন চিনত।

বহুকাল আগেকার সেইসব দিন আর আমার সেই ইশ্কুলের পড়ানোর কথা আজও যখনই মনে পড়ে তখনই যেন চোখের সামনে সর্বজনপ্রিয় সেই দুর্লভ প্রতিভাবান মানুষটিকে, আমাদের সেই আন্তনকে দেখতে পাই।

গালিনা মাকারেঙ্কো*

স্মৃতিচারণ

১

আন্তন মাকারেঙ্কোকে আমি প্রথম দেখি ১৯২২ সালে, ইউক্রেনের শিক্ষা-সংক্রান্ত জন-কমিশারিয়েত অফিসে। ওই সময়ে ইউক্রেনের শিক্ষা-বিভাগীয় নানা মহলে পোল্‌তাভার কাছের মাক্সিম গোর্কি কলোনিটি নিয়ে বহুরকম জল্পনা-কল্পনা চলছিল আর সেখানকার সম্পর্কে নানারকম উলটোপালটা খবরাখবরও শোনা যাচ্ছিল।

গোর্কি কলোনিতে আমি প্রথম যাই ১৯২৭ সালের বসন্তকালে কমিশারিয়েতের জনৈক ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গী হয়ে। কলোনিটি ততদিনে খার্‌কভের কাছে কুরিয়াজে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

---

* গালিনা স্তাখিয়েভ্‌না মাকারেঙ্কো (১৮৯৩-১৯৬৩) — আন্তন মাকারেঙ্কোর স্ত্রী, পেশায় শিক্ষিকা ও 'বাবা-মা'র জন্যে বই'টি লেখার ব্যাপারে মাকারেঙ্কোর সহযোগী। সাত খণ্ডে মাকারেঙ্কোর রচনাসমগ্র (১৯৫০-১৯৫২) সম্পাদনা করেন ইনি। — সম্পাঃ

গাড়িতে করে সেদিন যখন কলোনির চত্বরে গিয়ে নামলুম, তখন আকাশ মেঘে-ঢাকা, ঝড়ও বইতে শুরু করেছে।

দেখলুম উঠোনটার ধারে-ধারে চারপাশ ঘিরে বড়-বড় গাছ মাথা জাগিয়ে উঠেছে, আর এইসব গাছের ফাঁকে-ফাঁকে পরিপাটি সার-সার ছোট শাদা বাড়ি। বাড়িগুলোর কাঠের তৈরি গাড়ি-বারান্দাও ভারি মনোরম ঠেকল। এছাড়া বাড়ির সামনের ফুলবাগানগুলোয় চমৎকার ফুলের সব কেয়ারি চোখে পড়ল, আর নজরে পড়ল চত্বরের ঠিক মাঝখানে প্রাক্তন মঠের প্রধান গির্জের প্রকান্ড দালানটা। কলোনির সেই চত্বর আর গির্জেটা এত প্রকান্ড ছিল যে চত্বরে দাঁড়ানো সারি-সারি তিনখানা মোটরগাড়িকে খেলনা গাড়ির মতো ঠেকছিল। আমাদের গাড়িখানা গিয়ে গাড়ি রাখার কাজ-চালানো-গোছের ওই জায়গাটায় দাঁড়াল আর আমরা নেমে শক্ত কাঁকর-বিছনো উঠোনটায় পা রাখলুম।

প্রথমেই যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা হল কলোনিটার ভারি সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা-পদ্ধতি। ওই জীবনের যাঁরা ছিলেন সংগঠক, তত্ত্বাবধায়ক ও দলপতি তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করাটাও ভারি আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার ছিল। এখানে বলা দরকার যে গোর্কি কলোনিতে সেদিন যখন আমি গিয়ে পৌঁছই তখন আমার মনটা ছিল ঔৎসুক্যহীন সন্দেহেভরা, এবং শিশু-সদনগুলোয় স্বল্পকালীন পরিদর্শনে গিয়ে এর আগে প্রায়ই যে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে সেই অনুযায়ী এবারও পরের কয়েক ঘণ্টা ক্লান্তিকর সরকারি কাজে কাটাতে হবে এই ভেবে মনে এতটুকু উৎসাহ-উদ্দীপনা বোধ করছিলুম না।

গোর্কি কলোনি দেখতে যাওয়ার আগে আমি শ'দুয়েকের মতো অনাথাশ্রম পরিদর্শন করেছি, ১৫০টি ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেও একটি অনাথাশ্রম চালিয়েছি। বলা বাহুল্য, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান চালানোর কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার জানাশোনা ছিল। একাজে-যে কী সব অন্তহীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের বেলায় আমাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার দৌলতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যে অপেক্ষাকৃত পরিমিত মান ওই সময়ের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল তা-ও জানতুম।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাকে না-জানি কী দেখতে হবে এই ভেবে কলোনিটিতে পেঁছনোর মুহূর্তে আমার মন-যে কিছুমাত্র উন্মুখ হয়ে ছিল তা নয়। তবু, তা সত্ত্বেও, গোর্কি কলোনির প্রকাণ্ড চত্বরটায় শৃঙ্খলার নমুনা দেখে গোড়াতেই-যে বেশ একটু চমক লেগেছিল তা-ও সত্যি। ওই সময়ে কলোনিটির বাসিন্দা ছিল পাঁচ শো ছোটবড় ছেলেমেয়ে আর কমপক্ষে জনা-তিরিশেক শিক্ষক-পরিচালক সপরিবারে থাকছিলেন তাদের সঙ্গে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই আমি খুব ভালো করে জানতুম যে কার্যকর সাংগঠনিক শৃঙ্খলার অভাব থাকলে শিশু-সদনগুলিতে এমন কি ঘণ্টাকয়েকের জন্যেও লোকদেখানো কোনো কিছু জাঁকজমকের আয়োজনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কলোনির প্রধান বাড়িখানার দিকে হেঁটে গেলুম আমরা। হাতের ছোঁয়ায় সদর দরজাটা সহজেই খুলে গেল, তারপর আমরা ঢোকার পর মসৃণভাবে সেটা ফের বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। দেখলুম, দরজাটার মাথায় সাধারণত যে-প্রচণ্ড আওয়াজ-করা স্প্রিং লাগানো থাকে তা নেই। এই ছোট্ট ব্যাপারটাতেও একটু অবাক হলুম, ভালোও লাগল। দরজা

বন্ধ রাখার জন্যে নির্ভরযোগ্য মোটা-মোটা স্প্রিংয়ের ব্যবহার ওই সময়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এমনই একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে এমন কি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলো পর্যন্ত সেগুলো বাদ দিয়ে চলার কথা ভাবতে পারত না। দেখে-শুনে মনে হোত ওইসব স্প্রিংয়ের যন্ত্রপাতির কানফাটানো আওয়াজ কানে না-তোলার জন্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর্যন্ত যেন আগে থেকে তালিম দিয়ে রাখা হয়েছে।

শাদাসিধেভাবে সাজানো ছোট্ট একটা হলঘরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল একটি তরুণ। দেখলুম, তার জামার হাতায় ওপরদিকে লাল সিল্‌কের একটা আর্মব্যান্ড লাগানো। মুচকি হেসে আমাদের স্বাগত জানিয়ে ছেলেটি বললে যে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে পেরে গোর্কি কলোনি খুশি, তবে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু দেরিতে এসে পেঁাছনোয় দুপুরের খাওয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সে যাই হোক এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা যে-দ্বাদশ বাহিনীর টেবিলে আমাদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করা হয়েছে সেই বাহিনীর ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমরা যখন কোট ইত্যাদি ছেড়ে রাখছি তখন শুনলুম ছেলেটি হচ্ছে কোনো একটি বাহিনীর দলপতি এবং কম্‌সমোলের একজন সদস্য। এছাড়া ছেলেটির ওপর ওই দিনের জন্যে কলোনি দেখাশোনার ভারও ন্যস্ত। ছেলেটির পদবি শুনলুম ক্রুপভ।* আরও জানলুম কলোনিতে ওইদিন

---

* ১৯৩৯ সালে খনিবিদ্যার ইন্‌স্টিটিউট থেকে স্নাতক হয়ে বেরুনোর পর ক্রুপভ প্রকাণ্ড একটি খনির চিফ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হন এবং পরে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারেও ভূষিত হন। — সম্পাঃ

সাধারণভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়দায়িত্ব ওরই। ফের সে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল, তারপর আমাদের জিম্মা করে দিল অভ্যর্থনা সমিতির এক সদস্যের কাছে। সমিতির এই সদস্যটি দেখলুম বছর চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে। গোটা হলঘরে সেদিন একটিও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেখা পেলুম না।

অভ্যর্থনা সমিতির প্রতিনিধি মেয়েটি বিনীতভাবে, প্রায় অমায়িকভাবেই বলা চলে, আমাদের অভিবাদন জানাল, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খাবার ঘরের দিকে। যেতে-যেতে মাঠের মধ্যে দিয়ে কলোনিতে আসার রাস্তার অবস্থা কেমন তা জানতে চাইল আর বলল যে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকেও আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে ডাকা হবে, কাজেই ও নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তিত হবার কোনো দরকার নেই। খাবার ঘরের দরজাটা খুলতেই আমরা গিয়ে ঢুকলুম লম্বা-লম্বা টেবিল-পাতা আলো-ঝলমলে প্রকাণ্ড বড় একটা হল-ঘরে। সব ক'টা টেবিল দেখলুম শাদা টেব্‌লক্লথ দিয়ে ঢাকা, তার ওপরে সাজানো রয়েছে ফুলে-ভরা অনেকগুলো ফুলদানি। এছাড়া টেবিলগুলোর ওপর রাখা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সোনালি-বাদামি রঙের ইউক্রেনদেশী পিঠে, আরও নানারকমের খাদ্যসামগ্রী আর মিষ্টি মদ ও লেমনেডের বোতল। কলোনির সব ছাত্রছাত্রী আর পরিচালক-শিক্ষকগোষ্ঠীর জন্যে প্রতিবছরই এইরকম আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজন করা হয় বলে জানা গেল। এটা করা হয় ২৮ মার্চ — কলোনির সর্বজনপ্রিয় পৃষ্ঠপোষক ও অনুপ্রেরণার উৎস মাক্সিম গোর্কির জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির সূচনায়। ওইদিন কলোনির

বন্ধুদেরই একমাত্র নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল (আমিও-যে ওইদিন এই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলুম সেটা নেহাতই দৈবক্রমে)।

স্পষ্ট বোঝা গেল, মাকারেঙ্কো আগেই আমাদের আসার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে। আমরা যখন দ্বাদশ বাহিনীর টেবিলে এসে পেঁছিলুম তখন তিনি বললেন: 'কমরেডস, এঁরাই আজ আমাদের অতিথি।' শুনে ছেলেমেয়েরা সমস্বরে আমাদের অভিবাদন জানালে। তারপর মাকারেঙ্কোর সঙ্গে সবাই আমরা খেতে বসলুম। আমাদের জায়গাগুলো পরিপাটি করে সাজানো ছিল। ছেলেমেয়েরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালে, তারপর হাসিমুখে স-মনোযোগে আমাদের খাবার পরিবেশন করতে লাগল। হাসিমুখে অথচ গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করা — এটা ছিল গোর্কি কলোনির ও পরে দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনের জীবনযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বাদশ বাহিনীর নানা বয়সের ছেলেমেয়ে ছিল আমাদের আপ্যায়নের ভারপ্রাপ্ত। মাকারেঙ্কো তখনও বয়সে যুবক। তিনি ছিলেন আচার-আচরণে ভদ্র, সত্যি কথা বলতে কী ধরনধারণে অত্যন্ত বেশিরকমই মার্জিত, অথচ সংযতবাক এবং একটু যেন আত্মমগ্ন।

খেতে-খেতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গল্পগুজব শুরু হয়ে গেল আর বড় ছেলেমেয়েদের অনেকে তাতে যোগও দিল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই এটা বোঝা গেল যে মাকারেঙ্কো সম্পর্কে ওই ছেলেমেয়েদের মনোভাবকে সসম্মান শ্রদ্ধার ভাব বলা চললেও তাদের আচরণে কিন্তু বাধো-বাধো আড়ষ্টতার লক্ষণ বিন্দুমাত্রও নেই। ওরা সকলেই-যে এক সাধারণ আগ্রহের অংশীদার এবং একটি সাধারণ উদ্দেশ্যপূরণে তৎপর, সবাই

মিলে যৌথভাবে একটা কিছু-যে গড়ে তুলছে ওরা আর সেই সৃষ্টিকর্মের যৌথ দায়িত্ব বহন করে চলেছে সবাই — এটাও মনে-মনে অনুভব না-করে উপায় ছিল না।

গোড়ার দিকে আরও নানা ব্যাপার আমার নজরে না-পড়ে পারে নি। যেমন, যে-প্রকাণ্ড হলঘরখানা একদা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে ধর্মোপদেশ ও স্তবসঙ্গীত ঘরের সব দিক থেকে সহজে শোনা যায়, সেই ঘরে সেদিন কয়েক শো ছেলেমেয়ে আর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এক প্রাণোচ্ছল আনুষ্ঠানিক ভোজের শরিক হয়েছিল। থেকে-থেকে উচ্ছল হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে, জোর গল্পগুজব আর হাসি-তামাশার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তবু সত্যিকার হট্টগোল বলতে যা বোঝায় তা ছিল না ঘরখানায়। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা এবং স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের গলার স্বরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করার শিল্পটিও আয়ত্ত করে ফেলেছে। গোর্কি কলোনি ও দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার সর্বদাই ঘটতে দেখা গেছে।

সেদিনের সেই প্রাণমাতানো ভোজটি চলেছিল অনেকক্ষণ ধরে, এবং এই ধরনের বড় একটা আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যতরকমের জটিল সাংগঠনিক দায়দায়িত্ব আছে সে-সমস্তই কাঁধে তুলে নিয়েছিল ছেলেমেয়েরা নিজে থেকে। আর সকল কর্তব্যই তারা দ্রুত, নিপুণভাবে পালন করে চলেছিল। প্রাপ্তবয়স্করা খালি চুপচাপ টেবিলে বসে রইলেন আর ছেলেমেয়েরা বন্ধুভাবে, সৌজন্যপূর্ণ চালচলনে তাঁদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলল।

খাওয়াদাওয়ার পর মাকারেঙ্কো বললেন. অতিথিরা কলোনিটা একবার ঘুরে দেখলে ভালো হয়। ওইদিন ভোজের আসরে বহু অতিথিই উপস্থিত ছিলেন। ফলে বেশ বড় একটা দল হয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। ফুলের গন্ধ আর আর্দ্র বাতাসে-ভরা কাচের ঘরে সংরক্ষিত বাগানটি দেখানো হল আমাদের, তারপর একে-একে নিয়ে যাওয়া হল চেলাকাঠ শুকনোর আটচালায়, গোয়ালে আর শুয়োরের খোঁয়াড়ে, তারপর ঘোড়ার আস্তাবলে। ছেলেমেয়েদের এজমালি শোবার ঘরগুলো ছিল নতুন যে-বড়সড় দালানটাতে সেখানে গিয়ে দেখলুম অনেকগুলো চুল্লী জ্বলছে ঘরে-ঘরে আর সেগুলো থেকে আগুনে চেলাকাঠ ফাটার সেই পরিচিত গৃহস্থঘরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এরপর আমরা ঘুরে দেখলুম স্কুলবাড়িটা। কম্‌সমোল সংগঠনের কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে-ঘরখানা, তরুণতরুণীদের সাজানো-গোছানো ব্যস্তসমস্ত সেই সদর দপ্তরটাও ঘুরে-ঘুরে দেখলুম। এরপর গেলুম পাইওনিয়রদের মিটিঙের ঘরে — একগাদা খেলনা আর নানারকম মডেলে ভরা ছিল ঘরখানা। শুনলুম ছেলেমেয়েরাই জোড়াতাড়া দিয়ে বানিয়েছে ওগুলো। ঘরে ছিল অবসর-বিনোদনের উপযোগী নানারকম চারু ও কারু শিল্পচর্চার উপযোগী সাজসরঞ্জাম। লম্বা একটা টেবলের ওপর দেখলুম ছড়ানো রয়েছে অঙ্কের নানা ধাঁধা-সংক্রান্ত খেলনার একেবারে সর্বসাম্প্রতিক বেশ কিছু সংগ্রহ। শুনলুম, পাইওনিয়রদের এইসব কাজকর্মের পেছনে প্রধান প্রেরণা হল ভিক্তর তের্‌স্কির। অতঃপর লাইব্রেরিটা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হল। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। লাইব্রেরির সঙ্গে সংযুক্ত পড়ার ঘরগুলোও ঘুরে দেখলুম। এরপর বাইরে বেরিয়ে আমরা নামলুম গিয়ে

বাগানের কাচঘরের রীতিমতো একটা সমুদ্রের মধ্যে। ঘরগুলোর কাচের ছাদও ঢাকা ছিল খড়ে-বোনা চাটাই দিয়ে। তুষার প্রতিরোধের জন্যে এগুলো ছিল অতিরিক্ত ব্যবস্থা। এই কাচঘরগুলো দেখতে গিয়েই সেদিন আমরা প্রথম কাজে-ব্যস্ত কলোনির এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাক্ষাৎ পেলুম। ইনি ছিলেন কৃষিবিৎ নিকলাই ফেরে।

কলোনির যেখানেই গেলুম সেদিন সেখানেই দেখলুম পরিপাটি পোশাকপরা ছেলেমেয়েরা নিজের-নিজের কাজ করে যাচ্ছে। মনে হল বেশ উৎসাহ নিয়ে আর খুশিমনে কাজ করছে তারা। আমাদের অভিবাদনের জবাবে মুহূর্তের জন্যে কাজ থামিয়ে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে ফের সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিচ্ছে। কাজে অনিচ্ছা বা অসন্তোষের ভাব কোথাও দেখলুম না, ছেলেমেয়েরা কাজ করে চলেছিল দ্রুত, হাত চালিয়ে, ভারি ব্যস্তসমস্তভাবে।

আমাদের ঘোরার পথে যে-কোনো দালান পড়ছিল তার ভারপ্রাপ্ত ছেলে বা মেয়েটি দালানটির দোরগোড়ায় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ-হঠাৎ নিঃশব্দে হাজির হয়ে যাচ্ছিল। এরা ছিল কলোনিরই ছেলেমেয়ে, অথচ ওদের হুকুমে নিমেষের মধ্যে যতসব দরজা আর কাবার্ডের পাল্লা মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে হাট হয়ে খুলে যাচ্ছিল। দেখতে-দেখতে শিগ্‌গিরই অবাক হতেও ভুলে গেলুম আমি। আমার মনের অবস্থাটা তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'আজব দেশে অমলার' মতো। এদিকে মাকারেঙ্কো স্বয়ং তখন সুদুর্লভ সব রহস্যের চাবিকাঠিটি হাতে নিয়ে যাদুকর বা ওইরকম কিছু একটার ভূমিকায় নেমেছেন।

আমাদের এই সফরের একটা বিশেষ ঘটনা আমার মনে বিশেষ করেই গভীর রেখাপাত করে। তা হল চেলাকাঠ

শুকনোর আটচালাটায় আমাদের যাওয়ার ঘটনা। আটচালাটা বসবাসের দালানগুলো থেকে অনেকটা দূরে ছিল। সরু একটা পায়েচলা পথ ধরে ওখানে পেঁছতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। বসন্তের গোধূলিবেলার আলোয় ভারি একটা সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়েছিল পথটা জুড়ে। অবশেষে জানলাহীন লম্বা একটা কাঠের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ঘরের মধ্যেকার আধো-অন্ধকারে স্তূপাকারে-সাজানো কাঠের তক্তা নজরে পড়ল। কাঠ শুকনোর অদৃশ্য যন্ত্রটা চলার ফলে ঘরের ভেতরের হাওয়া গরম হয়ে ছিল। শাদাসিধে ধরনের একটা ওজনের-ভারে-চলা ঘড়ি কেবল সজোরে টিকটিক করে চলছিল। দেখলুম, দুটি ছেলে বসে আছে তক্তার স্তূপের ওপর চেপে, আর ছেলেদুটির গাঁট্টাগোট্টা পায়ের কাছে শুয়ে আছে ফ্যাকাশেরঙের লোমওয়ালা প্রকাণ্ড একটা কুকুর। আমাদের দেখতে পেয়ে ছেলেদুটি চটপট লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল, তারপর স্যালুট ঠুকল আমাদের। শুনলুম, ওদের নাম মিতিয়া চৌভিলি আর ভিতিয়া গোর্‌কভ্‌স্কি।*

এইবার প্রথম আমি মাকারেঙ্কোর সেই বৈশিষ্ট্যসূচক কণ্ঠস্বর শুনলুম যা নাকি কী এক আশ্চর্য কৌশলে ছিল একই সঙ্গে কর্তৃত্বব্যঞ্জক আবার বন্ধুতার সুরে ভরা। ওই কণ্ঠস্বরে ছেলেদুটিকে মাকারেঙ্কো যা শুধোলেন তা ছিল একই সঙ্গে প্রশ্ন ও নির্দেশসূচক। তিনি বললেন: 'কী? আজ কি তোমাদের খুব একঘেয়ে লাগছে?' জবাবে একটি ছেলে বললে: 'কাঠ শুকানোর কাজটা রাত দশটা অব্দি

* চৌভিলি পরে ওদেসার নৌবিদ্যার স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে সুমেরু সাগরে জাহাজের কাজে যোগ দেয়। গোর্‌কভ্‌স্কি পরে কাজ নেয় খার্‌কভের ট্র্যাক্টর কারখানায়। — সম্পাঃ

চলবে। কাজেই দ্বিতীয় দফায় কন্সার্ট আর নাচ শুরু হবার মুখে-মুখে আমরা ঠিক হাজিরা দিতে পারব।' শুনে বেশ আন্তরিক আর অনুমোদনসূচক গলায় মাকারেঙ্কো সংক্ষেপে শুধু মন্তব্য করলেন, 'বেশ।' এরপর আমরা সবাই ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

কলোনির প্রধান বাড়িগুলোর কাছে ফিরে এলুম যখন তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মাকারেঙ্কো কিন্তু কিছুই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন না, এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টররা সচরাচর যা করতেন সেভাবে কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের কিংবা কোনো ব্যাপারে তর্ক করে স্বমতে আনার প্রয়াস পর্যন্ত পেলেন না। বরং তাঁর কথাবার্তায় এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যৌথ সংস্থাটির এই বোলবোলাকে তিনি একটা বিশেষ কৃতিত্বের ব্যাপার বলে মোটে মনে করছেন না। বোঝা গেল যে তাঁর কাছে সুনির্ধারিত ও সুষ্ঠু শৃঙ্খলা জীবনের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে-সব ছেলেমেয়ে ওই বছর কলোনি ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল তাদের সম্বন্ধে ও তাদের জন্যে ভবিষ্যতে যে-সব কাজ ঠিক করে রাখা হয়েছিল সে-সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন মাকারেঙ্কো। জানালেন যে ওদের মধ্যে কিছু ছেলেমেয়ের জন্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর বাকিরা কাজ করতে যাচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে। ওইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ফ্যাক্টরির সঙ্গে কলোনি-যে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে তা-ও জানালেন। কলোনির মধ্যে বেশ জোরালো একটা ঐতিহ্য-যে সক্রিয় এবং কলোনির ভূতপূর্ব সদস্যরা যাতে তাদের প্রাক্তন 'পরিবার' বা যৌথ সংস্থা থেকে নিয়মিত বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন পায়

তার জন্যে তাদের সঙ্গে কলোনির দৃঢ় সম্পর্ক-যে বর্তমান এটা মনে-মনে স্বীকার না-করে উপায় ছিল না।

কলোনির কেন্দ্রবর্তী বাড়িখানার দিকে হেঁটে যেতে-যেতে পেতলের তৈরি বিউগ্‌লের একটা কাটা-কাটা বাজনার আওয়াজ কানে এল। শুনলুম ওটা নাকি দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট পেশ করার জন্যে দলপতিদের নিজ-নিজ বাহিনীকে ডাকার সংকেতধ্বনি।

ওই সময়ের মধ্যে কলোনির জমায়েতের প্রধান হলঘরখানার চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে দেখলুম। খাবার টেব্‌লগুলো তার মধ্যে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কলোনির রোজকার খাবার ঘরে রাখা হয়েছিল, আর সেই জায়গায় ঘরখানায় এনে সাজানো হয়েছিল ক্লাবঘরের কিছু শাদাসিধে আসবাবপত্র। ঘরখানায় আলোর ব্যবস্থা ভালোই ছিল, আর সেখানে কলোনির চমৎকার ব্যান্ডপার্টিটি যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে বাজনা বাজিয়ে চলেছিল। ছেলেমেয়েরাও তাদের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে আসন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ছিল। আর তখন কেন জানি না বারবার আমার মনে পড়ছিল সেই দুটি মেয়ের কথা — যারা তখনও কাচের ঘরের সংরক্ষিত বাগানে প্রয়োজনীয় উত্তাপ বজায় রাখার কাজটা দেখাশোনা করে চলেছিল, মনে পড়ছিল কাঠ শুকনোর অন্ধকার আটচালাটায় বসে-থাকা ভিতিয়া আর মিতিয়ার কথা, আর এরকম আরও অনেকের কথা — যারা তাদের নিজ-নিজ দায়িত্বের জায়গায় যৌথ জীবনের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত ছিল, কাজ করে চলেছিল পরম আনন্দে আর উৎসাহ নিয়ে।

সমাগত অতিথিদের মধ্যে কেউ-কেউ কাজের ডিউটিভাগের এই পদ্ধতি নিয়ে মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আলাপে

প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন, যেহেতু ঠান্ডার সময়ে এমন কি একঘণ্টার জন্যেও কাচের ঘরের সংরক্ষিত বাগানটার তদারকি না-করে তা এমনি ফেলে রাখা অসম্ভব, তাই দু'ঘণ্টা করে শিফ্‌টে চৌকি দেয়ার এই ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে। তিনি আরও জানালেন যে, ওই রাত্রে যাদের ওপর পাহারার ভার ন্যস্ত আছে তাদের পালা এলেই তারাও উৎসবের অনুষ্ঠান ছেড়ে কাজে চলে যাবে। একটু যেন বিপন্ন গলায় তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন: 'এছাড়া আর কীই-বা করতে পারি বলুন? বুঝি, এ-ধরনের আত্মসংযম অভ্যেস করতে শেখা মোটেই সহজ কাজ নয়। তবু একেবারে বাচ্চাবয়স থেকেই এসব ব্যাপারে সুশিক্ষা না-পেলে যখন এরা বড় হয়ে উঠবে আর আরও স্বাধীনতা পাবে আর বেপরোয়া হবে তখন-যে এসব ক্ষেত্রে এদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা কে বলতে পারে? হয়তো কাজ ছেড়েই সোজা লম্বা দেবে। এমন ঘটনা মোটেই বিরল নয়, তাই নয় কি? আর বয়স্কদের বেলায় এ-সমস্ত ক্ষেত্রে দোষ কার, এ-প্রশ্নের জবাবে সর্বদাই শুনবেন যে তাদের ঠিকভাবে মানুষ করা হয় নি।'

ওই সময়ে এই সমস্ত প্রশ্নে নিজের মতামতকে আবিল করে তোলার মতো যথেষ্ট পূর্ব-সংস্কার ছিল আমার। তাই অতিথিদের একজন যখন নিচের দ্বিমতটি প্রকাশ করলেন তখন আমিও মনে-মনে তাঁর কথা সমর্থন না-করে পারলুম না। তিনি বলছিলেন, 'কিন্তু এসময়ে ওইসব জায়গায় কাজ করতে ওদের নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে ঠেকে। এটা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না, কী বলেন?' শুনে মৃদু হেসে মাকারেঙ্কো জবাব দিলেন: 'ব্যাপারটা কী জানেন কমরেডস, অন্য লোকের প্রতি আমাদের বোধহয় আরেকটু বেশি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কেন, অন্য কাজ একঘেয়ে ঠেকবে কেন? আসলে

দুঃসাহসিক, বীরোচিত কোনো কাজ করা-আর ত্যাগস্বীকার করার ইচ্ছেটা মানুষের মধ্যে খুবই প্রবল। আর নিজের আন্তর শক্তি সম্বন্ধে এই প্রত্যয় মানুষকে যতখানি আনন্দ দেয় সাধারণ মামুলি আমোদপ্রমোদ তা তাকে কখনই দিতে পারে না। আমাদের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কথা বলতে গেলে, বারকয়েক এই অনুভূতির আস্বাদ পাওয়ার পর এ-ধরনের কাজ থেকে তাদের বিরত রাখাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে এই আনন্দের অনুভূতিকে লালন করা তাই খুবই দরকারি। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বছরের-পর-বছর খালি কেতাবি বিষয় ব্যাখ্যা করে চলি আর ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনের ভার তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, চরিত্রগঠনই হল সত্যিকার শিক্ষার একেবারে ভিত্তি বললেই চলে।'

সমবেত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা অতঃপর এই প্রশ্নটি নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন, যদিও মাকারেঙ্কোর উপরোক্ত যুক্তিতে মতভেদের কোনো অবকাশ ছিল না। গোড়ার দিকে মাকারেঙ্কো তর্কে যোগ না-দিয়ে চুপচাপ রইলেন, তারপর একসময় যেন নিজেরই মনের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এমনভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন: ' 'মৃত মানুষেরা' বইতে ভারি আশ্চর্য একটা জায়গা আছে। সেখানে বলা হয়েছে: 'কৈশোরের সুকুমার বছরগুলি পার হয়ে সাবালকের কঠিন জীবনে পা দেবার সময় যাত্রাপথে সঙ্গে নিয়ো... সঙ্গে নিয়ে যেয়ো সকল মানবিক অনুপ্রাণনা, পথিপার্শ্বে কখনও ফেলে যেয়ো না তাদের, কারণ তাহলে পরে আর কোনোদিন তুমি তাদের সংগ্রহ করে উঠতে পারবে না।' ' এই সময়ে পুশকিন থেকে আমিও একটা উদ্ধৃতি দিলুম: 'খোকা আমার, ভালো করে

লেখাপড়া শেখ, কারণ জ্ঞান দ্রুত বহমান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাছে সংহত আকারে উপস্থিত করে।' ভাবতে ভাবতে মাকারেঙ্কো জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা। তবে এই বাক্যটিকে সোভিয়েত জীবনের মতো করে একটু পরিবর্তন করে নেয়াও দরকার। আমাদের এই নতুন জগতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সুনির্দিষ্টভাবে বেছে-নেয়া নতুন কিছু অনুপ্রাণনা বা উদ্দীপনার যোগান দেয়া দরকার, যাতে অভিজ্ঞতার অভাবে তারা নিজেদের অযথা অতিরিক্ত ভারগ্রস্ত করে না-তোলে। তবে আমাদের মধ্যে এ-ধরনের লোক আছে খুব কমই। বেশির ভাগ লোকই সহজ সরল পথ বেছে নেন। অবশ্য অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা নিজেদের সহজে ভারগ্রস্ত করে তুলতেও চায় না। তবু আমাদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ হল প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে জীবনের পথে অপরিহার্য অভিজ্ঞতাটুকু আত্মস্থ করে নিতে বাধ্য করা, আর এমনভাবে তা করতে বাধ্য করা যাতে জীবনের পথচলায় তা মাঝপথে হারিয়ে না-যায়।'

কলোনির একটি ছেলে আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে গোটা আলোচনাটা মন দিয়ে শুনছিল। আগে থেকে কোনো জানানি না-দিয়ে হঠাৎ তার দিকে ফিরে মাকারেঙ্কো এই সময়ে শুধোলেন: 'কী, আলেক্সেই, তোমারও তা-ই মত তো? সাহিত্য এত দরকারি জিনিস অথচ তুমি তা খুব কম পড়। লাইব্রেরির রেজিস্টার দেখে আমি এটা জানতে পেরেছি। মনে হয় এখনও তোমার এ ভুল ধারণা কাটে নি যে উপন্যাস স্রেফ বানানো গল্প ছাড়া কিছু নয়। আসলে উপন্যাস থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, বুঝলে!'

আলেক্সেই কিন্তু এতে মোটেই অপ্রস্তুত হল বলে মনে হল না। উলটো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে

বলে বেশ খুশিই হয়েছে মনে হল। 'উপন্যাস থেকে আপনে কিছু শেখেন নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। মাকারেঙ্কো এবার কড়া চোখে, গভীর মনোযোগ নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকালেন। বললেন: 'নিশ্চয়! কী মনে ভাবো তুমি?' এ-কথার প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটির মধ্যে হাস্যকর রকমের সরল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার ভাব প্রকাশ পেল। সে বলল: 'কিন্তু আপনে তো অনেক কিছু জানেন, তাইলি আপনের বই পড়তি লাগবে কেন?' শুনে হো-হো করে হেসে উঠলুম আমরা সবাই। মাকারেঙ্কোও সজোরে দিল্‌খোলা হাসি হেসে উঠলেন। হঠাৎ তিনি বেশ সহজ আর যেন কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। ভাবলুম, ছাত্রছাত্রীরাও নিশ্চয় এই সমস্ত মুহূর্তে তাঁকে বিশেষ করে আপন জন বলে মনে করে। কেননা, সাধারণত তিনি নিজের আর রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের মধ্যে সুস্পষ্ট আর সুনির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলতেন। শুনলুম আলেক্সেইকে তিনি তখন বলছেন: 'দূর পাগল, মানুষের জানার খিদে-যে কী ভীষণ তা ভুলে গেছ তুমি — যতই জানবে ততই তোমার জানার ইচ্ছে-যে আরও বেড়ে চলবে তা বোঝ?' ঠিক এই সময় রাতের বাতাস চিরে জটিল আর কায়দা-করে-বাজানো বিউগ্‌লের একটা সংকেতধ্বনি ভেসে এল। শুনলুম, একটা সভায় আমাদের সমবেত হতে ডাকা হচ্ছে।

সভায় অল্প কিছুক্ষণ বক্তৃতা আর নানা ঘোষণার পালা চলল। তারপর কন্সার্ট বাজনা শেষ হলে পর এল নাচের পালা। পেতলের ব্যান্ড বাজনার তালে-তালে সে এক রীতিমতো বলনাচের আসর। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে তেমনই প্রাপ্তবয়স্করা — অতিথি-অভ্যাগত আর কলোনির শিক্ষক-পরিচালকবর্গ বসে-বসে তরুণতরুণীদের

নাচ উপভোগ করতে লাগলেন। মাকারেঙ্কোও এসে আমাদের সঙ্গে বসলেন। একসময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যান্ডের বাজনা আমার পছন্দ হচ্ছে কিনা। বুঝলুম ব্যান্ড বাজনা আমরা সমর্থন করি এটা তিনি চান। বললেন, কলোনির ব্যান্ডপার্টিতে পঞ্চাশটি বাদ্যযন্ত্র আছে আর শিগ্‌গিরই বাজনার সংখ্যা আরও বাড়বে। ব্যান্ডপার্টিটির জন্যে তিনি-যে রীতিমতো গর্ববোধ করছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন, 'ব্যান্ডপার্টি ছাড়া আমার চলছিলই না। ব্যান্ড ছাড়া সত্যিকার কোনো যৌথ সংস্থা চলতেই পারে না! এখানে মোটেই আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই, বুঝলেন! পুরো একটা ব্যান্ডপার্টি গড়ার উপযোগী বাজনা যোগাড় করাও শক্ত ছিল আমাদের পক্ষে, তবু অনেক কিছু দরকারি জিনিস বাদ দিয়ে ব্যান্ডপার্টি গড়তে মনস্থ করেছিলুম। ভালো একটা ব্যান্ডপার্টি ছেলেমেয়েদের সবার পক্ষে সংস্কৃতিতে হাতেখড়ির বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা উপায়। এটা আমাদের যৌথ সংস্থার একটা গর্বের বিষয়। আমরা-যে ঐক্যবদ্ধ তা প্রকাশের এটা একটা কার্যকর, বাস্তব উপায়ও বটে।'

শেষ কুচকাওয়াজের বাজনার সঙ্গে আমরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম রাত্রের অন্ধকারে। কলোনির অবশ্য নিজস্ব স্বল্পক্ষমতাবিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর ছিল, তবে কলোনির গোটা উঠোন আলোয় ভরে দেয়ার পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। মাকারেঙ্কো আমাদের, মেয়ে-অতিথিদের সঙ্গে করে রাত্রে আমাদের থাকার জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একখানা ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বাইরেটা তখন এত অন্ধকার যে তখনই শহরে ফিরে যাবার কথা মনেও স্থান দেয়া সম্ভব ছিল না।

যখন আমরা উঠোনের মধ্যেকার গির্জের কাছাকাছি এলুম তখন কে যেন অন্ধকারে হেঁকে বললে: 'কে যায়?' সঙ্গে সঙ্গে একটা পকেট-টর্চের আলো জ্বলে উঠল আর সেই ডিম্বাকার আলোর উৎসে রাইফেল-হাতে আর সঙ্গে গোটা দুই ছটফটে কুকুর নিয়ে একটি ছেলেকে অস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। ছেলেটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মাকারেঙ্কো, জানালেন ছেলেটি কলোনির হেড চৌকিদার, নাম মিশা চারস্কি। মিশা মাকারেঙ্কোকে জানালে: 'আমি ভাব্যেলাম বুঝি অজানা কোনো লোক আসতিছে। কুত্তা দুইডা কিন্তু আপনেরে ঠিক চিনেছে। আজ এয়ার আগি ওয়ারা এট্টা সন্দেহজনক লোকির গন্ধ পেয়্যেল, কিন্তু চারদিক এত অন্ধকার যে লোকডা-যে কেডা তা টের পাওয়া গেল না। সেজন্যি আমি পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ায়ে দিছি আর নিজিও একবার ঘুরে দেখতেছি চারিধার।'

ফের এগিয়ে চললুম আমরা। মাকারেঙ্কো এবার ভালোমানুষি-ভরা গলায় খেদ প্রকাশ করতে লাগলেন: 'বাইরে এত বেশি কুকুর ছেড়ে রাখে ওরা যে নড়েচড়ে বেড়ানোই মুশকিল। তবু যদি কুকুরগুলো খাঁটি শিকারী কুকুর হোত, নেহাত দো-আঁশলা নেড়িকুত্তা ওগুলো। কিন্তু ছেলেরা ওদের সম্পর্কে যেসব গল্প বলে তা শুনলে মনে হবে ওগুলো বুঝি সাক্ষাৎ নেকড়েশিকারী কুকুর... ওঃ, কুকুরগুলোর কী সব সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানার কথাই-না বলে ছেলেরা!.. আজ কোনো সন্দেহজনক লোক নিশ্চয়ই এখানে আসে নি, এ-তল্লাটই মাড়ায় নি নিশ্চয়। এসব কথার সবটুকুই নিছক কল্পনা। মিশা আর তার চৌকিদারের দল নিজেদের রূপকথার বীর বলে কল্পনা করে, অ্যাডভেঞ্চারের আশায় হা-পিত্যেশে বসে থাকে ওরা।'

কে যেন শুধোল: 'ওর এই কল্পনাশক্তির জন্যে আপনি কি মিশার কাছে কৃতজ্ঞ?' জবাবে মাকারেঙ্কো জোরে হেসে উঠলেন। বললেন: 'তা ছেলেরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে। তবে আকাশ-কুসুম কল্পনার জন্যে কাজকর্ম ভালোভাবে করায় ওদের কোনো বাধা ঘটে না। ওদের এই কষ্টস্বীকারের দৌলতে কিন্তু আমরা সবাই দিব্যি সুখে ঘুমোতে পারি।

'এই-যে, এই হল আমাদের আপেলবাগান। বড়-বড় গাছ এনে আমরা বসিয়েছি এখানে। শিক্ষাদানের এই ধরনের চমৎকার সহায়ক ব্যবস্থা কাজে লাগানোর পক্ষে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখনও পর্যন্ত বেশ অনভিজ্ঞ। অথচ এটা আমাদের কলোনির একটা গর্বের জিনিস। অন্য লোকের বাগানে ঢুকে গাছ থেকে আপেল চুরি করার চেয়ে এখানে বাগান পাহারা দেয়া অনেক বেশি মজাদার আর কাজের জিনিস। এটা কিন্তু নিছক আপেলের ব্যাপার নয়। জীবনের ব্যাপারটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু ধারণা, অনুভব আর বোধ নিয়ে যে-জীবন তার কথাই বলছি, যা নাকি আমাদের নিজ-নিজ জীবনযাপনে সাহায্য যুগিয়ে থাকে। সত্যিকার বিপদের সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে একেবারে শাদা-মাটা জীবনের চেয়ে কল্পিত বিপদও ভালো। বিপদের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহের মধ্যে মহৎ একটা ব্যাপার আছে। তবে মানুষকে শেখানো দরকার কীভাবে বুদ্ধিমানের মতো, অর্থাৎ সার্বিক স্বার্থের নামে, বিপদের ঝুঁকি নেয়াটা উপভোগ করতে হয়।'

মাকারেঙ্কোর কাছে একে-একে আমরা বিদায় নিচ্ছিলুম। গ্রীষ্মকালে ফের একবার কলোনি সফরে আসার জন্যে তিনি

আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, ওই সময়ের মধ্যে এক হেক্টরের সিকি অংশ জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা গোলাপবাগান গড়ে উঠবে কলোনিতে। আর এর পরের উৎসবগুলোয় লাল-নীল আলো দিয়ে সাজানো হবে কলোনি আর থাকবে আরও বড় এক ব্যান্ডপার্টি... সত্যি, সে একটা দেখবার-শোনবার মতো ব্যাপার হবে। যাওয়ার আগে ফের একবার তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন আবার আসতে, বললেন আমাদের আবার অভ্যর্থনা জানাতে পারলে ছেলেমেয়েরা ভারি খুশি হবে। 'এখানে আমাদের জীবন মোটেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা নয়, কিন্তু তা ভারি আনন্দময়। ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাইরের বন্ধু আর সঙ্গ পাওয়া সত্যিই দরকার। অতিথি এলে আমরা সর্বদাই ভারি খুশি হই।'

কলোনির গোটা সংগঠনটার মধ্যে মাকারেঙ্কোর ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য ও তাঁর ভূমিকার মূল্যনিরূপণ ও তা সঠিকভাবে বোঝা গোড়ার দিকে আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সংগঠনের কাজকর্ম এত মসৃণভাবে চলছিল যে অখণ্ডভাবে গোটা কলোনি সম্পর্কেই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। মাকারেঙ্কো নিজেও এই শ্রদ্ধা পোষণের ব্যাপারটিকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করতেন, কারণ তাঁর মতে এটা তাঁর যৌথ সংস্থার সদস্যদের মনে নিজ-নিজ শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে একটা আস্থা ও গর্বের ভাব জাগাতে সহায়ক ছিল। আর তিনি নিজে ছেলেমেয়েদের এই গর্ববোধের মধ্যে দেশপ্রেম ও সোভিয়েত পিতৃভূমির প্রতি তাদের কর্তব্যের চেতনাটিও সঞ্চারিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নিকলাই ফেরে*

আমার শিক্ষক

আমার এক বান্ধবী ইয়ে আ. পুশ্‌নোভা গোর্কি কলোনিতে খাজাঞ্চি হিসেবে কাজ শুরু করার পর একদিন আমায় খবর দিলেন যে মাকারেঙ্কো কৃষিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এমন একজন সহকারীর খোঁজে আছেন।

আমাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিনটিতে সন্ধের আগে পর্যন্ত মাকারেঙ্কো আমার সঙ্গে দেখা করতেই পারলেন না। অবশেষে সন্ধেবেলায় আধো-অন্ধকার একটা ঘরে আমি যখন তাঁর মুখোমুখি হলুম, প্রদেশ শিক্ষা-

---

* নিকলাই এদুয়ার্দভিচ ফেরে (জন্ম ১৮৯৭ সালে) গোর্কি কলোনিতে কৃষিবিৎ হিসেবে কাজ করতেন। ইনি ছিলেন মাকারেঙ্কোর ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের একজন। সম্প্রতিকালে তিমিরিয়াজেভ কৃষিবিদ্যার আকাদমিতে ইনি অধ্যাপকপদে নিযুক্ত। 'জীবনজয়ের পথে' বইটিতে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে এদুয়ার্দ্‌ নিকলায়েভিচ শেরে। — সম্পাঃ

দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খিটিমিটি তর্কবিতর্কের পর তখন তিনি রীতিমতো ক্লান্ত। তাঁর কণ্ঠস্বরে তখন সহৃদয়তার লেশমাত্রও ছিল না। আমাকে কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ না-করে তিনি সরাসরি কলোনির অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে শুরু করে দিলেন।

কাজ করতে গিয়ে আমাকে যেসব অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে মাকারেঙ্কো তা আমার কাছ থেকে গোপন করার কোনোরকম চেষ্টা করলেন না। এ-কাজে আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহও তিনি লুকোলেন না। আমি তখনও বয়সে তরুণ, তার মাত্র তিন বছর আগে, ১৯২১ সালে, স্নাতক হয়ে বেরিয়েছি, তাছাড়া আমার পড়ানোর কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু বসন্ত ঋতু ঘনিয়ে আসছিল বলে তিনি জানালেন যে যদি আমি কাজ করতে রাজি থাকি তাহলে কভালিওভ্‌কায় কাজ শুরু করা একান্ত প্রয়োজন আর তা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝির চেয়ে দেরিতে শুরু করা চলবে না।

ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখলুম আমি। বয়সে তরুণ হলেও জীবনের অনেক কিছুই জানা হয়ে গিয়েছিল আমার। অন্তত আমার সামনে যে-পথটা পড়ে ছিল তা যে মোটেই সহজে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না সে-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান ছিল আমার। তবু মাকারেঙ্কোর মধ্যে সৌহার্দের অভাব দেখে আমার মনে আশঙ্কা জাগছিল যে তাঁর সঙ্গে কাজ করা হয়তো আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একবার মনে হল ওখানে কাজ করা সম্বন্ধে আর কথাবার্তা না-চালানোই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু আমার তরুণ বয়সের উৎসাহ-উদ্দীপনাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। আমার তারুণ্য

বললে কাজটা কঠিন হবে শুধুমাত্র এই অজুহাতে একজন প্রতিভাবান লোকের অধীনে এমন একটা আগ্রহোদ্দীপক কাজের সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না, এর ফলে সমর্থনের অযোগ্য দুর্বলতাই প্রকাশ করা হবে শুধু।

১৯২৪ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে, নির্দিষ্ট দিনটিতে বারো-তেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলে দু'চাকার একখানা ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে আমার বাড়ির দরজায় এসে থামল।

ফলে আমার কাছে আর বাছাবাছির কোনো পথ খোলা রইল না। তবু ভবিষ্যৎ অশান্তির আশঙ্কা ফের একবার মনের মধ্যে তার কুৎসিত মাথাটা জাগাল।

আমার কুকুর ত্রুবাচ তখন ঘোড়ার গাড়িটার চাকাগুলোর আশপাশে লাফালাফি জুড়েছিল। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে গাড়ির ছোকরা কোচম্যানটি অসঙ্কোচে হেঁকে বললে, 'ওডাও আমাদের সাথে যাতিছে নাকি?'

কিন্তু একথার জবাবে আমি কী বলতে পারতুম? কিছু বলতে হলে আমাকে বলতে হোত যে, মনিব যদি যায় তাহলে ত্রুবাচও যাবেই, তবে কিনা ওর মনিব নিজেই মনস্থির করতে পারছে না সে কী করবে। কিন্তু সম্ভবত ছেলেটির ওই সরল প্রশ্নটিই সেদিন আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল।

সকল সতর্কতা বিসর্জন দিয়ে তাই বুঝি আমি হাসিমুখে বলে উঠলুম: 'হাঁ, নিশ্চয়ই, ও-ও মনিবের সঙ্গে যাবে বই-কি!'

বসন্তঋতু বেশ কিছুদিন হল তখন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবেশী চাষীরা ওর মধ্যেই জমিতে লাঙল আর মই দেয়া শুরু করে দিয়েছিল, কিছু-কিছু লোক তো

বীজ বোনা পর্যন্ত আরম্ভ করেছিল। কাজেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সময় হয়ে গিয়েছিল মাঠে নেমে পড়ার।

আমি কলোনিতে এসে পেঁছনোর পরদিন সকাল আটটার সময় বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে একদল ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক জড় হয়ে আছেন। খেতগ্লো একবার ঘ্রে দেখা, খামারে কাজের লোক আর যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম যা আছে তার হিসেবে নেয়া, এসব কোনো কিছ্ব করার এতটুকু স্বযোগ পর্যন্ত পাবার আগেই সকলে আশা করছিলেন যে আমি সরাসরি চাষের নির্দেশ দিতে শ্রর্ করব, কোন জমিতে কী করতে হবে তা দেখাব লোককে... স্পষ্ট বোঝা গেল যে বাচ্চা ছেলেপিলে নিয়ে কাজ করতে হলে কাজের যে-বিশেষ কায়দাকান্ন উদ্ভাবন করা দরকার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পর্যন্ত নেই। অথচ একসঙ্গে সবকিছ্ব কাজ করার জন্যে ওরই মধ্যে সময় করে নেয়ার দরকার ছিল। যেমন, এক জায়গায় একটা লাঙল মেরামত করা দরকার, আবার ওই একই সঙ্গে আরেক জায়গায় একটা বীজবোনা-যন্ত্র ঠিকমতো চাল্ব করা, তৃতীয় আরেক জায়গায় একজনকে দেখানো কী করে বোনার জন্যে বীজ তৈরি করতে হয়, চতুর্থ একটা জায়গায় বীজের বস্তা গাড়িতে তোলার কাজে জোর তাগিদ দেয়া, পঞ্চম একটা জায়গায় তরম্বজের খেত কতটা জায়গা জ্বড়ে হবে তার মাপজোক করা এবং ষষ্ঠ আরেকটা জায়গায় ঘোড়া লাঙলে জ্বততে সাহায্য করা — এই সব কাজই করার দরকার হচ্ছিল একসঙ্গে...

একেবারে প্রথম দিনটি থেকেই আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চমৎকার একটা কাজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল্বম। সম্ভবত এটা ঘটেছিল এইজন্যে যে নিজের কাজে

আমি সম্পূর্ণ ডুবে থাকতুম। এর অর্থ, আমি কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতুম না, বরং প্রাণপণে হাতে-কলমে কাজ করে চলতুম আর চাইতুম যে ছেলেমেয়েরাও তাদের বিবেকের বশবর্তী হয়ে কাজ করুক।

গ্রীনহাউসে কাচের ছাদের নিচে যথেষ্ট পরিমাণে বাঁধাকপি আর টোম্যাটোর চারা পোঁতার পর খানিকটা জায়গা আমি ছেড়ে রেখে দিলুম ফুলের চারা তৈরি করার জন্যে। পরে ওই চারাগুলো কলোনির সদর দালানের সামনেকার ফুলবাগানে এনে পুঁতে দেয়া হল। ফুলগাছের যত্ন করা বাস্তবিকই ভারি পছন্দ করত ছেলেমেয়েরা এবং চাষের মরশুমে ফুলবাগানে কাজের লোকের টানাটানি পড়া সত্ত্বেও মাকারেঙ্কোর পুরো সম্মতিক্রমে দলপতি-পরিষদ ওই সময়ে এই কাজের জন্যে সর্বদাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছেলেমেয়েকে নির্দিষ্ট করে দিত। তবে এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট-করে-দেয়া ছেলেমেয়েরা ছাড়াও সর্বদাই বহু আগ্রহী, ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবীকেও পাওয়া যেত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব সামান্য একটা সংখ্যালঘু অংশই মাত্র ফুল সম্বন্ধে উদাসীন ছিল কিংবা ফুলের বাগানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। গালাতেঙ্কো ছোকরা ছিল এই শেষোক্তদের দলে। দীর্ঘদিন ধরে সে নিযুক্ত ছিল কলোনিতে জল-বওয়া ভারির কাজে, কিন্তু পরে রূঢ় আচরণের অপরাধে তাকে ওই কাজ থেকে 'বরখাস্ত' করে দলপতি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঠানো হয় কাচের ঘরের সংরক্ষিত বাগানে কাজ করার জন্যে। ছেলেটার মনে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ওর কাজে এই বদল ঘটানো হয়। এবার গালাতেঙ্কোকে ভিড়িয়ে দেয়া

হল ‘সূক্ষ্ম কোমল’ কাজে ব্যস্ত ফুলবাগানের মালিদের অমায়িক সংসর্গে।

একদিন কাচের ঘরের সংরক্ষিত বাগানে ঢুকে মাকারেঙ্কো তো অবাক! তিনি দেখলেন, আগার-দিকে-চেরা ছোট্ট একটা কাঠি-হাতে বেগোনিয়ার সদ্য-গজানো ঘোড়ার বালামচির মতো সরু-সরু খুদে চারা সযত্নে মাটি থেকে তুলে অন্যত্র বসানোর কাজটা ভারি মন দিয়ে আর খেটে-খুটে করছে গালাতেঙ্কো। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে মাকারেঙ্কো স্বীকার করেই ফেললেন যে, এমনটি তিনি আশা করেন নি, বরং বহুদিন থেকেই তিনি ভাবছিলেন যে এ-ধরনের সূক্ষ্ম কোমল কাজের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী এই বিবেচনায় আমি হয়তো যে-কোনোদিন তাঁকে অনুরোধ জানাব গালাতেঙ্কোকে কাচের ঘরের বাগান থেকে সরিয়ে নিতে। আমি বললুম, ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই উলটো ঘটেছে। গালাতেঙ্কো তার কাজে দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠেছে, কাচের ঘরের বাগানের কাজ পুরোপুরি রপ্ত করে নিয়েছে সে আর এখানকার কাজের চলতি ধরনধারণও ভারি মনোযোগ দিয়ে মেনে চলেছে।

কথাপ্রসঙ্গে আরও জানালুম, ‘তবে ওর কাজের একটা ভারি অদ্ভুত দিক আমার নজরে পড়েছে। নানারকম ফুলের সাধারণভাবে প্রচলিত নাম ও স্বীকার করে না, নিজেই ও একেকরকম ফুলের একেক নাম দেয়।’

‘কী রকম? কী রকম?’ আগ্রহী হয়ে শুধোলেন মাকারেঙ্কো।

বললুম, ‘যেমন, ধরুন, গালাতেঙ্কোর জগতে গোলাপ হল ‘ছুঁড়ি’, লবঙ্গের গন্ধওয়ালা জিলিফুল হল ‘ছোঁড়া’,

মিনিওনেত্ হল 'মিঠা বাস', বেগোনিয়া 'তিতিরপাখি', স্ন্যাপ্ড্রাগন 'খরগোশ', লোবেলিয়া 'পুঁচকে ক্রুশ', শীতের ফ্লক্স 'মা-মণি' আর পার্স্লিন 'বাচ্চা'...' গড়গড় করে একগাদা মজাদার নাম বলে গেলুম আমি।

গালাতেঙ্কোর এই অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে কী খুশি-যে হলেন মাকারেঙ্কো কী বলি! কাচের ঘরের বাগানটার কাছে একখানা বেঞ্চিতে বসে একমুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন যে গালাতেঙ্কোর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ যদি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে থাকে, তাহলে অন্যান্য ছেলেপিলের মধ্যেও এদের জাগিয়ে তোলা-যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা না-বললেও চলে। ওইখানে বসেই মাকারেঙ্কো প্রস্তাব করলেন যে কলোনিতে ফুলের চাষ এত বিপুল পরিমাণে করতে হবে যাতে পরের গ্রীষ্মে গোটা কলোনি, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, ফুলের সমুদ্রে ডুবে যায়।

যাতে নিজে আমি বোকা বনে না-যাই সেই ভয়ে এবং যাতে কলোনির সত্যিকার কাজে লাগতে পারি তার জন্যে কলোনি-বাসিন্দাদের পুনঃশিক্ষাদান-সংক্রান্ত গোটা প্রক্রিয়াটা এবং বিশেষ করে 'অন্যায়কারীদের' ওপর যে-সমস্ত ধরনের চাপ সৃষ্টি করার রেওয়াজ চালু ছিল তা খুব মন দিয়েই আমি অনুধাবন করতুম। এসব ক্ষেত্রে মাকারেঙ্কোর প্রয়োগ-করা সুনির্দিষ্ট কৌশলগুলিই-যে আমি বোঝার চেষ্টা করতুম তা-ই নয়, ধরার চেষ্টা করতুম কোন পদ্ধতিতে ওগুলিকে মিলিয়ে একটা গোটা শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে আর সে-ব্যবস্থার স্থায়ী মর্মবস্তু ও অন্তর্নিহিত কার্যকারণ-সূত্রটিই বা কী।

গোড়ার দিকে আমি ভেবেছিলুম ছাত্রছাত্রীদের কোন অপকর্মের জন্যে ঠিক কোন ধরনের শাস্তি দিতে হবে তা বুঝি মাকারেঙ্কোর নোটবইয়ে কোথাও-না-কোথাও লেখা আছে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমি লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র মাকারেঙ্কোর সাংগঠনিক কায়দাকৌশলই মোটের ওপর কমবেশি একরকম থাকে, অপরপক্ষে তিনি যে-সমস্ত শাস্তির বিধান দেন তার কোনো বাঁধাধরা ছক বলে কিছু নেই। প্রায়ই এমন দেখা যেত যে একেবারে একই ধরনের 'অপরাধ'এর জন্যে মাকারেঙ্কো নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা দিচ্ছেন কিংবা কখনও-কখনও মোটেই শাস্তি দিচ্ছেন না। তবে এই অনির্দেশ্য 'অস্পষ্টতায়' ছেলেমেয়েরা কিন্তু কোনো কারণেই অবাক হোত না বা চটে যেত না। দেখেশুনে মনে হোত তারা যেন বেশ ভালোই বুঝতে পারছে একই রকম অপকর্মের জন্যে কেন মাকারেঙ্কো একেক ক্ষেত্রে একেক রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

কিছুকাল পরে আমিও যেন এটা বুঝতে শুরু করলুম যে মাকারেঙ্কো কলোনিতে যে-শিক্ষাদান ব্যবস্থার উদ্ভাবনা ও বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন তাতে শাস্তিদানের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল ছেলেমেয়েদের অন্যায় কাজের সম্ভাবনার পথ আগে থাকতেই যাতে মেরে রাখা যায় তার উপায়াদি খুঁজে বের করা।

ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠিত অপরাধের একেবারে মূলে পেঁছনোর ব্যাপারে মাকারেঙ্কোর সত্যিকার একটা ক্ষমতা ছিল। এ-ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা দেখে শুধু-যে আমিই তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম তা-ই নয়, অভিজ্ঞ বাঘা-বাঘা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এবং বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা নিজেরা এতে

একেবারে মাত হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা তো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসই করত যে, 'আন্তনের কাছ থেক্যে কিছু গোপন করাই যায় না।'

...ওই বছর অগস্ট মাসের শেষে আমাদের তরমুজ খেতগুলোয় এমন সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে শুরু করল যার সমাধান গোড়ার দিকে এমন কি মাকারেঙ্কো পর্যন্ত করে উঠতে পারলেন না।

সেবার তরমুজের ফলন দারুণ হয়েছিল। ওই সময়টায় প্রতিদিন দুপুরের খাবার সময় প্রতিটি ছেলেমেয়েকে আস্ত একেকটা তরমুজ দেয়া হচ্ছিল, তাছাড়া রাত্রের খাবার সময় আরও তরমুজ থেকে যাচ্ছিল খাওয়ার জন্যে। তবু, তা সত্ত্বেও, কিছু-কিছু ছেলেমেয়ে তরমুজ খেতেও উপদ্রব শুরু করে দিল।

তরমুজ খেতগুলো লপোতেত্স্কি নামে বয়োজ্যেষ্ঠ একটি ছাত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত এক বিশেষ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছিল। কিন্তু দেখা গেল খেতের পাহারা যথেষ্ট সজাগ নয়। একদিন সকালে বাহিনীটি আবিষ্কার করল যে তার আগের রাত্রে তরমুজ খেতে চোর ঢুকে এক ভারি তাজ্জব কান্ড করেছে। প্রায় গোটা কুড়ি তরমুজ থেকে বড় একেকটা চাকলা কেটে নিয়ে চোর সেই খোঁদলগুলো ভারি কায়দা করে তরমুজেরই খোলা দিয়ে ঢেকে রেখেছে যাতে চট করে তার এই শয়তানি লোকে টের না-পায়।

ওইদিন সন্ধেবেলা দলপতি-পরিষদের সভায় লপোতেত্স্কি এই বলে সকলকে শাসাল যে, যে-লোক এতগুলো চমৎকার তরমুজের বারোটা বাজিয়েছে সেই 'ইতরডার জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো হবে'। তা সত্ত্বেও সে দোষীকে ধরতে পারল না, যদিও এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে চোর

কলোনি-বাসিন্দা ছাড়া বাইরের কেউ নয়, কেননা তার আগের দিন রান্নাঘর থেকে বড় একখানা ছুরি উধাও হয়ে গিয়েছিল... এর পরদিন সকালবেলা হঠাৎ তরমুজ খেতের দিক থেকে চেঁচামেচি আর কান্নার শব্দ কানে এল আমার। মনে হল, ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই তাহলে 'ইতরডা'কে ধরেছে আর লপোতেত্স্কি তার শাসানি এতক্ষণে কাজে পরিণত করতে লেগে গেছে। অতএব গোলমাল লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পা চালালুম আমি। অবশ্য একটু পরেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখলুম যে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, খালি লপোতেত্স্কি তার দুই সঙ্গী পাহারাদারকে কাজে অবহেলার জন্যে মহা চটেমটে বকাঝকা করতে লেগেছে।

'দ্যাখেন, দ্যাখেন, নিকলাই এদুয়ার্দভিচ,' আমাকে আসতে দেখে লপোতেত্স্কি মহা হৈ-চৈ করে বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া ইতরডা আরও কী কম্মো করেছে দ্যাখেন!' বলে 'চৌকিদারের টুঙি'টার দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

এখন হয়েছে কী, জায়গাটায় প্রকান্ড একটা তরমুজ ধীরেসুস্থে পেকে উঠছিল আর তরমুজটা মাকারেঙ্কোকে উপহার দেবার জন্যে ছেলেমেয়েরা মতলব এঁটেছিল। তরমুজটার সবুজ খোলার গায়ে একটা তারা খোদাই করে তার নিচে ওরা লিখে রেখেছিল, 'গোর্কি কলোনির পক্ষ থেকে আন্তন মাকারেঙ্কোকে'। তরমুজটার নামকরণ পর্যন্ত করেছিল ছেলেমেয়েরা, সেটার নাম রেখেছিল 'কমিশার'। ওদের শ্যেনদৃষ্টির পাহারার আওতায় তরমুজটার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটছিল দিনে-দিনে। দিনে সেটা কতটুকু করে বাড়ছে তারও খবর রাখত প্রতিটি ছেলেমেয়ে। অধীর হয়ে ওরা সবাই প্রতীক্ষা করছিল সেই দিনটির জন্যে — যেদিন মাকারেঙ্কোকে ওরা তরমুজটা উপহার দিতে পারবে। যাতে

কোনো 'আনাড়ি' বা নবাগত ছেলেমেয়ে তরমুজটার গায়ে একটা আঙুল পর্যন্ত ঠেকাতে প্রলুব্ধ না-হয় সে-ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে লপোতেত্স্কি বিশেষ করে 'কমিশার'এর কাছেই তার 'চৌকিদারের টুঙি'টা বসিয়েছিল। আমি দেখলুম চোর এখানেও তার হাত বাড়াতে ছাড়ে নি, এই বিশেষ তরমুজটা থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে গর্তটা এক-টুকরো খোলা দিয়ে যথারীতি চাপা দিয়ে রেখে গেছে।

মর্মাহত লপোতেত্স্কি কিছুতেই সান্ত্বনা মানছিল না। ওই বিশেষ রাত্রে যে-ছেলেদুটি পাহারায় ছিল তারা বললে যে রাত্রে তারা একটা খস্‌খস আওয়াজ পেয়েছিল বটে। তাদের মনে হয়েছিল ঘাসপাতার ওপর দিয়ে বুঝি একটা সাপ চলে যাচ্ছে। সর্পভ্রমে তাদের কর্তব্যকর্মে এই অবহেলা লপোতেত্স্কির পক্ষে বকাবকি করার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তরমুজ খেতে এই 'জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা'র খবর দাবানলের মতো দেখতে-দেখতে সারা কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ল। গোটা কলোনিতে সেদিন এছাড়া আর অন্য কোনো কথা ছিল না। যত শুনতে লাগল খবরটা ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ছেলেমেয়েরা। লপোতেত্স্কি আর অন্য কোনো-কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে ইতিমধ্যেই নিজেদের মতো করে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিল। দেখেশুনে মাকারেঙ্কো তাড়াতাড়ি এ-সমস্ত বন্ধ করে দিলেন আর ওই দিনটার বাকি সময় নিজে ছেলেমেয়েদের ওপর কড়া নজর রাখলেন।

এমন কি ওইদিন সন্ধেবেলাতেও ছেলেমেয়েদের রাগ পড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কামারশালে

লপোতেত্‌স্কি লোহালক্কড় জোড়াতাড়া দিয়ে জাঁতিকল-জাতীয় একটা যন্ত্র তৈরি করে ফেলল। ওর মতলব ছিল তরমুজ খেতে ঢোকার মুখে ও ওই ফাঁদটা পাতবে।

অবশেষে একসময় সাধারণ সভায় সমবেত হবার বিউগ্‌ল-সংকেত বেজে উঠল। আর কী হয় তা জানবার জন্যে অধৈর্য প্রত্যাশা নিয়ে ছেলেমেয়েরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ছুটল সেদিকপানে।

প্রথমেই মাকারেঙ্কো প্রস্তাব করলেন যে সব ক'জন দলপতি তাদের নিজ-নিজ বাহিনীর যে-সমস্ত সদস্য সভায় উপস্থিত হয় নি তাদের নাম আর তাদের অনুপস্থিতির কারণ একেকখানা কাগজে টুকে যেন তাঁর হাতে দেয়। অতঃপর লপোতেত্‌স্কি উঠে দাঁড়াল এবং তরমুজ খেতে যা-যা ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করল। এরপর সব ক'টি বাহিনীর দলপতি উঠে কাকে-কাকে তারা সন্দেহ করছে তা বলল। কিন্তু এত সমস্ত সত্ত্বেও কিছুতেই কিছু হল না। অতঃপর চোখদুটি নামিয়ে ভাবতে বসলেন মাকারেঙ্কো আর কিছুক্ষণের জন্যে গোটা সভা স্তব্ধ হয়ে রইল।

হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন তিনি, 'আচ্ছা, বেশ। এবার তাহলে দেখা যাক তোমাদের মধ্যে কারা-কারা তরমুজ বিশেষরকম ভালোবাস।'

অতঃপর পাঁচটি কি ছ'টি ছেলেমেয়ের নাম শোনা গেল। সবশেষে বলতে উঠল মেয়েদের বাহিনীর দলনেত্রী মুখিনা। সে জানাল যে তার বাহিনীতে তরমুজ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ভালিয়া।

ভালিয়া ছিল মাথায় খাটো, রোগাসোগা, ছোট্ট একটি মেয়ে। মাত্র মাস-কয়েক আগে তাকে খার্‌কভ শহর থেকে

কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল। সে ছিল ভারি চুপচাপ, শান্তশিষ্ট, অন্য মেয়েদের মধ্যে কোনোদিক থেকেই চোখে পড়ার মতো ছিল না সে। তবে সে এসে পেঁছনোর সময় খার্‌কভের শিক্ষা-দপ্তর থেকে মাকারেঙ্কোর কাছে যে-বিশেষ চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে লোকের বাড়ি চুরি-ডাকাতি করে বেড়াত এমন একটা বড় দলের হয়ে সে হুঁশিয়ারি দেয়ার কাজ করত। একবার একটা বাড়িতে সিঁদ কাটতে গিয়ে ব্যর্থ হবার পর দলটা ভালিয়ার কাছ থেকে বিপদের হুঁশিয়ারি পেয়ে পালাতে সমর্থ হয়, কিন্তু সে নিজে ধরা পড়ে যায়। তবে মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না-থাকায় তাকে তুলে দেয়া হয় খার্‌কভের শিক্ষা-দপ্তরের অভ্যর্থনাকেন্দ্রের হাতে। ভালিয়ার কপালে কী ঘটল সে-ব্যাপারে অবশ্য সতর্ক নজর রেখেছিল ছোকরা ডাকাতরা। তাই দেখা গেল, অভ্যর্থনাকেন্দ্রে গিয়ে পেঁছনোর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই ওকে লুকিয়ে বের করে নিয়ে গেল তারা। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটা ফের ধরা পড়ে গেল, আর এবার ওকে পাঠিয়ে দেয়া হল আমাদের কাছে পোল্‌তাভায়। ওর-সঙ্গে-পাঠানো চিঠিতে আমাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল ওকে বিশেষভাবে চোখে-চোখে রাখতে, কেননা ওকে লুকিয়ে বের করে নেয়ার চেষ্টার পুনরাবৃত্তি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

মুখিনা যখন ভালিয়ার নাম করল বিস্ময়ে মাকারেঙ্কো তখন প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন আর-কি। তারপর মনে হল হঠাৎ তাঁর মাথায় যেন নতুন একটা বুদ্ধি খেলেছে। মিনিটখানেক চুপচাপ থেকে তিনি স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় ডেকে বললেন: 'ভালিয়া, এখানে টেবিলের কাছে একবার এস তো...।'

সারি-সারি বেঞ্চের ফাঁক দিয়ে ভালিয়া যখন মাকারেঙ্কোর কাছে হেঁটে আসছিল তখন ওর মুখে একটিই মনোভাবের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল, তা হল একটা হতভম্ভ ভাব। যেন হঠাৎ তারই ডাক পড়ল কেন এটা সে বুঝে উঠতে পারছে না! সত্যিই, অমন একটি শান্তশিষ্ট বাচ্চা মেয়ে-যে তরমুজ খেতে হানা দিতে পারে এমন সন্দেহ করার কারণই থাকতে পারে না বলে মনে হচ্ছিল।

'বিনা অনুমতিতে তুমি রান্নাঘরের ছুরিখানা নিয়েছিলে কেন?' একই রকম শান্ত গলায় মাকারেঙ্কো শুধোলেন।

'কই? ছুরি আমি নিই নাই তো!' কেমন যেন একটু বেশি ব্যস্ত হয়েই ভালিয়া জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই মাকারেঙ্কোর কাছে এই ব্যস্ততার ভাবটা ধরা পড়ল। এবার তিনি আক্রমণ শুরু করলেন।

বললেন: 'ভালিয়া, ছুরি তুমি নিয়েছই। এখন আমি যদি আর্দালিকে পাঠাই তোমার জিনিসপত্র খুঁজে দেখতে আর সে যদি ছুরিখানা পেয়ে যায় তাহলে তা কিন্তু তোমার পক্ষে ভালো হবে না। কাজেই বলে ফেল, কোথায় তুমি লুকিয়ে রেখেছ সেটা?'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ভালিয়া প্রায়-শোনা-যায়-না এমন স্বরে উত্তর দিল: 'বিছানার গদির মধ্যি একখান ছিদ্র আছে, তার মধ্যি গোঁজা আছে ছুরিখান।'

এর মিনিটকয়েক পরে আর্দালি সেই হারিয়ে-যাওয়া ছুরিখানা এনে মাকারেঙ্কোর সামনে টেবিলের ওপর রাখল। দেখে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি শুরু করে দিল। হলঘরখানা শিগ্‌গিরই ভরে উঠল গুঞ্জনধ্বনিতে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বরে রাগ বা বিদ্বেষের চেয়ে অবাক হবার সুরটাই ফুটে উঠল বেশি করে।

মাকারেঙ্কো এবার শুধোলেন, 'তরমুজ তুমি খুব ভালোবাস বুঝি ভালিয়া?'

'খু-উ-ব। আমি জেবনে কখনও তরমোজ খাই নাই।'

'কিন্তু তুমি তরমুজ থেকে একেকটা অংশ খুবলে বের করে নেবার পর খোলাটা তাতে ফের চাপা দিয়ে রাখ কেন?'

'আমি ভাব্যেলাম, এয়া করলি তরমোজ ফের জোড়া লেগি যাবে-নে,' বেশ গম্ভীর হয়েই জবাব দিল ভালিয়া।

এতে ফের একবার হলে গুঞ্জনের রোল উঠল... লপোতেত্‌স্কির সেই 'ইতরডা' যে এই রোগাসোগা পুঁচকে মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নয়, এটা যেমন ছেলেমেয়েদের কাছে তেমনই আমাদের সকলের কাছেও একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। লপোতেত্‌স্কি ইতিমধ্যেই তার সেই শাসানি, সেই 'ইতরডার জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো হবে' কথাটা ভুলে বসে ছিল। এখন সে অন্য ছেলেদের এই বলে উস্‌কোতে লাগল যে মিটিঙ শেষ হওয়ামাত্রই তারা যেন মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব উত্ত্যক্ত করে তোলে...

অবশ্য মাকারেঙ্কো ওর দিকে কড়া চোখে একবার তাকাতেই লপোতেত্‌স্কি সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেল।

'ভালিয়া, তুমি কি কথা দিচ্ছ যে আর কখনও তুমি তরমুজ খেতে সেঁধিয়ে ফলফুলুরি অমন করে নষ্ট করবে না?'

'না, আর কোনোদিন এমন কাজ করব্য না আমি,' নিচু গলায় জবাব দিল মেয়েটা।

এরপর মাকারেঙ্কো ভালিয়াকে তার অপকর্ম সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার একটা প্রস্তাব ভোটে দিলেন। ছেলেমেয়েরাও প্রায় সকলেই সাগ্রহে এ-প্রস্তাব সমর্থন করল। কেবল লপোতেত্‌স্কি, তার বাহিনীর ছেলেরা আর অন্য জনাকয়েক

ভোট দেয়া থেকে 'বিরত' থাকল। অতঃপর ভালিয়া নিজের জায়গায় ফিরে গেল আর মাকারেঙ্কো এইবার দৈনন্দিনের নানা ছোটখাট আর নেহাতই নিরীহ সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

সভা শেষ হলে সকলে যখন চলে গেল মাকারেঙ্কো তখন লপোতেত্স্কিকে আটকে রেখে নানা সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলেন। অবশেষে বলার কথা যা ছিল তা শেষ করলেন নিচের এই কথাগুলি দিয়ে: 'এরপর যদি আমি শুনি যে তুমি ভালিয়ার পেছনে লেগেছ, তাহলে তোমাকেই কিন্তু কলোনি ছেড়ে যেতে হবে। মনে রেখ, এর আর কোনোরকম অন্যথা হবে না। একথা অন্য ছেলেদেরও তুমি জানিয়ে দিতে পার।'

শেষের এই মন্তব্যটি তিনি করলেন, বলতে গেলে, নিতান্ত কথাচ্ছলে, কিন্তু এমন মোক্ষমভাবে কথাগুলি বললেন তিনি যাতে লপোতেত্স্কির কাছে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁর যে-কথা সেই কাজই-যে হবে এটাই তিনি বোঝাতে চাইছেন।

সভার শেষে আমি ঘরে ফিরে গেলুম ওইদিন যা-কিছু ঘটেছিল, যা-কিছু আমি দেখেছিলুম আর শুনেছিলুম তা-ই নিয়ে চিন্তা করতে-করতে। আর হঠাৎ আমার মনে হল, মাকারেঙ্কোর নোটবই রাখা নিয়ে আমি আগে যা-কিছু ভেবেছি, ছেলেমেয়েদের নানারকম অপকর্মের জন্যে যতসব শাস্তির ব্যবস্থা তিনি ভেবেচিন্তে গুছিয়ে নোটবইতে টুকে রাখেন বলে একসময়ে যা আমার মনে হয়েছিল সে-সবই একেবারে বুদ্ধুর মতো কিংবা অন্ততপক্ষে-যে আনাড়ির মতো ভাবনাচিন্তা সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রতিটি অস্বাভাবিক ঘটনা, এমন কি তাদের মেজাজে আর আচরণে অনেক সময় প্রায়-ধরাছোঁয়া-যায়-না এমন এক-আধটুকু পরিবর্তনও মাকারেঙ্কোর কাছে যেন আগে সমাধিত সমস্যারও নতুন করে সমাধান সন্ধানের, ছাত্রছাত্রীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাববিস্তারের নতুন-নতুন পথ খোঁজার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ হিসেবে দেখা দিত। একেবারে ঠিক এইভাবেই, প্রাত্যহিক জীবনের স্রোতের সঙ্গে তাল রেখেই, মাকারেঙ্কো তাঁর শিক্ষাদানের কৃৎকৌশল উদ্‌ভাবন করতেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতিগুলিই ছিল 'প্রতিটি শিশুর অন্তরে যে-মানুষটি ঘুমিয়ে আছে' তার প্রতি গভীর মনোযোগদান, নমনীয় মনোভাবপোষণ এবং সব রকমের প্রচলিত ও মামুলি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিশুদের সাহচর্যে আসা।

...১৯২৭ সালের বসন্তকালে চাষবাসের কাজের জন্যে আমরা দীর্ঘপ্রতীক্ষিত একটি ট্রাক্টর পেলুম। আর তারপর কিছুদিনের মধ্যেই 'রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ডাইরেক্টরেটের' কাছ থেকে আমাদের বন্ধুদের কৃপায় দ্বিতীয় আরেকটি ট্রাক্টরও পেয়ে গেলুম আমরা।

ছেলেমেয়েরা এই যন্ত্রগুলোকে সত্যিকার উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই বরণ করে নিল। আর দেখা গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সেইসব তরুণ রক্ষণাধীন ছেলেপিলেরা, যারা তার আগে থেকে বহুদিন ধরে যন্ত্রপাতি আর কারিগরিবিদ্যার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তারা যে-কোনো প্রশিক্ষণ-পাওয়া মেকানিকের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

নভেম্বরের এক সন্ধেবেলা খাওয়াদাওয়া চলার সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কলোনির সব আলো নিবে গেল।

জানা গেল, আমাদের বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের ৭৫ অশ্বশক্তির বৈদ্যুত মোটরটি হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছে। মেকানিক জানাল যে মোটরটি মেরামত করতে কমপক্ষে একমাস সময় লাগবে, তবে আমরা যদি অতিরিক্ত কিছু পয়সা দিতে রাজি থাকি, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, কিছু ঘুস দিই, তাহলে মেরামতের ওই সময়টা কমিয়ে বিশ দিনে নামানো যেতে পারে... অতএব কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলুম আমরা। বৈদ্যুত মোটর বিকল হওয়ার অর্থ ছিল এই যে জলের পাম্পগুলোও আর কাজ করবে না। অর্থাৎ, কলোনির চার শো ছেলেমেয়ে আর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারিদের জল আর বৈদ্যুত আলো ছাড়া চলতে হবে এবং তা চলতে হবে বছরের এমন একটা সময়ে যখন সূর্য দেরিতে ওঠে আর সন্ধে ঘনিয়ে আসে তাড়াতাড়ি।

এর পরদিন সকালে প্রথম কাজ যা মাকারেঙ্কো করলেন তা হল দলপতি-পরিষদের একটা জরুরি সভা ডাকা।

সভায় কলোনির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত সেমিওন রগ্‌দানোভিচ বিদ্যুৎকেন্দ্র আর জলের পাম্পগুলো অকেজো অবস্থায় থাকাকালীন যে-সমস্ত জিনিসপত্র কেনা একান্ত অপরিহার্য তার একটা লম্বা ফর্দ পড়ে শোনালেন। তাঁর এই ফর্দয় ছিল দু'শো প্যারাফিনের বাতি, তেলের পাত্র, অতিরিক্ত বেশ কিছু কাচের চিমনি, পলতে, নতুন কিছু বালতি, ইত্যাদি মোটমাট এক শো-টিরও বেশি ধরনের সাজসরঞ্জাম! অচিন্তিতপূর্ব এইসব খরচের মোট অংকটা এতই সাংঘাতিক বেশি বলে মনে হল যে, তা শুনে ছেলেমেয়েদের প্রায় খাবি খাওয়ার অবস্থা হল। মাকারেঙ্কো পর্যন্ত তাঁর এই সহকর্মীটিকে টাকার মোট অংকটা ফের

একবার উল্লেখ করতে বললেন: 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু টাকাটা কত যেন বললেন?'

তদুপরি রগ্‌দানোভিচ অনুরোধ জানালেন যে বাতিগুলোয় তেল ভরা ও বাতিগুলো দেখাশুনোর জন্যে একটা বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হোক। বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেকানিকটি এই সময়ে ফের একবার তাল বুঝে ইঙ্গিত করলে যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি অল্প এক-আধটুকু ঘুস দেয়ার জন্যে তৈরি থাকি তাহলে খুব সম্ভব মেরামতির কাজটা মাসখানেকের চেয়ে কম সময়ে হতে পারে...

এমন সময়ে বেলেন্‌কি ছোকরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে সে কিছু বলতে পারে কিনা।

বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুরেই সে বললে, 'আমার একটা নূতন প্রস্তাব আছে। কোনো কিছুই কেনার কিংবা কাউরে ঘুস দেয়ার মোটেই দরকার নাই। ট্রাক্টরের এঞ্জিনটা আমরা বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজে লাগাতি পারি আর তাইলে মেকানিক তাঁর যত খুশি সময় নিয়ি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোটরটা মেরামত করতি পারেন...'

আলোচনার মধ্যে আমাদের ট্রাক্টরচালকটির এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর হঠাৎ একেবারে কবরখানার নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল আর সবচেয়ে গরম-গরম কথা বলল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেকানিকটি। রীতিমতো চটে উঠে সে বলতে চাইল যে বেলেন্‌কির প্রস্তাবটা একেবারেই গাঁজাখুরি। বলল: 'কী সব আবোলতাবোল বকতিছ! আমার মোটরের ক্ষমতা পঁচাত্তর অশ্বশক্তি, অথাৎ গিয়ি তোমার ট্রাক্টরের মোটরের থেক্যে পেরায় চতুর্গুণ বেশি!' এর জবাবে অবশ্য বলার মতো বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু দেখা গেল বেলেন্‌কি আর

তার সহকর্মী বন্ধুরা এ-ব্যাপারটাও হিসাবের মধ্যে ধরে ওরই মধ্যে সবকিছুর সমাধান করে ফেলেছে। মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই তারা প্রমাণ করে দিল যে আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে কখনও তার পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ-ব্যাপারে অবশ্য শেষ কথা বলার অধিকার ছিল স্বয়ং মাকারেঙ্কোর। তবে সাধারণত যিনি চটপট দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখতেন সেবার তাঁকেও দেখা গেল যে হ্যাঁ-না কিছু-একটা বলার আগে তিনি ভাবনাচিন্তায় বেশ কিছুটা সময় নিচ্ছেন।

ছেলেপিলেদের উদ্ভাবনী দক্ষতায় বাস্তবে-যে কতখানি কী ফল ফলবে অঙ্কের হিসাবে তা অনুমান করা ছিল অসাধ্য, অথচ পঁচাত্তর অশ্বশক্তি-যে সত্যিই বিশ অশ্বশক্তির প্রায় চতুর্গুণ বেশি সেটা দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছিল।

হঠাৎ মাকারেঙ্কো আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি ওদের এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করার দায়িত্ব নিতে পারবেন?'

বললুম, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমার তো মনে হয় সন্ধে ঘনিয়ে আসার মুখে, ধরুন বিকেল পাঁচটা লাগাদ, এ-ব্যাপারের প্রাথমিক কাজকর্ম আমরা সেরে ফেলতে পারব আর তখনই কতদূর কী করা যাবে তা বুঝতে পারব...'

ওইদিন বিকেল পাঁচটা লাগাদ মাকারেঙ্কো যখন আমাদের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা দেখতে এলেন তখন আমরা সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র ফের চালু করার জন্যে তৈরি। আসল মুহূর্তের মুখোমুখি তখন আমরা। অতঃপর সুইচ টিপে এঞ্জিন চালু করা হল, তাতিয়ে তোলা হল এঞ্জিনটাকে, ট্রাক্টর-এঞ্জিন আর জেনারেটরের খাঁজকাটা চাকাদুটো পরস্পরের সঙ্গে জোড়া হল চালক-

বেল্টটি পরিয়ে। এবার বেলেন্‌কি আস্তে-আস্তে ক্লাচটা ছাড়ল আর অমনি জেনারেটর চলতে শুরু করল।

১৯২৮ সালের সূচনায় মাক্সিম গোর্কি ইতালি থেকে দেশে ফিরলেন। আমরা এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলুম যে কলোনি পরিদর্শনে আসার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করবেনই। কলোনির সাধারণ সভায় মাকারেঙ্কো প্রস্তাব করলেন যে আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় অতিথির আসন্ন পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি অবিলম্বে শুরু করা হোক। মাকারেঙ্কোর মত ছিল এই যে কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা নিজ-নিজ জীবনকথা লিখবে আর তারপর সেই আত্মজীবনীগুলি একত্র সংগ্রহ করে একখানি বইয়ের আকারে তা গোর্কিকে উপহার দেবে। সভায় উপস্থিত সকলে সোৎসাহে এ-মত সমর্থন করল। স্থির হল যে বইটিতে গোর্কি কলোনির সকল সদস্যেরই জীবনকথা থাকবে।

আর ওই মুহূর্তটি থেকে আমাদের যৌথ সংস্থা কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় চিন্তাতেই মশগুল হয়ে রইল — আমাদের মাননীয় সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষকের উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্যে তৈরি হওয়া যায় কীভাবে! প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রতিটি কাজ করার সময় সবাই এই একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজটার গুণাগুণ বিচার করতে শুরু করল: গোর্কি কি এটা সমর্থন করবেন? তাঁর কি আগ্রহ জাগাবে ব্যাপারটা? তিনি কি এটা পছন্দ করবেন, না এ-ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন?..

পশুখাদ্য বড় আকারের বীটের চারা ঠান্ডা আবহাওয়ার দরুন যখন প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে মাথা জাগাল না তখন

বীজ থেকে কী করে তাড়াতাড়ি চারা গজানো যায় তা নিয়ে নানারকম প্রস্তাব, পরামর্শ ইত্যাদি আসতে শুরু করল। এমন কি একজন তো প্রস্তাব করেই বসল যে সব্‌জিখেতের সেই বিশেষ দিকটাতে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে খেতের মাটি গরম করে তোলা হোক! কেননা একথা ভেবেই ছেলেমেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে কলোনিতে এসে ঘুরে-ঘুরে খেতখামার দেখার সময় গোর্কির চোখে যদি ওই খালি জমিটা পড়ে যায় তাহলে কী হবে! এরপর বড় আকারের বীটের ওই চারা যখন কিছুটা দেরিতে মাটির ওপর মাথা জাগাল (দেরি সত্ত্বেও চারাগুলো মোটামুটি সতেজই হয়েছিল) তখন সব্‌জিখেতের ভারপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা এসে এমনভাবে খবরটা ঘোষণা করল যেন না-জানি কী সাংঘাতিক গুরুতর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

এছাড়া মাক্সিম গোর্কি নামের আদ্যক্ষর দুটো ফুলগাছের ফুল দিয়ে প্রকাণ্ড বড়-বড় করে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েরা কলোনির বাগানের প্রকাণ্ড একটা জায়গা ফুলগাছ পোঁতার জন্যে সাফসুত্‌রো করতে লেগে গেল। আর কলোনির ক্লাববাড়ি আর সদর দালানের দেয়ালে-দেয়ালে তারা টাঙিয়ে দিলে গোর্কির রচনাবলী থেকে বাছাই-করা যতসব উদ্ধৃতি সুন্দরভাবে কপি করে পোস্টারের আকারে।

এমন কি কলোনির সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও এ-উপলক্ষে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কত-যে ছোট-ছোট প্রাণী তারা ধরল তার ইয়ত্তা নেই। যেমন বেশ কিছু ইঁদুর, খরগোশ ও এমন কি একটা শজারুও। তাছাড়া কী কৌশলে যেন নানারকমের পাখিও — যেমন, একরকমের ঘুঘু, ঝুঁটিওয়ালা হুপোপাখি, এমন কি ছোটজাতের একটা

বাজপাখি পর্যন্ত — ধরল তারা। তারপর সযত্নে এইসব পশুপাখির পরিচর্যা করতে লাগল তারা, যাতে গোর্কি এলে তাঁকে আস্ত এই চিড়িয়াখানাটা উপহার দিতে পারে।

১৯২৮ সালের জুনের মাঝামাঝি কলোনি থেকে একটি প্রতিনিধিদল মস্কো গেল গোর্কির সঙ্গে দেখা করতে। গোর্কি আমাদের মধ্যে দিনকয়েক কাটিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন এই খবরটা তারা নিয়ে এলে সকলেই ভারি পুলকিত হয়ে উঠল। বিশেষভাবে তলব-করা দলপতি-পরিষদের সভায় সেদিন এত কলোনি-সদস্য এসে হাজির হল যে সভাটা ক্লাববাড়িতে স্থানান্তরিত করতে হল।

গোটা কলোনিকে উৎসবের সাজে সাজানো, সব ক'টি ছেলেমেয়ের জন্যে নতুন গ্রীষ্মের পোশাক বানানো এবং পুরো একপ্রস্থ খাবার থালাবাসন কাঁটাচামচ ইত্যাদি কেনার প্রস্তাব বিনা বাধায় পাশ হয়ে গেল। কিন্তু ঝামেলা বাধল তখন যখন কলোনিতে কয়েকটা দিন থাকার সময় গোর্কিকে ঠিক কোথায় ও কীভাবে থাকতে দেয়া যেতে পারে তা-ই নিয়ে আলোচনা উঠল। যেমন, কথা উঠল যে গোর্কির জন্যে নির্দিষ্ট ঘরগুলো কী-কী আসবাব দিয়ে সাজানো দরকার। তাঁর কি আয়নার দরকার? আর তা দরকার থাকলে সেটা কেমনতরো আয়না হওয়া উচিত — পুরো মানুষসমান লম্বা আয়না কি? তাছাড়া খাটের ব্যাপারটা কী হবে? সাধারণ খাটবিছানায় কি গোর্কিকে আঁটবে, নাকি তাঁর জন্যে বিশেষরকম খাট, তাঁর প্রমাণসাইজ খাট দরকার? তাঁকে খেতেই-বা দেয়া হবে কী? রাঁধুনিকে কি বিশেষ কয়েকরকম খাবার বানানো শেখানোর দরকার নেই? জুতো তৈরির বাহিনীর দলপতি প্রস্তাব করল যে এটা আগে থেকেই স্থির করা দরকার, ওই সময়ে বৃষ্টিবাদলা হলে গোর্কির

পায়ে দেবার জন্যে বিশেষ ধরনের বুটের প্রয়োজন হবে কিনা।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত স্থির হল যে, গোর্কির জন্যে প্রয়োজনীয় বাড়তি যা-কিছু আসবাবপত্র দরকার এবং বিশেষ করে লেখার একখানা টেবিল ও একখানা চেয়ার তো বটেই — তা বানানো হবে আমাদের নিজস্ব ছুতোরশালে। এছাড়া প্রস্তাব নেয়া হল যে নতুন একপ্রস্থ খাটবিছানা কেনা হবে আর তা কেনা হবে কলোনির সবচেয়ে ঢ্যাঙা ছেলে কালাবালিনের মাপে। আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল। অবশেষে সবাই এ-ব্যাপারে একমত হল যে, মানুষসমান লম্বা আয়না একমাত্র দরকার পড়ে অভিনেত্রীদের, কাজেই খুব সম্ভব গোর্কির তা দরকার হবে না। ঠিক হল, গোর্কির শোবার ঘরে ছোট একখানা গোল আয়না দেয়ালে টাঙানো হবে, এবং ওর চেয়ে বড় একখানা আয়না রাখা হবে ড্রেসিংটেব্‌লের ওপরে।

গোর্কিকে কী খেতে দেয়া হবে সে-ব্যাপারটা নিয়ে সবচেয়ে বেশিক্ষণ পুঙখানুপুঙখ আলোচনা চলল। ছেলেমেয়েরা প্রস্তাব করল যে, যে-সমস্ত খাবার তাদের খুব ভালো লাগে গোর্কির জন্যেও সেইসব খাবার বানানো হোক। যেমন, সকালবেলার জলখাবারের জন্যে শুয়োরের চর্বিসহ বাজরার পরিজ, দুপুরের খাওয়ার জন্যে ইউক্রেনদেশী বর্‌শ্চ স্যুপ আর সেদ্ধ শুয়োরের মাংস আর রাত্রের খাওয়ার জন্যে আলুভাজা আর ভাপে সেদ্ধ ফল। কিন্তু প্রধান বাবুর্চি আর গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়িকারা এহেন খাবারের ব্যবস্থার ঘোর প্রতিবাদ জানাল। ছেলেমেয়েদেরও শেষপর্যন্ত স্বীকার করতে হল যে খাদ্যতালিকাটা বোধহয় কথঞ্চিৎ গুরুপাকই

হবে। যাই হোক, এই সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে একটা বিশেষ কমিটি তৈরি করে তার ওপর ভার দেয়া হল।

জুতো তৈরির বাহিনীর দলপতি যে-প্রস্তাব দিয়েছিল সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও বুটজোড়া বানানোর কাজটা তখনকার মতো স্থগিত রাখা হল, কেননা গোর্কির পায়ের মাপ কারো জানা ছিল না আর এক্ষেত্রে এমন কি কালাবালিনকেও 'মডেল' হিসেবে ধরে নেয়া সম্ভব ছিল না...

ইতিমধ্যে প্রতিদিন কলোনির দিকে-দিকে ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্ছিল ধোয়াপাখলা, মেরামত, সেলাইফোঁড়াই, ঘরবাড়ির ভেতরের অংশে চুনকাম আর বাইরের অংশে রঙ করা, ধুলোময়লা সাফ করা ইত্যাদি কাজে মেতে থাকতে। আর যতক্ষণে এই মর্মে একখানা টেলিগ্রাম এসে পেঁছিল যে গোর্কি খার্‌কভে এসে পেঁছচ্ছেন ৮ জুলাই তারিখে ততক্ষণে কলোনিতে গোছগাছের কাজ নিখুঁতভাবে সমাধা হয়ে গেছে।

সারা মঠের চত্বর বারে বারে উল্লসিত 'হুর্‌রে' ধ্বনি আর খুশির চিৎকারে প্রতিধ্বনিত করে কুচকাওয়াজ সাঙ্গ হল। অতঃপর মাকারেঙ্কো গোর্কির কাছে প্রস্তাব করলেন যে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে তাঁর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ভালো হয়।

অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গোর্কি ছেলেমেয়েদের বললেন তাঁকে কলোনি-এলাকা ঘুরিয়ে দেখাতে।

ছেলেমেয়েরাও ধরে নিল (এবং সঠিকভাবেই) যে কলোনিতে যা-কিছু আছে সব ব্যাপারেই গোর্কি নিশ্চয় দারুণ আগ্রহী, তাই তারা সবকিছুই তাঁকে দেখাতে শুরু

করল, এমন কি কুরিয়াজের দূরতম কোণগুলি পর্যন্ত। রীতিমতো গর্বের সঙ্গেই তারা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল তাঁকে ফুলবাগান, কাচের ঘরে সংরক্ষিত বাগান, ফলবাগান, গোশালা, আস্তাবল আর শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো... আর পদে-পদে অসংখ্য প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল তাঁকে। গোর্কি কিন্তু অক্লান্তভাবে সে-সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললেন আর তাঁর মুখে সারাক্ষণই লেগে রইল প্রশান্ত, প্রসন্ন, জ্ঞানী মানুষের সেই হাসিটি। বোঝা যাচ্ছিল এ-সবই গোর্কি প্রাণভরে উপভোগ করছেন, সানন্দে উপভোগ করছেন ছেলেমেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচি, তাঁর সঙ্গে ওদের তর্কবিতর্ক, কলোনির প্রতিটি ব্যাপারে ওদের লোভীর মতো আগ্রহ আর ওদের জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন তা জানার জন্যে ওদের অপরিসীম কৌতূহল।

কাচের ঘরের সংরক্ষিত বাগানে গিয়ে গোর্কি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন যে জিলিফুলের লবঙ্গের গন্ধটা বেশ মিষ্টি, তবে গোলাপের গন্ধ আরও মিষ্টি, তামাকফুল আর ম্যাথিওলা ফুল দেখতে তেমন কিছু না হলেও তাদেরও সৌরভ ভারি মনমাতানো এবং স্ন্যাপড্রাগন ফুলের অমন নাম দেয়াটা স্রেফ বোকামি ছাড়া কিছু নয়, কেননা ফুলগুলো মোটেই ড্রাগনের মতো দেখতে নয়।

আবার শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো দেখার সময় গোর্কি হাসিমুখে মেনে নিলেন যে আকুলিনা সত্যিই সুন্দরী তবে কিনা মাশা আবার আরও বেশি সুন্দর।

নদীর ধারের ছাঁটাঘাসের মাঠে বেড়াতে-বেড়াতে ছেলেমেয়েরা গোর্কিকে জানাল যে ওই মাঠে ঘাস কাটতে,

আঁকশি দিয়ে কাটা ঘাস একেক জায়গায় জড় করে গাদা মেরে রাখতে আর কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একেক বার নদীতে সাঁতরে আসতে কী মজাই-না লাগে।

মাঠে বেড়ানো শেষ হলে ছেলেরা তাদের সঙ্গে সাঁতারে যোগ দেয়ার জন্যে গোর্কিকে লোভানি দিতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁরও এতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, তবে নেহাত স্বাস্থ্যের কারণে জলে না-নেমে তিনি শেষ পর্যন্ত নদীর পাড়ে বসেই ছেলেদের সাঁতার দেয়া আর 'হামাসাঁতার', 'কুকুরসাঁতার', 'কাতসাঁতার' ইত্যাদি কসরত দেখতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে ছেলেরা বিনা প্রস্তুতিতেই নিজেদের মধ্যে সাঁতার-প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল আর গোর্কির চোখে ছেলেমানুষের মতো ঝিলিক হানা দেখে আমরা টের পেলুম যে বাচ্চাদের মতো তিনিও প্রতিটি বাজির ফলাফল কী হয় তা দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তিনি আর এক-জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারছিলেন না, সবটুকু পুরোপুরি দেখার জন্যে ইতিমধ্যে কখন খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। একেক সময় মনে হচ্ছিল এই বুঝি তিনি নিজেই কাপড়চোপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লম্বা-লম্বা হাত চালিয়ে হামাসাঁতার দিয়ে অন্য সাঁতারুদের ধরতে ছুটবেন। ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারছিল যে গোর্কি সত্যিই তাদের জীবনের অংশীদার হয়ে উঠেছেন আর কে-যে কীভাবে গোর্কিকে তার শিশুশোভন মুগ্ধ প্রশংসা আর বিস্ময়ের ভাগ দেবে তা-ই নিয়ে তাদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

প্রথম দিন সন্ধেবেলা গোর্কি আমাদের সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বাহিনীর দলপতিদের বিশেষ রিপোর্ট পেশ করা শুনলেন।

পরদিন সকালে গোর্কি জানালেন যে-সব জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে সে-জমিগুলো তিনি দেখতে আগ্রহী।

ওই সময়ে মাঠের খড় কাটার দু'খানা কাটাইযন্ত্র সহ একখানা ট্রাক্টরকে মাঠে নামানোর জন্যে আমরা তৈরি হয়েছিলুম। আমরা যাচ্ছিলুম গোরুঘোড়ার জাবনা যোগানোর জন্যে মাঠ থেকে ভেচকলাই আর ওট-ফসলের খড় কেটে আনতে।

আমাদের প্রধান ট্রাক্টরচালক বেলেন্‌কি ট্রাক্টরখানার স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসল। ট্রাক্টরের একটা মাডগার্ডের ওপর উঠে বসলেন গোর্কি স্বয়ং আর মাকারেঙ্কোকে ডাকলেন অন্য মাডগার্ডে চাপতে। আমি চাপলুম ট্রাক্টরের সংযোজক ডান্ডাটার ওপর। তারপর সবাই মিলে রওনা দিলুম মাঠের দিকে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে গোর্কি আমাদের আবাদী জমিগুলো দেখতে-দেখতে চললেন।

আমরা বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই নানা খেতে কাজে-ব্যস্ত মিশ্রবাহিনীর ছেলেমেয়েরা অনেকেই মুখের কাছে হাতদুটো মুঠো করে এনে প্রাণপণে চিৎকার করে আমাদের ডাকতে লাগল যাতে আমরা তাদের কাছে যাই। তাদের এই ডাকাডাকিতে অভিভূত হয়ে গোর্কি ঘনঘন তাদের দিকে ফিরে-ফিরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। তাঁর অবশ্য হাত নাড়ার উপায় ছিল না, কেননা হাত দু'খানা ব্যস্ত ছিল ট্রাক্টরের মাডগার্ডটা আঁকড়ে ধরে থাকার কাজে।

'জায়গাটা ভারি চমৎকার, তাই-না?' ট্রাক্টর-এঞ্জিনের গোঁ-গোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে গোর্কির চিৎকার শোনা গেল। মাকারেঙ্কোকে উদ্দেশ করে তিনি বলছিলেন, 'এই বাচ্চাদের সাহচর্যে আমার যেন বয়স কমে গেছে অনেকখানি। কী

আনন্দেই-না এরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ আর খেলাধুলো করছে! সত্যিই তোমাদের এখানে নতুন জীবনের পত্তন হয়েছে, সত্যিকার সোভিয়েত জীবনযাত্রার ধরন পুরোদমে চালু হয়ে গেছে দেখছি...'

কিছুক্ষণ কথা না-বলে নিঃশব্দে হেঁটে চললেন তিনি, তারপর হঠাৎ এক সময় বিদেশে তাঁর জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জানালেন, ইউরোপীয় সমাজের বহু বিভিন্ন স্তরের মানুষ সোভিয়েত স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে সত্যি খবর জানবার জন্যে কতই-না ব্যগ্র। জানালেন সোভিয়েতের মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে তা সকল দেশের সৎ মানুষের মনে কতখানি প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করছে তার কথা।

বেশ জোর দিয়েই মাকারেঙ্কোকে বললেন গোর্কি, 'আমি তোমাকে বলছি, শিক্ষার ব্যাপারে তোমার এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর তার অসামান্য সব ফলাফল সত্যিসত্যিই যাকে বলে সর্বজনীন গুরুত্বের বিষয়, তা-ই। তোমার পক্ষে সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ-সমস্ত খবর জানানো শুধু দরকারিই নয় একেবারে আবশ্যিক। আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই ভালো, বুঝলে...'

সেমিওন কালাবালিন*

কীভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন মাকারেঙ্কো

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তন সেমিওনভিচ মাকারেঙ্কোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার — কিছুটা অস্বাভাবিক পরিবেশে, অর্থাৎ জেলখানায়। তিক্ত শৈশবের ভুলভ্রান্তির ফলস্বরূপ আমি তখন ওখানে কয়েদ খাটছি। সেদিনের পর বহু বছর কেটে গেছে, তবু সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

---

* সেমিওন কালাবালিন (১৯০৩-১৯৭২) — ইনি প্রথমে ছিলেন গোর্কি কলোনির কিশোর বাসিন্দা, পরে ১৯২৭ সালে মাকারেঙ্কোর পরিচালনাধীনে নিজেই শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সোভিয়েতের শিক্ষাক্ষেত্রে পরে ইনি এক সুপরিচিত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে দেখা দেন, এবং উৎপাদনী কাজের সঙ্গে জড়িত নানা কলোনি ও অনাথাশ্রমের পরিচালনাভার ন্যস্ত হয় এঁর ওপর। মাকারেঙ্কোর 'জীবনজয়ের পথে' বইটিতে এঁকে সেমিওন কারাবানভ নামে উপস্থিত করা হয়েছে। — সম্পাঃ

ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে। জেলখানার কর্তা একদিন ডেকে পাঠালেন আমায়। তাঁর অফিসে ঢুকতে কর্তা ছাড়াও একজন অপরিচিত লোককে দেখলাম। টেবিলের পাশে একটা আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে, মাথায় হুডওয়ালা টুপি ও ধুকড়ি একটা গ্রেটকোট গায়ে বসে ছিলেন মানুষটি। দেখলাম, লোকটির করোটি বেশ বড় আর প্রশস্ত, প্রসন্ন কপাল। কিন্তু প্রথমেই যে-জিনিসটি আমার নজর কাড়ল তা হল পাঁশনে-চড়ানো ওঁর মস্ত নাক, আর চশমার কাচের আড়ালে একজোড়া সদয় দৃষ্টি, যে-দৃষ্টি বিচক্ষণতা আর কৌতুকে মেশামেশি, মানুষকে বশীভূত হতে বাধ্য করে যে-দৃষ্টি। মানুষটি ছিলেন আন্তন সেমিওনভিচ মাকারেঙ্কো।

'ও তুমিই তাহলে সেমিওন কালাবালিন?' উনি আমায় বললেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

'তা, তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজি তো?'

আমি একবার প্রশ্নভরা-চোখে ওঁর দিকে তাকালাম, তারপর তাকালাম জেলখানার কর্তার দিকে — কারণ, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কথার ওপরই আমার 'সম্মতি' নির্ভর করছিল। এদিকে তখন আন্তন সেমিওনভিচ বলে চলেছেন:

'বুঝেছি, বুঝেছি। যাওয়ার ব্যাপারটা আমি নিজেই কর্তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেব। আচ্ছা তাহলে, সেমিওন, যদি কিছু মনে না কর তো এক মিনিট ঘর ছেড়ে একটু বাইরে যাও দেখি। ও কি যেতে পারে, কমরেড জেলর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যাও, বাইরে যাও,' কর্তা বললেন।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ওয়ার্ডারের সঙ্গে বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নিজের মনেই ভেঙচি কেটে

ওঁর কথাগুলো আওড়ালাম, 'কিছু মনে কোরো না। ঘর ছেড়ে একটু বাইরে যাও দেখি, সেমিওন'। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিলাম না। কেবল ভাবছিলাম, লোকটা আচ্ছা মজার তো!

কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে অফিস-ঘরে ডাকা হল। আন্তন সেমিওনভিচ তখন দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

'আচ্ছা, সেমিওন, তোমার কিছু জিনিসপত্র আছে?'

'না। কিস্যু নাই।'

'ঠিক আছে,' বলে মাকারেঙ্কো কর্তার দিকে ফিরলেন, 'তাহলে এখান থেকেই আমরা সোজা রওনা দিতে পারি?'

কর্তা বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারেন।'

জেলের দরজাগুলো সটান খুলে গেল। আন্তন সেমিওনভিচের সঙ্গে আমি পা বাড়ালাম আমার জীবনপথের সবচেয়ে সুখকর অংশ পাড়ি দিতে।

এরও প্রায় বছর দশেক পরে আমি যখন মাকারেঙ্কোর অন্যতম সহকারী তখন একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন:

'জেলখানার কর্তার অফিস-ঘর থেকে সেদিন তোমায় আমি বাইরে পাঠিয়ে দিলুম কেন, জানো তো? কারণ, তোমাকে আমার হেফাজতে দেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে আমি-যে সই করছি তা যাতে তুমি দেখতে না-পাও। এতে তোমার মানব-মর্যাদাবোধে ঘা লাগত, তাই।'

মাকারেঙ্কো তখনই আমার মধ্যে এমন সব মানবিক গুণের সন্ধান পেয়েছিলেন যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি নিজেও ঘুণাক্ষরে সচেতন ছিলাম না। এটাই ছিল আমার জীবনে ওঁর প্রথম উষ্ণ, মানবিক স্পর্শ।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরে যাওয়ার পথে আমি মাকারেঙ্কোকে ছাড়িয়ে অল্প আগে-আগে হাঁটতে

চেষ্টা করলাম। এটা করলাম এইজন্যে যাতে উনি আমার ওপর নজর রাখতে পারেন, আর আমি-যে ওঁকে ছেড়ে পালাতে চাইছি না সেটা দেখানোর জন্যেও বটে। কিন্তু উনি আমাকে আগাগোড়া ওঁর পাশে-পাশে রাখলেন, একটার-পর-একটা শুনিয়ে গেলেন কলোনির গল্প, কলোনি-সংগঠন যে কত কঠিন কাজ তাও জানালেন। এক কথায়, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা বললেন, কেবল জেলখানা, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আমার অতীত সম্বন্ধে টুঁ-শব্দটি করলেন না।

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের বাড়ির উঠোনে পেঁছে কলোনির গাড়ি আর ঘোড়াটাকে আমার জিম্মা করে দিলেন মাকারেঙ্কো। তারপর আমাকে এমন একটা কাজে পাঠালেন যাতে আমি মনে-মনে চমকে উঠলাম।

'তুমি লিখতে-পড়তে জানো তো, সেমিওন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।'

পকেট থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে উনি আমার হাতে দিলেন। বললেন:

'এই জিনিসগুলো আমার হয়ে কিনে ফ্যালো দেখি — এই রুটি, চর্বি খানিকটা, আর চিনি। আমার কেনাকাটার সময় নেই এখন, সারাটা দিন আজ সরকারি আপিসে-আপিসে দৌড়োদৌড়ি করে কাটবে। সত্যি বলতে কি, দোকানী, ওজনদার, এই সব পাঁচমিশেলি লোকের সঙ্গে কারবার করতে ভারি বিশ্রী লাগে আমার। ওরা যাচ্ছেতাইভাবে আমায় ঠকাবেই ঠকাবে — হয় ওজনে মারবে, আর নয়তো ভাঙানির খুচরোয় কম দেবে। আমার ধারণা, তুমি কাজটা আমার চেয়ে ভালো পারবে।'

হতভম্ব ভাবটা কাটানোর, এমন কি ভদ্রতাসূচক আপত্তি জানানোর সময়টুকুও না-দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন উনি। ভ্যালা ঝামেলায় পড়লাম তো! ভাবলাম, কিন্তু এর শেষটা দাঁড়াবে কী রকম? যে-মামুলি জায়গাটা থেকে জীবনের যতকিছু ধাঁধার উত্তর মেলে সেই মাথার পেছনটা চুলকে নিলাম একবার। তারপর শুরু হল ভাবনার জাবর কাটা: কে জানে! জেল থেকে সোজা বেরুতে-না-বেরুতেই একেবারে রুটি আর চিনি কেনার ভার! এটা আমায় পরীক্ষা করার জন্যে নাকি? কিংবা এ একরকম ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা নয়তো? শেষপর্যন্ত ধারণা হল, মাকারেঙ্কো নিশ্চয়ই ছিটগ্রস্ত। তা না-হলে আমার মতো লোককে কেউ বিশ্বাস করে এ-কাজের ভার দেয়।

যা-যা দরকার ছিল সব মালপত্র নিয়ে সেই ছাদখোলা ঘোড়ার গাড়িটায় এনে রাখলাম। গাড়ি মানে আর কিছুই নয়, রেলগাড়ির কামরার নিচে যে-স্প্রিং ব্যবহার করা হয় তারই ওপর বসানো অদ্ভুতদর্শন একটা জরাজীর্ণ কলবিশেষ। মাকারেঙ্কোও এসে পড়লেন তখনই। তাঁর দেয়া কাজ সমাধা হয়েছে দেখে আমায় ঘোড়া জুতে গাড়ি ছাড়তে বললেন।

কখনও রাশ আলগা দিয়ে, কখনও টেনে, চাবুক হাঁকড়িয়ে, চ্যাঁচামেচি করে আর জিভ দিয়ে নানারকম আওয়াজ তুলে ৩৬-বছর ধরে কুড়েমি করায় অভ্যস্ত সেই ঘোড়াসদৃশ প্রাণীটিকে তো কোনোরকমে নড়ানো গেল। কিন্তু জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের বাড়িটা ছেড়ে সবে শ-দুই মিটার মাত্র এগিয়েছি এমন সময় মাকারেঙ্কো আবার আমায় থামতে বললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে যা বললেন তার মর্মার্থ এই:

‘ওহো, আমি তোমায় বলতে ভুলেছি। এই মালগুলো

গস্ত করার ব্যাপারে একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। ওরা আমাদের দুটো আস্ত পাঁউরুটি বেশি দিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্মী ছেলে, ও-দুটো একটু ফেরত দাও গিয়ে, কেমন? নইলে দোকানীরা পরে মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে। আমি তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করি, কেমন?'

লজ্জায় আমার কানদুটো উঠল ঝাঁ-ঝাঁ করে, মুখটা লাল হয়ে উঠল। যাই হোক, গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে খড়ের তলা থেকে লক্ষ্মীছাড়া পাঁউরুটি দুটো টেনে বের করলাম, তারপর হাঁটা শুরু করলাম দোকানের দিকে। মনে-মনে ভাবছি তখন: এ কেমনধারা লোক? নিজেই তখন বললেন, দোকানীরা ওঁকে ঠকায়। তাই ভাবলাম, এর ভালোরকম শোধ তোলা যায় কীভাবে, তা-ই করতে হবে। দু-খানা তো পাঁউরুটি মাত্তর, তা উনি এখন বলছেন কিনা, 'লক্ষ্মী ছেলে, ওগুলো ফেরত দিয়ে এস দিকি'। বাঃ!

পাঁউরুটিদুটো ফেরত দিতে দোকানীরা মহা খুশি। একজন বললে, 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ, ছেলে। আচ্ছা, এস তাইলি। তোমার সাথে দেখা হল্য, ভারি ভালো লাগল্য...'

কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দ্রুত দোকান ছেড়ে চলে এলাম।

গাড়িতে উঠে বসার পর মাকারেঙ্কো আমার দিকে হাতের মুঠো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাজা সূর্যমুখী বীজ আর বাদাম চলবে নাকি? আমার তো দারুণ লাগে।'

রুটির কথা আর ঘুণাক্ষরেও তুললেন না উনি।

পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, ভুলভাবে যাকে আমি ন্যায্য প্রতিশোধগ্রহণ বলে মনে করেছিলাম আমার সেই কাজের নিজস্ব পুনর্মূল্যায়নে পাছে ব্যাঘাত ঘটে, স্পষ্টত এই সব কারণেই উনি উপরোক্ত আনাড়ির মতো ব্যবহার থেকে বিরত

থাকলেন। আমাকেও দূরে ঠেলে দিলেন না। সেদিন উনি যদি আমায় ধমকাতে শুরু করতেন, তাহলে আমরা দু-জনে মিলে শেষপর্যন্ত কলোনিতে পৌঁছতাম কিনা সন্দেহ।

রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের ওপর প্রভাববিস্তার করার সময় মাকারেঙ্কো কত-যে বিচিত্র সব পদ্ধতি কাজে লাগাতেন তার ইয়ত্তা নেই। আর প্রতিবার লোক বুঝে তিনি আচরণের কৌশল পালটাতেন, প্রতিবারই তাঁর আচরণ হোত নতুন ধরনের, কখনও দু-বার একই রকম ব্যবহার করতেন না।

আমার এখনও মনে পড়ে কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে তাদেরই নিয়ে মদ-চোলাই নিবারণী বাহিনী গড়ে উঠেছিল যারা নিজেরা এক-আধটুকু মদ গেলা পছন্দ করত আর তা করতে গিয়ে ধরা পড়ত প্রায়ই। আর রাস্তাঘাটে রাহাজানি ঠেকানোর জন্যে যে-বিশেষ নৈশ রক্ষীবাহিনী তৈরি হয়েছিল তার সদস্যরা নিজেরাই ডাকাতির অপরাধে কলোনিতে প্রেরিত হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থা আমাদের তখন হতবুদ্ধি করে দিত। এর বহুবছর পর আমরা বুঝেছিলাম, একজন বুদ্ধিমান ও মানুষের মন বুঝে চলতে ওস্তাদ লোকের পক্ষে এটা কতখানি আস্থা জ্ঞাপনের নিদর্শন ছিল। আর আমাদের প্রতি অতখানি আস্থা রাখার ফলে আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যে-শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণগুলি সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাদের জাগিয়ে তুলেছিলেন মাকারেঙ্কো। আমাদের নিজেদের পূর্বকৃত যতসব অপরাধের কথা ভুলে এবং স্বভাবচরিত্রে বাহ্যত সত্যিকার কোনো উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই আমরা-যে শুধু অন্যদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে সমালোচনার মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলাম তাই নয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও সক্রিয়ভাবে

তার বিরোধিতা করতেও শুরু করেছিলাম। আর আমাদের এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আমাদের বয়স্ক বন্ধু ও শিক্ষক স্বয়ং।

আমাদের প্রত্যেককে সেই যৌথ জীবনের বেষ্টনীর মধ্যে যৌথ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি গড়েপিটে ঢালাই করে নিচ্ছিলেন শ্রমের মধ্যে দিয়ে ও সেইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত উদাহরণ, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে দিয়েও। সকলেই আমরা তখন ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম অন্ততপক্ষে কোনো একটা দিক থেকেও মাকারেঙ্কোর মতো হতে — তা সে গলার আওয়াজ, হাতের লেখা, হাঁটাচলার ভঙ্গি, কাজ সম্পর্কে মনোভাব কিংবা রসিকতার বোধ যা-ই হোক না কেন।

একদিন সকালে দেখি কী, একপাল মেয়ে ছুটে মাকারেঙ্কোর অফিসে ঢুকে পড়ে হুড়মুড় করে একসঙ্গে, একে অন্যকে বাধা দিয়ে, কথা বলতে শুরু করে দিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে মেরে ফেললেও তারা আর কলোনির উঠোনে পা দেবে না।

'সব্বদা আমরা এজমালি ঘরগুলোয় বন্ধ হয়ি থাকব্য, খাবার ঘরে যাব্য না পেয্যন্ত। কিছুতি যাব্য না।'

'কেন? কেন? হল কী?' মাকারেঙ্কো শুধোলেন।

'ভাসিয়া গুত্ ঘোড়সওয়ার রঙরুটদের মতেন যা মুখখিস্তি দিতেছে তা যাই কী করো?'

'সে কী? এখনও মুখখারাপ করে নাকি ও?'

'তাইলি আর কতিছি কী! ওয়ার মুখ বন্ধ করা যায় কেমনে কন দেখি?'

মেয়েদের এই নালিশের সময় আমিও সামনে উপস্থিত ছিলাম। কথাটা শুনে আমি একটু লজ্জিতই হয়ে পড়লাম,

কেননা যদিও আমি গুত্‌কে যখন-তখন মুখখারাপ করতে শুনেছি তবু কখনও ওকে থামাবার চেষ্টা করি নি।

মাকারেঙ্কো বললেন, 'ঠিক আছে, মেয়েরা, এখন তাহলে যাও।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ভাসিয়াকে ভালোরকম জব্দ করতে হবে তবে যদি ওর মুখখারাপের অভ্যেস বন্ধ হয়। আচ্ছা, ওকে একবার ডাক দেখি...'

ভাসিয়া গুত্‌ চোরের মতো এসে মাকারেঙ্কোর অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়াল। এ-প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে গেল। সে-সময়ে কলোনিতে কাউকে যদি বলা হোত যে 'আন্তন' তাকে ডাকছেন তাহলে সে বুঝত যে নিশ্চয়ই সাধারণ দৈনন্দিন কোনো কাজে তার ডাক পড়েছে, কিন্তু যদি কাউকে বলা হোত যে 'অফিস'এ তার ডাক পড়েছে তাহলে সে বুঝত যে নিশ্চয়ই তার কোনো কাজের কৈফিয়ত দেবার জন্যে তাকে তলব করা হয়েছে।

আমি যখন গিয়ে গুত্‌কে ডাকলাম, তখন তাকে তলব করলাম এই 'অফিস'এ আসার জন্যেই।

শুনে গুত্‌ শুধোল, 'ক্যানে? কী দরকার?'

'ওখেনে গেলিই জানতি পারবি।'

বিচলিত গুতের সম্মুখীন হয়ে মাকারেঙ্কো ভয়ের উদ্রেককর হিস্‌হিস আওয়াজ তুলে এই প্রশ্নটি ছুড়লেন: 'দেখা যাচ্ছে, আমাদের চমৎকার রুশ ভাষাটার বারোটা বাজানোর কাজ এখনও বন্ধ কর নি তুমি, তাই না? এত নিচে নেমে গেছ যে মেয়েদের সামনেও মুখখারাপ করতে বাধছে না তোমার! আর কী, এবার দেখছি আমাকেই মুখখিস্তি করবে! না! কিছুতেই আমি এটা হতে দেব না! দ্যাখো দেখি, কীভাবে দাঁড়িয়ে আছ তা-ই একবার তাকিয়ে দ্যাখো! চলে এস! আমার সঙ্গে জঙ্গলে চল, মুখখিস্তি করা

কাকে বলে সেখানে তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব একবার! জীবনে তা তুমি ভুলবে না, খুদে ছারপোকা কোথাকার! চলে এস বলছি, চল আমার সঙ্গে!'

'কনে যাতিছি আমরা?' মিনমিন করে একবার শুধোল ভাসিয়া গুত্।

'জঙ্গলে যাচ্ছি, আবার কোথায়!'

এই পর্যন্ত কথাবার্তা হবার পর দু'জনে জঙ্গলমুখো রওনা দিলেন। মাকারেঙ্কো যেতে লাগলেন সামনে-সামনে আর গুত্ তাঁর পেছন-পেছন। কলোনি ছাড়িয়ে প্রায় আধ-কিলোমিটারটাক যাবার পর বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে মাকারেঙ্কো থামলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, এইবার মুখখিস্তি শুরু কর! মুখে যা আসে তা-ই বলতে থাক এবার!'

'কিন্তু বলত্যেছি তো, আর আমি এমন কাজ করব্য না। আমারে আর যা-খুশি শাস্তি দ্যান আপনে।'

'কই, আমি তো তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি না। আমি তোমাকে মুখখিস্তির মনোমতো জায়গা খুঁজে দিয়েছি মাত্তর। এখন যত ইচ্ছে মুখখারাপ করে যাও! এই নাও আমার হাতঘড়ি। এখন বারোটা বাজছে। সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত সময় পেলে প্রাণ ভরে মুখখিস্তি করার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছ বলে মনে হবে তো?.. তাহলে চালিয়ে যাও দেখি!'

বলে মাকারেঙ্কো চলে এলেন।

এরপর ভাসিয়া সত্যিই ওইদিন আর মুখখিস্তি করেছিল কিনা তা যে-কারও অনুমানের বিষয়। হয়তো জায়গাটা ছেড়ে সে আগেই চলে আসার ঝুঁকি নিয়ে ফেলত, যদি-না হাতঘড়িটা তাকে বাধা দিত। ঘড়িটা যেন ওকে জায়গাটায় বেঁধে ফেলেছিল।

ঘড়ি ধরে ঠিক সন্ধে ছ'টার সময় ভাসিয়া এসে হাজির হল মাকারেঙ্কোর অফিস-ঘরে। ঘরে ঢুকে বলল: 'ছয়ডা বেজ্যেছে। আপনের হাতঘড়িডা নেন দেখি।'

'তাহলে? কত বছরের জন্যে অগ্রিম মুখখিস্তি করে এলে?' মাকারেঙ্কো শুধোলেন।

'পঞ্চাশ বছরের জন্যি,' হড়বড় করে বলে ফেলল গুত্।

কথাটা আশ্চর্য শোনালেও এটা সত্যি ঘটনা যে ওইদিনের পর গুতের মুখখারাপ করার অভ্যাস চিরতরে দূর হয়ে গিয়েছিল। আর শুধু গুতের নয় বদভ্যাসটা দূরে হয়ে গিয়েছিল সকলেরই...

মাকারেঙ্কোর নিজস্ব অফিস-ঘরটি সর্বদাই ভিড়াক্রান্ত থাকত। কলোনির বাসিন্দারা কেবল-যে প্রতিষ্ঠানের যৌথ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যেই সেখানে যেত তা নয়, নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আলাপ করতে যেত তারা। আর এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলার মতো সময় খুঁজে পেতেন মাকারেঙ্কো। কখনও-কখনও কথা বলতেন তিনি গম্ভীরভাবে, সাগ্রহ আন্তরিকতার সঙ্গে, আবার কখনও-বা তাঁর কৌতুকভরা একটিমাত্র মন্তব্য আলাপরত দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মত-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট হোত। আমার নিজেরও এ-রকম অভিজ্ঞতা আছে। ১৯২২ সালে আমি গভীরভাবে ওল্গা নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। নিজের বাবা থাকলে যেমন বলতাম তেমনই প্রথম যে-ব্যক্তিটির কাছে আমি আমার মনের কথা খুলে বলি, তিনি হলেন আন্তন সেমিওনভিচ। উনি আমার সব কথা শুনলেন, তারপর টেবিলের ওধারে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুই কাঁধে ওঁর দুটি হাত রেখে খুব

আস্তে, আবেগভরে বললেন, 'ধন্যবাদ, সেমিওন। তুমি আমায় কী-যে আনন্দ দিলে, কী বলি। ধন্যবাদ!'

'আনন্দ কেন, আন্তন সেমিওনভিচ?'

'প্রথম কথা, তুমি আমায় বিশ্বাস করেছ বলে।'

অবশ্য এর পরে, ১৯২৪ সালে, ছুটি কাটাতে আমি যখন কলোনিতে এলাম তখন জানতে পারলাম যে ওল্‌গা আমায় ছেড়ে গেছে, ও অপর একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। যে-গ্রামে ওল্‌গা থাকত তিন কিলোমিটার পথ ভেঙে সেই গ্রামে দৌড়লাম। গিয়ে দেখলাম, কথাটা সত্যি।

বেশ রাত করে সেদিন কলোনিতে ফিরে আন্তন সেমিওনভিচের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার শরীর-মনের তখন যা অবস্থা!

'কী ব্যাপার, সেমিওন? অসুস্থ নাকি?'

'জানি না। বোধহয় অসুস্থই।'

'যাও, শোবার ঘরে যাও। তোমায় দেখার জন্যে এলিজাভেতা ফিওদরভ্‌নাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কোনো দরকার নেই। কোনো এলিজাভেতা ফিওদরভ্‌নার সাধ্যি নেই আমায় সাহায্য করেন। ওল্‌গা আমায় ছেড়ে গেছে। ও বিয়ে করছে। সামনের রবিবার বিয়ে... ওইসব মেয়ে আমাদের, কলোনির বাসিন্দাদের, বিশ্বাস করে না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সব শেষ। আমি ভেবেছিলাম এ বুঝি সারা জীবন টিকবে। কিন্তু...'

এই পর্যন্ত বলেই কাঁদতে শুরু করলাম।

'কিছু মনে কোরো না, সেমিওন, কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই তো মাত্র তিন মাস আগে ওল্‌গার

সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও বলেছি ওর সঙ্গে। ও তো তোমাকেই ভালোবাসে। না-না, কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে।'

'কিছ্ছু গোলমাল নেই, বিয়ে একদম পাকা। আমার ওপর রাগ করবেন না, আন্তন সেমিওনভিচ, ভাববেন না আমি এমনি কথার কথা বলছি... আমি গলায় দড়ি দেবই!'

'উহ্, তোমার কি মাথা খারাপ হল, সেমিওন?'

'না, মাথা খারাপ হয় নি। কিন্তু আর বাঁচব কী জন্যে বলতে পারেন?'

'যাও তাহলে গলায় দড়ি দাও গিয়ে! নিকুচি করেছে, নাকে-কাঁদা কন্যে-মাছি কোথাকার! তবে আমার একটা উপকার কর — গলায় দড়িটা কলোনি থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দাও দেখি, যেন তোমার ওই বিরহরোগে-ভোগা দেহের দুর্গন্ধ আমাদের নাকে না-পেঁছয়। বুঝলে?'

ক্রুদ্ধভাবে টেবিলের ওপর কী-একটা জিনিস যেন সরালেন মাকারেঙ্কো। তাঁর কথার তাৎক্ষণিক ফল হল এই যে গলায় দড়ি দেবার ইচ্ছেটা আমার উবে গেল।

আন্তন সেমিওনভিচের ছিল মহৎ মানবিক গুণাবলী। মস্ত বড় মনের অধিকারী ছিলেন তিনি, অনেক কিছু শেখার ছিল তাঁর কাছ থেকে।

আন্তন মাকারেঙ্কো প্রায়ই বলতেন, 'মানুষের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার — সে হবে এমন একজন মানুষ যার 'ম'-অক্ষরটা লেখা হবে বড়-বড় করে, তাকে হতে হবে সত্যিকার মানুষ।' নিজেই মাকারেঙ্কো ছিলেন এই বৈশিষ্ট্যের স্ফুটতম রূপের অধিকারী, আর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর দায়িত্বাধীন ছেলেমেয়েরা যাতে আয়ত্ত করতে পারে তার জন্যেও যথাসাধ্য করতেন।

কোনো একবার সূর্যকরোজ্জ্বল এক বসন্তে শৈশবের তিক্ত স্মৃতি কী করে যেন আমার মনের মধ্যে চাগিয়ে উঠেছিল আর হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ভারি মনকেমন করতে লাগল আমার। হঠাৎ একদিন আমার মনের চোখে ভেসে উঠল মায়ের সদয় শান্ত মুখখানা। খেতখামারে কঠিন পরিশ্রমের ফলে জীর্ণ সেই মুখখানি। মনে হল, এখন তাঁকে কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে! কতকাল, পাঁচ বছর তাঁকে চোখে দেখি নি... হ্যাঁ, আমি মাকারেঙ্কোর কাছে গিয়ে বলব। আমাকে যেতেই হবে!

'অল্প ক'দিনির জন্যি আমারে বাড়ি যেতে দ্যান।'

'ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। ও, তাহলে মায়ের জন্যে তোমার মনকেমন করছে, কেমন? চমৎকার! খুব ভালো!'

'না-না! মায়ের জন্যি মনকেমন করতেছে এটা ভাবতেছেন কেন? বাবার জন্যি আরও বেশি মনকেমন করতেছে আমার... না, সত্য কথা বলতে কী, বাড়ি যাবার জন্যি মন টানতেছে আমার।'

'সেমিওন!' একটু জোর দিয়ে গম্ভীরভাবে কথাটা বলে মাকারেঙ্কো এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে ভেতরে-ভেতরে কেমন দুর্বল বোধ করলাম। ইচ্ছে হল দু'হাতে ওঁর গলাটা জড়িয়ে ধরে ওঁকে আলিঙ্গন দিই আর কেঁদে ফেলি। মাকারেঙ্কো বলে চললেন, 'সেমিওন! মা-কে ভালোবাস বলে লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সত্যিকার মানুষ হলেই তবে লোকে মা-কে ভালোবাসতে পারে। সত্যিকার শক্ত ধাতের মানুষ হলে তবে। আমিও আমার মাকে ভারি ভালোবাসি। তোমাকে যাতে ছুটি দেয়া হয় আমি তা দেখব। তুমি দলপতি কিনা, তাই দলপতি-পরিষদের অনুমতি ছাড়া

আমি তোমাকে ছুটি দিতে পারি না। তবে তোমার ছুটির দরখাস্ত আমি সমর্থন করব নিশ্চয়ই!'

'ধন্যবাদ!'

দলপতি-পরিষদের পরের সভা বসলে কোলিয়া শেশর্নিওভ তার খোলা হাঁটুর ওপর আমার দরখাস্তের কাগজখানা চেপে ধরে সেটাকে সমান করতে-করতে দরখাস্তের বক্তব্যটা সবাইকে পড়ে শোনাল। বলল:

'দলপতি কমরেডসব, ব্যাপার হল্য গে এই যে আমাদের সেমিওন সামনের শনিবার পর্যন্ত ছুটি চায় ওর গাঁয়ে স্তরজিভোয়েতে যাবে বলে, বোঝলে! বাপ-মায়েরে একবার দেখতি চায় ও। তা, এবিষয়ে প্রেথম কে কথা বলতি চায়?'

কিন্তু গ্রিশা সুপ্রুন এ-কথায় আপত্তি জানাল। বলল, 'এয়া নিয়ি আলোচনা করার আবার আছে কী? সেমিওন হল্য গিয়ি আমাদের প্রেথম দলপতি, আমাদেরই একজনা সে, শিগ্গিরি ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার জন্যি সে পড়াশোনা শুরু করতি যাচ্ছে... আমার মনে হয় ওরে ছুটি মঞ্জুর করা উচিত।'

'আর কেউ এ-নিয়ি কিছু বলতি চায়? কেউ বলতি চায় না? তাইলে তো ব্যাপারটার মধ্যি ঘোরপ্যাঁচ কিছু নাই। বেশ, তাইলে এবার ভোট নেয়া যাক।'

সবাই প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিল। এরপর আমার হাতে একখানা কাগজ ধরিয়ে দেয়া হল। তাতে লেখা:

গোর্কি কলোনির বাসিন্দা সেমিওন কালাবালিনকে এই শংসাপত্রখানি দেয়া হইল এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ যে

কলোনির দলপতি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাকে ১৯২২ সালের ২২ মে, সোমবার হইতে ১৯২২ সালের

২৭ মে, শনিবার দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চুতোভ জেলার স্তরাজিভোয়ে গ্রামে ছুটি কাটানোর অনুমতি দেয়া হইতেছে।

কলোনির ডাইরেক্টর:

আন্তন মাকারেঙ্কো

দলাতি-পরিষদের সেক্রেটারি:

নিকলাই শের্নিওভ

বাড়ি যাবার পথে প্রথম মাইলখানেক পথ কলোনির অন্য ছেলেপিলেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর আরামে ছুটি উপভোগের শুভেচ্ছা জানিয়ে দৌড়ে বাড়ির পথ ধরল।

ওইদিন সন্ধে ছ'টার সময় বিশ মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে আমি প্রায়-ভুলে-যাওয়া আমার জন্মস্থান গ্রামখানায় এসে পেঁছিলাম।

দেখলাম সেই ব্রিজ আর গির্জে ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় গাঁয়ের কিছু-কিছু লোক আমায় চিনতেও পারল।

বাবলা-ডালের বেড়ার ওধার থেকে কাকে যেন বলতেও শুনলাম একবার: 'কালাবালিনদের সবথেকে ছোট ছেল্যা এইডা, ওই যে যে-নাকি মারা পড়েছ্যে বলি ওয়াদের ধারণা হয়্যেছেল!'

আরে, ওই তো আমাদের বাড়ি! ওই তো মা!.. উনি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেন...

'মা! মাগো!'

মা-কে জড়িয়ে ধরে নোন্‌তা চোখের জলে-ভাসা তাঁর গালে চুমো দিলাম। মা-র চোখে তখন আনন্দাশ্রুর প্লাবন নেমেছে। বললাম, 'মাগো!'

মনে হল, দিনগুলো যেন পাগলা হয়ে গেছে! তারা দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই! দেখতে-দেখতে পরদিন, মঙ্গলবার, এসে গেল, তারপর সন্ধে হতে-না-হতেই এসে গেল বুধবার। এক-মুহূর্তের জন্যেও অবশ্য ভুলি নি যে আমি ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র, আমার আসল জায়গা হচ্ছে কলোনি, আমাদের সেই যৌথ জীবন। আবার বাড়িতে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে ও আমার আপন গাঁয়ে ছেলেপিলেদের মধ্যে থাকতেও ভারি স্বস্তিবোধ করছিলাম। গাঁয়ে সর্বত্র সবাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে লাগল — কম্‌সমোলের মিটিঙে, অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর নাটকের মহলায়, ইত্যাদি।

আমাদের পরিবারের সুখ, আনন্দ তখন দেখে কে? বিশেষ করে সে-সময়ে একটা বিয়ের ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছিল বাড়িতে। আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল পূর্ণোদ্যমে। সেলাই-ফোঁড়াই, জিনিসপত্র রঙ-পালিশ করা আর মেরামত করা চলছিল। প্রত্যেকের করার মতো কাজ ছিল অপর্যাপ্ত, যথেষ্ট করেও কুলিয়ে উঠতে পারছিল না সবাই; প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ভূমিকা ছিল এই বিয়ের প্রস্তুতিতে, প্রত্যেকের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। প্রতিবেশীরা ঘনঘন আসছিলেন আমাদের বাড়িতে আর পড়শি মেয়েরা এসেই মায়ের কানের কাছে কী-সব ফুসফুস-গুজগুজ করতেন আর সঙ্গে করে আনতেন নানারকমের টুকিটাকি জিনিস আর উপহার। এই আবহাওয়ায় আমিও মেতে উঠলাম, আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিয়ের প্রস্তুতির কাজে। আমারও অনেক কাজ করার ছিল; আর আমাকে কাজ করতে দেখে মা তো আমার আনন্দে আটখানা হয়ে পড়লেন। পাছে আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি এই ভয়ে মুখে কোনো কথা না-বলে আমি যেখানটায় কাজ করছি সেই দিকে ইঙ্গিতে মাথা

ঝাঁকিয়ে যেন তাঁর বন্ধুদের বলতে চাইতেন মা: দ্যাখো, দ্যাখো, ছেল্যাডা আমার কত সোন্দর, কত বড় হয়ি উঠ্যেছে!

একদিন রাত্রে খড়ে-বোঝাই গাড়িতে আমার নির্দিষ্ট বিছানাটায় শুয়ে সুখে মশগুল হয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে ঠিক তার পরদিনই হচ্ছে শনিবার, আর সেইদিনই কলোনিতে আমার ফিরে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ, পরদিনই আমায় ফিরতে হবে আর তা-ও আবার দুপুর বারোটার পরে ফিরলে চলবে না। এর অন্যথা হলেই কপালে জুটবে কড়কানি — আর সে কী যে-সে কড়কানি! ছুটি থেকে দেরি করে ফেরা বলে কথা! কিন্তু বিয়েতে উপস্থিত থাকার কী হবে? সেই দারুণ দিনটা পড়ছে শনিবারের ঠিক পরদিনই — অর্থাৎ রবিবারে! গাঁয়ের অল্পবয়সী যত ছেলেমেয়ে সবাই হাজির থাকবে বিয়ের আসরে — সেখানে নাচগান হবে, পেতলের ব্যান্ড বাজাবে ব্যান্ডপার্টি। ওইদিন থাকতে পারলে আমিও নিজের গুণপনা কিছু জাহির করতে পারতাম, কেননা যে যা-ই বলুক ওদের সব ক'টাকে নাচে হারিয়ে দেবার মুরোদ রাখি আমি। খড়ের গাড়ির বিছানা থেকে একলাফে উঠে পড়ে এবার আমি ছুটে বাড়িতে ঢুকলাম। বাবা ততক্ষণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, মা খালি জেগে ছিলেন — কিসের জন্যে যেন ময়দা না কী মাখছিলেন তিনি।

বললাম, 'মাগো, কাল ভোরবেলাতিই কিন্তু আমারে কলোনিতি ফিরে যেতি লাগবে।'

'কনে কলি? কী আবোলতাবোল বকতিছিস? তর ওসব কোনো কথা শুনতি চাই না আমি!'

'কিন্তু কলোনিতি-যে ফিরে যেতেই হবে আমারে।

আমারে শুধু ক'দিনির ছুটি দেয়া হয়্যেছে মাত্তর। মাগো, আমারে কিন্তু যেতেই হবে, বুইলে!'

কথাবার্তার আওয়াজে বাবা ইতিমধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিলেন। দাদা আর তার বন্ধুরাও এসে হাজির হয়ে গিয়েছিল। সবাই মিলে এবার চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'ঘাবড়াস নে সেমিওন, কিচ্ছুটি ক্ষেতি হব্যে না। আরে, যতই যাই হোক, এয়া বিয়ার ব্যাপার, তার নিজির দাদার বিয়া। তুই তো আর বাজে ওজর তুল্যে ছুটির মেয়াদ বাড়াত্যে যেতেছিস না।'

মা একেবারে কেঁদে পড়লেন। বললেন: 'আমি বলে ভাবত্যেছেলাম এই মচ্ছবের দিনডায় তদের সবাইরে কাছে পাব্য! এ-গাঁয়ের সব মানুষজন সেদিন একসাথে জড় হবে... কিন্তু আমার কেউ নাই, আপনজন সবারে হারায়্যেছি আমি... তাদের সবারে হারায়্যেছি!'

বাবা বললেন, 'কী বলল্যে তুমি — থাকতি পারব্যে না? তা, তাইলি তো আমাদের বিশেষ কিছু করার নাই... আর যদি কিছু করার না-থাকে, তাইলি আর করাডা কী! মনে নিতেছে তমরা সব চমৎকার ছেল্যাপিলা হয়্যি গড়্যে ওঠত্যেছ। কী দারুণা শৃঙ্খলা তমাদের ওখেনে। ঠিক আছে তাইলি, যাত্রা করার আগি কিছুডা ঘুমায়্যে লও। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতি হবে তোমারে।'

পরদিন ভোর পাঁচটা লাগাদ উঠে পড়ে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। মা তখনও কেঁদে চলেছিলেন, আর আমার সঙ্গে দেবার জন্যে বিয়ের মিষ্টির একটা পোঁটলা বাঁধতে-বাঁধতে তখনও যাওয়া থেকে আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা পাচ্ছিলেন। বাবা আমাকে চমৎকার সুগন্ধি কিছুটা তামাক দিলেন। বললেন, 'এডা নিয়ি যাও, তমার

মাকারেঙ্কোরে দিও। ওনি নিচ্চয়ই খুব সাচ্চা জ্ঞানী লোক আর দরাজ দিলের মানুষ। ওঁরে যত্ন ক্যোরো... আর ক্যোয়ো যে তামাকডা আমাদের ঘরে বানানো হয়্যেছে।'

'কিন্তু সেমিওন, তুই হয়তো থাক্যে যাতিও পারিস, তাই না?' দাদা এমনি নেহাত কথার কথা হিসেবে বলল, যদিও আমার থাকা সম্বন্ধে সকল আশায় ও ইতিমধ্যেই জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছিল।

বললাম, 'না, আন্দ্রেই, আমার থাকার উপায় নাই। এটা হল্য গিয়ি নির্দেশের ব্যাপার। আমি নিজিই এয়ার পক্ষি ভোট দিছি। আচ্ছা, চলি তাইলে, বিদায়!'

বেলা ঠিক এগারোটার সময় আমি দৌড়ে গিয়ে কলোনির উঠোনে ঢুকলাম।

'সেমিওন এয়্যেছে, সেমিওন এয়্যেছে,' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে কলোনি-এলাকার নানা দিক থেকে ছেলেমেয়েরা আমার কাছে ছুটে এল।

'এই-যে সেমিওন! আন্তনের সাথে দেখা কর্যেচিস? তারপর, খবর কী সব?'

'নে, ধর্। খায়্যে দ্যাখ দিকি কেমন লাগে!' বলে উপস্থিত কারও একজনের হাতে আমার-আনা খাবারগুলো ধরিয়ে দিয়ে আমি মাকারেঙ্কোর অফিসে ছুটলাম।

'সুপ্রভাত!'

'আরে, সেমিওন-যে!' বলে মাকারেঙ্কো চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। এমন করে পরস্পরকে আমরা আলিঙ্গনে বাঁধলাম যেন কত বছর আমাদের মধ্যে দেখা হয় নি। বাবার উপহার-দেয়া তামাকটুকু এবার ওঁর হাতে তুলে দিলাম।

'বোসো। বাড়ির খবর সব বল, শুনি।'

'বলার আর কী আছে?'

'না-না, সবকিছু শুনতে চাই! বাড়িতে সকলের কাজকর্ম চলছে কেমন? গাঁয়েরই-বা খবর কী? গাঁ-ঘরে সবাই আছেন কেমন?'

'বাড়ির সকলের চলত্যেছে কেমন? তা, ভালোই তো চলত্যেছে। আমার বাবারে একখান কুঁড়্যে আর পাঁচ দেসিয়াতিনা* জমি দেয়া হয়্যেছে... গাঁয়ের সক্কলে জমি পায়্যেছে! প্রেত্যেকেরে জমিদারের জমি থেক্যে এট্টা টুকরা, এট্টা গোরু আর এট্টা করি ঘোড়া দেয়া হয়েছে।'

'খুব ভালো কথা। তোমার তামাকটার আস্বাদও তো বেশ ভালো দেখছি!'

'সত্য কথা, ওয়াদের দিন চমৎকার কাটতেছে। দানা-সফলের খেতগুলা একবারে সমুদ্দুরের মতন, তার আদিঅন্ত চোখে পড়্যে না। লোকে দিব্যি সুখেস্বচ্ছন্দে আছে আর অল্পবয়েসী ছেল্যামেয়্যাদের মধ্যি প্রায় সকলেই তো কম্‌সমোলের সদস্য বন্যে গেছে। ছেল্যামেয়্যারা এট্টা লাইব্রেরি চালু করি দেছে, নাটকের অভিনয় করতি লেগ্যেছে, এইসব আর-কি। সবই ভারি চমৎকার চলত্যেছে!'

'শুনে ভারি ভালো লাগল! তা, তোমার বাবা-মা আছেন কেমন?'

'দেখলি মনে হয় তাঁদের বয়েস কম্যে গেছে। গতকাল তো তাঁরা আমারে পাড়্যে ফেল্যেছেলেন প্রায়। কিছুতি আমারে ছাড়তি চান না, এই হল্য গিয়ি ব্যাপার!'

---

* দেসিয়াতিনা — রাশিয়ায় পূর্বে ব্যবহৃত জমির আয়তনের পরিমাপ। — সম্পাঃ

'কেন? দানা-ফসলের বীজ বোনার জন্যে তাঁরা তোমাকে থেকে যেতে বলছিলেন নাকি?'

'না-না, ওয়া নিয়ি কোনো কথাই হয় নাই। এট্টা বিয়ার জন্যি তাঁরা বলতিছেলেন আমারে থাক্যে যেতে।'

'বিয়ের জন্যে? ওঁরা তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন নাকি?'

'আমার না আরকিছ্ন! আমার দাদার বিয়া। বিয়া হতি যাচ্ছে আসচে কাল।'

'ও, তাই বল, তোমার দাদার বিয়ে। তা, তুমি বিয়েতে না-থেকে চলে এলে?'

'কিন্তু আমি থাকতাম কী প্রেকারে, কন?'

'আরে, সেমিওন, এস্যে গেছিস তুই!' বলতে-বলতে এমন সময়ে দরজার ওধার থেকে উ'কি দিল হাসিখ্নশিতে-ভরা কোলিয়া শেশ্‌র্নিওভ। ফের বলল, 'দে, দে, তর সার্টিফিকিটটা দে। নইলে আমি কিন্তু তরে 'লেট প্রেজেণ্ট' করতি বাধ্য হব্য।'

নিখ্ংতভাবে পাট-করা আমার সার্টিফিকেটখানা কোলিয়ার হাতে তুলে দিলাম।

হঠাৎ মাকারেঙ্কো শেশ্‌র্নিওভকে হে'কে বললেন, 'কোলিয়া, এখ্ননি একবার দলপতি-পরিষদের সভা ডাক দেখি!'

মিনিট-তিনেকের মধ্যে দলপতিরা সবাই এসে হাজির হয়ে গেল।

মাকারেঙ্কো তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'দলপতি কমরেড-সব, কাজ থেকে তোমাদের ডেকে আনার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু যে-জন্যে ডেকেছি সেটাও অত্যন্ত জরনুরি ব্যাপার। আমি তোমাদের ডাকিয়ে এনেছি এই

কথাটা জানতে যে তোমরা সেমিওনের ছুটিটা আসচে সোমবার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি আছ কিনা। আসলে, ওর দাদার বিয়ে হচ্ছে। আসচে কাল সেই বিয়ের তারিখ।'

'খুব জরুরি ব্যাপার,' মাঝ থেকে ফোড়ন কাটল মারুসিয়া তেরেশ্‌চেঙ্কো।

আমি অনুনয় করে বললাম, 'না-না, তদেরে এ-নিয়ি মাথা ঘামাতি লাগব্যে না। ব্যাপারটা নিয়ি এত হৈ-চৈ করার কিছু নাই। আমারে ছাড়াও ওরা দিব্যি কাজ চালায়্যে দেবে-নে। আমার মনে হয় না...'

'কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা পাস না, সেমিওন। তুই তো সেখেনে যেতি চাস, না কী!' অন্য দলপতিরা গর্জে উঠল একসঙ্গে।

এবার ডেস্কের ওপর পেন্সিলের ঠোকা দিয়ে আওয়াজ করে মাকারেঙ্কো বললেন, 'গোলমাল বন্ধ কর। শোনো, সেমিওন, আমরা এটা করতে যাচ্ছি তোমার জন্যে নয়, তোমার মায়ের জন্যে, বুঝলে! তাঁকে আমরা সবচেয়ে বড় সুখ যা দিতে পারি তা সম্ভবত এই... আমারও মা আছেন, এদেরও সকলের মা আছেন,' বলতে-বলতে মাকারেঙ্কো তাঁর সামনে জড়-হওয়া ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাতখানা অনেকখানি আন্দোলিত করলেন।

শের্গিওভ এইবার ঘোষণা করে দিল, 'তাইলে আমাদের পক্ষ থেক্যে সেমিওনরে জানায়্যে দেয়া যাক যে সামনের সোমবার পর্যন্ত ওরে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া গেল!'

'ঠিক আছে!' অন্য দলপতিরাও প্রতিধ্বনি তুলল এ-মতের।

আমি জবাব দিলাম, 'আমিও বলি, ঠিক আছে। তবে

আমি আরও একজন দলপতিরে সাথে করো আমার বাড়িতি নিয়ি যেতি চাই — তার জন্যি অনুমতি চাচ্ছি।'

'দল বেঁধ্যে আমরা সবাই যেতি পারি নে?' রিন্‌রিনে গলায় শুধোল তোস্‌কা সলভিয়েভ।

ফ্রসিয়া ক্রাভ্‌ত্‌সোভা শুধোল, 'বিয়াটা এখেনে, এই কলোনিতি আমরা উদ্‌যাপন করতি পারি নে?'

ফ্রসিয়ার কাঁধে স্নেহভরে একটা চাপড় দিয়ে মাকারেঙ্কো মন্তব্য করলেন, 'ভাবনা কী, শিগ্‌গিরই এখানে তোমাদেরই কারও-কারও বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা যাবে'খন।'

অতঃপর আমার আর সুপ্রুনের জন্যে ছুটির অনুমতিপত্র তৈরি হয়ে গেল আর আমাদের কলোনি-বাসিন্দা বন্ধুর বড় একটা দল গাঁয়ে ফেরত যাওয়ার পথে এগিয়ে দিয়ে আমাদের বিদায় জানিয়ে গেল।

অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পর পেছনে আমরা ঘোড়ার খুরের ভোঁতা খপখপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফিরে তাকাতে কলোনির ঘোড়ার গাড়িখানা আর তার সামনে-জোতা বুড়ি মারিকে আসতে দেখে আমরা তো অবাক!

হঠাৎ দেখি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছেন মাকারেঙ্কো।

'কী ব্যাপার? যাতিছেন কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'বলছি। আগে গাড়িতে ওঠ দেখি। সেমিওন, তুমি ওঠ কোচবাক্সে। আমিও ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাব বলে ঠিক করেছি, আর ভেবেছি তোমাদের বাড়ির বিয়েতে ছুটিটা কাটাব।'

'অ্যাঁ, আপনে আমাদের বাড়ি যাতিছেন? স্তরজিভোয়েতি যাতিছেন?!'

'তা যদি যাই-ই তাতে এত অবাক হবার আছে কী?

তোমরা সবাই দিব্যি মজা করে বেড়াতে যাবে আর আমি বুঝি জঙ্গলের মধ্যে আমার কুঁড়েয় সন্নিসির মতো বসে থাকব! ওঠ, গাড়িতে উঠে পড় বলছি। কী, চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে-যে বড়? হল কী তোমার?'

বললাম, 'মাথার মধ্যি সব তালগোল পাকায়্যে যাতিছে।'

'কী ব্যাপার? একমগ ভোদ্‌কা আর একখানা সরের পিঠে আমায় খেতে দিতে আপত্তি আছে নাকি তোমার?'

'কী মজা, তাইলে আমরা সবাই মিলি যেত্যেছি!' বলে এতক্ষণে পুলক-শিহরিত গলায় চেঁচিয়ে উঠে শক্ত করে ওঁর দুখানা হাত জড়িয়ে ধরলাম আমি। তারপর সুপ্রুনকে গাড়ির ভেতরের সিটে উঠে বসতে সাহায্য করে লাফিয়ে কোচবাক্সের ওপর উঠে আমার চিরাচরিত জায়গাটা দখল করে নিলাম।

এতক্ষণে ওর পরিচিত হাতে লাগামগাছ উঠেছে বুঝতে পেরে মারিও দ্রুতপায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে দৌড় শুরু করল।

এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম আমি যে ব্যাপারটা কী-যে ঘটছে তা প্রায় বুঝে উঠতে পারছিলাম না! গোটা ঘটনাটা ঠেকছিল রূপকথার গল্পের মতো, আমার চারপাশের জগৎটাকে দেখতে লাগছিল অন্যরকম, যেন নীল আর গোলাপি আলোর যাদুর আভায় ঝলমল করছিল তা। মিষ্টি রুপোলি শন্‌শনে বাতাস মনটা আমার ভরিয়ে তুলছিল আনন্দে আর গৌরবে।

আজ যখন পেছন ফিরে ওই দিনগুলোর দিকে তাকাই তখন কলোনিতে-কাটানো আমার ওই দুটো বছর খেলনা-দুরবীনের মধ্যে-দিয়ে-দেখা মনোহর রঙিন ছবির মতো খালি চমকে-চমকে যায়। অপর কোনো লোকের তরমুজ-খেতে 'হানা' দেয়ার অপরাধে মাকারেঙ্কোর নির্দেশে একবার

আমাকে প্রথম বাহিনীর দলপতির পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। আবার আরেকবার কাছাকাছি একটা গাঁয়ের এক বৃদ্ধকে আগুন-লাগা জ্বলন্ত কুঁড়ে থেকে উদ্ধার করায় মাকারেঙ্কো আমায় খুব সংক্ষেপে এই সহজ কথাগুলি বলেন: 'এই তো চাই! প্রত্যেকেরই আচরণ এরকম হওয়া উচিত!'

এছাড়া ওই জীবনে ছিল সেইসব অবিস্মরণীয় অবকাশের ঘণ্টা যখন মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আমাদের গোটা দলটা জঙ্গলে বেড়াতে যেত আর সেখানে আমরা আলোচনা করতাম আমাদের দেশের মানুষের আনন্দ-উদ্ভাসিত জীবন নিয়ে, সংস্কৃতি ও কমিউনিজম নিয়ে। অসামান্য এইসব আলাপ-আলোচনাই ছিল রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি।

আর একমাত্র এখন — যখন মাকারেঙ্কো আর আমাদের মধ্যে বর্তমান নেই — তখনই আমি উপলব্ধি করতে পারছি এই সবল-প্রবল সাহসী মানুষটি, হৃদয়তাপে-ভরা এই মহৎ মানুষটি জীবন সম্পর্কে কী উদার, ব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিই-না আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন!

ভিক্তর ফিঙক্*

অস্থিরতার সুখ

'জীবনজয়ের পথে' বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি জুটে গেল মাকারেঙ্কোর কপালে। সারা দেশ জুড়ে লোকের মুখে-মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

তাঁর এই খ্যাতি অবশ্য সাধারণ সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল না।

এটাও স্বীকার্য যে 'জীবনজয়ের পথে' বইখানিও সাধারণ কোনো সাহিত্যকর্ম ছিল না। সারা পৃথিবীতে বহুকাল ধরেই এটা সাধারণভাবে গ্রাহ্য যে একজন লেখকের কাজ হল জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা, তা নিয়ে ধ্যানে মগ্ন হওয়া, তাঁর পক্ষে যতখানি সাধ্য ততখানি গভীরভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিহিত দুনিয়ার হালচালের নিয়মগুলি অনুধাবন করা এবং অতঃপর তাঁর এইসব পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনার ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করা।

---

* ভিক্তর ফিঙক্ (১৮৮৮-১৯৭৩) — সোভিয়েত লেখক ও সাংবাদিক। — সম্পাঃ

অথচ মাকারেঙ্কোর আলোচ্য বইখানি ছিল সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অভিনব উদ্‌ভাবনার সামিল: যে-ব্যক্তি ‘জীবনজয়ের পথে’ বইখানি লিখেছিলেন তিনি-যে শুধু জীবনকে পর্যবেক্ষণই করেছিলেন তা-ই নয়, তাকে ঢেলে সাজছিলেন ও তার পুনর্নির্মাণেও হাত লাগিয়েছিলেন। এটা এমন একটা ব্যাপার যা যে-কোনো পাঠকের পক্ষেই টের না-পেয়ে উপায় ছিল না।

মাকারেঙ্কোর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটল আর প্রতিবেশী হিসেবে আমি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বাঁধা নিয়মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হবার সুযোগ পেলুম, তখন দেখলুম তাঁর এই খ্যাতি কত বড় গুরুভার সামাজিক দায়দায়িত্বের বোঝা বয়ে চলেছে।

দেশের নানা অঞ্চল থেকে আসা চিঠিপত্র মাকারেঙ্কোর কাছে পৌঁছে দিতেন ডাকপিওনরা। নানাধরনের তাজ্জব সমস্ত কারণে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলে অসংখ্য মানুষ পরামর্শ ও সান্ত্বনালাভের আশায় তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন। এঁদের মধ্যে থাকতেন ছেলেমেয়েদের সেইসব বাবা-মা, সন্তানপালনের চেষ্টায় যাঁদের ছেলেমেয়েরা বিশেষ সাড়া দিত না আর তাদের সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে তাঁরা শরণাপন্ন হতেন মাকারেঙ্কোর। থাকতেন সেইসব বিবাহিত দম্পতি — যাঁদের সংসার ভাঙবার উপক্রম হয়েছে অথচ কী করে-যে তা ঠেকানো যায় তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। আর থাকতেন সেইসব তরুণতরুণী যাঁদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটেছে কিংবা থাকতেন প্রচণ্ড হতাশাবোধে ভেঙে-পড়া যতসব বৃদ্ধবৃদ্ধা। এঁরা সবাই সাগ্রহে চিঠি লিখতেন মাকারেঙ্কোকে। পাঠকেরা বশীভূত হতেন তাঁর বইগুলির উজ্জ্বল অভিনবত্বেই শুধু নয়, গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের

পরিচয়ে, তাঁর অসাধ্যসাধনের সাফল্যে ও তাঁর সদয় প্রাজ্ঞ হৃদয়ের সংস্পর্শে এসেও।

দেশজোড়া তাঁর খ্যাতির কথা বাদ দিলেও, যে-সমস্ত লোক তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতেন তাঁরাও কোনোদিন চমৎকৃত না-হয়ে পারেন নি। মাকারেঙ্কোর জ্ঞানের প্রসার ছিল বহুব্যাপ্ত, বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস ও বস্তুত প্রায় সকল মানববিদ্যাতেই তাঁর অধিকার ছিল লক্ষণীয়।

...একদা গোর্কি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার সময় মাকারেঙ্কো বলেছিলেন:

'হ্যাঁ, গোর্কি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে সাধারণ মাপকাঠিতে মাপা চলে না! মাঝে-মাঝে আমার কী মনে হয় জানেন? শুনুন, বলি। আচ্ছা, উনিশ শতকের গোড়ার দিককার ফ্রান্সের দিকে একবার তাকান। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের যৌবনধর্মে-পূর্ণ নায়ক কাকে বলা চলে বলে আপনার ধারণা? বাল্‌জাক আর স্তঁদাল আমাদের হয়ে কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের দিয়েছেন রাস্তিন্যাক আর জুলিয়েন সোরেল-এর মতো নায়কচরিত্র। যদিও দুই বিভিন্ন ধরনের নীতিশাস্ত্র মেনে জীবন কাটিয়েছিল তারা, তবু মূলত তারা ছিল একই ছাঁচে ঢালাই-করা: দু'জনেই ছিল সাংঘাতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এটা অবশ্য স্বীকার করতেই হয় যে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যটা ছিল নিতান্ত নগণ্য, তাদের কর্মোদ্দীপনাকেও মহৎ বলা চলে না, তবু নাপলেয়ঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে তারা ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্মর শিকার। এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আমেরিকার কথা ধরা যাক — সেখানে আমরা দেখতে পাই রকফেলর, মর্গান আর ভ্যান্ডরবিল্ট-পরিবারের মাথা-ঘুরিয়ে-দেয়া বৈষয়িক ঐশ্বর্য। আগের দিন

যারা ছিল নিঃস্ব, রিক্ত, রাতারাতি তারা হয়ে দাঁড়াল লক্ষপতি বা কোটিপতি। জুতো-পালিশওয়ালা ছেলেরা পর্যন্ত সেদিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল পঞ্চাশ লক্ষ ডলার উপায় করার। আপনার কথা বলতে পারব না ওস্তাদ, কিন্তু আমি যখন ভাবি যে মানুষের আদর্শ এরকমও হতে পারে তখন আমার কেমন যেন গা গুলোতে থাকে... যাই হোক, এরপর এসেছে রাশিয়ার পালা। কিন্তু এবার দেখা গেল যে কেউই আর দিগ্বিজয়ী শাসক কিংবা টাকার কুমির হবার জন্যে মাথায় ঘাম পায়ে ফেলছে না। এরকম কিছু হবার কোনো জল্পনাকল্পনাই শোনা যাচ্ছে না এখন। এমন-যে যুগ সে-যুগে আমাদের মন অধিকার করে বসলেন গোর্কি, অর্থাৎ তার অর্থ মানবিকবাদ...'

এরপর অল্প কিছুক্ষণ থেমে মাকারেঙ্কো ফের বললেন: 'এবং বিপ্লব: সত্যি, এ না-হয়ে আর উপায় কী ছিল? মানবিকবাদ এখানে আমাদের মধ্যে — এই রুশদেশে — সম্ভব করে তোলা যেত কীভাবে একমাত্র বিপ্লব ছাড়া?'

একবার আমাদের দু'জনেরই পরিচিত কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলুম যে লোকটি বেশ শিক্ষিত।

শুনে মাকারেঙ্কো আপত্তি জানালেন। বললেন, 'অমন শিক্ষার কোনো দাম নেই। ওর মাথাটা বইয়ের আলমারির মতো। সেটা অসংখ্য বইয়ে-ঠাসা। কিন্তু তাতে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে গেছে আর বইগুলোকে যে কোন কাজে লাগানো যায় তা ও জানে না।'

শুধোলুম, 'তাই যদি বলেন তো বলি, ও কী করলে আপনি খুশি হতেন, বলুন দেখি?'

'কী করলে আমি খুশি হতুম? আমার ধারণা, কোনো লোকের মস্তিষ্ক বইয়ের আলমারির নিরেট কাঠ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থে দিয়ে যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে সে-মস্তিষ্কের পক্ষে সারাক্ষণ কাজ করে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। মানুষের মনকে সারাক্ষণ কাজ করে চলতেই হয়। সঞ্চিত জ্ঞানকে ক্রমাগতই তাকে ঝাড়াই-বাছাই করে চলতে হয়, প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ও জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমৃদ্ধ করে তুলতে হয় তাকে। মনের উচিত পুরনো-হয়ে-যাওয়া স্বীকৃত সত্যকে পরখ করে দেখা আর নতুন সত্যের সন্ধানে ফেরা। মনকে সর্বদাই আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করতে হয়, সর্বদাই চেষ্টা করতে হয় নিজের ডানায় ভর দিয়ে ওড়ার। যদি এতে ব্যর্থতা আসে, কুছ পরোয়া নেই, ব্যর্থতা তত ভয়ংকর ব্যাপার নয়। তাকে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে, ফের একবার পরীক্ষা করতে হবে ডানার ক্ষমতা। সত্যি যদি আপনি জানতে চান তো বলতে পারি, ভবিষ্যতের ভার একমাত্র এইরকম মনের লোকের হাতেই ন্যস্ত, শুধুমাত্র এদের হাতেই...

'মনে রাখবেন, আমাদের চারপাশে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রেই জয় করে নেবার মতো নতুন ভূখন্ড এখনও রয়ে গেছে, আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে তারা। কিন্তু কে তাদের আবিষ্কার করবে? আপনার ওই ন.? আসলে নতুন-নতুন সত্য আবিষ্কার করবে সেইসব মানুষ যারা দুর্জয় কল্পনাশক্তির অধিকারী। কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

তারপর নিজেই হঠাৎ হেসে উঠে ইতি টানলেন আলোচনায় এই বলে: 'যারা দূরপাল্লার চিন্তাবিৎ।'

মাকারেঙ্কো নিজেই ছিলেন ঠিক ওই ধরনের মানুষ, সত্যিকার 'দূরপাল্লার চিন্তাবিৎ'। ওই ছাঁচ-ঢালা মানুষ।

মাকারেঙ্কোকে বলা হয়, শিক্ষক-আবিষ্কর্তা। তবে আবিষ্কর্তা-শিক্ষক খেতাব দিলেই বোধহয় তাঁর সম্বন্ধে সঠিক বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত ও প্রধানত তিনি ছিলেন একজন আবিষ্কর্তা। যে-সব নতুন নিয়মকানুনের সাহায্যে জীবনকে সাজিয়েগুছিয়ে সুশৃঙ্খল করে তোলা যায়, নতুন যে-সমস্ত পথে জীবনকে পরিচালিত করলে বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে তিনি ছিলেন তাদেরই তন্নিষ্ঠ সন্ধানী।

আন্তন মাকারেঙ্কো যদি পেশায় শিক্ষক না-হতেন, যদি হতেন তিনি এঞ্জিনিয়র কিংবা আইনজীবী, তাহলেও অন্তহীন অন্বিষ্টের ব্রতগ্রহণ তাঁর জীবনে একই রকম থেকে যেত। তার ধরনধারণ, তার ছাঁদ হয়তো অন্যরকম হোত, তবু সবসত্ত্বেও তা আত্মপ্রকাশ করত নিঃসন্দেহে — কেননা যা নতুন, যা অপেক্ষাকৃত ভালো তার অন্বেষায় তাঁর অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধাই ছিল তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের অন্তঃসার।

১৯৩৭ সালের হেমন্তে মাকারেঙ্কো 'সুখ' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। ওই প্রবন্ধে লেখক সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'মানুষের দুঃখবেদনার জমাখরচের হিসাব' বলে। সাহিত্যে তিনি এমন একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যা তাঁর আগে আর কেউ লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয় না। বিষয়টা হল এই, বিশ্বের মহৎ লেখকদের কেউ কখনও সুখের বর্ণনা দেন নি। কারণ এই নয় যে আমাদের এই পাপে-ভরা পৃথিবীতে সুখের চেয়ে শোক-দুঃখের পরিমাণ বেশি। এর আসল কারণ, আলোচ্য বস্তুর সাহিত্য-প্রযুক্তিগত গুণ। মাকারেঙ্কো বললেন, মানুষের

সুখ যে সাহিত্যে আলোচনার পক্ষে কখনও বিশেষ কাজের হয় নি তার কারণ ওই সুখ ছিল তুচ্ছ বস্তু। সাধারণত তা ছিল নিছক ব্যক্তিগত সুখ, আর তাসখেলায় বাজি জেতার মতো প্রায়শই ছিল তা দৈবাৎ-লভ্য। সাহিত্যে একে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না এই জন্যে যে এ-সুখ এ-পর্যন্ত কাউকে স্পর্শ করে নি, কেউ এ-নিয়ে মাথা ঘামায় নি। দুঃখ-শোকই একমাত্র নায়ককে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছে — কারণ, শোক হল সার্বিক ব্যাপার। পরিশেষে মাকারেঙ্কো এই মত প্রকাশ করলেন যে ব্যক্তিগত সুখ একমাত্র তখনই সাহিত্যের মঞ্চ অধিকার করবে যখন তা আর দৈবক্রমে-প্রাপ্য বস্তু হয়ে থাকবে না এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচার যখন সে-সুখের প্রতিবন্ধক হবে না।

প্রবন্ধটি আমি প্রথম পড়ি পারি'তে থাকতে। মুখে-মুখে তর্জমা করে তখনই সেটি পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক পুরনো সতীর্থ, এক ফরাসি ভদ্রলোককে শোনাই।

শুনে তিনি বললেন, 'ধুত্তোর, তোমরা এমন অস্থির মানুষ যে কী বলি! আচ্ছা, আমাদের এই বুড়ি পৃথিবীটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই থাকতে চাইলে তাতে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বল তো? তোমাদের কি সবকিছুরই ভিত নড়িয়ে দিতে হবে, এমন কি সাহিত্যের খাম্বাগুলো পর্যন্ত?'

মাকারেঙ্কোর বক্তব্যের সমর্থনে বলতে শুরু করলে তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'থাক, হয়েছে! তোমাকে আর প্রমাণ করতে হবে না! উনি ঠিক কথাই বলেছেন! একেবারে খাঁটি কথা! আমি নিজেই তা ধরতে পারছি। তবু... ব্যাপারখানা ভাবো একবার। আমরা এতকাল বিশ্বাস করে এসেছি যে আমাদের

দেবদেবীরা সব মার্বেল-পাথরে তৈরি, তাঁরা শাশ্বত। আর উনি কিনা এসেই দিলেন এক ঘা — ব্যস, শাশ্বত দেবদেবীরা দড়াম করে আছড়ে পরে মাটির ঢেলার মতোই ভেঙে হয়ে গেলেন টুকরো-টুকরো।'

'না-না, তুমি ভুল করছ,' ওঁকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বললুম, 'দেবদেবীরা সত্যিই একদিন মার্বেল-পাথরে গড়া ছিলেন। কিন্তু কাল, কালের গ্রাস যাবে কোথায়, বুঝলে হে বন্ধু! কালক্রমে মার্বেল-পাথর ভেঙে পড়তে শুরু করেছে এই আর-কি...'

কিন্তু উনি এ-কথা মানতে চাইলেন না।

গলা চড়িয়ে বললেন, 'ওঁরা আরও হাজারখানেক বছর অনায়াসে খাড়া থাকতেন। একমাত্র তোমাদের জন্যে এই হাল। তোমাদের জাতটার কোনো ডেলাইল্যা নেই-যে এই মুশকিল! তা না-হলে ইতিমধ্যেই সে-ডেলাইল্যা কুচকুচ করে তোমাদের কেশর ছেঁটে ছোট করে দিত!'

মস্কোয় ফিরে এসে মাকারেঙ্কোর কাছে তাঁর এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি উচ্ছ্বাসবর্ষণ শুরু করলুম। আর, আমার উচ্ছ্বাস যথারীতি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তবে যখন কথা বলা শুরু করলেন তখন তাঁর চোখে একটা চাপা ঝলক লক্ষ্য করলুম।

তিনি বললেন, 'না, সত্যিই, আমার কথাটা ঠিক। আচ্ছা, আপনি বিশ্ব-সাহিত্যের এমন একখানা বইয়েরও নাম করতে পারেন যেখানে ব্যক্তিগত সুখের বর্ণনা আছে? ভালোই জানেন, আপনি নাম করতে পারবেন না! এমন কোনো বই-ই নেই আসলে। আপনি কি মনে করেন লেন্‌স্কি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল আর অনেগিন নিজ বুদ্ধির দোষে তাতিয়ানাকে হারিয়েছিল বলেই পুশ্‌কিন সুখী প্রেমের বর্ণনা

দেন নি?.. আপনি কি বলতে চান পুশ্‌কিন তাঁর জীবনে একটিও সুখময় বিয়ে ঘটতে দ্যাখেন নি? একদম বাজে কথা!.. আসলে, এই জাতীয় সীমিত সুখে শিল্পীর সুখ নেই-যে... যেমন, ধরুন, তলস্তোয়। সুন্দরী হেলেনকে বিয়ে করার পর পিয়েরে বেজুখভ যতক্ষণ অসুখী হয়ে ছিল ততক্ষণ তলস্তোয় তাকে উলটেপালটে এদিক-সেদিক থেকে কেবলই দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু নাতাশা রস্তোভাকে বিয়ে করার পর যেই পিয়েরে সুখের মুখ দেখল অমনি তলস্তোয় তাকে পরিত্যাগ করলেন — এ-ধরনের সুখ নিয়ে তাঁর আর কিছু করার ছিল না, তাই। আর শেক্সপিয়র? তিনি কী করলেন? না, রোমিও আর জুলিয়েটের প্রেম দেখাতে গিয়ে তাঁকে আস্ত একখানা ট্র্যাজেডির কাঠামোয় ধরিয়ে তাকে আরও ঘোরালো করে তুলতে হল। আবার সেই ট্র্যাজেডিও ছিল অন্ধ সংস্কারের ফলাফল মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, শেক্সপিয়র এটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে কুৎসিত সমাজ-ব্যবস্থাই জন্ম দেয় যতসব ঔদ্ধত্য, শত্রুতা, শোষণ আর অসাম্যের, খুন করে মানুষের মনের যতকিছু মহত্তম অনুভব — এমন কি তাদের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ যেটি সেই চরিতার্থ প্রেমকে পর্যন্ত।'

অল্পক্ষণের জন্যে কথায় ছেদ পড়ল। মনে হল, মাকারেঙ্কোর মুখের উপর দিয়ে এক টুকরো মেঘ যেন ছায়া ফেলে গেল। স্পষ্টতই, হৃদয়দৌর্বল্য তাঁকে আবার কাবু করে ফেলছিল। তাই তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্যে আমার পারি'র সেই বন্ধু, যিনি আমাদের ডেলাইল্যার ভয় দেখিয়েছিলেন, তাঁর কথা বলতে শুরু করলুম।

গল্প শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন মাকারেঙ্কো।

'ডেলাইল্যাই বটে! বন্ধুকে আপনার বলা উচিত

ছিল যে বহুদিন ধরে ডেলাইল্যা আমাদের এখানে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যা। পিয়াত্নিত্স্কায়া স্ট্রিটে নাপতিনীর কাজ করে সে, আর সারা দিন ধরে পুরুষদের দাড়ি কামায় আর চুল ছাঁটে। এখানে কে তার কড়ি ধারে!'

মাকারেঙ্কো এ-ব্যাপারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত — অর্থাৎ, আচমকা হাসিমস্করা জুড়ে দিয়ে যে-কোনো গুরুগম্ভীর আলাপ-আলোচনায় ইতি টানতে।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার তিনি একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'মানুষের দোষত্রুটি কি থাকতেই হবে?'

তাঁর বক্তব্য ছিল এই রকম: মানুষের চরিত্রে বহুতর ছোটখাট অথচ বিরক্তিকর খুঁত থাকে। কিন্তু, হায়রে, তার জন্যে কেউ শাস্তি পায় না। অতি-সম্মানিত ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী, অসার দাম্ভিক, অর্থলিপ্সু, অমার্জিত বা রূঢ়ভাষী হতে পারে কিংবা তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করতে পারে। অথচ এহেন ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বদাই বলতে শোনা যায়: 'লোকটি ভারি কাজের! আর দোষত্রুটি যদি বলো তো সে কারই-বা নেই? প্রত্যেক মানুষেরই দোষত্রুটি আছে।'

এই পর্যন্ত এসেই মাকারেঙ্কো আচমকা প্রশ্ন তোলেন, 'ঠিক-ঠিক বলতে গেলে, মানুষের কি দোষত্রুটি থাকতেই হবে? যদি সে মিথ্যাবাদী কিংবা অভব্য বর্বর না-হয় তাহলে কি সে তার কাজ ভালোভাবে করতে পারবে না?'

বক্তৃতাটি নিয়ে অতঃপর আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল।

'আন্তন সেমিওনভিচ, আপনি দেখছি সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন বিষয়ীপনার ঘোরতর শত্রু। আপনি কি লক্ষ্য

করেছেন, এই দোষ আমাদের নিজেদের মধ্যেই, লেখকদের মধ্যেই বৃদ্ধি পাচ্ছে?'

এ-ব্যাপারে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে শেষে বললুম:

'জানেন তো, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন এই বিষয়ীপনার দুর্গন্ধ এমন একটা ব্যাপার যা এমন কি সেকালের বুর্জোয়াশ্রেণীও সহ্য করতে পারত না...'

শুনে মাকারেঙ্কো যেন ফেটে পড়লেন:

'সেকালের বুর্জোয়াদের কথা আর বলবেন না। তাদের পক্ষে সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন বিষয়ীপনার দুর্গন্ধ এড়ানো সম্ভব ছিল না, কারণ ওটা ছিল তাদের নিজস্ব, স্বাভাবিক, শারীরিক দুর্গন্ধ। কিন্তু আমাদের একালের মানুষ তা সহজেই শরীর থেকে ধুয়ে ফেলতে পারে। সে এখনও সাতবাসি পুরনো পোশাক গায়ে চড়িয়ে আছে, তা থেকেই এই দুর্গন্ধ। তফাতটা ভুলবেন না, ওস্তাদ!..'

আর একসময়ে এক প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে একখানা চিঠি পাওয়ার পর তিনি মন্তব্য করলেন, 'এই নিকলাইটা দেখছি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' নিকলাই ছিল একদার রাস্তায় পরিত্যক্ত শিশু। পরে সে ডাক্তার হয়ে কাজকর্ম করছিল। মাস্টারমশাইকে সে চিঠিতে অভিযোগ জানিয়ে লিখেছিল যে চারিদিকে বড্ড বেশি মূর্খের ছড়াছড়ি।

'কেমন লাগছে শুনতে — চারিদিকে বড্ড বেশি মূর্খের ছড়াছড়ি?' মাকারেঙ্কো রাগে গাঁক-গাঁক করে উঠলেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, বিপ্লব যদি না-হোত তাহলে আমার এই সোনার চাঁদ নিকলাইয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াত?'

'কী করে জানব, বলুন!'

'শুনুন, তাহলে আমিই বলছি। পচে মরত কোনো একটা নগণ্য জেলা-শহরের নরকে। নিজেই বাঁচত মূর্খ

হয়ে, অথচ তা বোঝার ক্ষমতাও থাকত না ওর। এটা অনুভব করার মতো, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো বুদ্ধিই থাকত না ওর। আর, বলা যায় না নিজের মতো করে হয়তো ও সুখেই থাকত... কিন্তু আমি ভাবছি, এখন কি ও ওই ধরনের সুখ মেনে নিতে রাজি হবে?'

'তাহলে, আপনার মতে, সুখ হল গিয়ে নানা ধরনের?' সতর্কভাবে বললুম আমি।

মাকারেঙ্কো হাসলেন:

'নিশ্চয়ই! বহু রকম সুখ আছে। যার যা কাজ তা-ই করার সুখ — প্রকৃতির বিরুদ্ধে, খারাপ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বদমায়েসদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কঠিন, ঝামেলায়-ভরা, অশান্ত সুখ। এ-সুখ পেতে হলে শরীরে কালশিরা পড়ে, দেহ ছিঁড়েকুটে যায়। কিন্তু, মনে রাখবেন, এই সুখই দুনিয়াটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে... অবশ্য এছাড়া আরও এক রকমের শান্তির সুখ আছে মানুষের যাতে মানুষ স্বল্পে সুখী হয় আর চায়ও না কিছুই।'

'আমার তো মনে হয় প্রত্যেকেই যে-যার নিজের মতো করে সুখী হতে পারে,' বললুম আমি।

উনি আমার দিকে তেরছা চোখে তাকালেন। স্পষ্টতই, ওঁর মনে হল যে-মানুষ কিছুই চায় না আমি বুঝি তার সেই শান্ত সুখের সমর্থনে কথা বলছি। আর কথাটা মনে হতেই উনি কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। আমার দিকে না-তাকিয়ে টেনেটেনে শুরু করলেন:

'হ্যাঁ-াঁ, তা বটে!'

তারপর বিরক্ত হলে যে-ঢঙে কথা বলতেন সেই কাট-ইউক্রেনীয় উচ্চারণে বললেন:

'তবে ওয়া তো শুয়োরের সুখ। ও সুখ শুয়োরে খাউক!..'

মাকারেঙ্কো ছিলেন এমন একজন লোক, কোনো পরিশ্রমেই তৃপ্ত হতেন না যিনি। প্রথম-প্রথম আমি ভাবতুম, এটা বুঝি তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যমাত্র। কিন্তু পরে আমার ভাবনায় নতুন আলোকপাত ঘটল। আসলে ব্যাপারটা ছিল এই যে মানুষটির অনেক কাজ করার ছিল, কিন্তু তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যে আর বেশিদিন কুলোবে না বুঝে তিনি মৃত্যুর উপর একহাত নিতে, তাকে হারিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

মৃত্যুকে ভয় করেন নি তিনি। তাকে নিছক একটা জ্বালাতনের ব্যাপার বলে মনে করতেন, কারণ তা মানুষের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই মৃত্যুকে তিনি ঘৃণা করতেন। ওই সময়ে লেখা আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাসে পূর্ণ এক চিঠিতে তিনি এমন কথাও লিখেছেন: 'প্রকৃতি আবিষ্কার করেছে মৃত্যুকে, কিন্তু মানুষ শিখেছে তাকে প্রতিরোধ করতে...'

মনে-মনে ছবিটা স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি।

রাত্রি। উনি বসে আছেন নিজের টেবিলে। কাজ করছেন আর বুকের মধ্যে একটা কিছু একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত হচ্ছে — মৃত্যু ভেঙ্‌চি কাটছে ওঁকে। কিন্তু মানুষটির চোখে ঝিকমিক করছে কাউকে জব্দ করার দুষ্টুহাসি — সোজাসুজি, চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গিতে উনি তাকিয়ে আছেন মৃত্যুর কুৎসিত মুখের দিকে। আর ওইখানে বসেই, মৃত্যুর একান্ত উপস্থিতিতেই কালি-কলম দিয়ে লিখে যাচ্ছেন যে উনি তার পরোয়া করেন না, আর কাজ করে চলছেন অনবরত।

মাকারেঙ্কো ছিলেন ঠিক এই ধরনের মানুষ।

কর্নেই চুকোভ্স্কি*

মাকারেঙ্কোর সঙ্গে, বারকয়েক

১

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই কবে, ১৯৩৬ সালে কিয়েভের কাছে ইর্‌পেনে। আপেল খাওয়ার ইচ্ছেটা খুব পেয়ে বসায় বুড়ো প্রকোপিচের ফলবাগানে গিয়েছিলুম সেদিন। গল্প করতে-করতে এক সময় তিনি আমায় জানালেন যে 'ওই ছোট্ট শাদা বাড়িখান' থেকে একজন লেখক প্রায়ই তাঁর কাছে আসেন ফল কিনতে।

'নাম কী লেখকটির?'

'তা আমি জানব্য কেমনে? ওনি লেখকও হতি পারেন, আবার কমিশারও হতি পারেন।'

বুড়োকে আপেলের দাম মিটিয়ে দিয়ে আমি যখন বাগানের গেটের দিকে ফিরছি তখন একটা গাছের ওপর থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে (তার বয়স সাত বছর কিংবা তারও কম হতে পারে তবে সাত বছরের বেশি নয়), যাকে

---

* কর্নেই চুকোভ্স্কি (১৮৮২-১৯৬৯) — সুপরিচিত সোভিয়েত সাহিত্যিক ও সমালোচক। — সম্পাঃ

বাগানে ঢোকার সময় আমি লক্ষ্যই করি নি, সে হেঁকে বললে যে লেখকটির নাম হচ্ছে আন্তন সেমিওনভিচ।

কী? মাকারেঙ্কো নাকি?.. আবার অন্য কেউ হওয়াও বিচিত্র নয়। নামটা রীতিমতো বহুল প্রচলিত। গ্রীষ্মকালের রোদে-তেতে-ওঠা পথ ধরে আস্তে-আস্তে কাছের নিচু শাদা বাড়িটার দিকে হেঁটে চললুম। বাচ্চা মেয়েটিও পিছু নিয়েছিল আমার।

বাড়িখানা চোখে পড়ার মতো এমন কিছু ছিল না, সাধারণ চাষী গৃহস্থের কুঁড়ে থেকে তার তফাত ছিল সামান্যই। রোদে-তাতা সামনের গাড়িবারান্দাটায় উঠে আমি দেখলুম যে সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলুম, ধাক্কা দিতে ভরসা পেলুম না। বাড়ির সামনেটায় কয়েক পা দূরে একদল ছেলেমেয়ে বল না 'রিউখি' কী যেন খেলছিল। সবসুদ্ধ জনা পাঁচ-ছয় ছিল তারা। এর মধ্যে তারা আমায় দেখতে পেয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে দু'জন এবার আমার কাছে ছুটে এসে খুবই ভদ্রভাবে (এত ভদ্রভাবে যে প্রথমটা আমি সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম!) আমায় অনুরোধ করলে বাড়ির কাছে ছায়ায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে, 'কেননা আন্তন সেমিওনভিচ এখন বিশ্রাম করতিছেন, তবে খুব শিগ্‌গিরই — খুব বেশি দেরি হলি পনারো মিনিট পর — উনি ঘুম থেকে উঠবেন'।

ভাবলুম, 'না, তাহলে সম্ভবত এ লোক মাকারেঙ্কো নন।'

তবু আমার হাতের আপেলভর্তি থলেটা এত ভারি ঠেকছিল আর ছায়াঢাকা জায়গাটায় এত মনোরম ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল যে বাড়িটার কাছাকাছি ছায়ায় বসতে পেয়ে আমি যেন বর্তে গেলুম।

ছেলেদ্ুটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল আর আদবকায়দাদ্ুরস্ত লোকজনের বসার ঘরে যেমনটি হয়ে থাকে তেমনই অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখিয়ে আমায় কথাবার্তায় ব্যস্ত করে রাখার প্রয়াস পেল। সশ্রদ্ধভাবে অথচ বেশ জোরালো গলায় সমস্বরে আমাকে প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন করে যেতে লাগল তারা: ইর্পেনে আমি কি বেশিদিন আছি? এর আগে দেশের এই অঞ্চলে আর কি কখনও এসেছি? ইউক্রেনীয় গ্রামাঞ্চল আমার কেমন লাগছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেদ্ুটি-যে আমার মতো নিছক একজন অপরিচিত লোককে আপ্যায়ন করার জন্যে তাদের খেলা ফেলে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে তাদের এই সৌজন্যের প্রকাশে সবে আমি ম্গ্ধ হয়ে যেতে শ্রু করেছি এমন সময় হাতে আস্ত একটা ভুট্টা নিয়ে আন্তন সেমিওনভিচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি আমার মনে হল ইনি মাকারেঙ্কো না হয়ে যান না।

ব্ড়ো ঠিক কথাই বলেছিলেন। সত্যিই মাকারেঙ্কোকে গৃহয্দ্ধের আমলের কমিশারের মতো দেখতে লাগছিল। সেই একই রকম কম কথার মান্ষ, কঠোর ম্র্তি, আত্ম-প্রত্যয়ী, অযথা অঙ্গভঙ্গি অথবা ম্খে লাজ্ক হাসির নামগন্ধও নেই।

বন্ধ্ভাবে, খোলা মনে আমাকে সম্ভাষণ করলেও রাশভারি মর্যাদাবোধের ভাবটুকু হারালেন না তিনি। সাক্ষাতের একেবারে প্রথম ম্হ্র্তটিতেই অন্ভব করল্ম তাঁর মধ্যে কী যেন একটা আছে যা প্রবল, যা কখনও নষ্ট হতে পারে না, যা অবিচলিতরকম স্থিরসংকল্প...

দৃঢ় এবং জোরালো একটা ভঙ্গি করে হাতের ভুট্টার ছড়াটা ভেঙে দ্'টুকরো করলেন তিনি, তারপর তার

আধখানা আমার সঙ্গের সেই ছোট্ট মেয়েটিকে দিলেন। বোঝা গেল, মেয়েটি ওঁর কাছ থেকে এ-ধরনের উপহার পেতে অভ্যস্ত।

সৌজন্যপরায়ণ ছেলেদুটি এবার একদৌড়ে তাদের খেলার সাথীদের কাছে ফিরে গেল। ভালো করে খেয়াল করতে দেখলুম ওদের ওই সাথীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়ে আছে। আর তখন আমার মনে হল আমাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে ওদের না-জানি কতখানি একঘেয়ে ঠেকেছে, মাঝপথে বাধা পড়ে যাওয়ায় সারাক্ষণ নিশ্চয়ই ওরা খেলায় ফিরে যাওয়ার জন্যে মনে-মনে আকুলিবিকুলি করেছে।

এমনিতে কিন্তু মাকারেঙ্কো দেখলুম ভারি অমায়িক আর অতিথিপরায়ণ গৃহস্থ। আমার হাত থেকে ভারি থলেটা নিজের হাতে নিয়ে তিনি আমাকে ঠাণ্ডা একখানা ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন, পরিবারের বাকি সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তারপর চমৎকার কয়েক টুকরো তরমুজও খেতে দিলেন। তবু সারাটা সময় তাঁর মধ্যে কেমন একটা কর্তাব্যক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, যার ফলে আমি কিছুটা অস্বস্তিই বোধ করছিলুম।

অথচ সেই-যে ছোট্ট মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছিল সে কিন্তু দিব্যি স্বাভাবিক বোধ করছিল। তরমুজের বড় একটা টুকরো পাওয়ার পর বিন্দুমাত্র পরোয়া না-করে সে মাকারেঙ্কোর গা ঘেঁসে কাছের কোচখানায় দিব্যি গুটিসুটি হয়ে বসল।

গল্প করতে-করতে আমি জানালুম বাচ্চা ছেলেদুটির আচরণে আমি কতটা মুগ্ধ হয়েছি তার কথা। বললুম, পাছে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেজন্যে ছেলেদুটি ভারি নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে গল্পগুজবে ব্যস্ত করে রেখেছিল। শুনে

মাকারেঙ্কো হাসলেন, তারপর বাহুমূল ধরে আমাকে বের করে আনলেন সেই বাগানে যেখানে ছেলেমেয়েগুলি খেলছিল। ও'র হাঁটার ভঙ্গীটি ছিল যথাযথ ও কিছুটা ফৌজী কায়দায়। যেন নিজের সেনাবাহিনী পরিদর্শন করছেন এমন এক ফৌজী অফিসারের ভঙ্গীতে হাঁটছিলেন তিনি।

ছেলেমেয়েদের খেলার ধরনধারণ ভারি ভালো লাগছিল। ওদের হাবভাবে এমন একটা জিনিস ছিল যা আমাকে অক্সফোর্ডের ছাত্রদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। কথাটা মাকারেঙ্কোকেও বললুম আমি।

দুষ্টুমির হাসি হেসে তিনি আমার কথায় সায় দিলেন। বললেন, 'তা যা বলেছেন। তবে জানেন কি যে ওই কোঁকড়া-চুলো ছেলেটি খার্কভের কাছে লজভায়া রেলস্টেশনের এককালের ভারি প্রতিভাবান এক মালপত্র-চোর? লজভায়া চিরকালই নামকরা চোরেদের কর্মস্থল, তবে এই ছেলেটি সব চোরকেই টেক্কা দিয়েছে এক সময়। এছাড়া ওই-যে ছেলেটিকে দেখছেন — শাদা ট্রাউজার্স-পরা? ও হল গিয়ে পকেটমার, তবে একেবারে যাকে বলে টেক্কামার্কা।'

কথাগুলো এমনভাবে বলছিলেন তিনি যেন প্রতিদিনের তুচ্ছ শাদাসিধে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন। এসব শুনে-যে বিস্ময়ে আমার চোখ কপালে উঠতে পারে তা-ও যেন তাঁর খেয়াল ছিল না।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্তভাবে একই সুরে তিনি ফের বললেন: 'অথচ ওই প্রথম ছেলেটি এখন কিন্তু ডাক্তারি পড়ছে... দেখবেন, ভালো সার্জন হবে ও। আর শাদা ট্রাউজার্স-পরনে ওই-যে ছেলেটি, ও কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আপনাকে বাধ্য করবে লাইনে দাঁড়িয়ে ওর কন্সার্ট শোনার জন্যে টিকেট কাটতে। যা বলছি ফলে কিনা দেখবেন।'

এই দুটি ছেলেই আগে মাকারেঙ্কোর রক্ষণাধীন ছিল। ওরা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইর্‌পেনে এসেছিল, কারণ এর বছর কয়েক আগেই তিনি কলোনি পরিচালনার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে অতীতে নিশ্চয়ই একদিন তিনি ওদের দু'জনকে অপরাধীর পেশা গ্রহণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এর আগে কিংবা পরেও আর কখনও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আমি প্রাক্তন শিক্ষকের প্রতি এতখানি কৃতজ্ঞ কিংবা ভালোবাসায় এতখানি একনিষ্ঠ হতে দেখি নি। ছেলেপিলেরা-যে কতখানি মাকারেঙ্কোর অনুরক্ত ছিল এর পরেও একাধিক বার তা দেখার আমার সুযোগ ঘটেছিল। পরিচয়ের ওই প্রথম দিনটিতেই যা আমার মনে সবচেয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল অ হল মাকারেঙ্কো তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের যে-সূক্ষ্ম বোধটি সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা-ই। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুধু কাজকর্মে শৃঙ্খলারক্ষা ও নিষ্ঠাই দাবি করেন নি, তাদের শিখিয়েছিলেন সূক্ষ্ম, আন্তরিক সৌজন্যবোধও।

এই কথাটিই ভারি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিল মাকারেঙ্কোর এক প্রাক্তন রক্ষণাধীন ছাত্র তার কোনো এক স্মৃতিকথায়। সে লিখেছিল: 'পরস্পরের প্রতি আচরণে এবং আরও বেশি করে বৃদ্ধবৃদ্ধা, কলোনিতে সমাগত অতিথি-অভ্যাগত ও অপরিচিত লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সময় আমাদের কাছে দাবি করা হোত একেবারে নিখুঁত ভব্যতা। মাকারেঙ্কো প্রায়ই আমাদের বলতেন, 'আমাদের, সোভিয়েত স্ত্রী-পুরুষকে অনিন্দনীয় আচার-আচরণ ও ভদ্র, বিনীত ব্যবহার দেখিয়েই বিশিষ্ট হয়ে উঠতে হবে।

আমাদের আচার-ব্যবহার এমন হবে যেন তা হয়ে ওঠে সারা দুনিয়ার ঈর্ষার বস্তু।''

সেদিন যখন আমার বিদায় নেবার সময় এল তখন মাকারেঙ্কো আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে সঙ্গে চললেন। যাবার পথে তাঁর নিজের সাহিত্যগত পরিকল্পনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলছিলেন আমাকে। যদিও বারবার নিজেকে তিনি 'শিক্ষানবিশ সাহিত্যিক' বা 'নতুন রঙ্‌রুট' বলে (একটু বেশি বয়সেই অবশ্য লিখতে কলম ধরেছিলেন তিনি) উল্লেখ করছিলেন, তবু নিজের সৃষ্টিশীল পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে তাঁর কথায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দোমনা ভাব, বিভ্রান্তি, ইতস্তত ভাব কিংবা কথা হাতড়ানোর বড় একটা লক্ষণ চোখে পড়ল না। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে ভবিষ্যতে বেশ কয়েকটি বছর সাহিত্যে কোন পথে চলবেন তিনি তা আগে থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে রেখেছেন আর যে-কোনো বাধাই আসুক-না কেন ওই পথে-যে অবিচলিত চিত্তে চলবেন তাতেও সন্দেহ নেই।

কথায়-কথায় তিনি জানালেন যে আগে তাঁরও মনে নানারকম দ্বিধাসন্দেহ দেখা দিয়েছিল, তবে সেসব একেবারে গোড়াকার কথা। অতীতের সেই দিনগুলোকে তিনি এখন পেছনে ফেলে এসেছেন। একটানা কাজের একাধিক পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা পর্যন্ত এখন নিশ্চিতভাবে ছকে ফেলেছেন তিনি, যার জন্যে তাঁর নিজের হিসেবমতো দরকার দশ থেকে বারো বছরের মতো সময়। তাঁর এই প্রশান্ত আত্মপ্রত্যয় দেখে সত্যিই আমার ঈর্ষা হচ্ছিল এবং মানুষটির মধ্যে এমন একটা প্রবল অনন্যমনা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটতে দেখছিলুম যে আমারই এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে তিনি নিশ্চয়ই এই সমস্ত কাজ সমাধা করতে সমর্থ হবেন।

তারপর এক সময় হঠাৎ খেপে উঠে তিনি অনর্গল কথা বলতে শুরু করলেন। মস্কোর সাহিত্যসমাজে কী ঘটছে না ঘটছে তা-ই নিয়ে আমরা তখন আলোচনা করছিলুম। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, সাহিত্যক্ষেত্রে 'শিক্ষানবিশ' বা 'নতুন রঙ্‌রুট' ছিলেন বলে তিনি বেশ কিছু দেরিতে, অর্থাৎ সবেমাত্র ওই সময়ে, এমন একদল লেখকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাদের মধ্যে নৈতিক বাছবিচারের কোনো বালাই না দেখতে পেয়ে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। এত বেশি চটে উঠতে ও রাগ প্রকাশ করতে সেদিন দেখলুম মাকারেঙ্কোকে, যা তাঁর পক্ষে সম্ভব বলে তার আগে আমার মনেই হয় নি। এমন কি তার আগের মুহূর্তের আত্মসংযম পর্যন্ত কোথায়-যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কে জানে!

আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তার অল্প আগে তাঁর জানার সুযোগ হয়েছে এমন নানারকম বিসদৃশ ঘটনার বিবরণ দিলেন তিনি এবং কঠিন সংকল্প ঘোষণার মতো করে জানিয়ে দিলেন যে মস্কোয় ফেরামাত্রই ওই ঘৃণ্য চক্রটার মুখোশ খুলে দিতে ও চক্রটা ভেঙে দিতে যথাসাধ্য করবেন।

তাঁর এই কথা শুনতে-শুনতে কেবলই আমার মনে পড়ছিল প্রথম কমিউন গড়ার সেই গোড়ার দিনগুলোয় কীভাবে তিনি বেশ বড় একদল ঝানু পাকাপোক্ত সরকারি আমলার মোকাবিলা করেছিলেন, প্রাণপণে লড়ে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ওই আমলারা বহির্জগৎ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জেলা শিক্ষাদপ্তরের অন্ধকুঠুরিতে নিজেদের বন্দী করে রেখেছিল।

এবার জীবনে এই প্রথম নিজেকে সাহিত্যজগতের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে করতে শুরু করায় পদোন্নতিতে আগ্রহ ও

ভণ্ডামির এই ঘোর শত্রুর মধ্যে 'লড়াইখ্যাপা' মানুষটি আবার তৎপর হয়ে উঠেছিল। তিনি সেদিন ঠিক কার-কার কথা বলছিলেন তা আজ আর আমার স্পষ্ট মনে নেই, তবে যতদূর মনে পড়ে আলোচ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমি সেদিন মোটেই একমত হতে পারি নি। তবু মাকারেঙ্কোর কথাগুলো-যে আমার মনে রেখাপাত করেছিল এটাও ঠিক। সেদিন যে-ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন তা ছিল অভিজ্ঞ বাগ্মীর ভাষা — চোখা-চোখা বিশেষণ আর একেবারে অন্তর থেকে উৎসারিত সাবলীল, ব্যঙ্গবিদ্রূপে-ভরা তুলনার ফুলঝুরি ছিটনো।

মনে-মনে সেদিন আমি না-মেনে পারি নি যে 'কথাবলার এই অসামান্য দক্ষতা না-থাকলে ইনি কখনই কুরিয়াজের ছেলেদের ওপর অতখানি প্রভাববিস্তার করতে পারতেন না।' তবু 'বাগ্মী' খেতাব কেন যেন তাঁর স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মিলত না। এর চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত খেতাব হতে পারত 'সঙ্গে সঙ্গে মাথা খাটিয়ে বের করা শব্দের যাদুকর'। পরে যখন খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলো পড়েছি তখন বারবারই মনে হয়েছে যে লেখার চেয়ে কথা বলে মানুষকে স্ববশে আনায় তাঁর ক্ষমতা বেশি। স্নিগ্ধ ইউক্রেনীয় রসিকতাবোধও তাঁর কথাবার্তাকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলত।

তবু গতদিনের এইসব 'লড়াই' তাঁর কাছ থেকে-যে রীতিমতো মাশুল আদায় করে ছেড়েছিল তা-ও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কেননা লক্ষ্য করছিলুম যে কথা বলতে-বলতে মাকারেঙ্কো থেকে-থেকেই থেমে যাচ্ছিলেন, লম্বা দম নিচ্ছিলেন আর সে-সময়ে তাঁর মুখখানা বেশ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। ফলে কাছেই পড়ে-থাকা কতগুলো গাছের

কাটা গুঁড়ির ওপর বসে কথা বলতে লাগলুম আমরা। গভীর দুঃখে আমি লক্ষ্য করলুম যে প্রাণবন্ত আচরণ, আত্মপ্রত্যয়ে-ভরা কথাবার্তা ও দৃঢ় অঙ্গভঙ্গি সত্ত্বেও মাকারেঙ্কো স্পষ্টতই ক্লান্ত ও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যার ফলে 'শত্রু'র সঙ্গে তাঁর যে-কোনো লড়াইয়েরই পরিণতি বিয়োগান্ত হয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

২

সন-তারিখের হিসেব আমার এতই গুলিয়ে গেছে যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও এখন আমি মনে করতে পারছি না, এর পরের বার মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার যে-ঘটনাটা ঘটেছিল তা ঘটেছিল ওই বছরই না তার পরের বছর। তবে যতটুকু আমার মনে পড়ছে তা হল এই যে ঘটনাটা ঘটেছিল কিয়েভ শহরে লেখক সঙ্ঘের একটা বিশেষ সভায়।

সে-বছর গ্রীষ্মকালটা ছিল সাংঘাতিক গরম। আর তাই সভার ঘরের দমবন্ধ আবহাওয়া, সিগারেটের ধোঁয়া আর আমার পক্ষে অনভ্যস্ত তুমুল তর্কবিতর্কের ফলে কেমন করে জানি না হঠাৎ সেদিন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এর দু-এক ঘণ্টা পরে যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন দেখি 'কণ্টিনেণ্টাল' হোটেলে নিজের ঘরে শুয়ে আছি।

বিছানায় শুয়েই প্রথম যে-লোকটিকে আমি দেখতে পেলুম তিনি হচ্ছেন মাকারেঙ্কো। নিঃশব্দে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। অবশেষে জানা গেল যে ওই সভায় মাকারেঙ্কোও উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে দেখে হোটেলের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে

এসে তিনি এতক্ষণ একেবারে হাসপাতালের নর্সের মতোই বিছানার পাশে বসে আমার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন।

এরপর আরও কিছুক্ষণ আমি একাধিকবার জ্ঞান হারিয়ে ফের জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলুম। ফলে ওই সময়ে মাকারেঙ্কো-যে আমাকে কী বলছিলেন দুঃখের বিষয় তার সামান্যই এলোমেলো টুকরোটাকরা হিসেবে আমি মনে করে রাখতে পেরেছি। এটা মনে আছে যে বেশির ভাগ সময়ই আমাদের কথাবার্তা চলছিল গোর্কিকে নিয়ে। মাকারেঙ্কোর চোখে গোর্কি ছিলেন দুনিয়ার যা-কিছু মহৎ তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর এই মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে 'গোর্কি' নামটি উচ্চারণ করার সময় তাঁর গলার স্বর সত্যিই পাল্‌টে যাচ্ছিল, গলাটা কেমন কোমল, প্রায় সুরেলা হয়ে উঠছিল।

গোর্কির সঙ্গে আমারও দেখা হয়েছে একথা শুনে মাকারেঙ্কো আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যাতে আমি যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে গোর্কির সঙ্গে আমার বারকয়েক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিই।

আবার হঠাৎ কথার মাঝখানে, বলা যেতে পারে কল্পনার পাখায় ভর দেবার পর মাঝপথে, অসুস্থ মানুষের বিবেকী পরিচর্যাকারী হিসেবে নিজের কর্তব্যের কথা স্মরণ করে তিনি আমাকে যথাসম্ভব কম কথা বলতে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। প্রায়-প্রায়ই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলছিলেন: 'না-না, কথা বলবেন না, কথা বলা উচিত হবে না আপনার!' আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেকথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ফের আমাকে অনুরোধ করছিলেন আমার গল্পটা চালিয়ে যেতে।

ওইবার কিয়েভে এটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মাকারেঙ্কো সত্যিই ভারি অসুস্থ। তবু ফিরে-

ফিরে অনবরত অসুখে পড়া সত্ত্বেও তখনও তিনি একেবারে সিধে হয়ে সৈনিকের মতো প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছিলেন আর বাহ্যত কড়া কর্তাব্যক্তির চালচলন বজায় রেখে চলছিলেন। তবে, বলা বাহুল্য, তখন আর ওই চালচলনে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলুম না।

পরে আমি জেনেছিলুম যে ওই সভার কাজ চলার সময় নিজের কাজের চাপে মাকারেঙ্কো একেবারে চোখেকানে দেখতে পাচ্ছিলেন না, অথচ সেজন্যে দীর্ঘ সময় আমার দেখাশোনার কাজে ব্যয় করতেও কোনো বাধা হচ্ছিল না তাঁর। ওই সময়ে কমিউনের আমলের তাঁর প্রাক্তন রক্ষণাধীন কয়েকটি ছেলে — যেমন ক্লিউশ্‌নিক, সাল্‌কো ও তেরেন্তিউকও — আমার দেখাশোনায় তাঁকে সাহায্য করছিল। ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলুম।

৩

স্বাস্থ্যহীনতার কারণে এর পরের বছর মাকারেঙ্কো বাধ্য হন কিস্‌লভোদ্‌স্কে গিয়ে সেখানকার কোনো একটি স্যানাটোরিয়মে থেকে নিজের চিকিৎসা করাতে।

ওই সময়ে আমিও ওই স্যানাটোরিয়মে ছিলুম। আমাদের ঘরদুটো ছিল একই বারান্দার পাশে। মাকারেঙ্কো এসে পৌঁছনোর পর প্রথম দিনই তাঁর বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে দ্রুতহাতে টাইপরাইটারের চালানোর আওয়াজ পেলুম। একমুহূর্তও বিশ্রাম না-নিয়ে এবং ডাক্তারদের রীতিমতো চটিয়ে দিয়ে তিনি ‘দুই পুরুষের পথ’ নামের উপন্যাসখানি লিখে চললেন।

যে-ডাক্তারটি মাকারেঙ্কোর চিকিৎসা করছিলেন তাঁর কাছ থেকে জানলুম যে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা সত্যিই খারাপ এবং দেখেশুনে ডাক্তারের মনে হয়েছে তাঁর দিন নিশ্চয়ই খুব ঝুটঝামেলার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ডাক্তার বললেন, 'ওঁর দরকার পুরো বিশ্রাম নেয়া, অথচ হৃদ্‌যন্ত্রকে উনি নির্মমভাবে খাটাচ্ছেন। যন্ত্রটাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টার বদলে উনি সেটাকে পঙ্গু করে ফেলছেন। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে চলেছেন উনি। যান-না একটু ওঁর কাছে... টাইপরাইটারের কবল থেকে উদ্ধার করে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসুন-না... ধরুন, পপ্‌লার বনে কিংবা ফোয়ারার ধারে কিংবা পার্কে — যেখানে হয়।'

কিন্তু ডাক্তার বললে কী হয়, তাঁর উপদেশ কাজে পরিণত করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। মাকারেঙ্কো লেখায় একেবারে মত্ত হয়ে ছিলেন। লেখার ব্যাপারে বাধা পড়লে সত্যিকার ক্ষতি বলে গণ্য করছিলেন তা। এমন কি তাঁর তৎকালীন 'পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা'র কাজের বেগ ঢিলে করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারছিলেন না।

তাই দেখা যেত যতবারই আমি তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে পার্কে বের করে আনতুম ততবারই পনেরো মিনিটটাক পরে দ্রুত পা চালিয়ে তিনি ফিরে চলেছেন অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পূরণ করার কাজে ফের ডুবে যেতে।

অথচ একদিন দুপুরের খাওয়ার সময় দেখা হওয়ায় তিনিই পাল্‌টা আমায় শুধোলেন যে অত ঘনঘন আমি বেপাত্তা হয়ে যাই কোথায়। স্বীকার করলুম যে ডাক্তারদের আমাকে দরকার না-হওয়ায় আমি ওই অঞ্চলের স্থানীয় স্কুলগুলো দেখতে মাঝে-মাঝে ডুব মেরে থাকি। কেননা, আগে যতবার কিস্‌লভোদ্‌স্কে এসেছি ততবার

ইশ্‌কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে ভারি আনন্দ পেয়েছি।

শুনে মাকারেঙ্কো লাফিয়ে উঠলেন, ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার সঙ্গে ভিড়ে এইরকম স্যানাটোরিয়ম-'পালানো'র একটা অভিযানে যোগ দেয়ার জন্যে। এজন্যে উপন্যাস লেখার কাজ কয়েক ঘণ্টা ফেলে রাখার মতো ত্যাগস্বীকারেও প্রস্তুত দেখলুম তাঁকে। বললেন, ভবিষ্যতে লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন এমন একখানা বইয়ের আরও কিছু মালমশলা সংগ্রহের জন্যে তিনি হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন। আমার কিন্তু ধারণা আসল ব্যাপার ছিল এই যে নিছক বাচ্চাদের সংসর্গে যাবার জন্যেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, বিখ্যাত কমিউন আমলে যা নাকি ছিল তাঁর কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয় তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সেই জগতে ফের একবার কিছুক্ষণ ফিরে যাওয়ার জন্যে।

ডাক্তারদের ভ্রূকুটির তোয়াক্কা না-করে আমরা দু'জনে স্থানীয় স্কুলগুলোয় হানা দিতে শুরু করলুম। কল্পনাকে অনেকখানি টেনে লম্বা করেও অবশ্য এ-ধরনের প্রমোদভ্রমণকে স্যানাটোরিয়মের স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলত না, কেননা সে-সময়কার অপ্রচুর যানবাহন-ব্যবস্থার দিনে স্যানাটোরিয়মে ফেরার সময় আমাদের পায়ে হেঁটে ক্রেস্তোভায়া পাহাড়টির চড়াই ভাঙতে হোত।

প্রতিবার কোনো একটি স্কুলে পৌঁছে মাকারেঙ্কো ক্লাসটিচারের অনুমতি নিয়ে ক্লাসের পেছনদিকের একটা ডেস্কে গিয়ে ভালোমানুষের মতো চুপটি করে বসতেন। তারপর কীভাবে পড়ানো হচ্ছে তা-ই লক্ষ্য করতেন চুপচাপ বসে। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে কিস্‌লভোদ্‌স্কের স্কুলগুলির সেইসব ছেলেমেয়ে (যারা এর মধ্যে বহুদিন আগেই পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ হয়ে উঠেছে) নিশ্চয়ই

মাকারেঙ্কোর সঙ্গে তাদের সেই দেখাসাক্ষাৎ আর প্রতিবার ক্লাসের শেষে তিনি তাদের সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা বলতেন তা মনে রেখেছে। এইসব আলাপ-আলোচনায় আমি সে-সময়ে যোগ দিই নি, কেননা আমি সর্বদাই তখন সবচেয়ে ছোটদের ক্লাসে যেতুম আর মাকারেঙ্কোর বেশি আগ্রহ ছিল সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেশার।

ফিরে আসার সময় ক্রেস্তোভায়া পাহাড়ে উঠতে আমাদের ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লেগে যেত। পথে পাহাড়ের সবচেয়ে খাড়াই অংশটার ঠিক নিচেই একটা বেঞ্চিতে আমরা কিছুক্ষণ বসতুম বিশ্রাম নেবার জন্যে। আর তখন আলাপ জমে উঠত আমাদের সাহিত্য নিয়ে, গোর্কি, ফাদেয়েভ, আলেক্সেই তলস্তোয়, ইত্যাদিকে নিয়ে আর পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে-শোনাতে মাতোয়ারা হয়ে উঠতুম।

আর তখন দেখা গেল যে মাকারেঙ্কোর কবিতা জানা আছে ভালোরকম (সত্যি বলতে কী, এতটা আমি আশা করি নি!), কবিতার দারুণ ভক্ত তিনি, বিশেষ করে তিউত্‌চেভের কবিতার। পুশকিন, শেভ্‌চেঙ্কো আর ক্রিলোভের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন তিনি, কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর বাগ্রিত্‌স্কি আর তিখনভের কবিতাও।

এছাড়া দস্তয়েভ্‌স্কি নিয়েও আমাদের মধ্যে বহু সময় ধরে তর্কবিতর্ক চলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই সময়ে মাকারেঙ্কো দস্তয়েভ্‌স্কির সাহিত্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়াশুনো করছিলেন।

ওই সময়ে ৫ নভেম্বর তারিখে কিস্‌লভোদ্‌স্ক থেকে মাকারেঙ্কো স্ত্রীকে এক চিঠিতে লেখেন: ‘ভালোবাসা জানাচ্ছি। এখানে বসে আমি তোমার প্রিয় লেখকদের বইপত্র পড়ছি। শেক্সপীয়রের রচনাবলী পড়া শেষ করে এখন

দস্তয়েভ্স্কি ধরেছি। সত্যি, এই একজন লেখক যাঁকে নিয়ে কেউই আজ পর্যন্ত ঠিকমতো পর্যালোচনা করেন নি। চুকোভস্কির সঙ্গে আমি এই দুই বিরাট লেখক নিয়ে আলোচনা করছিলুম। আমাদের এই আলোচনাটা সত্যিই দারুণ আগ্রহোদ্দীপক হয়েছে... খুবই দুঃখের কথা যে এ-সময়ে তুমি কাছে নেই।'*

কিস্লভোদ্স্কের স্থানীয় স্কুলগুলিতে হানা দিতে যাওয়ার পথে আমাদের মধ্যে এইরকম যে-সমস্ত আলাপ-আলোচনা হোত তার অনেকগুলিই আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। এটা বললে অবশ্য ভুল হবে যে আমরা দু'জন প্রায়ই একমত হতুম। ব্যাপারটা ঘটত বরং উল্টোই। যেমন, কিছু-কিছু কবিতা যা নাকি আমার দারুণ ভালো লাগত, এমন কি চোখে জল এনে দিত প্রায়, মাকারেঙ্কোর তা এমন কিছু ভালো লাগত না, আবার কিছু-কিছু বই যাদের তিনি অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করতেন, হাজার চেষ্টা করেও সেগুলিকে আমি কিন্তু ভালো লাগাতে পারতুম না। তবু যেহেতু আমাদের দু'জনেরই মধ্যে ছিল শিশুদের প্রতি গভীর মমতা, তাই এসব ক্ষেত্রে মতভেদের কথা ভুলে যেতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হোত না। সোভিয়েতের ছেলেমেয়ে এবং তাদের ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ ছিল এমন একটি বিষয় যা নিয়ে মাকারেঙ্কো সারা দিনরাত অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন, কেননা পেশাদার লেখক বনে যাওয়ার পরেও তিনি-যে শিক্ষক তা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

---

* মাকারেঙ্কোর একটি চিঠিতে লেখা উপরোক্ত অনুচ্ছেদটির কথা আমাকে পরে জানিয়েছিলেন তাঁর বিধবা স্ত্রী।

আমার মধ্যেও-যে একজন শিক্ষক ঘুমিয়ে আছে এটা আবিষ্কারের জন্যেও তিনি ভারি ব্যগ্র ছিলেন। আমার 'দুই থেকে পাঁচ' বইখানা পড়বার পর ওইদিনই আমরা দু'জন যখন ক্রেস্তোভায়া পাহাড়ের চড়াই ভেঙে উঠছিলুম তখন তিনি এই বলে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলেন যে বইখানার পরের সংস্করণে আমি যেন তার শিক্ষা-সংক্রান্ত মর্মবাণী ও লক্ষ্যের ওপর আরও বেশি জোর দিই।

বইখানায় আমার লেখা ভূমিকাটা পড়ে মাকারেঙ্কো কিন্তু ভারি চটে গিয়েছিলেন। কারণ ওই ভূমিকার একটা জায়গায় এই হালকা মন্তব্যটি ছিল যে 'বইখানিকে কেউ যেন পাঠ্যপুস্তক বলে ভুল না-করেন, কেননা আমি শিক্ষক নই, লেখকমাত্র...'

মাকারেঙ্কো সেদিন এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'একদম বাজে কথা! প্রথমত, প্রতিটি লেখকই শিক্ষক ছাড়া কিছু নন, তাছাড়া দ্বিতীয়ত, আপনি সচেতনভাবে চান বা না-চান আপনার গোটা বইখানার আলোচ্য বিষয় হল ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ করা। কাজেই নিজেকে বাইরে থেকে উটকো দর্শক বলে জাহির করার ভান করবেন না... যে-কোনো কারণেই হোক বইখানায় শিক্ষামূলক বক্তব্যগুলো হয় সবই পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে আর নয়তো তাদের খুঁজে পাওয়া যায় লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে। মনে হয় যেন শিক্ষক বনতে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন।' গলায় বেশ একটু ধমকের সুর ফুটিয়ে এইভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার পর তিনি ফের জোর দিয়ে বললেন যে বইটিতে আমার মতামত এবং ছেলেমেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার নানা পর্যবেক্ষণ থেকেই শিশুদের লালনের ব্যাপারে 'কী-কী করা উচিত' ও 'কী-কী করা উচিত নয়' ইত্যাকার মন্তব্যে পেঁছতে আমি বাধ্য।

আমি তখন মাকারেঙ্কোর এসব কথা মানি নি বটে তবে বছর পনেরো পরে যখন আমার ওই বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময় এল তখন মাকারেঙ্কোর সেই ভর্ৎসনা মনে পড়ে গেল আমার আর যেখানে-যেখানে সম্ভব হল সেখানেই আমি বইখানার শিক্ষামূলক দিকটি পরিস্ফুট করে তুললুম।

এর ফলে বইখানার যা-কিছু উন্নতি ঘটেছে তার জন্যে প্রথমত ও প্রধানত মাকারেঙ্কোর কাছেই আমি ঋণী।

৪

কিস্‌লভোদ্‌স্কে থাকার সময় শেষের দিকে মাকারেঙ্কো প্রতি সন্ধেতেই আমার ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন আর তাঁর খুব অন্তরঙ্গ এক ব্যক্তি যাঁর অভাব তিনি তখন ভয়ঙ্কর অনুভব করছিলেন তাঁর স্ত্রী সেই গালিনার কথা বলতেন আমাদের কাছে। গালিনা মাকারেঙ্কোর সঙ্গে কিস্‌লভোদ্‌স্কে আসতে পারেন নি, তাঁকে মস্কোয় থেকে যেতে হয়েছিল। তাঁকে ছাড়া নিজেকে ভারি অসহায় অনাথ বলে মনে করছিলেন মাকারেঙ্কো, আর তাই গালিনার কথা সাতখানা করে বলে নিজের নিঃসঙ্গ 'অনাথ' অবস্থার দুঃসহ ভার লাঘবের জন্যে সর্বদাই ভারি ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। তাঁর কথা থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলুম যে তার আগে বেশ কয়েক বছর ধরে গালিনা ছিলেন মাকারেঙ্কোর সকল কাজের সহযোগী। সারাদিনের হাড়ভাঙা লেখার খাটুনির পরে প্রতিদিন সন্ধেবেলাটিতে তিনি অসম্ভব ব্যাকুল হয়ে উঠতেন গালিনার কাছে (যদিও তিনি তখন মাকারেঙ্কোর কাছ থেকে অনেক দূরে) বুকখানা উজাড় করে মন খুলে একটু কথা বলতে, যা তাঁর পক্ষে চেপে

রাখা প্রায় সাধ্যাতীত ছিল গালিনার প্রতি তাঁর সেই কাব্যময় সকৃতজ্ঞ মনোভাবটুকু তাঁরই কাছে ব্যক্ত করতে। অন্য লোকের মুখে যেসব কথাবার্তা ভাবপ্রবণ ঠেকত কিংবা তুচ্ছ ন্যাকামি বলে মনে হোত, মাকারেঙ্কোর মুখে তাই-ই এমন স্বাভাবিক ও জ্বলন্ত অনুপ্রেরণার প্রকাশ বলে ঠেকত যে আমাদের মন তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠত আর তাঁর কথা শুনতে-শুনতে চমৎকৃত হয়ে যেতুম এই ভেবে যে সেই কঠোর প্রকৃতির মানুষটির মধ্যে অতখানি কাব্যিক ঐশ্বর্য লুকিয়ে থাকতে পেরেছিল কী করে!

স্ত্রীর সঙ্গে আমি যেদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ছেড়ে এলুম মাকারেঙ্কো সেদিন স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আমাদের সঙ্গে এলেন। আর এই সমস্ত বিদায়ের মুহূর্তে যেমন চিরকাল মনে হয়ে থাকে সেদিনও তেমনই আমাদের দু'জনেরই মনে হয়েছিল যে ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে এমনই বারে বারে দেখাসাক্ষাৎ আর আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটবে।

হায়রে, তখন কে জানত যে ভবিষ্যৎ একেবারে অন্যরকম হতে চলেছে!

মস্কোয় ফিরে আসার পর প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন আমি কাজকর্মে ও দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্বাহে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে রইলুম। অতঃপর ফুরসত পেলুম মাকারেঙ্কোর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু দেখা গেল, সাক্ষাৎকারের জন্যে আমি খুব ভুল সময় বেছেছি। লাভ্রুশিন্স্কি স্ট্রিটে মাকারেঙ্কোর নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির সদরের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম যখন তখন টাইপরাইটারের সেই পরিচিত খটাখট শব্দ কানে এল। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা নিয়ে মাকারেঙ্কো তখন তাঁর দৈনন্দিন

কাজের বরাদ্দটুকু দ্রুত শেষ করে চলেছিলেন। গিয়ে পৌঁছলুম যখন তখন তিনি রীতিমতো কাজে ডুবে ছিলেন, তবু তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের ভারি ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তাঁদের নতুন ফ্ল্যাটবাড়িটি দেখালেন আমায়।

গোটা ফ্ল্যাটটি যেন মাকারেঙ্কোর সাহিত্যিক পরিকল্পনায়, অধৈর্য আগ্রহে ও প্রত্যাশায় ধুকপুক করছিল (কিংবা কে জানে তখন হয়তো আমার ওইরকম মনে হয়েছিল)। তিনি আমায় জানালেন যে মস্কোয় ফিরে আসার পর তখন তাঁর অন্যান্য দায়দায়িত্বের বোঝা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে, কাজেই তিনি নিশ্চিন্তমনে এবার একে-একে একখানি নাটক, ফিল্মের একখানি সিনারিও ও একখানি উপন্যাস লিখবেন। ভবিষ্যতে আরও কী-কী বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেবেন, ফিল্মের গল্প ও খবরের কাগজের প্রবন্ধ লিখবেন সে-কথাও বললেন। অথচ আমি দেখছিলুম তাঁর মুখখানা প্রচণ্ড ক্লান্তিতে একেবারে শুকিয়ে গেছে আর তাঁর স্ত্রী গালিনা থেকে-থেকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চোরা-চোখে তাকাচ্ছেন।

বিদায় নেয়ার পর আমার পেছনে ফ্ল্যাটের দরজা সবে বন্ধ হয়েছে কি হয় নি এমন সময় ফের সেই টাইপরাইটারের অদম্য খটাখট আওয়াজ শুরু হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

ওইদিনের সাক্ষাতের পর দুটো মাসও কাটে নি এমন সময় একদিন, ১৯৩৯ সালের ১ এপ্রিল তারিখে, মস্কোর একটি ফিল্ম-স্টুডিওয় একখানি নতুন (কিংবা, আমার যতদূর মনে পড়ে, সংশোধিত) ফিল্ম-সিনারিও দিতে যাওয়ার পথে একটি লোকাল ট্রেনে হঠাৎ মারা যান মাকারেঙ্কো। তাঁর বয়স তখন একান্ন বছর।



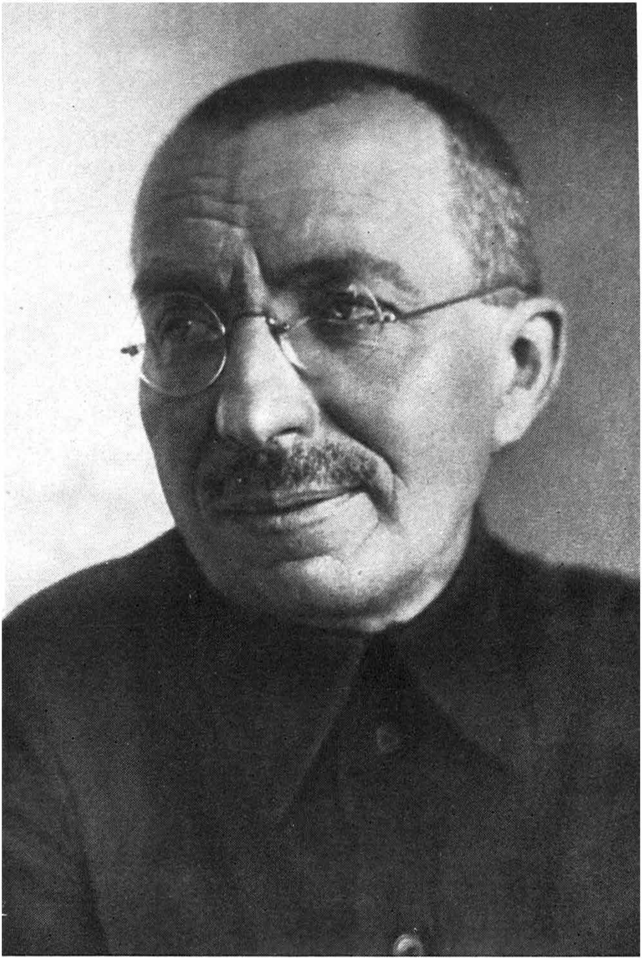
স্কুলের ছাত্র আন্তন মাকারেঙ্কো



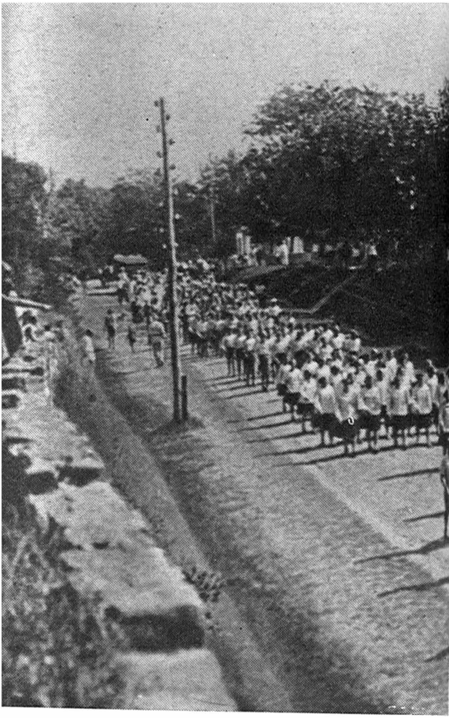
পোল্‌তাভা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের ছাত্র হিসেবে মাকারেঙ্কো
(১৯১৪ সাল)



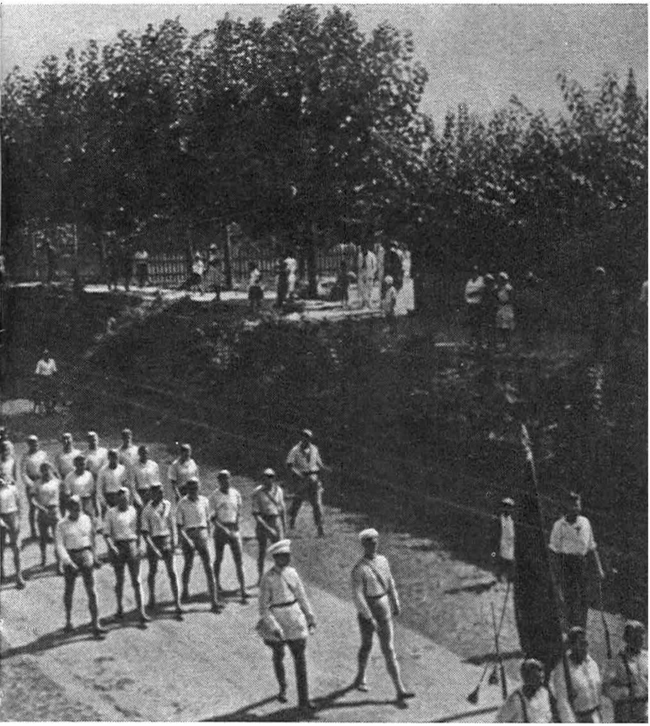
আন্তন মাকারেঙ্কো (পোল্‌তাভা, ১৯২০ সাল)



গোর্কি কলোনির প্রধান হিসেবে আন্তন মাকারেংকো (১৯২৮ সাল)



কুচকাওয়াজে এগিয়ে চলা





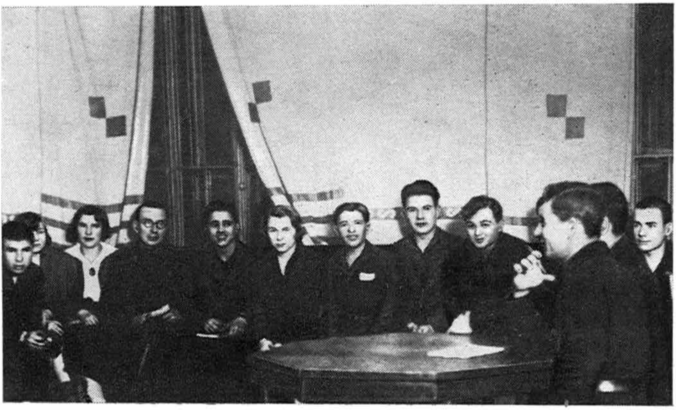
কলোনির ব্যাণ্ডপার্টি







একদল ছাত্র সহ মাক্সিম গোর্কি ও আন্তন মাকারেঙ্কো



দলপতি-পরিষদের সভায়



সাহিত্যের ক্লাস

শিক্ষাব্যাপারে মাকারেঙ্কো

শিশুশিক্ষা-বিষয়ক বক্তৃতাবলী (সংক্ষেপিত)

পরিবারে শিশুলালন সম্পর্কে সাধারণ পথনির্দেশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রিয় অভিভাবক ও নাগরিকবৃন্দ!

শিশুসন্তানদের মানুষ করে তোলা আপনাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, বিশ্বের ভাবী নাগরিক তারা। ওরা তৈরি করবে নতুন ইতিহাস। আমাদের শিশুরা ভবিষ্যৎ পিতামাতাও বটে, ওদের আবার নিজ-নিজ শিশুসন্তানকে মানুষ করে তুলতে হবে। অতএব আমাদের শিশুদের যোগ্য নাগরিক, সুযোগ্য বাপ-মা হিসেবে গড়ে ওঠা দরকার। শুধু তা-ই নয়, আমাদের শিশুরা আমাদের বৃদ্ধ বয়সের সুখদুঃখের নিয়ন্তা। তাদের যথাযোগ্য, সঠিক লালনের অর্থ আমরা সুখে বার্ধক্য কাটাতে পারব আর খারাপভাবে তাদের বড় করে তোলার মানে ভবিষ্যতে আমাদের কষ্ট পেতে হবে, চোখের জল ফেলতে হবে, অন্য মানুষের কাছে, গোটা দেশের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাদের।

প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, প্রথমেই আপনাদের বুঝতে হবে এ-কাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, কী বিপুল পরিমাণ দায়িত্ব জড়িত এর সঙ্গে।

পরিবারের মধ্যে সন্তানলালনের বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা একটি আলোচনামালার সূত্রপাত ঘটাতে যাচ্ছি। এর পরে অবশ্য শিশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত আলাদা-আলাদা দিকগুলি — যেমন, শৃঙ্খলা ও বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব, খেলাধুলো, খাওয়াপরা, বিনয় ও সৌজন্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে এ-সমস্তই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ-সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় নামার আগে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এমন কিছু সমস্যার দিকে সাধারণভাবে যেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিক্ষাদানের যাবতীয় দিকের সঙ্গে যেগুলি সম্পর্কিত। এই প্রশ্নগুলি সর্বদাই মনে রাখা দরকার।

প্রথমেই আপনাদের আমি এই কথাটি মনে রাখতে বলি যে শিশুকে সঠিক ও স্বাভাবিকভাবে মানুষ করে তোলা অনেক-অনেক গুণ সহজ, কেঁচে গণ্ডূষ করিয়ে তাকে পুনঃশিক্ষিত করে তোলার চেয়ে। একেবারে শুরু থেকে সঠিক পদ্ধতিতে শিশুকে মানুষ করে তোলা অনেকে যতটা কঠিন বলে মনে করে আসলে তার চেয়ে তা বহুগুণে কম কঠিন কাজ। এটা এমন একটা ব্যাপার যা প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি বাপ-মায়ের পক্ষে সম্ভব। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের শিশু-সন্তানটিকে ভালোভাবে মানুষ করে তুলতে পারে যদি সে সত্যিই তা করতে আগ্রহী থাকে। এ-কাজটা ভারি সুখপ্রদ, আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ। কিন্তু পুনঃশিক্ষাদান একেবারে অন্য ধরনের ব্যাপার। আপনার সন্তান যদি

বেঠিকভাবে বড় হয়ে উঠে থাকে, যদি আপনি নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি কিংবা অবহেলা-অমনযোগের দোষে দোষী হন কিংবা নিছক কুঁড়েমি করে সন্তানপালনে অবহেলা করে থাকেন, তাহলে পরে সেইসব দোষত্রুটি ক্ষালন করতে হলে ও বিচ্যুতির সংশোধন ঘটাতে হলে অনেক-অনেক বেশি খাটতে হবে। শিশুর চরিত্র সংশোধন ও পুনঃশিক্ষাদান মোটেই সহজ কাজ নয়। এ-জিনিস সম্ভব করে তুলতে হলে এত বেশি মানসিক শক্তি, জ্ঞানগম্যি ও এত বেশিরকম ধৈর্যের দরকার পড়ে যা বেশ কিছু বাপ-মায়ের সাধ্যায়ত্তই নয়। প্রায়ই দেখা যায় যখন কোনো পরিবার সন্তানকে পুনঃশিক্ষাদানের সঙ্গে সংযুক্ত বহুতর সমস্যা সামলে উঠতে না-পেরে হিমসিম খায়, তখন তারা ছেলে বা মেয়েকে উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত এমন যে-কোনো কলোনিতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এমন সমস্ত ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে যখন শিশু ও কিশোরদের কলোনি পর্যন্ত এ-ব্যাপারে বাপ-মাকে কোনোরকম সাহায্য দিয়ে উঠতে পারে নি, আর সেই শিশু বা কিশোর পূর্ণবয়স্ক যুবক-যুবতী হয়ে উঠে সংসারে প্রবেশ করেছে চরিত্রগত নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েই। আবার সেই সমস্ত ঘটনার কথাও যদি ধরি যেসব ক্ষেত্রে পুনঃশিক্ষাদানের এই কাজ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আলোচ্য ছেলেটি বা মেয়েটি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে সমর্থ হয়েছে ও সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে, সেক্ষেত্রে বাপ-মা সহ সকলেই এতে সুখী হলেও কেউই একথাটা বিবেচনা করতে চায় না যে ছেলে বা মেয়েটির জীবন নতুন করে পুনর্গঠিত করতে গিয়ে অনর্থক কতখানি সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটল। সেই ছেলে বা মেয়েটি যদি গোড়া থেকেই ঠিকমতো লালিত হোত

তাহলে সে জীবনের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পেতে পারত, জীবন শুরু করতে পারত সবলতর হয়ে, অভিজ্ঞতায় অপেক্ষাকৃত বেশি সমৃদ্ধ হয়ে এবং ফলত অপেক্ষাকৃত সুখে। তদুপরি, পুরনো স্বভাবের খোলনলচে পালটে পুনঃশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার যে-কাজ তা কেবল অপেক্ষাকৃত বেশি কঠিনই নয়, বেশি দুঃখজনকও বটে। এমন কি এসব ক্ষেত্রে যখন পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব হয়, তখনও কিন্তু এ-ধরনের কাজে বাপ-মায়ের বারে-বারে আশাভঙ্গ ঘটে, তাঁদের স্নায়ুদৌর্বল্যের তা কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রায়ই তাঁদের চরিত্রের ওপরও তা নেতিবাচক প্রভাববিস্তার করে থাকে।

অতএব এ-ব্যাপারটা সর্বদাই খেয়াল রাখতে বাবা-মাদের আমি পরামর্শ দেব। তাঁদের বলব, ছেলেমেয়েদের সর্বদাই এমনভাবে মানুষ করে তুলতে সচেষ্ট হোন যাতে পরে তাদের স্বভাবের কোনো কিছু পালটানোর প্রয়োজন একেবারেই না-পড়ে, যাতে গোড়া থেকেই সবকিছু সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়।

...আমি জানি যে ছেলেপিলে মানুষ করার এই কাজটি কিছু-কিছু ক্ষেত্রে অপর অনেক ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি সফলভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়। এটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল এ-ব্যাপারে সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক শর্ত হল পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তব কাঠামো ও তার ভারসাম্য বজায় থাকা। এই কাঠামোটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবারের মধ্যে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরিবারের মধ্যে

একসঙ্গে বেশ ক'টি ছেলেপিলে মানুষ করার চেয়ে একটিমাত্র ছেলে বা মেয়ে মানুষ করা অনেক বেশি কঠিন। এমন কি যে-সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবারে কিছুটা আর্থিক অসুবিধে থাকে সেখানেও বাপ-মায়ের পক্ষে একটিমাত্র ছেলে বা মেয়েতে সন্তানের জন্মদান সীমাবদ্ধ রাখা ভুল। একমাত্র সন্তান দেখতে-দেখতে গোটা পরিবারের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। আর একটিমাত্র সন্তানের প্রতি বাপ-মায়ের মনোযোগ সাধারণতই স্বাভাবিক বিচক্ষণতার মাত্রা যায় ছাড়িয়ে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা খানিকটা মৃগীরোগীর বাতিকের চেহারা নেয়। একমাত্র সন্তানের অসুখবিসুখ কিংবা মৃত্যু পরিবারের পক্ষে ভয়াবহ ট্রাজেডি হয়ে দাঁড়ায়, ফলে বাপ-মায়ের মনে এরকম বিপদ-আপদের ভয় সর্বদাই বাসা বেঁধে থাকে আর মানুষের পক্ষে যতখানি স্বস্তিতে থাকা দরকার তা তাঁরা থাকতে পারেন না। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে একমাত্র সন্তান পরিবারের মধ্যে তার বিশিষ্ট মর্যাদা ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং সত্যিকার উৎপীড়ক হয়ে দাঁড়ায়। বাপ-মায়ের পক্ষেও এসব ক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মনোযোগ মাত্রার মধ্যে সামলে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে এবং চান বা না-চান শেষপর্যন্ত তাঁরা দেখতে পান যে ছেলে বা মেয়েটিকে তাঁরা একান্ত আত্মসর্বস্ব করে গড়ে তুলেছেন।

একাধিক সন্তানের পরিবারেই একমাত্র বাপ-মায়ের স্নেহযত্ন স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে থাকতে পারে। আর এই স্নেহযত্ন সমানভাবে তখন সকল সন্তানের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। বহু ভাইবোনের পরিবারে ছেলেপিলেরা একেবারে শিশুবয়স থেকেই যৌথ জীবনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শেখে ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা

অর্জন করে। নানাবয়সী ভাইবোনের বৃহৎ পরিবারে বাচ্চারা পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপ্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে স্নেহমমতা ও বন্ধুতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এরকম একটি পরিবারে বাস্তব জীবনই বাচ্চাদের পক্ষে সম্ভব করে তোলে নানাজাতীয় মানবিক সম্পর্কের পটভূমিতে নিজের নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পেতে। একমাত্র সন্তানের যা ধ্যানধারণার বাইরে এমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যপালনের সম্মুখীন হয় এ-সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। যথা, তারা ভালোবাসতে শেখে বয়সে বড় বা ছোট ভাইটিকে — (যার জন্যে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার দরকার হয়) এবং শেখে ভাইবোনেদের মধ্যে সবকিছু জিনিসপত্র ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে ও তাদের প্রতি দরদ ও আগ্রহ দেখাতে। আর এই সবকিছুই তারা শেখে মূল ব্যাপারটা আয়ত্ত করা ছাড়াও, আর তা হল প্রতিটি পদক্ষেপে, এমন কি খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েও, যৌথ জীবনযাত্রার মধ্যে শিশুর নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। বিশেষ করে সোভিয়েত শিক্ষা-ব্যবস্থার পটভূমিতে এই ধরনের যৌথ জীবনযাপনের শিক্ষালাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুর্জোয়া পরিবারে কিন্তু এই প্রশ্নটি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা সেক্ষেত্রে গোটা সমাজ-ব্যবস্থারই ভিত্তি হচ্ছে আত্মস্বার্থ রক্ষার অহংবাদী নীতি।

এছাড়া আরও নানারকম সমস্যা আছে, যা পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে দেখা দেয়। বাবা-মা যদি আলাদা জায়গায় থাকেন কিংবা তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তাহলে সন্তানের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার ফল হয় অত্যন্ত নেতিবাচক। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেপিলেকে কেন্দ্র করে বাপ-মায়ের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ বেধে উঠতেও দেখা যায় আর ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে বাপ-মায়ের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা

এতদূর প্রকাশ্য হয়ে পড়ে যে যে ছেলেপিলেদের কাছেও তা গোপন থাকে না।

যে-সমস্ত বাপ-মা যে-কোনো কারণেই হোক পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান তাঁদের এটা মনে করিয়ে দেয়া বিশেষ প্রয়োজন যে পরস্পর ঝগড়াবিবাদ করা ও মতানৈক্য প্রকাশ করার সময় তাঁরা যেন ছেলেমেয়ের কথাটাও মনের মধ্যে একটু স্থান দেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ ও তার কারণ যা-ই থাকুক না কেন, মোটামুটি ভদ্রজনোচিত উপায়ে অবশ্যই তার সমাধান করা যেতে পারে। একদার জীবনসঙ্গী সম্পর্কে বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা ছেলেমেয়েদের সামনে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকাটা নিশ্চয়ই সম্ভব। অবশ্য যে-পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে চলে গেছেন তাঁর পক্ষে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে আগের মতো কিংবা অন্য কোনোভাবে কোনো ভূমিকাপালন সত্যিই কঠিন। তবে তাঁর প্রাক্তন পরিবারের পক্ষে কল্যাণকর এমন কোনো প্রভাববিস্তারে যদি তিনি অপারগ হন, তাহলে বরং তাঁর এমনভাবে চলাফেরা করাই ভালো যাতে তাঁর পরিবার তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। সেটাই হবে তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সৎ আচরণ। অবশ্য এর অর্থ মোটেই এ নয় যে বাপ তাঁর পরিত্যক্ত সন্তানদের প্রতি আর্থিক দায়দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হবেন।

পরিবারের কাঠামো-সংক্রান্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুবই তন্নিষ্ঠভাবে বিষয়টির আলোচনা করা উচিত।

বাবা-মা যদি সত্যিই তাঁদের সন্তানদের ভালোবাসেন ও যথাসাধ্য প্রয়াসে তাদের মানুষ করে তুলতে চান, তাহলে তাঁদের উচিত নিজেদের মধ্যে মতভেদ যাতে বিচ্ছেদের

পর্যায়ে না-পৌঁছয় তার চেষ্টা করা ও ছেলেপিলেদের কঠিন অবস্থায় ফেলাটা এড়িয়ে চলা।

এরপর যে-বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশের যোগ্য তা হল শিক্ষাদান ও শিশুদের লালনপালনের লক্ষ্যটি। এমন কিছু পরিবার আছে যেখানে এটা স্পষ্ট যে উপরোক্ত এই প্রশ্নটি নিয়ে সেখানে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। বাপ-মা সেখানে ছেলেপিলের পাশাপাশি নিছক বাস করে চলেছেন মাত্র আর আশা করছেন যে ভবিষ্যতে আপনা থেকেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'খন। এসব ক্ষেত্রে বাপ-মাকে দেখে মনে হয় যে তাঁদের সামনে কোনো স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, ছকে-রাখা কোনো কর্মসূচিও নেই। বলা বাহুল্য, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ফলাফল সর্বদাই এলোমেলো হতে দেখা যায় এবং ছেলেপিলে যখন ভালো তৈরি না-হয় তখন প্রায়ই এ-ধরনের বাপ-মাকে অবাক হতে দেখতে পাই। এ তো জানা কথাই যে গোড়া থেকে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য চোখের সামনে না থাকে তাহলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

প্রতিটি বাবা-মায়ের নিশ্চয়ই ভালো করে এটা জানা দরকার যে তাঁদের সন্তানের মধ্যে কোন চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যকে তাঁরা লালন করে তুলতে চান। সত্যিই কী-যে তাঁরা চান সে-সম্পর্কে বাপ-মা হিসেবে তাঁদের নিজেদেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যিক। নিজেদেরই আপনারা জিজ্ঞাসা করুন যে, সোভিয়েত দেশের এমন এক সত্যিকার নাগরিক হিসেবে সন্তানকে আপনারা গড়ে তুলতে চান কিনা যে হবে শিক্ষিত, কর্মচঞ্চল, সৎ, দেশের মানুষ ও বিপ্লবের প্রতি একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, আশাবাদী ও ভদ্র। নাকি চান যে আপনাদের সন্তান হোক লোভী বিষয়াসক্ত, ভীরু আর

ধূর্ত, কাজ উদ্ধারে পোক্ত লোক? বিষয়টা নিয়ে নিজ মনে কিংবা অন্যদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে গভীরভাবে বেশ কিছুটা চিন্তা করার মতো কষ্টস্বীকার করুন দেখি, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা ধরতে পারবেন অতীতে কোথায়-কোথায় কী-কী ভুল আপনারা করেছেন এবং ভবিষ্যতে কোন-কোন সঠিক পথ ধরে আপনাদের পক্ষে চলা সম্ভব হতে পারে...

এক্ষেত্রে আপনার নিজের আচরণটাই হল আসল জিনিস। ভুলেও কখনও মনে এমন ধারণা পোষণ করবেন না যে যখন আপনি সন্তানের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছেন, আলাপ-আলোচনা করছেন, একমাত্র তখনই আপনি তার চরিত্রগঠনে হাত লাগিয়েছেন, কিংবা যখন আপনি তাকে উপদেশ দিচ্ছেন তখনই শিক্ষা দিচ্ছেন তাকে। মনে রাখবেন, আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আপনি তার চরিত্র গড়ে তুলছেন, এমন কি যখন আপনি বাড়িতে থাকছেন না তখনও। আপনার পোশাক-আশাকের ধরনধারণ, অন্য লোকের সঙ্গে কিংবা অপরের সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যখন আপনি কিছু বলছেন তার ধরন, বন্ধুদের ও শত্রুদের সঙ্গে যেভাবে আপনি আচরণ করছেন, যেভাবে হাসি-তামাশা করছেন কিংবা খবরের কাগজ পড়ছেন আপনি — তার সবকিছুই আপনার সন্তানের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু আপনার কণ্ঠস্বরের সামান্য পরিবর্তন পর্যন্ত লক্ষ্য করে কিংবা ধরতে পারে। আপনি নিজে লক্ষ্য না-করলেও আপনার চিন্তার ধারা কী এক রহস্যজনক উপায়ে শিশুর কাছে ঠিকই ধরা পড়ে যায়। বাড়িতে যদি আপনি রূঢ় কিংবা দাম্ভিক আচরণ করেন কিংবা মদ্যপানের মতো কাজ-কারবার চালাতে থাকেন, অথবা যা আরও খারাপ সেই কাজ

করতে থাকেন, অর্থাৎ স্ত্রীকে অপমান করে চলেন, তাহলে আপনি-যে কীভাবে ছেলেপিলেকে মানুষ করছেন তা আর বলার দরকার করে না। কেননা ছেলেপিলেকে আপনি ঠিক ওইভাবেই শিক্ষা দিচ্ছেন আর তা দিচ্ছেন ভুল পথের আর অন্যান্য সময়ে চমৎকার-চমৎকার উপদেশ দিয়ে কিংবা দারুণ সব শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করেও আপনি কোনো কিছুরই সুরাহা করতে পারবেন না।

বাবা-মা'রা নিজেদের আচার-আচরণের যে-মানটি স্থাপন করেন, নিজ পরিবারকে যে-পরিমাণে সম্মান দেন, প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেদের ধরনধারণের ওপর যতটুকু লাগাম কষেন — সন্তানলালনের ক্ষেত্রে সেইসবই হয়ে দাঁড়ায় একেবারে প্রাথমিক যতসব পদ্ধতি প্রয়োগের সামিল!

আজকাল এমন সমস্ত বাপ-মাও দেখা যায় যাঁরা মনে করেন যে, ছেলেপিলে মানুষ করতে হলে ভোজবাজির মতো কিছু কৌশল জানা দরকার আর এটা জানতে পারলেই নাকি সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে। এঁদের ধারণা, এমন কিছু কায়দাকৌশল যদি সবচেয়ে কর্মবিমুখ বাপ-মায়েরও আয়ত্তে থাকে তাহলে তাঁরাও ছেলে বা মেয়েকে কঠোর পরিশ্রমী করে তৈরি করতে পারবেন, কিংবা কোনো বদমায়েশ লোকের তা জানা থাকলে সে-ও সন্তানকে সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আবার মিথ্যেবাদী বাপের হাতে এই কৌশলের যাদু থাকলে নাকি অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, তার সন্তান গড়ে উঠতে পারে একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে।

কিন্তু ব্যাপার হল এই যে এ-ধরনের অলৌকিক কান্ডকারখানা ঘটতে দেখা যায় না। বাপ বা মায়ের চরিত্রে বড় রকমের কোনো খুঁত থাকলে কোনোরকম হাতে-গরম কায়দাকৌশলেই কোনো কাজ হবার নয়।

বরং উলটো, বাপ-মায়ের এইসব চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতির দিকেই বিশেষ করে নজর দেয়া দরকার। আর যাদুবিদ্যার কৌশলের কথা বলতে গেলে এই মোক্ষম কথাটি স্পষ্ট করে বলাই যথেষ্ট যে শিক্ষাদান ও শিশুপালনের ক্ষেত্রে কোনোরকম ভোজবাজিই কোনো কাজে আসে না। তবে দুঃখের বিষয় এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখা যায় যারা কিনা এই ধরনের সাঁটে মেরে দেয়ায় বিশ্বাস রাখে। তাই দেখতে পাই কেউ হয়তো মাথা খাটিয়ে ছেলেপিলেকে শাস্তি দেবার নিত্য-নতুন পদ্ধতি বের করছে, কেউ তাদের ভোলাতে চাইছে নতুন-নতুন উপহার দিয়ে, কেউ-বা ছেলেপিলের মনোরঞ্জনের জন্যে বাড়িতে মজাদার ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে, আবার কেউ এটা-সেটা দেবে বলে কথার ঘুষ দিয়ে ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে মনোমতো ফল পেতে চাইছে।

কিন্তু সত্যিসত্যিই ছেলেমেয়েকে যথাযথভাবে মানুষ করে তুলতে হলে কাজটাকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে একান্ত মনোযোগী, অকপট ও আন্তরিকভাবেই তা করার চেষ্টা করতে হবে। ভালো বাবা-মা'র সৎ জীবনযাপন বলতে প্রথমত ও প্রধানত এই তিনটি গুণের সমন্বয়কেই বুঝতে হবে। এ-ব্যাপারে এমন কি আন্তরিকতার একেবারে সামান্যতম অভাব ঘটলে এবং কৃত্রিমতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ছ্যাবলামির বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচ লাগলেই বাপ-মায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর অর্থ কিন্তু মোটেই এ নয় যে আপনাদের সর্বদাই রাশভারি হয়ে কিংবা তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে থাকতে হবে — শুধুমাত্র আন্তরিক হোন, বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে ও সেই মুহূর্তে আপনাদের পরিবারে যা ঘটছে তার মূল

ব্যাপারটার সঙ্গে আপনাদের মেজাজের সামঞ্জস্য রাখুন, তাহলেই চলবে।

আসল কাজ সাঁটে মারতে চাইলে তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কাজটির সত্যিকার লক্ষ্য থেকে তার দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। এরকম চেষ্টার ফলে সবচেয়ে বেশি করে যা ঘটে তা হল বাপ-মায়ের মনোযোগ আমোদ-আহ্লাদে অনেকখানি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অপেক্ষাকৃত ভালো কাজে লাগতে পারত এমন অনেকটা সময় তাঁদের নষ্ট হয়। আর তখন অনেক বাবা-মা'ই এই বলে অনুযোগ করতে থাকেন যে তাঁরা ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেবার একেবারেই সময় পাচ্ছেন না।

বাবা-মা যদি ছেলেপিলের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই, আর ছেলেপিলেকে দেখার ও তাদের সঙ্গে মেলামেশার সময় তাঁরা না-পেলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপারও কিছু হতে পারে না। তবে এ-প্রসঙ্গে কথাটা বলা একান্ত আবশ্যক যে সঠিকভাবে সন্তানলালনের অর্থ মোটেই এ নয় যে বাবা-মা ছেলেপিলেকে কখনোই চোখের আড়াল করবেন না। ছেলে মানুষ করার এই ধরনের পদ্ধতি বাচ্চাদের ক্ষতি ছাড়া ভালো করে না। এর ফলে ছেলেপিলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং এই ধরনের বাপ-মায়ের ছেলেপিলেরা বড়দের সঙ্গ পেতে বড় বেশি অভ্যস্ত হয় ও তাদের মানসিক বিকাশটাও স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি দ্রুত ঘটে। এ-সমস্ত বাপ-মা অবশ্য ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির এই অস্বাভাবিক বিকাশ নিয়ে গর্ব করতে ভালোবাসেন, তবে পরে প্রায়ই তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে ছেলেমেয়েদের চালাকচতুর করে তোলার জন্যে তাঁরা একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন।

এটা খুবই দরকারি যে আপনাদের বাচ্চা কী করে, কোথায় যায় ও কার সঙ্গে মেশে আপনারা তার খোঁজ খবর রাখবেন, তবু সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে সে যাতে চব্বিশ ঘণ্টাই আপনাদের চোখে-চোখে না থেকে অন্য বহুতর বিচিত্র প্রভাবের সংস্পর্শে আসে তার জন্যে তাকে আপনাদের যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিতে হবে। এটা কখনোই মনে ঠাঁই দেবেন না যে যে-সমস্ত প্রভাব নেতিবাচক কিংবা এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাদের হাত থেকে সন্তানকে ভয়ে-ভয়ে সযত্নে আড়াল করে রাখাই আপনাদের কাজ। কেননা আপনাদের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবন এমনই যে তা আপনাদের সন্তানকে তার পক্ষে অপরিচিত কিংবা এমন কি ক্ষতিকারকও নানারকম প্রলোভনের, মানুষজনের ও ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেই। এক্ষেত্রে আপনাদের কাজ হবে কেবল তার মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতাটা জাগিয়ে তোলা যাতে সে এইসব বাইরের প্রভাবের মধ্যে তারতম্য, ঝাড়াইবাছাই করতে পারে, নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এবং সময় থাকতে তাদের স্বরূপ চিনতে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি আপনারা বাচ্চাকে হটহাউসের ক্ষীণপ্রাণ গাছের চারা বলে গণ্য করে বাইরের জগৎ-সংসার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, তাহলে তার মধ্যে ভালোমন্দ বাছবিচারের এই ক্ষমতা মোটেই বেড়ে উঠবে না। অতএব খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের অবশ্যই নানারকম লোকের সংস্পর্শে আসতে দেবেন, তবে সেইসঙ্গে যাদের সঙ্গে আপনাদের ছেলেপিলেরা মেলামেশা করছে তাদের রকমসকম ও মতলব সম্বন্ধে একেবারে চোখ বুজে থাকলে চলবে না।

শিশুদের সর্বদাই সময়মতো সাহায্য যোগানো, সময়মতো তাদের রাশ টানা ও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা দরকার। এর অর্থ, বাবা-মাকে সর্বদাই ছোটখাট, সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বন করে বাচ্চাকে তার জীবনে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তবে কখনোই একেবারে হাত ধরে তাকে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করিয়ে নিয়ে গেলে চলবে না। পরে অবশ্য এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করব, এখানে আমি এটার উল্লেখ করলুম নিছক বাবা-মা'র সময় পাওয়া না-পাওয়ার প্রসঙ্গে। ছেলেপিলে মানুষ করার ব্যাপারে আমরা কতটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাচ্ছি সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুতর কত ভালোভাবে আমাদের হাতের সময়টুকু আমরা তাদের সঙ্গে কাটাচ্ছি। এখানে আমি ফের একবার সেই আগের কথাটার ওপর জোর দিতে চাই যে আপনাদের ছেলেপিলের চরিত্রগঠনের কাজ সারাক্ষণই চলেছে, এমন কি আপনারা যখন বাড়িতে থাকছেন না তখনও।

ইতিমধ্যে আপনারা হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন যে সন্তানপালনের ব্যাপারে বাবা-মায়ের কর্তব্যের একেবারে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে সে-কর্তব্য ছেলেপিলের সঙ্গে কথাবার্তায় কিংবা তাদের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারের মধ্যে নিহিত নেই, তা নিহিত আছে গোটা পারিবারিক জীবন সংগঠিত করা, নিজেদের ব্যক্তিগত ও কাজকর্ম-সংক্রান্ত বহির্জীবন সংগঠিত করা এবং ছেলেমেয়েদের জীবনকেও সুবিন্যস্ত করার মধ্যে। সন্তানলালনের ব্যাপারটা প্রথমত ও প্রধানত হচ্ছে এই সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্ন। শিশুপালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন, অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বলে কিছু নেই। এক্ষেত্রে কোনো খুঁটিনাটিকেই তুচ্ছ বলে

জ্ঞান করা ও তা ভুলে থাকার অধিকার নেই আমাদের। এটা ভাবলে কিন্তু ভয়ঙ্কর ভুল হবে যে আপনাদের জীবনে কিংবা আপনাদের সন্তানদের জীবনে কোনো একটা ব্যাপারকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বেছে নিয়ে তাতেই আপনাদের অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করলে চলবে আর বাকি সবকিছুকে চলার পথের প্রান্তে সরিয়ে রাখলে কিছু এসে-যাবে না। সন্তানদের মানুষ করার কাজে তুচ্ছ বলে কোনো বস্তু নেই। বাচ্চা মেয়েটির চুলবাঁধার জন্যে যে-রিবনটি আপনি ব্যবহার করেন, যে-ছোট্ট টুপিটি তার মাথায় পরিয়ে দেন কিংবা যে-খেলনা হাতে দেন তার — সেই সবকিছুই আপনার সন্তানের জীবনে অশেষ গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিতে পারে। সাবলীল সংগঠনের সঠিক অর্থই হল এই যে ছোটখাট খুঁটিনাটি জিনিস ও ঘটনা আপনার চোখ এড়ায় না। তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য সর্বক্ষণই, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টাতেই, বস্তুত ওদের যোগফলেই গড়ে ওঠে খোদ জীবন। বাবা-মা হিসেবে আপনাদের অবশ্যকরণীয় সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য হল আপনাদের সন্তানদের জীবনে পথনির্দেশক প্রভাববিস্তার ও তাদের জীবন সংগঠনে সাহায্য করা।

পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে শিশুশিক্ষা ও শিশুপালনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আমরা পর্যালোচনা করব। আজকের বক্তব্যগুলি হল সেই পর্যালোচনার ভূমিকামাত্র।

পিতামাতার কর্তৃত্ব-বিষয়ে

...বাবা-মায়ের কর্তৃত্বের উৎস কী ও কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়?

যেসব বাপ-মা'র ছেলেপিলেরা 'অবাধ্য' তাঁদের মধ্যে প্রায়ই এরকম একটা ভাবনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, কর্তৃত্বের ক্ষমতা বুঝি মানুষের সহজাত একটা ব্যাপার এবং এটা অনপেক্ষ একটা প্রতিভাবিশেষ। অতএব কারো মধ্যে যদি এ-প্রতিভার অভাব থাকে তাহলে তার আর কিছুই করার থাকে না কেবল যারা এই প্রতিভার অধিকারী তাদের ঈর্ষা করা ছাড়া। কিন্তু অভিভাবকদের এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসলে প্রতিটি পরিবারেই বাবা-মায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আর তা বিশেষ কোনো কঠিন কাজও নয়।

দুঃখের বিষয় প্রায়ই এমন সব অভিভাবকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁদের সন্তানদের ওপর কর্তৃত্বের ভিত্তি হল একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। ছেলেমেয়েদের নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করানোই হল প্রথমত ও প্রধানত এঁদের লক্ষ্য, এটাকেই এঁরা জীবনে পরম কাম্য বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ এটা একটা পুরোপুরি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। পিতামাতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সন্তানের বশ্যতাস্বীকার কখনোই পরম কাম্য হতে পারে না, তা হওয়া উচিতও নয়। অভিভাবকের লক্ষ্য একটাই মাত্র হওয়া উচিত, তা হল তাঁদের সন্তানদের সঠিকভাবে মানুষ করে তোলা। এটাই একমাত্র লক্ষ্য যেটা তাঁদের পরম কাম্য হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের বশ্যতা ওই লক্ষ্যে পৌঁছনোর নেহাতই একটা পথ মাত্র। যে-সমস্ত বাবা-মা সন্তানের শিক্ষার সত্যিকার লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামান না, একমাত্র তাঁরাই নিছক বশ্যতার জন্যে সন্তানকে বশ মানাতে ব্যস্ত। ছেলেপিলে যদি বশ্য বাধ্য হয় বাপ-মায়ের জীবনযাত্রাও তাহলে সহজতর হয়ে ওঠে, আর এই সহজ জীবনের প্রতি আকর্ষণকেই ওইসব বাপ-মা আর সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়ে থাকেন। তবে ব্যাপারটা ভালো করে লক্ষ্য করলে

সর্বত্রই এটা দেখা যায় যে এ-ধরনের পারিবারিক শান্তি কিংবা বশ্যতা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় না, কেননা ভ্রান্ত পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা কর্তৃত্ব খুব অল্প সময়ের জন্যেই কিছুটা কার্যকর হতে পারে। শিগ্‌গিরই দেখা যায় এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সবকিছু ধসে যাচ্ছে এবং বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব কিংবা ছেলেপিলের বশ্যতার খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকছে। আবার এমনও হতে পারে যে, ছেলেপিলের শিক্ষার অপর সমস্ত চরম লক্ষ্য জলাঞ্জলি দিয়ে বাপ-মা তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লাগলে তার শেষ ফল হিসেবে হয়তো বশ্য বাধ্য ছেলেপিলে তাঁরা পেতে পারেন তবে তারা ভীরু আর দুর্বলচিত্ত ছেলেপিলে হয়ে গড়ে উঠবে।

এমন শূন্যগর্ভ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নানা রকমফের আছে। এখানে আমরা এ-ধরনের দশ রকমের কর্তৃত্বের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করছি। আশা করি প্রশ্নটি নিয়ে এইভাবে পর্যালোচনা করার পর অভিভাবকের নির্ভেজাল কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝায় তা ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

দমনপীড়নের মারফত কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: এটা হল সবচেয়ে দুঃখজনক ধরনের কর্তৃত্ব, যদিও এটা-যে সবচেয়ে ক্ষতিকর তা বলা যায় না। সবচেয়ে বেশি করে বাবারাই এ-ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়ে দোষী হয়ে থাকেন। সংসারে যদি বাবা নামক ব্যক্তিটি সব সময়ে গর্জন করতে থাকেন, সর্বদাই মেজাজ খারাপ করেন, যে-কোনো খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রেগে শুরু করে দেন প্রচণ্ড হাঁকডাক, যে-কোনো ছুতোনাতায় লাঠি কিংবা বেত ব্যবহারের জন্যে খেপে ওঠেন, সব প্রশ্নের জবাব দেন

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ও প্রতিটি ছোটখাট দোষত্রুটির জন্যে ছেলে বা মেয়েকে শাস্তি দিতে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটাকে বলতে হয় দমনপীড়নমূলক কর্তৃত্ব। বাপের কায়েম-করা এই ত্রাসের রাজত্ব গোটা পরিবারটাকেই তটস্থ করে রাখে। কেবল বাচ্চাদের নয়, তাদের মাকেও। শুধুমাত্র বাচ্চারা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে বলেই-যে এ-অবস্থাটা ক্ষতিকর তা নয়, এর ফলে মা-ও হয়ে দাঁড়ান নগণ্য ব্যক্তি, একমাত্র দাসীবৃত্তি ছাড়া সংসারে তাঁর আর কোনো ভূমিকাই থাকে না। এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা-যে কতখানি ক্ষতিকর তা বলার দরকার করে না। এ-অবস্থা ছেলেপিলেকে যথাযথভাবে মানুষ করার পক্ষে সহায়ক তো হয়ই না বরং এর ফলে তারা বাপের ভয়াবহ সান্নিধ্য এড়িয়েই চলে। ছেলেপিলের মধ্যে ভীরুতা ও মিথ্যে কথা বলার প্রবণতাও এর ফলে বেড়ে ওঠে, আবার সেইসঙ্গে তারাও বেড়ে ওঠে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয়ে। আর এই সব পরিবারের সন্ত্রস্ত, দুর্বলচিত্ত ছেলেপিলের পক্ষে হয় মেরুদন্ডহীন নগণ্য মানুষ আর নয়তো এমন সব উৎপীড়ক, দুর্বলের যম হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি যারা নিজেদের অবদমিত পীড়িত শৈশবের জন্যে অন্যদের ওপর তার প্রতিশোধ তুলতে ব্যগ্র হয়ে থাকে। অত্যন্ত ভ্রান্ত ধরনের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একমাত্র অশিক্ষিত বা অ-সংস্কৃত অভিভাবকদের মধ্যেই দেখা যায়। অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আজকাল আমাদের দেশে এ-ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চলন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে।

দূরত্ব বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: কিছু-কিছু বাবা এবং এমন কি মা-ও সত্যিসত্যি বিশ্বাস করেন যে ছেলেপিলেকে বশ মানাতে গেলে তাদের সঙ্গে মেপেজুখে কথাবার্তা বলা ও দূরত্ব বজায় রেখে মেলামেশা করাই

সবচেয়ে ভালো। তাঁদের মতে, একমাত্র কালেভদ্রে ওপর থেকে নিয়মকানুনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পুরনো আমলের বুদ্ধিজীবীদের কিছু-কিছু পরিবারের মধ্যে বিশেষ করে এই ধরনের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই ধরনের সংসারে বাপেদের প্রায়ই নিজস্ব আলাদা পড়ার ঘর থাকে, সেখান থেকে কখনও-সখনও তাঁরা বেরিয়ে এসে সকলকে দেখা দেন অনেকটা বড় গির্জার প্রধান ধর্মযাজকের কায়দায়। এইসব পিতৃদেব আলাদাভাবে খানা খান, আমোদআহ্লাদ করেন আলাদাভাবে এবং তাঁদের রক্ষণাধীন পরিবারকে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে না-হবে এমন কি সে-সম্বন্ধে তাঁদের নির্দেশ ইত্যাদিও ছেলেপিলেকে পরোক্ষভাবে জানান তাঁরা তাদের মায়েদের মারফত। এই ধরনের কিছু-কিছু মাকেও দেখা যায় যাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে থাকেন, নিজস্ব মতামত ও নানা ব্যাপারে নিজস্ব আগ্রহ পোষণ করেন, ওদিকে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হতে থাকে দিদিমাদের কিংবা এমন কি দাসদাসীর তত্ত্বাবধানেও।

এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠাও কোনো দিক থেকে কল্যাণকর নয়।

আত্মাভিমান মারফত কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: দূরত্বরক্ষার মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠারই এটি একটি রকমফের মাত্র, তবে এটি আরও বেশি ক্ষতিকর। কিছু-কিছু লোক মনে করেন যে তাঁরা সমাজের কাছে বিশেষরকম কাম্য ও তার অপরিহার্য কিছু সদস্য। আর এটা তাঁরা কথায়-কথায় যত্রতত্র ফলাও করে বলেন, নিজেদের ছেলেমেয়েদের সামনেও এটা জাহির করতে কসুর করেন না তাঁরা। কাজের জায়গার চেয়েও বাড়িতে তাঁরা বেশি করে মেজাজ নিয়ে চলেন আর বেশি

করে জাহির করেন নিজেদের। অনবরত নিজেদের লম্বা-চওড়া কার্যকলাপের কথা সাতখানা করে বলতে থাকেন তাঁরা আর অন্য সবার সম্পর্কে দাক্ষিণ্যভরে উ'চকপালের ভঙ্গিতে এক-আধটুকু পিঠ-চাপড়ানো কথা বলেন। আর প্রায়ই দেখা যায় ছেলেপিলেরাও এই ধরনের বাপের মুরুব্বিয়ানায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে আর নিজেরাও অন্যের কাছে চাল দিতে শুরু করে। সর্বদাই তারা বন্ধুবান্ধব ও ইশকুলের সঙ্গীসাথীদের কাছে এই বলে চাল দেয় যে তাদের বাবারা সব মস্তমস্ত লোক, কেউ-বা তাঁদের মধ্যে লেখক, কেউ সামরিক অফিসর, আবার কেউ-বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি। চালিয়াতির এই সর্বব্যাপী আবহাওয়ায় আত্মাভিমানী বাবাটি খেয়ালই রাখেন না যে তাঁর ছেলেপিলেরা কী সব প্রবণতা নিয়ে বেড়ে উঠছে, কেমন সব মানুষ তৈরি করছেন তিনি। এই একই ধরনের আধিপত্য মায়েরাও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাঁদের স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট ধরনের পোশাক-আশাক, নামী লোকেদের সঙ্গে পরিচিতি কিংবা ফ্যাশনদুরস্ত স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে অহংকার দেখিয়ে। আর এরই দৌলতে অন্যদের প্রতি উন্নাসিক ভাব দেখান তাঁরা এবং অপর সকলের থেকে নিজেদের পৃথক জীব বলে গণ্য করেন, এমন কি নিজেদের ছেলেপিলেরাও সেই অপর সকলের দল থেকে বাদ পড়ে না।

পণ্ডিতিয়ানা দেখিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: এই ধরনের পরিবারে বাবা-মা বরং বেশি করে নিজেদের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেন, তাদের নিয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামান, অথচ সেই মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা ঘটে আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে। এ'দের দৃঢ় বিশ্বাস যে ছেলেমেয়েদের উচিত বাপ-

মায়ের প্রতিটি কথা দুরুদুরু বুকে কান পেতে শোনা, বাপ-মায়ের কথা শাস্ত্রবাক্য জ্ঞান করা উচিত তাদের। এঁরা সন্তানদের উপদেশ-নির্দেশ দেন শান্ত কঠিন সুরে আর আশা করেন যে কথাগুলো এঁদের মুখ থেকে খসামাত্র সন্তানদের কাছে তা আইন হয়ে দাঁড়াবে। এই ধরনের বাপ-মা সবচেয়ে বেশি যা ভয় করেন তা হল এই, পাছে এমন কিছু ঘটে যাতে ছেলেমেয়েদের মনে ধারণা জন্মায় যে তাদের বাবা ভুলও করতে পারেন কিংবা তাঁর মতের স্থিরতা নেই। এই প্রকৃতির কোনো বাপ যদি একবার বলে বসেন যে 'কাল বৃষ্টি হবে, কাজেই তোমরা কেউ বাইরে বেড়াতে যাবে না', তাহলে পরদিন আবহাওয়া ভালো থাকলেও তিনি হুকুমজারি বহাল রাখবেন যে তাঁর ছেলেমেয়েদের সেদিন বাইরে বেড়াতে যাওয়া কোনোরকমেই চলবে না। এই ধরনের বাপের যদি কোনো একটা ফিল্‌ম খারাপ লাগে, তাহলে তিনি অনায়াসে হুকুমজারি করতে পারেন যে তাঁর ছেলেমেয়েদের সিনেমায় যাওয়া সেদিন থেকে বিলকুল বন্ধ, তা সে ভালো ফিল্‌ম দেখানো হোক চাই না-ই হোক। যদি এমন বাপ সন্তানকে শাস্তি দেয়ার পর জানতে পারেন যে প্রথমে যা মনে হয়েছিল ব্যাপারটা তা নয়, বাচ্চাটি সত্যিই কোনো অভদ্র আচরণ বা অন্য কোনো দোষ করে নি, তাহলেও তিনি শাস্তি মকুব করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না, বরং জিদ ধরে বলতে থাকেন যে যে-সিদ্ধান্ত একবার তিনি নিয়েছেন তা চূড়ান্ত, তার আর হেরফের করা সম্ভব নয়। এই ধরনের বাপেরা ছেলেপিলেকে নিয়ে মাথা ঘামানোর খোরাক প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ে যান, কেননা সন্তানের প্রতিটি চলাফেরায় তাঁরা আইনশৃঙ্খলা ভাঙার নমুনা দেখতে পান আর তখন ফের নতুন করে আইনকানুন

জারি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সমস্ত বাপ বাচ্চার জীবন, তার আগ্রহ-উদ্দীপনা ও তার মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকেন, তাঁদের পরিবারের জীবনকে নিজেদের মতো করে আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না তাঁদের।

নীতিশিক্ষার মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: এ-ধরনের পরিবারে বাপ-মা অনবরত বক্তৃতা আর নৈতিক উপদেশ দিয়ে-দিয়ে তাঁদের সন্তানদের জীবন একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বিষময় করে তোলেন। ছেলেমেয়েদের অল্প কথায়, হয়তো-বা ঠাট্টার ছলে, দু-চারটে নির্দেশ না-দিয়ে এই ধরনের বাপ-মা সন্তানদের একেবারে পেড়ে ফেলে লম্বা, নীরস বক্তৃতার তুবড়ি ছোটাতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ছেলেপিলে মানুষ করতে গেলে সবচেয়ে বিচক্ষণ পন্থা হল বক্তৃতা দেয়া। তাই এই ধরনের পরিবারে আনন্দের উচ্ছ্বাস বা হাসির হর্‌রা উঠতে বড় একটা দেখা যায় না। এ-পরিবারে বাপ-মায়েরা আদর্শ উদাহরণ স্থাপনের জন্যে একেবারে উঠে-পড়ে লেগে যান, কেননা ছেলেমেয়েদের চোখে নিজেদের অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়ে থাকেন তাঁরা। তাঁরা ভুলে যান যে বাচ্চারা বাচ্চাই, তারা প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তাদের নিজস্ব জীবন ও জগৎ আছে, আর সে জীবন ও জগৎ যেমনটি তা মেনেই তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া উচিত। শিশুর জীবন তার প্রাপ্তবয়স্কের চেয়ে আরও চড়া আবেগ ও মত্ততার সুরে বাঁধা, লম্বা-চওড়া বক্তৃতা তার ধাতে সয় না। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার অভ্যাস সে ক্রমে-ক্রমে ও কিছুটা ধীরে-ধীরেই আয়ত্ত করে, তাই বাপ-মায়ের অনর্গল বক্তৃতাবাজি, অনবরত খোঁচাখুঁচি ও অনর্থক বকবকানি শিশুমনে সামান্যই ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। তর্ক

করে শিশুদের মধ্যে অন্য কারো কর্তৃত্ব মেনে চলার বোধটি জাগানো বড় একটা সম্ভব নয়।

স্নেহের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: ভ্রান্তভাবে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার এটা হল সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ধরন। বহু বাপ-মায়ের এরকম দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ছেলেপিলে যদি বাপ-মাকে ভালোবাসে একমাত্র তবেই তারা বশ্য বাধ্য সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠে, আর তাদের কাছ থেকে এই ভালোবাসা পেতে হলে তাদের প্রতি বাপ-মায়ের স্নেহের প্রকাশ প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট হয়ে ওঠা একান্ত আবশ্যিক। একারণে অনবরত মিষ্টি-মিষ্টি কথা, বারবার আদর আর চুম্বন এবং স্নেহের আরও নানারকমের প্রকাশ রীতিমতো বাড়াবাড়ি রকমে সন্তানদের ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে। শিশুসন্তান যদি কখনও অবাধ্য হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কি তার বাবাকে ভালোবাসে না? ছেলেমেয়ের চোখে ভাবপ্রকাশের রকমফের গভীর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে বাবা-মা সারাক্ষণ লক্ষ্য করতে থাকেন, অনবরত ছেলেমেয়ের কাছে দাবি জানাতে থাকেন কোমল আচরণ করা ও ভালোবাসা দেখানোর জন্যে। প্রায়ই দেখা যায় এই ধরনের মায়েরা ছেলেপিলের সামনেই বন্ধুদের বলছেন যে তারা তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে কতই-না ভালোবাসে, কী ভীষণ স্নেহাসক্ত তারা, ইত্যাদি ইত্যাদি...

এই ধরনের পরিবারগুলি ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগের বাড়াবাড়িতে এত বেশি পরিমাণে হাবুডুবু খেয়ে থাকে যে, অন্য কোনো দিকে নজর দেবার ফুরসতটুকুও থাকে না তাদের। এ-সমস্ত বাবা-মা পরিবারের মধ্যে সন্তানলালনের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে খেয়াল করতে ভুলে যান। তাঁরা

আশা করেন যে বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসার বশেই ছেলে বা মেয়ে তার যথাকর্তব্য করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিন্তু বহু ধরনের বিপদের সম্ভাবনা নিহিত। পরিবারগুলিকে এ-দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্মুখ করে তোলে। স্বভাবতই বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় ভালোবাসার উপযোগী আবেগের প্রাবল্য থাকে না। অল্পদিনের মধ্যে তারা বুঝে ফেলে যে তাদের বাবা-মায়ের অতি সহজেই ঠকানো চলে, কেবল মিষ্টি-মিষ্টি কথায় সবকিছু বলতে পারলেই হল। তারা এ-ও বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র মুখ গোমড়া করে থেকে বাপ-মায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসায়-যে ভাঁটার টান ধরেছে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই বাপ-মাকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে তারা। এই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা খুব অল্প বয়স থেকেই শেখে যে মিষ্টি কথা বলে ও স্নেহভালোবাসা দেখিয়ে মানুষকে বশ করা খুব সোজা। নিজেদের পরিবারের লোকজনের মতো অন্যদের অতখানি ভালোবাসা অসম্ভব, তাই এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা এ-ও শিখে ফেলে যে মতলবে-ভরা হিসেবী ভালোবাসা লোকদেখানোভাবে প্রকাশ করে কীভাবে বাইরের লোককে ফুসলিয়ে জিনিসপত্র আদায় করে নিতে হয়। কখনও-কখনও অবশ্য এমন দেখা যায় যে এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের প্রতি দীর্ঘদিন ধরেই অনুরক্ত থাকছে, তবে এ-ও ঠিক যে অন্য সকল মানুষকে তারা কিন্তু নিতান্ত অনাত্মীয় বা পর বলে গণ্য করে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি কিংবা বন্ধুতার ভাব পোষণ করে না।

আসলে এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ধরনের কর্তৃত্বের নমুনা। এর ফলে গড়ে ওঠে যতসব কপট ও মিথ্যাচারী

আত্মসর্বস্ব ছেলেপিলে। আর প্রায়ই এটা দেখা যায় যে এই আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরতার প্রথম শিকার বনছেন ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা নিজেরাই।

দয়াদাক্ষিণ্য মারফত কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: এটি সবচেয়ে অ-বিজ্ঞজনোচিত কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার ধরন। এ-সমস্ত ক্ষেত্রেও শিশুর বশ্যতার মূল নিহিত বাপ-মায়ের প্রতি ভালোবাসায়, তবে সে-ভালোবাসা জাগানোর চেষ্টা হয় চুমো খাওয়া, আদর করা কিংবা ভাবাবেগ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে নয়, অনবরত বিশেষ সুবিধাদান ও বাপ-মায়ের নরম ব্যবহার ও মায়াদয়া প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে শিশুর চোখে বাবা-মা হয়ে দাঁড়ান এক ধরনের পরীর দেশের কল্পতরুর মতো। তাঁরা ছেলেমেয়েকে কোনো কাজেই বাধা দেন না, তাদের কোনো কিছুই তাঁদের চোখে বাড়াবাড়ি ঠেকে না, ছেলেমেয়ের জন্যে অঢেল পয়সা খরচ করতে তাঁদের বাধে না। এক কথায়, তাঁরা আদর্শস্থানীয় বাবা-মা হবার চেষ্টা করেন। এইসব বাপ-মা পাছে ছেলেপিলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন ও যে-কোনো শর্তে বাড়িতে শান্তি বজায় রাখা পছন্দ করেন এবং সবকিছু মসৃণভাবে চললে ওই শান্তিটুকু বজায় রাখার জন্যে তাঁরা যে-কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই সমস্ত পরিবারের ছেলেপিলেরা তাদের বাপ-মাকে কড়ে আঙুলে নাচায়, বাপ-মায়ের দিক থেকে কোনোরকম বাধা না-আসায় তারা চাহিদা, খামখেয়াল ও দাবির মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে চলে। কখনও-সখনও বাপ-মা হয়তো ছোটখাট কোনো-কোনো ব্যাপারে আপত্তিও জানান, কিন্তু দেখা যায় ততদিনে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে এবং শিশুলালনে ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে।

বন্ধুত্বস্থাপনের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: প্রায়ই দেখা যায় যে ছেলেপিলে জন্মাবার আগেই বাপ-মা মনে-মনে এটা স্থির করে ফেলেছেন যে ছেলে বা মেয়েকে তাঁরা বন্ধু করে তুলবেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে এটা মোটেই খারাপ কিছু নয়। বাপ আর ছেলে, মা আর মেয়ে পরস্পরের বন্ধু নিশ্চয়ই হতে পারেন আর তা হওয়া উচিতও। তবু, সব সত্ত্বেও, বাপ-মা পরিবার-যৌথের বয়স্ক সদস্য থেকে যান আর ছেলেপিলেরা থেকে যায় সেইসব সদস্য যাদের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। কাজেই এই বন্ধুত্ব যদি মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে তাহলে শিক্ষাদানের ব্যাপারটাও বিপরীতমুখী হয়ে ওঠে আর ছেলেমেয়েরাই পালটা বাবা-মাকে 'শিক্ষা দিতে' শুরু করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও-কখনও এই ধরনের পরিবারের সাক্ষাৎ মেলে — যেখানে ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে নাম ধরে ডাকে, তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, অভদ্রভাবে তাঁদের কথায় বা কাজেকর্মে বাধা দেয় ও প্রতি পদক্ষেপে কীভাবে চলতে হবে তাঁদেরকে তা বাত্লায়। ফলে ছেলেমেয়েদের বশ্যতাস্বীকারের প্রশ্ন এমন ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। অথচ, সত্যি কথা বলতে কী, এসব ক্ষেত্রে কোনো বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে না, কেননা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাড়া সত্যিকার কোনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা সম্ভবই নয়।

ঘুষ দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা: এটা হল সবচেয়ে নীতিবিরুদ্ধ জাতের কর্তৃত্ব। এসব ক্ষেত্রে উপহার দিয়ে কিংবা উপহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছেলেপিলের কাছ থেকে বশ্যতা 'কেনা' হয় মাত্র। মানসিক দ্বিধাসঙ্কোচমুক্ত কিছু-কিছু বাবা-মা বেশ নিঃসঙ্কোচেই ছেলে বা মেয়েকে এই বলে লোভানি দিয়ে থাকেন যে সে ভালো হয়ে চললে তাকে তাঁরা খেলনা-ঘোড়া কিনে দেবেন কিংবা সার্কাস দেখাতে নিয়ে যাবেন।

অবশ্য বাড়িতে কোনো-না-কোনো কারণে ছেলেপিলেকে উপহার দেয়া দুষ্য কিছু নয়, বরং তা খুবেই সম্ভব। কিন্তু তাই বলে ছেলেমেয়ে ভালো আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলে কিংবা বাপ-মায়ের প্রতি ভালোবাসা জানালে তার প্রতিদানে **কখনোই** উপহার দেয়া উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা উপহার পেতে পারে ইশ্‌কুলের পড়াশুনোয় ভালো নম্বর পেলে কিংবা সত্যিসত্যি কঠিন কোনো দায়িত্ব সম্পাদন করলে। তবে এমন কি এ-সমস্ত ক্ষেত্রেও আগে থেকে কোনোরকম লোভানি দেয়া উচিত নয়। স্কুলে কিংবা অন্য কোনো কাজেও ছেলেপিলেকে আগে থেকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চালনার চেষ্টা একেবারেই ঠিক নয়।

ভ্রান্ত মনোবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা এই সমস্ত ধরনের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও নানারকম কর্তৃত্বের ধরন আছে। যেমন, হৈ-হুল্লোড়, পাণ্ডিত্যজাহির, বাহাদুরি দেখানো এবং সৌন্দর্যের জাঁক দেখিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তবে এছাড়া আরও বহু পরিবার আছে যেখানে বাপ-মা কোনোরকম কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার কথা মনেও স্থান দেন না, তাঁরা দিন থেকে দিনে যখন-যেমন-তখন-তেমন ভাবে এলোমেলো জীবন কাটাতে থাকেন আর তাঁদের সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটা ভালোভাবে সন্তানপালনের চেষ্টা করেন। যেমন, কোনোদিন বাপ হয়তো রেগে একেবারে বজ্রগর্জন শুরু করে দিলেন আর সামান্য ত্রুটির জন্যে বাচ্চা ছেলেকে শাস্তি দিতে লাগলেন, আবার তারপরই আদরসোহাগের বান ডাকিয়ে ছেলেকে অস্থির করে তুললেন। ফের পরদিন ছেলেকে দিয়ে নিজের পছন্দমতো কোনো কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তাকে হয়তো উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আবার তার পরদিনই ছেলেকে ফের শাস্তি দিলেন

আর তাকে আগের দিন মায়াদয়া দেখিয়েছেন বলে নিজের বুদ্ধির ওপর দোষারোপ করতে লাগলেন। এই ধরনের বাপ-মায়েরা সর্বদাই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় থাকেন, আগুনের ছ্যাঁকা-খাওয়া বেড়ালের মতো এক চরম অবস্থা থেকে আরেক চরম অবস্থায় লাফালাফি করে বেড়ান, কোনো কিছুই সুষ্ঠুভাবে করার ক্ষমতা থাকে না তাঁদের, কী-যে করছেন তাঁরা তাই-ই বুঝে উঠতে পারেন না। এছাড়া আরও অনেক পরিবার আছে যেখানে বাবা এক রকমের ও মা অন্য রকমের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা করতে চান। এই ধরনের পরিবারে ছেলেমেয়েরা কূটনীতিবিৎ হতে বাধ্য হয় এবং বাবা ও মায়ের ধরনধারণের মাঝামাঝি একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শেখে। পরিশেষে, এমনও কিছু পরিবার আছে যেখানে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন না, কেবলমাত্র নিজেদের মানসিক শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখতেই তৎপর থাকেন।

তাহলে সোভিয়েত মানুষের পরিবারগুলিতে বাবা-মায়ের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তগুলি কী হওয়া উচিত?

বাবা-মায়ের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হতে পারে তাঁদের নিজস্ব জীবনযাপন ও কাজকর্ম, সমাজে তাঁদের ভূমিকা ও তাঁদের আচার-আচরণ। পরিবার প্রতিপালন হল গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ, যার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন বাবা-মায়েরা নিজেরা ও যার জন্যে তাঁরা সমাজের কাছে দায়ী থাকেন। এই কাজটি যেভাবে ও যতখানি সুষ্ঠুভাবে তাঁরা সম্পন্ন করেন তার ওপর তাঁদের নিজেদের সুখ ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের জীবনের গুণগত মান নির্ভর করে। বাবা-মা যদি পরিবার প্রতিপালনের

কাজটি সৎ ও বিচক্ষণভাবে পরিচালনা করেন, এ-কাজ করার সময় যথাযোগ্য ও সুস্থ আদর্শের দিকে যদি নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারেন এবং কী তাঁরা করছেন সে-বিষয়ে সর্বদাই সচেতন থাকেন, তাহলে তাঁরা অভিভাবকশোভন কর্তৃত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আর তখন কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্যে কৃত্রিম নানা পদ্ধতি অবলম্বনের কথা ভাবা দূরে থাক, বাইরের কোনো প্রেরণা আমদানিরও দরকার পড়ে না।

ছেলেপিলেরা একটু বড় হয়ে উঠতে শুরু করলেই তাদের বাবা-মায়েরা কোথায় কাজ করেন এবং তাঁদের সামাজিক পদমর্যাদা কেমন সে-সম্পর্কে তারা কৌতূহল দেখাতে শুরু করে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের জানানো উচিত তাদের বাবা-মায়েরা কী-কী ধরনের কাজে লিপ্ত, তাঁদের আগ্রহ ও তাঁদের প্রবণতা কোন-কোন দিকে। তার বাবা কিংবা মা যে-কাজে লিপ্ত তা-যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার কাজ তা বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে বুঝতে দেয়া বিশেষ দরকার। শিশুর বাবা-মায়ের যোগ্যতা ও গুণাবলী সমাজের চোখেও-যে যোগ্য ও গুণসম্পন্ন, শুধুমাত্র বাইরে থেকে জাঁকালো নয় তার-যে স্বকীয় ও সত্যিকার মূল্য আছে, এটা প্রথমত ও প্রধানত শিশুর চোখে প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন। শিশুসন্তানদের কাছে এই গুণাবলী বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে প্রতিভাত না-হয়ে যাতে গোটা দেশের সাফল্য ও কীর্তিকলাপের পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা দেখাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সন্তানরা যাতে বৃথা অহংকার বর্জন করে স্বাভাবিকভাবেই ইতিবাচক সোভিয়েতশোভন গর্বের অধিকারী হয়ে ওঠে তা দেখা দরকার। সেইসঙ্গে এদিকেও নজর রাখা দরকার যে

শিশুসন্তানরা কেবলমাত্র তাদের বাবা-মায়েদের সম্পর্কেই গর্ববোধ করবে না, আমাদের সমাজের মহৎ ও খ্যাতকীর্তি মানুষজনেরও খোঁজখবর রাখবে, তাদের চোখে বাবা-মায়েরা দেশের বিশিষ্ট জনসেবকদের গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে প্রতিভাত হবেন।

প্রসঙ্গত, একথা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে মানুষের সব ধরনের কাজকর্মেই বিশেষ ধরনের উদ্বেগ ও উত্তেজনা আছে, তাদের বিশেষ-বিশেষ গুণাগুণ আছে। বাপ-মায়ের কোনো কারণেই উচিত হবে না ছেলেমেয়েদের সামনে তাঁদের বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সবসেরা বলে জাহির করা, অনন্য প্রতিভাবান মানুষ হিসেবে নিজেদের দেখানোর চেষ্টা করা। বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকের, বিশেষ করে বাপ-মায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের, গুণাবলীও শিশুরা যাতে বুঝতে পারে তা দেখা দরকার। বাপ-মায়ের নাগরিক প্রতিপত্তি একমাত্র তখনই ছেলেমেয়ের চোখে সত্যিকার মর্যাদা পেতে পারে, যদি সে প্রতিপত্তি ভুঁইফোড় বা অসার দাম্ভিকের না-হয়ে যৌথ সমাজের উপযুক্ত সদস্যের হয়। যদি কোনো বাপ ছেলেকে এমনভাবে মানুষ করে তুলতে পারেন যাতে তিনি যে-ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন ছেলে সেই গোটা ফ্যাক্টরির সাফল্যেই গর্ববোধ করবে, উদ্দীপিত হয়ে উঠবে, তবেই বলা চলবে যে ছেলেটি উপযুক্তভাবে মানুষ হয়ে উঠছে।

তবে বাপ-মা শুধুমাত্র তাঁদের নিজ-নিজ কর্মস্থলে কর্মী-যৌথের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সক্রিয় সদস্য হলেই চলবে না, তাঁদের আরও বেশি কিছু হতে হবে। আমাদের জীবন সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবন। কাজেই বাবা-মা যে সেই জীবনের সক্রিয় অংশীদার এটাও ছেলেমেয়েদের চোখে

স্পষ্ট হওয়া চাই। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, সাহিত্যের সেরা কীর্তিকলাপ — এ-সবেরও ছাপ সন্তানের বাপের ধ্যানধারণা, আবেগ-অনুভূতি ও তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর পড়া দরকার। একমাত্র সেইসব বাবা-মা যাঁদের ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটে, যাঁরা পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন করে থাকেন, আমাদের পিতৃভূমির উপযুক্ত নাগরিক যাঁরা — একমাত্র তাঁরাই সন্তানের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হবেন। তবে একথা কেউ যেন না-ভাবেন যে এ-ধরনের জীবন 'চেষ্টাকৃতভাবে', অভ্যাস করে যাপন করা একান্ত দরকার, যাতে তাঁর সন্তানদের সেটা চোখে পড়ে ও তারা বাবা বা মায়ের গুণের বহর দেখে চমৎকৃত হয়। এরকম পরিস্থিতি জোর করে সৃষ্টি করলে কিন্তু তা আবহাওয়া সত্যিই কলুষিত করে তুলবে। বাবা-মায়েদের আসলে উচিত তাঁরা বাস্তবে যেমনটি হুবহু সেইভাবেই আন্তরিক জীবন যাপন করা, জোর করে অন্য কোনোরকম সাজবার চেষ্টা না-করা কিংবা ছেলেমেয়েদের সামনে আদর্শ আচার-আচরণ জাহির করার চেষ্টায় বিরত থাকা। তাহলে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই তাদের চরিত্রগঠনের পক্ষে যা প্রয়োজন তা বুঝতে পারবে।

তবু এ-কথাও অবশ্য ভুললে চলবে না যে আপনারা শুধু নতুন এক সমাজের নাগরিকই নন, আপনারা পিতামাতাও বটেন। বাবা-মা হিসেবে আপনাদের কর্তব্য হবে নিজেদের দায়িত্ব যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে পালন করা, আর প্রতিটি মানুষের এই প্রয়াসেই নিহিত তাঁর সত্যিকার কর্তৃত্ব বা প্রতিপত্তির বীজ। প্রথমত ও প্রধানত, আপনাদের জানতে হবে আপনাদের শিশুসন্তান কিসে আগ্রহী, কী সে পছন্দ করে কী-ই বা পছন্দ করে না, কী সে করতে চায় আর কী করতে চায় না। আপনাদের আরও জানতে

হবে আপনাদের ছেলে বা মেয়ের বন্ধুবান্ধব কারা, কাদের সঙ্গে সে মেশে, খেলা করে ও কী ধরনের খেলা করে, কী-কী বই সে পড়ে আর যা পড়ে তার কতখানি সে আত্মস্থ করতে পারে। তারপর যখন সে ইশ্‌কুলে ভর্তি হবে ততদিনে তাকে আপনাদের এতখানি চিনে নিতে হবে যাতে ইশ্‌কুল ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্কে তার ধারণা ও মনোভাব আপনারা পরিষ্কার বুঝে নিতে পারেন, বুঝতে পারেন কোথায়-কোথায় বা কোন-কোন বিষয়ে তার দুর্বলতা, ক্লাসে তার আচরণ কেমন, ইত্যাদি। সন্তানের একেবারে দুধের বয়স থেকেই তার সম্পর্কে এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনাদের সর্বদাই সজাগ ও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। ছেলে বা মেয়ে কোনো জটিল পরিস্থিতিতে বা ঝামেলায় পড়লে আপনাদের যেন আকাশ থেকে পড়তে না-হয়, বরং আগে থেকেই যেন সে সম্ভাবনার কথা আন্দাজ করতে পেরে আপনারা তার পথ বন্ধ করে দিতে পারেন।

আপনাদের, বাবা-মায়েদের পক্ষে ছেলেমেয়ে সম্পর্কে এসব খোঁজখবর রাখা নিশ্চয়ই দরকার। তবে এর অর্থ মোটেই এ নয় যে অনবরত জেরা করে-করে ছেলেমেয়েদের আপনারা শ্রান্তক্লান্ত করে তুলবেন, তাদের পেছনে অবিশ্রান্ত খেলো ধরনের গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে তাদের জ্বালাতন করে তুলবেন। বরং একেবারে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অভ্যাসটা উভয়ত স্বীকৃত হওয়া দরকার যে তারা কী করছে, কী-ই বা করতে চায় তারা তা আপনাদের কাছে এসে খোলাখুলি বলবে, আপনারা তাদের সব ব্যাপার জানুন শুনুন এজন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকবে তারা। এছাড়া আপনাদের উচিত হবে আপনাদের ছেলেমেয়েদের বন্ধুদের মাঝেসাঝে বাড়িতে ডাকা, হয়তো-বা নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো,

আবার কখনও-সখনও ওইসব বন্ধুর বাড়িতে সপরিবারে দেখা করতেও যাওয়া আর এইভাবে একেবারে প্রথম সুযোগে আপনাদের ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব ও তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

এসব করার জন্যে আপনাদের পক্ষে-যে প্রচুর সময় ব্যয় করা দরকার তা নয়, এ-কাজ করতে হলে আসলে যা দরকার তা হল ছেলেপিলের দিকে ও তারা যে-জীবন যাপন করছে সে-ব্যাপারে আপনাদের বেশ কিছু পরিমাণে মনোযোগ দেয়া।

এ-কাজ যদি আপনারা করে উঠতে পারেন তাহলে ছেলেপিলেরা আপনাদের প্রয়াসের মর্যাদা দিতে কসুর করবে না। ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়েদের এরকম বুঝদার মনোভাবের জন্যে সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং এজন্যে বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করে থাকে।

• জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মধ্যে দিয়ে অর্জিত কর্তৃত্ব চিরকালই অবশ্যম্ভাবীরূপে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠায় পরিণত হয়। যে-কোনো বাচ্চার জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যখন সে বুঝে উঠতে পারে না কী করতে হবে, যখন তার দরকার পড়ে উপদেশের ও সাহায্যের। কীভাবে এই সাহায্য চাইতে হয় তা সে জানে না বলে হয়তো সে এসময়ে আপনার মুখাপেক্ষী হবে না, কাজেই আপনার কর্তব্য হবে তখন আপনা থেকেই তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

প্রায়শই এরকম সাহায্য দিতে হবে আপনাকে সরাসরি উপদেশের মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও-বা ঠাট্টা-ইয়ার্কি, কখনও-বা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ কিংবা এমন কি হুকুম করার মধ্যে দিয়েও। আপনি যদি আপনার সন্তানের জীবনযাত্রার

সঙ্গে ভালোরকম পরিচিত থাকেন তাহলে নিজেই আপনি বুঝতে পারবেন কেমন করে সবচেয়ে ভালোভাবে এই সাহায্য দেয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে এই সাহায্য একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে দেয়ার দরকার করে। যেমন, ধরুন, বাচ্চাদের কোনো বিশেষ খেলায় বাবাকে বা মাকে যোগ দিতে হয়, ছেলে বা মেয়ের বন্ধুদের ভালো করে চিনতে হয়, কিংবা স্কুলে যেতে হয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, ইত্যাদি। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে আপনার কয়েকটি ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্যে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ছেলে বা মেয়েটির সাহায্য নেন।

বাপ-মায়ের এই সাহায্য বিরক্তিকর নাছোড়বান্দা ধরনের হলে ও অতিরিক্ত পরিমাণে মাথা-গলানোর মতো করে করলে কখনোই চলবে না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়েটিকে তো নিজে থেকেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে দেয়া একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়তে পারে, এটা দেখার দরকার হতে পারে যাতে সে পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিপত্তিতে অভ্যস্ত হয় ও সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলির সমাধান নিজে-নিজেই করে উঠতে পারে। তবে সেইসঙ্গে সর্বদা এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে ছেলে বা মেয়েটি সমস্যা সমাধানের এই কাজটা করছে কেমনভাবে, নিশ্চিত হওয়া দরকার যাতে সে তার অভ্যস্ত আচরণে বড়রকমের কোনো পরিবর্তন না-ঘটায় ও হতাশায় ডুবে না-যায়। কখনও-কখনও শিশুর শক্তিসামর্থ্যে আপনার আগ্রহ ও আস্থা কতখানি তার পক্ষে তা বাজিয়ে দেখাও দরকার করে।

সহায়তা এবং সতর্ক ও সুবিবেচনাপ্রসূত পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা কর্তৃত্বকে সর্বদাই জ্ঞান ও

বিচক্ষণতাভিত্তিক প্রতিপত্তি পরিপূর্ণতা দেয়। শিশুর এটা অনুভব করা দরকার যে, আপনি তার পাশে-পাশে আছেন, যুক্তিগ্রাহ্য মাত্রার মধ্যে থেকে তার জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনি ও বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে আপনি সর্বদাই তৈরি। তবে এই একই সঙ্গে তাকেও এটা জানানি দিতে হবে যে তার কাছে আপনারও কিছু চাহিদা আছে যা তার পূরণ করা দরকার, জানিয়ে দিতে হবে যে তার হয়ে সবকিছু করে দেয়ার জন্যে কিংবা সব রকমের দায়িত্ব থেকে তাকে রেহাই দিতে আপনিও প্রস্তুত নন।

বাপ-মায়ের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত এই পথনির্দেশটিই। শিশুকে কোনোমতেই এটি ভাবতে দিলে চলবে না যে আপনার তরফে সংসার চালানো ও বিশেষ করে তাকে পরিচালনা করা নিছকই একটা আনন্দের বা চিত্তবিনোদনের ব্যাপার। তাকে এটা বুঝতে দিতে হবে যে সোভিয়েত সমাজের কাছে আপনি শুধু নিজের জন্যে নন, শিশুর সবকিছুর জন্যেও দায়ী। ছেলে বা মেয়েকে খোলাখুলি ও দৃঢ়ভাবে একথা বলতে কোনো বাবা বা মায়ের ভয় পাওয়ার দরকার নেই যে একটি সুনির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী তাকে মানুষ করে তোলা হচ্ছে, তাকে জানতে ও শিখতে হবে অনেক কিছু, তাকে বড় হয়ে উঠতে হবে সু-নাগরিক ও ঋজু চরিত্রের চমৎকার মানুষ হিসেবে, এই লক্ষ্য পূরণের জন্যে তার বাপ-মা দায়িত্ববদ্ধ এবং এ-দায়িত্বপালনে তিনি পিছ-পাও নন। বাবা-মায়ের এই-যে সামাজিক দায়িত্ব এর মধ্যে নিহিত শুধু-যে শিশুদের সাহায্য করার মনোভাব তা-ই নয়, এতে নিহিত শিশুদের কাছে বাবা-মায়ের চাহিদাও। দরকার পড়লে কখনও-কখনও শিশুদের কাছে এইসব

চাহিদা জানাতে হবে একেবারে কঠোরতম ভাষায়, যাতে শিশু কোনোরকম ওজর-আপত্তি তোলার বা প্রতিবাদ জানানোর অবকাশ না-পায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই ধরনের চাহিদা জানানোর ফলাফল ইতিবাচক হতে পারে একমাত্র তখনই যখন শিশুসন্তান দায়িত্বপালনের মধ্যে দিয়ে বাবা-মায়ের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। একেবারে অত্যন্ত কচি অবস্থাতেই শিশুর মধ্যে এই বোধটি সঞ্চারিত করা প্রয়োজন যে সে ও তার বাবা-মা কোনো মরুদ্বীপে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে না।

নিয়মশৃঙ্খলা

'নিয়মশৃঙ্খলা' কথাটির কয়েকরকম অর্থ করা যায়। কিছু-কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে এ-কথাটির অর্থ দাঁড়ায় আচরণের কতগুলি বিধি বা নিয়ম। অন্যদের কাছে এটা আবার ক্রমে-ক্রমে ধীর ও সতর্ক প্রশিক্ষণের ফলে গড়ে-ওঠা কতগুলি অভ্যাস, যা ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। আবার আরও অনেকের কাছে এটা হল বশ্যতাস্বীকারের নামান্তর। এইসব বিভিন্ন অর্থই অবশ্য কমবেশি সত্যের কাছাকাছি, তবে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সঠিকভাবে কাজ করতে হলে 'নিয়মশৃঙ্খলা' কাকে বলে সে-সম্পর্কে তাঁর পক্ষে আরও যথাযথ ধারণা পোষণ করা একেবারে অপরিহার্য।

বশ্যবাধ্য আচরণ যার বৈশিষ্ট্য কখনও-কখনও এমন লোককেই বলা হয় শৃঙ্খলাপরায়ণ। অবশ্য বিপুল সংখ্যক অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চতর সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষদের হুকুম

ও নির্দেশ যথাযথভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে পালন করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবু এও ঠিক যে সোভিয়েত সমাজে তথাকথিত আজ্ঞানুবর্তিতা শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তির সবটুকু পরিচয় বহন করে না। আমাদের দেশের প্রাক্-বিপ্লব অতীতের ইশকুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সাধারণত যা দাবি করা হোত সেই সরল আজ্ঞানুবর্তিতায় এখন আমরা আর সন্তুষ্ট হই না, বিশেষ করে সেই আজ্ঞানুবর্তিতা যদি অন্ধ হয় তাহলে তো কথাই নেই।

সোভিয়েত নাগরিকদের কাছে কাম্য হল নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে অনেক বেশি জটিল একটা চেতনা। অমুক বা তমুক নির্দেশ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং কেন তাঁর পক্ষে পালন করা প্রয়োজন তাঁকে শুধু সেইটুকু জানলে-বুঝলেই হবে না, সেই কর্তব্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সক্রিয়ভাবে পালনের চেষ্টাও তাঁকে করতে হবে। আবার এটুকুও সব নয়। সমাজের দাবি এই যে আমাদের নাগরিকরা তাঁদের জীবনের যে-কোনো মুহূর্তে অপর কারও নির্দেশ বা হুকুমের অপেক্ষা না-রেখেই নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত থাকবেন, তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন স্বেচ্ছায় উদ্যোগগ্রহণে, অধিকারী হবেন সৃষ্টিশীল ইচ্ছাশক্তির। আবার ওই একই সঙ্গে তাঁদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা এই যে তাঁরা শুধু সেই কাজই করবেন যা আমাদের সমাজের ও দেশের পক্ষে সত্যিসত্যিই প্রয়োজনীয়, দেশ ও সমাজের কাজে লাগবে যা এবং কোনোরকম অসুবিধে ও বাধার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে যাবেন না তাঁরা। অপরপক্ষে আমরা চাই যে সোভিয়েত মানুষ যেন এমন কোনো আচরণ বা ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত না-হন যা নাকি একমাত্র তাঁর নিজের পক্ষে লাভজনক

বা আনন্দদায়ক হতে পারে অথচ অন্যের পক্ষে কিংবা সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে যা ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। তদুপরি এটাও সর্বদা কাম্য যে আমাদের নাগরিকরা কখনই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সংকীর্ণ জগতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন না, নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবেন না বিশেষ-বিশেষ কর্মক্ষেত্র, যন্ত্রপাতি আর পরিবারের চতুঃসীমায়, বরং তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত থাকবে চারপাশের মানুষের কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা, জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণের পরিধি পেরিয়ে, সঙ্গীসাথীদের সাহায্যে আসার মতো যোগ্যতা অর্জন করবেন তাঁরা, আর তা শুধু কথায় নয় কাজেও, এমন কি তা করতে গিয়ে যদি তাঁদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা বিসর্জন দিতে হয় তবুও। বিশেষ করে আমাদের যারা সাধারণভাবে শত্রু তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি সোভিয়েত মানুষের কাছে সমাজের দাবি এই যে তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের কার্যকলাপে বাধাসৃষ্টি করবেন এবং যে-কোনোরকম অপ্রিয় পরিস্থিতি বা বিপদের সম্মুখীন হোন না কেন প্রতিনিয়তই তিনি শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।

এক কথায়, সোভিয়েত সমাজে একমাত্র সেই মানুষকেই সঠিকভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ বলা চলতে পারে যিনি সর্বদা এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতেই যথাযথ ও সামাজিক বিচারে কার্যকর কর্মপন্থা বেছে নিতে পারেন এবং নানারকম অসুবিধে ও ঝুটঝামেলা সত্ত্বেও সে-পথে টিকে থাকার মতো মনের জোর খুঁজে পেতে পারেন নিজের মধ্যে।

বলা বাহুল্য যে একমাত্র নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলাটাই শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াটাকেই নিয়মশৃঙ্খলা মানার

অর্থে বোঝানো হচ্ছে। শৃঙ্খলাপরায়ণ সোভিয়েত নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব একমাত্র তখনই যখন তাঁরা সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সঠিক প্রভাবের ছত্রচ্ছায়ায় আসেন। এই প্রভাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে পারে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, বই ও খবরের কাগজ, শ্রম, সামাজিক কাজকর্ম এবং এমন কি খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদ ও অবসরবিনোদনের মতো আপাতদৃষ্টিতে গৌণ ব্যাপারগুলিও। মাত্রা রেখে, সুসমঞ্জসভাবে এই সকলপ্রকার প্রভাবে জারিত হলে তবেই একমাত্র সঠিক লালন সম্ভব, সম্ভব সমাজতান্ত্রিক সমাজের খাঁটি শৃঙ্খলাপরায়ণ নাগরিক হিসেবে শিক্ষিত হয়ে ওঠা।

অভিভাবকদের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিশেষ করে এবং সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার। তা হল এই যে বিচ্ছিন্নভাবে শৃঙ্খলা কায়েম করার উপযোগী 'শাস্তিমূলক' ব্যবস্থাদি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তনা সম্ভব হয় না, তা সম্ভব হয় একমাত্র শিশুশিক্ষার গোটা একটা পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সমগ্রভাবে একটা উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার সাহায্যে, ছেলেমেয়েরা যে-সমস্ত প্রভাবের অধীন হয় তাদের সমষ্টির যৌথ নিকষে যাচাই হতে-হতে। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে নিয়মশৃঙ্খলা যথাযথ শিক্ষার 'আদি সংঘটক' নয়, ওই শিক্ষার কোনো পদ্ধতি বা কলাকৌশলও নয় তা, আসলে নিয়মশৃঙ্খলা হল যথাযথ শিক্ষালাভের ফলমাত্র। সঠিক শৃঙ্খলাবিধান হল সেই ইতিবাচক পরিণতি যাতে পৌঁছনোর জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের কর্মশক্তি নিঃশেষে উজাড় করে দিতে হয়, তাঁদের হাতের কাছে যে-যে উপায় জোটে তার সব ক'টির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে। এ-কারণে

প্রতিটি অভিভাবককে একথা বুঝতে হবে যে যখন তিনি তাঁর ছেলে বা মেয়েকে একখানি বই পড়তে দিচ্ছেন, নতুন কোনো বন্ধুর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছেন, তাঁর কর্মস্থল বা ফ্যাক্টরির উন্নতি ঘটে চলেছে কীভাবে কিংবা কাজকর্মে তাঁর নিজের সাফল্যের কথা যখন বলছেন ছেলেকে বা মেয়েকে, তখন সেইসঙ্গে তিনি তাঁর সেই ছেলেকে বা মেয়েকে নিয়মনিষ্ঠ আচরণের লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে কম বা বেশি পরিমাণে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

এর অর্থ, নিয়মশৃঙ্খলাকে শিক্ষাদান ও শিশুলালন-সংক্রান্ত সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার।

তবে শিক্ষাদান সম্বন্ধীয় কাজের অবশ্য অপর একটি সংকীর্ণতর ক্ষেত্রও আছে যা নাকি নিয়মশৃঙ্খলা বিকশিত করে তোলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং যাকে প্রায়শই নিয়মশৃঙ্খলা বলে ভুল করা হয়। এটি হল, কাজের বাঁধা রুটিন অনুসরণ। নিয়মশৃঙ্খলা যেখানে বহুব্যাপক অর্থে গণ্য শিক্ষা-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ, সেখানে রুটিন অনুসরণ হল শিক্ষাদাতার তরফে ব্যবহার্য কর্মসম্পাদনের নিছকই একটি উপায় বা কৌশলমাত্র। রুটিন অনুসরণ ও নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে পার্থক্যগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের অভিভাবকদের সেগুলি সম্পর্কে সু-পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, নিয়মশৃঙ্খলা হল সেই ধরনের একটি ব্যাপার, যার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত বিকাশ সর্বদাই আমাদের চাহিদার বস্তু। আমাদের নিজ-নিজ পরিবারে, আমাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত ধরনের, সবথেকে কড়া নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকুক,

এটাই সর্বদা আমাদের কাম্য। এ-সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের কোনো অবকাশ নেই যে নিয়মশৃঙ্খলাই হল চরম ফল, আর আমাদের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে সবথেকে সেরা ফলাফল অর্জনের জন্যে লড়াই করতেই আমরা অভ্যস্ত। এমন মানুষের কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য যে নাকি বলতে পারে: 'আমাদের নিয়মশৃঙ্খলা সবাইকে জানানোর মতো দেখনাই তেমন কিছু নয়, তবে আমাদের কাজ চলার পক্ষে তা যথেষ্ট...'

যে-লোক এমন কথা বলতে পারে, হয় সে বোকা নয় সে খাঁটি দুশমন। যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সবচেয়ে উন্নত ধরনের শৃঙ্খলা অর্জনে, অর্থাৎ সবথেকে ভালো ফলাফল লাভে মনোযোগী হওয়ারই কথা।

কিন্তু রুটিন অনুসরণ হল গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আগেই বলা হয়েছে যে রুটিন হল কার্যাদি সাধনের উপায়মাত্র, আর সাধারণভাবে একথাও আমরা জানি যে জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রই আমরা বেছে নিই-না কেন সেক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের কোনো উপায়কে একমাত্র তখনই কাজে লাগানোর দরকার পড়ে যখন তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যখন তা হয় উপযোগী। এই কারণেই সবসেরা নিয়মশৃঙ্খলার রূপ কী হতে পারে তা কোনো একজন মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু আদর্শ, অনতিক্রমণীয় রুটিন যে কী বস্তু তা ধারণা করা অসম্ভব। কেননা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এক ধরনের রুটিনকে মনে হতে পারে সবচেয়ে উপযোগী বলে, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কোনো রুটিনকে কার্যকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

পরিবর্তিত নানা পরিস্থিতিতে কোনো একটি পরিবারের জীবনযাপনের সময়সূচি একই রকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয় আর সেরকমটি থাকা উচিতও নয়। পরিবারভুক্ত শিশুদের বয়স, তাদের কর্মক্ষমতা, তাদের পরিবেশ, প্রতিবেশীদের স্বরূপ, বাসস্থানের আকার-আয়তন ও বাসের স্বাচ্ছন্দ্য, ইশ্‌কুলে যাতায়াতের পথ, স্থানীয় রাস্তাগুলিতে ব্যস্ততার ও ভিড়ের মাত্রা এবং আরও বহু এ-ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও পারিবারিক রুটিনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে ও তার পরিবর্তন ঘটায়। বহু সন্তানের বড় পরিবারে এক ধরনের রুটিন অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে, আবার এক সন্তানের পরিবারে প্রয়োজন পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রুটিন মেনে চলার। ছোট-ছোট বাচ্চার পক্ষে উপযোগী দৈনন্দিন নিয়মনির্ঘণ্ট অপেক্ষাকৃত বড় বালক-বালিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার ফল বিষময় হয়ে দেখা দিতে পারে। এইরকম অল্পবয়সী মেয়েদের জীবনযাত্রার রুটিনও নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হওয়ার ফলে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে তাদের শিক্ষাদানের শেষাংশে তো বটেই।

এই সবই প্রমাণ করছে যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনো এক ধরনের রুটিনকে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করা চলে না। আর তা মনে করা অসমীচীনও বটে। কিছু-কিছু পরিবারে এই ধরনের ভুলটি সাধারণভাবেই ঘটতে দেখা যায়। এই সব পরিবারে সংশ্লিষ্ট সকলেই দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণের সুপ্রভাব সম্পর্কে অন্ধভাবে বিশ্বাসী। এঁরা পরিবারের শিশুদের, এমন কি নিজেদের স্বার্থের হানি ঘটিয়েও ঐতিহ্যসিদ্ধ রুটিনের অলঙ্ঘনীয়তার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। অথচ

জীবনযাত্রার যে-কোনো অনমনীয় রুটিন দেখতে-দেখতে অচলিত, সেকেলে যন্ত্রপাতির সামিল হয়ে দাঁড়ায় আর তখন তা কারো উপকারে তো আসেই না বরং হয়ে ওঠে নিছক ক্ষতির কারক।

রুটিন বস্তুটির নিজস্ব প্রকৃতিই তার চিরস্থায়িত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কেননা এটি শিক্ষাদানের একটি কর্মকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা বাবা-মা নিজেদের পক্ষে অর্জনযোগ্য সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন, আর দেখা যায় এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি সব সময়েই পরিবর্তিত হচ্ছে ও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একেবারে শিশুকালে সন্তানদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস ধাতস্থ করানোর ব্যাপারটাই বাপ-মায়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তখন বাবা-মায়েরা তাঁদের শিশুসন্তানদের জীবন এক সুনির্দিষ্ট রুটিনের ছাঁচে ঢালাই করে থাকেন, তাঁরা নির্দিষ্ট করে দেন হাতমুখ ধোয়া, বাথরুম ব্যবহার করা ও ধারাস্নানের ঝাঁঝরি-কলে কিংবা সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট স্নানকক্ষে স্নান করার নিয়মাবলী, ঘরদোর পরিষ্কার করা ও গোছানো, বিছানা ও ডেস্‌কো পরিপাটি করে রাখার কানুন। দৈনন্দিনের এই রুটিনটি নিয়মিতভাবে যাতে প্রতিপালিত হয় তা দেখা দরকার হয় এবং বাপ-মায়েদের এ-ব্যাপারে কখনও অমনোযোগী হলে চলে না। তাঁদের দেখা দরকার হয় যে ছেলেমেয়েরা রুটিনটি মেনে চলছে এবং তাদের পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন সব পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ও কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে বেশ উন্নত ধরনের মান শিশুদের কাছ থেকে দাবি করা বাপ-মায়ের পক্ষে

অবশ্যকর্তব্য হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন আচার-আচরণের এই ধরনের নিয়মিত ছাঁদ যদি সুসংগঠিত করে তুলতে পারা যায় তাহলে আখেরে তা অত্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে এবং পরিশেষে এমন একটা সময় আসবে যখন পরিচ্ছন্নতা রীতিমতো একটা অভ্যাসে পরিণত হবে ও দেখা যাবে খেতে বসার সময় বাচ্চারা সর্বদাই, বিনা ব্যতিক্রমে, হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে তবে টেবিলে বসছে। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, এমন একটা সময় আসবে যখন বাপ-মায়ের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। অতএব, এই সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে তার আগে যে-দৈনন্দিন রুটিন ধাতস্থ করানোর দরকার ছিল তখন তা অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে উপরোক্ত রুটিন অনুসরণের অভ্যাস তখন ত্যাগ করতে হবে। ক্রমে-ক্রমে তখন আগেকার ওই রুটিন মানানোর জায়গা নেবে অন্যতরো, নতুনতরো রুটিন মানানোর কর্মসূচি — যে-রুটিনের লক্ষ্য হবে নতুন গড়ে-ওঠা অভ্যাসগুলিকে সংহত করা এবং সেগুলি বাঁধা নিয়মের রূপ নিলেই শিশুদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর বলে বাবা-মায়েরা যে-সমস্ত নতুন-নতুন, আরও জটিল ও আরও গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসসমষ্টিকে গণ্য করছেন সেগুলির বিকাশ ঘটানো। এই সময়ে আর সবকিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত করে রাখার অর্থ দাঁড়াবে শুধু-যে বাবা-মায়ের কর্মক্ষমতার অনাবশ্যক অপচয় তাই-ই নয়, অধিকন্তু ক্ষমতার ক্ষতিকর অপচয়ও বটে। কেননা, ঠিক এই কারণেই ও এইভাবেই পরিচ্ছন্নতার বাতিকগ্রস্ত হৃদয়হীন মানুষ গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে সেই সব ছেলেপিলে যারা একমাত্র পরিচ্ছন্ন অভ্যাস ছাড়া আর কোনো দিক থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ

করার মতো হয় না, ব্যক্তিসত্তা হিসেবে কিছুমাত্র কৌতূহল জাগাতে অক্ষম যারা, কাজের দায়িত্ব পেলে পরে যারা কখনও-সখনও তা করতে সক্ষম হয় আর তাও নেহাতই দায়সারাভাবে — কেননা তাদের মনোযোগ প্রথমত ও প্রধানত নিবদ্ধ থাকে হাত দু'খানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর।

পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করে তোলার উপযোগী রুটিন অনুসরণের এই উদাহরণ প্রমাণ করছে যে সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে রুটিন মেনে চলা কতটা সঠিক ও উপযোগী। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর উপযোগী অপর সকল প্রকার উপায়ের মতো রুটিনের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি, আর যতই যাই হোক রুটিনও তো লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর উপায় ছাড়া কিছু নয়।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে বাবা-মা'দের কখনও বিশেষ একটা নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলার পরামর্শ দেয়া সঙ্গত নয়। রুটিনের বহু ভিন্ন-ভিন্ন রকমফের আছে এবং কোনো একটি বিশেষ অবস্থায় বিশেষভাবে উপযোগী একটি রুটিন বেছে নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

রুটিনের সম্ভাব্য নানা রকমফের সত্ত্বেও এটা অবশ্য বলা দরকার যে একটি সোভিয়েত পরিবারে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত রুটিনকে সর্বদাই এমন সমস্ত সুনির্দিষ্ট চারিত্র্যলক্ষণে বিশিষ্ট হতে হবে যা নাকি যে-কোনো পটভূমিতে সফলভাবে কার্যকর হওয়ার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। আমাদের এই আলোচনায় উপরোক্ত সাধারণ চারিত্র্যলক্ষণগুলি নিয়ে অল্প কিছু বাগ্‌বিস্তার একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, আমি অভিভাবক-অভিভাবিকাদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করতে চাই যে তাঁরা তাঁদের পরিবারের

দৈনন্দিন কার্যক্রম হিসেবে যে-কোনো বিশেষ রুটিনই নির্বাচন করে থাকুন-না কেন প্রথমত ও প্রধানত সে-রুটিনের উদ্দিষ্ট হওয়া দরকার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পরিবারের মধ্যে চালু করা দরকার এজন্যে নয় যে অন্য একটি পরিবারে আলোচ্য দৈনন্দিন চর্যাটি প্রচলিত আছে কিংবা ওই বিশেষ নিয়মাবলী অনুসারে জীবনযাপন অপেক্ষাকৃত বেশি স্বস্তিদায়ক হওয়া সম্ভব। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিধিবদ্ধ একটি নিয়ম একমাত্র এজন্যেই চালু করা দরকার যাতে বাবা-মায়ের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। উদ্দিষ্ট এই লক্ষ্যমাত্রাটি সম্বন্ধে আপনাদের নিজেদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিবারের শিশুদেরও এটি জানা প্রয়োজন। মোট কথা, যাই হোক-না কেন, আপনারা এবং আপনাদের সন্তানরা যে-রুটিন অনুসরণের জন্যে গ্রহণ করবেন তাকে আপনাদের জীবনযাত্রার যুক্তিসঙ্গত একটি বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদি আপনারা চান যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা একটা বিশেষ সময়ে দুপুরের বা রাত্রের খাওয়ার জন্যে সমবেত হোক, তাহলে আপনাদের দেখতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা এটা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে মায়ের কিংবা রাঁধুনির সাংসারিক দায়দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হালকা করার জন্যে এবং পরিবারের সব ক'জন দিনের মধ্যে কয়েক বার যাতে একত্র মিলিত হতে ও কিছুক্ষণ সবাই মিলে পরস্পরের ভাবনাচিন্তা ও আবেগের অংশীদার হতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্যেই বিশেষ করে উপরোক্ত এই নিয়মটি প্রতিপালিত হওয়া দরকার। আপনারা যদি চান যে প্লেটে-প্লেটে যতটা করে খাবার দেয়া হয়েছে তার সবটুকুই

ছেলেমেয়েরা খেয়ে নিক ও খাবার ফেলে-ছড়িয়ে নষ্ট না-করুক, তাহলে আপনাদের ছেলেমেয়েদের এটা বুঝতে দিতে হবে যে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে অন্যান্য বহু লোকের পরিশ্রম এবং ছেলেমেয়েদের বাবা-মাদের পরিশ্রমের প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শন হিসেবে ও পরিবারের আর্থিক অপচয় বন্ধ করার জন্যেই এই নিয়মটি পালন করা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তবে এমনও কিছু-কিছু পরিবার দেখা যায় যেখানে বাবা-মায়েরা এই মর্মে হুকুম জারি করে থাকেন যে খাবার টেবিলে ছেলেমেয়েদের মুখ বুজিয়ে চুপটি মেরে থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই হুকুম তামিল করে থাকে বটে, তবে ঠিক কী উদ্দেশ্যে-যে এই নিয়ম জারি করা হয়েছে তা না-পারে তাঁদের ছেলেমেয়েরা না-পারেন তাঁরা নিজেরাই বুঝতে। এই সব বাপ-মা'দের যখন এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তাঁরা এই বলে ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন যে খাওয়ার সময় কথা বললে শ্বাসনালিতে নাকি খাবার আটকাতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের নিয়ম জারি করে অবশ্য কোনো কাজের কাজ সাধিত হয় না। কেননা, দুনিয়ার সর্বত্র এটা সবাই মেনে নিয়েছে যে টেবিলে খেতে বসে লোকে গল্পগুজব করবেই, আর তাছাড়া এর ফলে কোথাও কোনো শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও শোনা যায় না।

পারিবারিক জীবনযাত্রার রুটিনগুলি যাতে যুক্তিসম্মত ও প্রকৃতিতে উপযোগী হয় বাবা-মাদের সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সুপারিশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এ-বিষয়ে সাবধানও করে দেয়া দরকার যে ছেলেমেয়েদের কাছে প্রতিটি বিশেষ নিয়মকানুনের তাৎপর্য উঠতে-বসতে ব্যাখ্যা করাটা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। এই ধরনের টীকা-ব্যাখ্যা দিয়ে

ছেলেমেয়েদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে যেন না-তোলা হয় সেদিকে খেয়াল রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মা'দের কর্তব্য হবে যেখানে সম্ভব সেখানে এই সমস্ত রুটিনের অর্থ ছেলেপিলেদের বুঝতে সাহায্য করা। দেখা যাবে, একেবারে নিতান্তই কালেভদ্রে ছেলেমেয়েদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দরকার পড়ছে। বস্তুত, শিশুদের মধ্যে সু-অভ্যাসগুলি যাতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসে তা নিশ্চিত করে তোলাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আর এই উদ্দেশ্যপূরণের সবচেয়ে অপরিহার্য পন্থা হল হাতে-কলমে সঠিক আচরণের অনুশীলন। তবে সঠিক আচরণবিধি নিয়ে অন্তহীন আলোচনা ও বাগাড়ম্বর কিন্তু এক্ষেত্রে সর্ববিধ সাফল্যের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে সমর্থ।

সর্বপ্রকার রুটিনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দৈনন্দিন নিয়মের পরিষ্কার সীমানানির্দেশ। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের যদি একদিন দাঁত মাজতে নির্দেশ দেয়া হয়, তবে তার পরদিনও যাতে তারা একইভাবে দাঁত মাজে তা দেখা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ যদি বাচ্চাদের নিজের-নিজের বিছানা পাততে বলা হয়, তাহলে আসচে কালও তাদের ফের বিছানা পাততে বলা দরকার। বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে একদিন তার নিজের বিছানা পাততে বলে পরদিন রাশ আল্‌গা দেয়া ও নিজে বাচ্চার বিছানা পেতে দেয়া মায়ের পক্ষে অনুচিত হবে। এই ধরনের এলোমেলো অস্পষ্ট আচরণ যে-কোনো অনুসরণযোগ্য রুটিনের সকল তাৎপর্য নষ্ট করে দেয় এবং বাঁধাধরা রুটিনকে পর্যবসিত করে খেয়ালখুশিমাফিক হঠাৎ-হঠাৎ জারি-করা, পরস্পর অসংবদ্ধ কতগুলো নির্দেশের সমষ্টিতে। সত্যিকার কার্যকর রুটিন

স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ হওয়া আবশ্যিক, তার মধ্যে বাদ বা ব্যতিক্রমের কোনো অবকাশ থাকলে চলবে না। তবে যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটানো নিতান্তই প্রয়োজন এবং অপরিহার্য অবস্থার তাগিদে তা ঘটাতেই হয় সে-সমস্ত ক্ষেত্রের কথা আলাদা। প্রতিটি পরিবারে অনুসৃত দৈনন্দিন রুটিন একেবারে নিয়ম হিসেবে এমন হওয়া দরকার যাতে তা থেকে প্রতিটি বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে সকলের চোখে ধরা পড়ে। এই নিয়মটি এমন কি একেবারে কচি বাচ্চাদের বেলাতেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আসলে বাবা-মায়েরা যত বেশি কড়াকড়িভাবে বিশেষ একটি রুটিন অনুসরণের জন্যে চাপ দেবেন, সেই রুটিন থেকে ছেলেমেয়েদের বিচ্যুতিও তত কম ঘটবে এবং বাবা-মা'দেরও তত কম করে শাস্তিদানের আশ্রয় নিতে হবে।

এই বিশেষ বক্তব্যটির দিকে বাবা-মা'দের দৃষ্টি রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে আকর্ষণ করা দরকার। এ-ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বহু লোকই ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। ধরুন, একটি বাচ্চা ছেলে সকালে ঘুম থেকে উঠে তার বিছানা গুটিয়ে তুলতে ভুলে গেল। মনে হতে পারে, আচ্ছা, এটা এমন একটা কী ব্যাপার যা নিয়ে ঝামেলা পাকিয়ে তোলা চলে? তাছাড়া, এমন ভুল তো এই প্রথমবারই ঘটল। সত্যি, বাসি বিছানা না-তুলে ফেলে রাখা নিতান্তই তুচ্ছ একটা ব্যাপার, বাচ্চাকে এ-নিয়ে বিচলিত করে তোলার সত্যিই কোনো অর্থ হয় না। আমি বলব, হ্যাঁ, হয়। কেননা, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখাটাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দৃষ্টির প্রমাণ। আসলে শিশুলালনের ক্ষেত্রে তুচ্ছ ব্যাপার বলে কিছু নেই। বাসি বিছানা গুটিয়ে না-তুলে ফেলে রাখা শুধু-যে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অপরিচ্ছন্ন

অভ্যাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে তা-ই নয়, এ-থেকে সমগ্রভাবে পারিবারিক রুটিনের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাবও চাগিয়ে উঠতে পারে। আর এটা সম্ভব হলে তা এমন একটা রাস্তার সূচনা হিসেবে দেখা দিতে পারে যা পরিণতিতে বাবা-মায়ের প্রতি খোলাখুলি বিদ্বেষের আকার ধারণ করাও বিচিত্র নয়।

দৈনন্দিন রুটিনের সুস্পষ্ট রূপরেখা, তার যথাযথতা ও তা মানার বাধ্যবাধকতাও গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হতে পারে যদি বাবা-মায়েরা নিজেরা আলোচ্য ওই রুটিন সম্বন্ধে আন্তরিক আগ্রহী না হন, যদি তাঁরা হুকুম জারি করেন যে ছেলেমেয়েদের ওই রুটিন মেনে চলতে হবে অথচ তাঁরা নিজেরা এমন বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করবেন যা কোনো নিয়মিত জীবনযাত্রার ছাঁদ মেনে চলে না। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে বাবা-মায়ের পক্ষে অনুসরণীয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রুটিন ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনুসরণীয় রুটিনের চেয়ে পৃথক হতে বাধ্য, তবে এই পার্থক্য মৌল নীতিগত হলে কিন্তু চলবে না। যদি আপনারা চান যে ছেলেমেয়েরা টেবিলে বসে খাওয়ার সময় বই বা কাগজপত্র পড়বে না, তাহলে আপনাদের নিজেদেরও তা থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি আপনারা দাবি করেন যে ছেলেমেয়েদের খেতে বসার আগে হাত ধুতে হবে, তাহলে আপনারাও খাওয়ার আগে হাত ধুতে ভুলবেন না। যদি চান যে ছেলেমেয়েরা শোওয়ার আগে ও পরে বিছানা পাতুক ও তুলুক, তাহলে নিজেরাও সেই কাজটি একেবারে নিয়ম করে করতে থাকুন। মনে রাখবেন, এ-কাজটা একেবারেই কঠিন নয় এবং এতে লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। এই সব ছোটখাট তুচ্ছ কাজ লোকে সাধারণত যা মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বাড়িতে দৈনন্দিন জীবনের নিচের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক রুটিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যেমন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার ও রাতে শুতে যাওয়ার সময়টা কড়াকড়িভাবে বাঁধাধরা হওয়া উচিত ও তার একদম নড়চড় হওয়া উচিত নয় এবং কি কাজের দিন ও কি ছুটির দিন সব সময়েই তা একই রকম থাকা দরকার। এছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছালো হওয়া অভ্যাস করার জন্যেই নিয়মকানুন চালু থাকা দরকার। যেমন, অন্তর্বাস ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ বদলানোর নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মকানুন, কীভাবে পোশাক-আশাক পরতে ও ব্যবহার করতে হবে এবং কীভাবে সেসব কাচাকুচি করতে হবে তারও নিয়ম, ইত্যাদি। শিশুদের এটাও শেখাতে হবে যে তাদের সবকিছু জিনিসপত্র রাখার এককেটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখানে প্রতিবারের কাজ কিংবা খেলাধুলোর পর সেসব জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হবে। যতদূর সম্ভব অল্প বয়স থেকে বাচ্চাদের শেখানো দরকার কীভাবে পায়খানা ব্যবহার করতে হয়, ওয়াশবেসিনে হাতমুখ ধুতে হয় ও বাথরুমে স্নান করতে হয় এবং ঠিক-ঠিক সময়ে খেয়াল করে কীভাবে ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বালাতে ও নেবাতে হয়। এছাড়া খাবার সময়ে বিশেষরকম সুসংগঠিত রুটিন চালু করা একান্ত দরকার। যথা, সে-সময়ে প্রতিটি বাচ্চাকে টেবিলে তার নির্দিষ্ট স্থানটি জেনে নিতে ও তা মনে রাখতে হবে, খেতে আসতে কখনও দেরি করবে না সে, টেবিলে ভব্য আচরণ করবে, খাওয়ার ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করতে শিখবে, টেবলক্লথের ওপর এঁটোকাঁটা ফেলবে না এবং খাবার যা দেয়া হবে তার সবটুকু খেয়ে ফেলবে ও যতটা খেতে পারে তার চেয়ে বেশি নিয়ে খাবার নষ্ট করবে না সে।

শিশুর কাজের সময়ের ভাগ-বাঁটোয়ারাও কড়া রুটিন অনুযায়ী সংগঠিত করা দরকার। বাচ্চা ইশ্‌কুল যেতে শুরু করার পর তো এ-কাজটা বিশেষরকমই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন কি তার আগে থেকেও বাচ্চা যাতে তার দু'বেলার খাওয়া, খেলাধুলো করা, বেড়ানো, ইত্যাদির বাঁধা সময় নিয়মিতভাবে মেনে চলে সেদিকে সতর্ক নজর রাখা বাঞ্ছনীয়। বাচ্চার ব্যায়ামের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া দরকার। কিছু-কিছু লোক বলে থাকে যে শিশুদের পক্ষে প্রচুর দৌড়োদৌড়ি করা, চিৎকার-চেঁচামেচি করা ও সাধারণভাবে তাদের বাড়তি প্রাণশক্তি উদ্দাম আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যয় করা খুবই প্রয়োজনীয়। বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের-যে বেশি ব্যায়ামের দরকার সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে এই প্রয়োজনীয় নীতিটিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ও ব্যাপারটাকে ঠেলে চরমে নিয়ে যাওয়া অনুচিত হবে। শিশুকে বরং শেখাতে হবে রয়ে-সয়ে ব্যায়ামটা কীভাবে উপভোগ করতে হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যায়াম করা কখন সমাধা হয়েছে কীভাবেই-বা তা বুঝতে হয়। অন্ততপক্ষে ঘরের ভেতর থাকার সময় বাচ্চাদের দৌড়োদৌড়ি-লাফালাফি করতে দেয়া উচিত নয়, বাগান বা বাড়ির উঠোনের জন্যে এই সব ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ করে রাখা দরকার। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ব্যাপার হল বাচ্চাদের শেখানো কীভাবে তাদের কণ্ঠস্বর আয়ত্তে রাখতে হয়। হৈ-হল্লা, চিল-চিৎকার, গলা ছেড়ে কান্না — এ-সবই হল সমপর্যায়ের ব্যাপার, আর এ-সবই শিশুর পক্ষে যত-না সত্যিকার প্রয়োজনীয় আবেগের বিস্ফোরণ তার চেয়ে বেশি করে স্নায়ুতন্ত্রের অস্বাস্থ্যকরতার লক্ষণ। বাচ্চাদের স্নায়ুদৌর্বল্যঘটিত বিস্ফোরণের প্রবণতার

জন্যে সাধারণভাবে বাপ-মায়েদেরই দোষ দিতে হয়। অনেকসময় তাঁরা নিজেরাই গলার স্বর এত উচ্চগ্রামে তোলেন যে তা কার্যত চিৎকারে পরিণত হয় এবং পারিবারিক আবহাওয়ায় একটা সৌম্য প্রত্যয়ের সুর সংযোজনের পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই থেকে-থেকে আত্মসংযম হারিয়ে বসেন।

...পারিবারিক রুটিন সংগঠনের মোটামুটি পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আপাতত এই পর্যন্তই। রুটিনের এই মোটাদাগের সাধারণ ছকগুলি ব্যবহারের সময়ে প্রতিটি বাবা কিংবা মাকে পারিবারিক জীবনযাত্রার এমন একটি ছাঁদের উদ্ভব ঘটাতে হবে যা তাঁর পরিবারের বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়। এই রুটিন চালু করার সময় পরিবারে বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুসন্তানদের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আচরণে বাড়াবাড়ি ও বিচ্যুতির এমন অসম্ভব রকমের বিচিত্র সব নমুনার সাক্ষাৎ মেলা সম্ভব যা নাকি শিশুদের যথাযথ লালনের সকল প্রচেষ্টাকে ঘোরতরভাবে ব্যাহত করতে সক্ষম। কেউ-কেউ অনুরোধ-উপরোধের কৌশলকে বাড়াবাড়িরকমে প্রয়োগ করে থাকেন, কেউ-বা প্রয়োগ করেন ব্যাখ্যামূলক সারগর্ভ বক্তৃতার চাপ, আবার অন্য কেউ-কেউ বাড়াবাড়ি ঘটান আদরের। এই একই ভাবে হুকুম জারি, উপহারের লোভানি, শাস্তিদান, নানা রকমের ছাড় ও সুযোগ-সুবিধা দান এবং বাড়াবাড়িরকমের কঠোরতা — সবকিছুরই অপব্যবহার ও মাত্রাহীন বাড়াবাড়িতে বাপ-মা ও শিশুসন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনতার আমদানি ঘটতে পারে। পারিবারিক জীবনে অবশ্য এমন যথেষ্ট ঘটনা

ঘটতে দেখা যায় যে-সমস্ত ক্ষেত্রে স্নেহ ও প্রীতির প্রকাশ, কোনো কিছু বুঝিয়ে বলা, দৃঢ়তা প্রকাশ ও অল্পবিস্তর ছাড় দেয়া — এ-সবই চলে আর তা যথাযথও হয়ে থাকে। তবে যখন পারিবারিক রুটিন অনুসরণের প্রশ্ন ওঠে তখন উপরোক্ত এই সমস্ত পদ্ধতিই কিন্তু গোণ বা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও একমাত্র অব্যর্থ পদ্ধতি তখন হয়ে দাঁড়ায় — নির্দেশ জারি করা।

পরিবার প্রতিপালন হল গিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি কর্তব্যকর্ম। পরিবার মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কারক। তদুপরি প্রতিটি পরিবার, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনযাত্রায় তো বটেই, সমগ্র জাতির পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ নানা লক্ষণাক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। একারণেই পারিবারিক রুটিনকে সুশৃঙ্খল ও কড়াকড়িভাবে সংগঠিত, বিকশিত ও কার্যকর করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বাবা-মা'দেরও এক্ষেত্রে কেজো লোকের দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করায় কোনোরকম দুর্বলতা কিংবা অস্বস্তি বোধ করা উচিত নয়। একথা মনে করা তাঁদের পক্ষে ঠিক হবে না যে কেজো লোকের দৃঢ় মনোভাব বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতার সঙ্গে খাপ খায় না এবং এর ফলে পরিণামে সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে হৃদয়তাপের ঘাটতি ঘটতে পারে। ফের একবার এ-ব্যাপারে জোর দিয়ে বলা বিশেষ প্রয়োজন যে একমাত্র ঐকান্তিক, সত্যিকার কেজো লোকের দৃঢ় মনোভাবই পরিবারে শান্ত প্রসন্ন আবহের সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এটাই একাধারে সঠিক পদ্ধতিতে শিশুপালন ও পরিবারের লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বিকাশসাধনের পক্ষে অপরিহার্য।

বাবা-মা'দের উচিত হবে যথাসম্ভব শিশুবয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের নির্দেশদানের সময় এমন একটা বাচনভঙ্গি অবলম্বনের চেষ্টা করা যা নাকি হবে ধীরস্থির, অবিচল, বন্ধুত্বপূর্ণ, আবার ওই একই সঙ্গে সর্বদাই দৃঢ়তাব্যঞ্জক। অপরপক্ষে ছেলেমেয়েদেরও খুব অল্প বয়স থেকেই এ-ধরনের বাচনভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে তোলা দরকার, দেখা দরকার যাতে তারা বাবা-মায়ের সকল নির্দেশ মেনে নিতে ও স্বেচ্ছায় তা পালন করতে কুণ্ঠিত না-হয়। নিজেদের ইচ্ছেমতো, প্রাণভরে, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করতে, তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করতে ও খেলাধুলো করতে অবশ্যই কোনো বাধা নেই, কোনো ক্ষতিও নেই তাতে, তবে এটা দেখা দরকার যে প্রয়োজন বোধ হলে বাবা কিংবা মা কোনো একটা কাজের নির্দেশ যেন মাত্র একবারের মতোই, সংক্ষেপে এমন এক প্রয়োজনীয় ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে জারি করতে সমর্থ হন যাতে তাঁদের নিজেদের কিংবা ছেলেমেয়েদের মনে ওই নির্দেশের যথাযথতা ও নির্দেশটি-যে প্রতিপালিত হবেই সে-সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না-ঘটে।

এই ধরনের নির্দেশদানের অভ্যাস বাবা-মা'দের আয়ত্ত করা উচিত সন্তানদের একেবারে শিশুকাল থেকে; অর্থাৎ যখন তাদের বয়স দেড় কি দু'বছর তখন থেকেই। এটা কিন্তু কোনোক্রমেই কঠিন কাজ নয়। কেবলমাত্র এটাই দেখা দরকার যে আপনাদের নির্দেশগুলি নিচের শর্তগুলি পূরণ করছে। শর্তগুলি এই:

১) নির্দেশগুলি বিদ্বেষের সুরে, গলা চড়িয়ে কিংবা বিরক্তিভরা গলায় জারি করা উচিত হবে না। সনির্বন্ধ অনুরোধের ঢঙেও তা উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়;

২) নির্দেশিত কাজগুলি শিশুর শক্তিসামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। কাজগুলি করার জন্যে শিশুকে যেন অতিরিক্ত প্রয়াস করতে না-হয়;

৩) নির্দেশগুলি যেন যুক্তিসম্মত ও সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়;

৪) নির্দেশগুলি যেন আপনাদের মধ্যে কোনো একজন বা অপরজনের অন্য কোনো নির্দেশের সঙ্গে সময় বা প্রকৃতির দিক থেকে বিরোধ না-ঘটায়।

একবার নির্দেশ দেয়ার পর সেগুলির যাতে অন্যথা না-হয় ও তা ঠিকমতো পালিত হয় তা দেখা দরকার। নির্দেশ জারি করে বাবা-মা নিজেরাই যদি সে-সব নির্দেশের কথা ভুলে যান তাহলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারের মধ্যেও অনবরত ও অক্লান্ত তদারকি ও কাজের অভ্রান্ততা যাচাই করা একান্ত অপরিহার্য। অবশ্য বাবা-মা'দের এই তদারকির কাজটা এমনভাবে চালানোর চেষ্টা করা দরকার যাতে তার অনেকখানিই ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিগোচর না-হয়। বস্তুত, বাবা-মায়ের নির্দেশগুলি-যে অবশ্যপালনীয় এ-ব্যাপারে শিশুর মনে কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক হতে দেয়াই অনুচিত হবে। তবে কখনও-কখনও শিশুদের ওপর যখন এমন অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজের ভার দেয়া হবে যে-সব কাজ নিষ্পন্ন করার সময় কাজের উঁচু মানের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের খোলাখুলি ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার হবে।

শিশু যদি বাবা-মায়ের নির্দেশগুলি পালন না-করে তাহলে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণীয় কর্মপন্থা কী

হবে? প্রথম কথা হল এই যে এরকম ঘটনা যাতে একেবারে না-ঘটে তার জন্যে সবরকমে চেষ্টা করা দরকার। তবু যদি তা ঘটেই এবং শিশুর পক্ষে আপনাদের নির্দেশ পালন না-করার মতো ঘটনা যদি সেই প্রথম বার হয় তাহলে নির্দেশগুলি দ্বিতীয় বারের মতো ফের জারি করা দরকার। তবে এবার তা জারি করতে হবে অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিকভাবে ও অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ গলায়। যেমন, বলতে পারেন: 'আমি তোমায় অমুক-অমুক কাজ করতে বলেছিলুম, কিন্তু দেখছি তুমি তা কর নি। যাই হোক, কাজগুলো এখুনি করে ফেলো। আর দেখো, এ-ধরনের ব্যাপার যেন ভবিষ্যতে আর না-ঘটে।'

এইভাবে পুরনো নির্দেশের পুনরাবৃত্তি ক'রে সেগুলি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সে-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে আপনার নির্দেশগুলি কেন পালিত হল না তার কারণগুলি নিয়ে চিন্তা করা ও তা বিশ্লেষণ করে দেখাও প্রয়োজন। এটা করলে আপনি নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন যে হয়তো আপনি নিজেই কোনো-কোনো দিক থেকে এর জন্যে দায়ী, হয়তো কোনো ব্যাপারে আপনার ভুল ঘটেছে কিংবা কোনো কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে আপনার। আর তা যদি হয় তাহলে ভবিষ্যতে অমন ভুল এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

এরকম অবস্থায় সবচেয়ে গুরুতর কাজটি হবে বিশেষভাবে এদিকে নজর রাখা যে আপনার ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হতে যেন অভ্যস্ত হয়ে না-পড়ে এবং পারিবারিক রুটিন যেন বানচাল হয়ে না-যায়। এ-জিনিস যদি আপনি একবার হতে দেন, আপনার নির্দেশগুলি কোনোক্রমে বাধ্যতামূলক নয় ছেলেমেয়েদের মনে যদি একবার এ-ধারণা

জন্মাতে দেন আপনি, তবে তা সাংঘাতিক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

এ-ব্যাপারটা মোটেই যাতে না-ঘটে একেবারে গোড়া থেকে সেদিকে যদি আপনি সতর্ক নজর রাখেন, তাহলে পরে আপনাকে কখনই নির্দেশ অমান্যজনিত শাস্তিদানের আশ্রয় নিতে হবে না।

কোনো পারিবারিক রুটিন একেবারে শুরু থেকেই যদি যথাযথভাবে খুঁটিনাটি দিকগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে বিশদ করে তোলা হয় এবং বাবা-মায়েরা যদি সে-রুটিন পালনের প্রতিটি স্তরে তার ওপর সতর্ক নিয়ন্ত্রণ রেখে চলেন তাহলে শাস্তিদানের কোনো দরকারই পড়বে না। সু-নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলিতে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা চালু নয়, আর পরিবারে শিশুলালনের পক্ষে এটাই হল সবচেয়ে সেরা ও সবথেকে সঠিক পথ।

তবু এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে শিশুপালনের ব্যাপারটি এত বেশি পরিমাণে অবহেলিত যে বারে বারে শাস্তি সেখানে দিতেই হয়। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরা সাধারণত নিতান্ত আনাড়ির মতো শাস্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন আর প্রায়শই এইভাবে শাস্তি দিতে গিয়ে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করেন বেশি করে।

শাস্তিদান হল অত্যন্ত জটিল একটা ব্যাপার। শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা বাবা-মাকে শাস্তি দিতে হলে প্রচন্ড রকমের কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ-কারণে বাবা-মা'দের পক্ষে যতটা সম্ভব শাস্তিদান এড়িয়ে চলাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এর পরিবর্তে প্রথমেই যা তাঁদের চেষ্টা করা উচিত তা হল পারিবারিক জীবনে সঠিক ধরনের একটি রুটিনের প্রবর্তনা। এটা করতে গেলে অবশ্যই প্রচুর সময় ব্যয় করা

দরকার, তবে বাবা-মা'দের ধৈর্য না-ধরে ও ফলের জন্যে অপেক্ষা না-করে উপায় নেই।

চরম কিছু-কিছু অবস্থায় অবশ্য কয়েক ধরনের শাস্তিদানের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা (যদি ছেলেমেয়েকে সিনেমায় কিংবা সার্কাসে নিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা থাকে তাহলে তা) মুলতুবি রাখা যেতে পারে, পকেটখরচার পয়সা দেয়ার রেওয়াজ থাকলে তা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা যায় এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশাতেও কয়েক দিনের মতো অনুমোদন না-দেয়া চলে।

তবে এ-প্রসঙ্গে আবার আমি বাপ-মায়েদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই যে পারিবারিক জীবনে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো রুটিনের অস্তিত্ব যদি না-থাকে তাহলে শাস্তিদান এমনিতে বড় একটা উপকারে আসবে না। আর যদি অমন কোনো রুটিন চালু থাকে পরিবারে তাহলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটা এমনিতেই এড়িয়ে চলা যেতে পারে, কেননা তখন আরেকটু বেশি পরিমাণে ধৈর্য রাখতে পারলে আপনা থেকেই সকল সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, এটা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে সঠিক অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারা অনেকদিনের গড়ে-তোলা বেঠিক অভিজ্ঞতাকে সংশোধন করে নেয়ার চাইতে বহুগুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি কার্যকর।

এই রকম 'উপহার'এর লোভানি দেয়া সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কখনই আগেভাগে পুরস্কার বা উপহার দেয়ার কথা জানানো উচিত হবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অভ্যাস হল সহজ-সরল ভাষায় প্রশংসা করা ও অনুমোদন জানানো। বাচ্চাদের খুশি করা, আনন্দ দেয়া

ও তাদের মনোরঞ্জক আমোদপ্রমোদের শরিক করাকে তারা নিজেরা যেন কখনও সৎ আচরণের পুরস্কার হিসেবে দেখতে না-শেখে, এসবকে তারা যেন গণ্য করতে শেখে বৈধ প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে মেটানোর উপকরণ হিসেবে। শিশুর পক্ষে যা-কিছু সত্যিকার প্রয়োজন তা তার যোগ্যতা ও গুণাগুণ নির্বিশেষে যে-কোনো সময়ে কিংবা যে-কোনো জায়গায় দেয়া যেতে পারে, কিন্তু যা তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিংবা ক্ষতিকর পুরস্কার হিসেবে তা কখনই তাকে দেয়া উচিত নয়।

খেলাধুলো

শিশুর জীবনে খেলাধুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। বয়স্ক মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, শ্রম ও চাকুরিগত পেশা ইত্যাদি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ এও তারই সমকক্ষ। খেলাধুলোর সময়ে শিশুর আচরণ অনেকখানি পরিমাণে পূর্বাভাস দেয় বড় হয়ে ওঠার পর কাজকর্মে তার পরবর্তী আচরণ কেমন হবে। একারণে ভবিষ্যৎ কর্মীর সত্যিকার প্রশিক্ষণ প্রথমত ও প্রধানত ঘটে থাকে খেলার মাঠেই।

শিশুর খেলাধুলো-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে পরিচালনা ও খেলার পটভূমিতে তাকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে খেলাধুলো আসলে কী বস্তু এবং শ্রমসাধ্য কাজ থেকে তার তফাতটা কোথায় এই প্রশ্নটি নিয়ে বাবা-মায়ের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। বাবা-মায়েরা যদি এই প্রশ্নটি নিয়ে মাথা না-ঘামান, নিজেদের মনে এটিকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ না-করেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের

ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দিতে পারবেন না, প্রতি পদক্ষেপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবেন এবং এটা খুবই সম্ভব যে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত করে তোলার পরিবর্তে তাদের বিগড়ে যেতেই সাহায্য করবেন।

প্রথমেই এটা বলা দরকার যে খেলাধুলো ও শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে পার্থক্য যতখানি বলে সাধারণত মনে করা হয় আসলে তার চেয়ে তা অনেক কম। ইতিবাচক খেলাধুলো ইতিবাচক কাজেরই সমতুল্য এবং নেতিবাচক খেলা নেতিবাচক কাজের সদৃশ। এই সাদৃশ্য এতই বেশি যে বিনা দ্বিধায় একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে, নেতিবাচক কাজের ইতিবাচক কাজের চেয়ে নেতিবাচক খেলাধুলোর সঙ্গেই প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বেশি।

সকল ইতিবাচক খেলার সঙ্গে প্রথমত ও প্রধানত কায়িক ও মানসিক শ্রমের প্রয়াস জড়িত। বাচ্চাকে একটি দম-দেয়া কলের ইঁদুর কিনে দেয়ার পর যদি আপনি নিজেই সারাটা দিন একবার করে সেটায় দম দেন ও একবার করে সেটাকে হেঁটে-চলে বেড়াতে দেন আর আপনার বাচ্চা সারা দিন ইঁদুরটার চলাফেরা শুধু দেখতে থাকে ও উপভোগ করতে থাকে — তাহলে বলতে হবে অমন খেলায় ইতিবাচক দিকটির অস্তিত্ব যৎসামান্যই আছে। এইভাবে শুধু দেখায় ব্যস্ত থাকলে শিশুটি নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে, সমগ্র ব্যাপারটিতে তার অংশগ্রহণ শুধু সীমাবদ্ধ থেকে যাবে চোখ মেলে দেখায়। আপনার বাচ্চা সব সময়ে যদি এইভাবেই খেলায় রত থাকে তাহলে সে বেড়ে উঠবে এমন এক নিষ্ক্রিয় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে যে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে শুধু অন্য লোকের কাজকর্ম তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে, সবরকম

উদ্যোগ হারিয়ে বসবে সে এবং তার নিজের কাজে কোনোরকম নতুন ধ্যানধারণার আমদানি ঘটানো অপছন্দ করবে কিংবা সম্ভাব্য কোনো বাধার সম্মুখীন হলে তা লঙ্ঘন করতে নারাজ হবে। যে-খেলায় কোনোরকম প্রয়াস করার, সক্রিয়ভাবে কোনো দিক থেকে জড়িত হওয়ার দরকার করে না সে-খেলা সর্বদাই নেতিবাচক বলে গণ্য হবার যোগ্য। ওপরের এই বক্তব্য বিষয়গুলির সব ক'টিই শ্রমসাধ্য কাজ ও খেলাধুলোর মধ্যে সাদৃশ্যের দিকগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

খেলাধুলো শিশুদের আনন্দ উপভোগের যোগান দেয়। এই আনন্দের উপভোগ সৃষ্টিশীল হতে পারে, সাফল্য অর্জনের বোধ থেকে এ-আনন্দ উৎসারিত হতে পারে, অথবা এ হতে পারে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ — অর্থাৎ, এক কথায়, গুণগত মানবিশিষ্ট আনন্দ। অন্যপক্ষে ইতিবাচক কাজই কেবল এহেন আনন্দের যোগান দিতে সমর্থ। এইভাবেই খেলা ও কাজের মধ্যে সাদৃশ্যগত তুলনাটি সম্পূর্ণ হচ্ছে।

কিছু-কিছু লোক মনে করেন যে শ্রমসাধ্য কাজের সঙ্গে খেলাধুলোর পার্থক্য হচ্ছে এইখানে যে কাজের সঙ্গে দায়দায়িত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু খেলার সঙ্গে তা নয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। কাজের মতোই খেলার সঙ্গেও দায়দায়িত্ব একই মাত্রায় সম্পৃক্ত, অর্থাৎ খেলাটা যদি অবশ্য ইতিবাচক ধরনের হয় তবেই। এই বিষয়টি পরে আমি আরও বিস্তারিত করে বিশদ করব।

তাহলে খেলাধুলো ও শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা দাঁড়াচ্ছে কোথায়? সত্যিকার পার্থক্য কেবল একটিই: শ্রমসাধ্য কাজ হল সামাজিক উৎপাদনে কিংবা সেই উৎপাদনকর্মের পরিচালনার সঙ্গে, বৈষয়িক ও

সাংস্কৃতিক, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, সামাজিক সম্পত্তি সৃষ্টির কাজে মানুষের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা। খেলাধুলোর লক্ষ্য অবশ্য একই নয়। একই ধরনের সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন করে না খেলাধুলো, কিংবা বলতে হয় খেলাধুলো সে-উদ্দেশ্য পূরণ করে একমাত্র পরোক্ষ উপায়ে। অর্থাৎ, ব্যক্তিবিশেষের পরবর্তী জীবনে কাজকর্মের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য সেই শারীরিক ও মানসিক প্রয়াস-পরিশ্রম প্রয়োগ করার ব্যাপারে খেলাধুলো তাকে প্রশিক্ষণ দেয় মাত্র।

এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদ করার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে খেলাধুলোর ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের পরিচালনা করতে হলে বাবা-মায়ের পক্ষে কোন জিনিসটা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার তা হল খেলাধুলো যেন কোনোক্রমেই বাচ্চার কাছে সর্বস্ব হয়ে না-দাঁড়ায়, সামাজিক লক্ষ্যবস্তুগুলি থেকে খেলাধুলো যেন বাচ্চার মনোযোগ পুরোপুরি কেড়ে না-নেয়। দ্বিতীয় কথা হল এই, বাবা-মা'দের এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে খেলার মধ্যে দিয়ে তাঁদের সন্তান যেন সেই মানসিক ও শারীরিক অভ্যাস ও নৈপুণ্যনিচয় বিকশিত করে তুলতে সমর্থ হয় যা নাকি তার পরবর্তী জীবনের কাজকর্মের পক্ষে অপরিহার্য গুণাবলী হিসেবে দেখা দেবে।

আগে যে-প্রথম লক্ষ্যটির কথা বলা হয়েছে তা অর্জন করা সম্ভব হবে শিশুকে ক্রমে-ক্রমে শ্রমসাধ্য কাজের পরিধির মধ্যে টেনে এনে। এই কাজের ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে তবে নিয়মিতভাবেই খেলাধুলোকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গা নেবে। এছাড়া দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পূরণ করা সম্ভব হবে সঠিকভাবে খেলাধুলোর ব্যাপারটারই তদারক করে, শিশু

কোন ধরনের খেলা খেলবে না-খেলবে তা বাছাই করে এবং খেলার সময় তাকে নানা দিক থেকে সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে।

আজকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি শুধু উপরোক্ত দ্বিতীয় লক্ষ্যটি সম্পর্কেই কথা বলব, কেননা পরে কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে পৃথক একটি গোটা আলোচনারই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রায়ই এটা আমার চোখে পড়েছে যে বাবা-মায়েরা অত্যন্ত ভুলভাবে ছেলেমেয়েদের খেলার তদারকি করে থাকেন। তাঁদের এই ভ্রান্ত পদ্ধতি সাধারণত নিচের তিনটি ধরনের মধ্যে কোনো একটি ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, কিছু-কিছু বাবা-মা ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর ব্যাপারে একেবারেই কোনো আগ্রহ দেখান না। তাঁদের বক্তব্য এই যে কীভাবে খেলাধুলো করতে হয় তা ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সবচেয়ে ভালো জানে। এই সব বাপ-মায়ের ছেলেপিলেরা তাই তাদের যেমন খুশি ও যখন খুশি খেলে বেড়ায়, নিজেরাই এরা এদের মনমতো পুতুল-খেলনা বেছে নেয়, নিজেদের খেলা নিজেরাই এরা সংগঠিত করে। এছাড়া আরও কিছু বাবা-মা আছেন যাঁরা বাচ্চাদের খেলার ব্যাপারে অনেকখানি, বলা ভালো অতিরিক্তই, মনোযোগ দিয়ে থাকেন, কীভাবে খেলতে হয় বাচ্চাদের এঁরা তার নমুনা দেখিয়ে থাকেন, অনবরত ব্যাখ্যা করে তাদের সবকিছু বোঝান, নিজেরাই বিশেষ-বিশেষ খেলার নিশানাগুলি নির্দিষ্ট করে দেন, শিশুদের দেখিয়ে-দেখিয়ে নিজেরাই সেই সব নিশানা পূরণ করেন এবং নিজেরাই বাচ্চাদের খেলায় মেতে ওঠেন। ফলে এঁদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে শুধু কী করে খেলতে হয় তা শোনা ও তার অন্ধ অনুকরণ করা ছাড়া আর কিছুই

করার থাকে না। এসব ধরনের ক্ষেত্রে আসলে যাঁরা খেলুড়ে তাঁরা হলেন শিশুর বাবা-মায়েরাই, শিশু নিজে ততটা নয়। এই ধরনের বাপ-মায়ের ছেলেমেয়ে খেলনা দিয়ে কোনো কিছু বানাতে-বানাতে হঠাৎ যদি কোনো সমস্যায় পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, তাহলে তার বাবা কিংবা মা সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে বসে পড়ে বলে ওঠেন: 'না-না, তুমি ঠিকমতো বানাতে পারছ না। দ্যাখো, এইভাবে এটা করতে হয়।'

বাচ্চাটি কাগজ কেটে কোনো কিছু তৈরি করতে বসলে দেখা যাবে বাবা-মা অল্প একটু সময় ঠাহর করে ওর এই চেষ্টাটা দেখছেন আর তারপরই বাচ্চার হাত থেকে কাঁচিটা নিয়ে নিতে-নিতে বলছেন: 'এস, আমিই তোমার হয়ে কেটে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন দেখ দেখি জিনিসটা কত সুন্দর হয়েছে!'

আর তখন বাচ্চাটি বানানো জিনিসটা দেখে বুঝতে পারে যে বাবা কিংবা মায়ের বানানো জিনিসটা সত্যিই তার নিজের বানানোর চেয়ে ভালো হয়েছে। স্বভাবতই সে দ্বিতীয় একখানা কাগজ বাবা বা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে অন্য কিছু একটা বানিয়ে দিতে বলবে আর বাবা বা মা নিজের সাফল্যে গদ্‌গদ হয়ে খুশিমনে সেটাও ফের বানিয়ে দেবেন। ফলে এই ধরনের বাবা-মায়ের সন্তান শুধুমাত্র বাবা-মায়ের কাজের অনুকরণই করতে শেখে, সমস্যা বা অসুবিধের সমাধান করার, কিংবা স্বাধীনভাবে নিজের 'কাজের' গুণগত মান উন্নত করার কোনো অভিজ্ঞতাই তার জন্মায় না। অল্পদিনের মধ্যেই এ-ধরনের ছেলেমেয়ে ভাবতে শুরু করে যে একমাত্র বয়স্করাই ভালোভাবে কাজ করতে সমর্থ। প্রায়ই এই সমস্ত ছেলেমেয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসে ও পাছে অসফল হয় এই ভয়ে সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকে।

খেলাধুলো সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এমন তৃতীয় দলের আরও কিছু বাবা-মা আছেন যাঁরা মনে করেন যে বাচ্চার খেলনার সংখ্যাটাই হল খেলাধুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা। এঁরা খেলনা কেনার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, বাচ্চাদের যখন-তখন নানা ধরনের খেলনা উপহার দেন ও এর জন্যে রীতিমতো গর্ববোধও করে থাকেন। এঁদের ছেলেমেয়েদের খেলার ঘরগুলো পুরোপুরি খেলনার দোকানের চেহারা নেয়। এরকম মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাপ-মায়েদের আবার বিশেষরকম পক্ষপাত দেখা যায় সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্রচালিত খেলনা সম্পর্কে আর সে-সব খেলনা এঁরা গাদা-গাদা চাপিয়ে দেন বাচ্চাদের ওপর ও আর সবকিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র খেলনা দিয়েই বাচ্চাদের জীবনগুলো কার্যত ভরিয়ে তোলেন এঁরা। এ-সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভালো হলে বড় জোর খেলনাপাতির নিছক সংগ্রাহক হয়ে দাঁড়ায়, আর মন্দ হলে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা এরকমটাই হয়) উদ্দেশ্যহীনভাবে তারা একের-পর-এক খেলনা বদল করতে থাকে, খেলায় সত্যিকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে তারা, খেলনাপাতি ভেঙেচুরে তছনছ করতে থাকে ও অনবরত দাবি জানাতে থাকে নতুন-নতুন খেলনার জন্যে।

খেলাধুলোর ব্যাপারে সঠিক তদারকি বলতে বোঝায় বাবা-মা'দের পক্ষে ব্যাপারটা নিয়ে আরও কিছু চিন্তাভাবনা করা ও আরও সতর্ক মানসিকতা অবলম্বন করা।

শিশুদের খেলাধুলো তাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি স্তর পরপর অতিক্রম করে এবং প্রতিটি স্তরে একেকটি সুনির্দিষ্ট ধরনের তদারকির দরকার পড়ে। এর প্রথম স্তরটি হল বাড়িতে খেলনা-পুতুল নিয়ে ঘরের মধ্যে

বসে খেলা। শিশুর পাঁচ থেকে ছ'বছর বয়সের মধ্যে সে এই স্তরটি অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে পেঁছয়। প্রথম স্তরটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে ওই স্তরে শিশু একা-একা খেলা করতে ভালোবাসে, খুব কমই সে পছন্দ করে যে তার এই খেলায় আরও এক-আধজন খেলার সাথী যোগ দিক। এছাড়া ওই স্তরে শিশু তার নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, অন্য কারো খেলনা নিয়ে খেলতে নারাজ হয় সে। এই স্তরে শিশু বিকশিত করে তোলে তার ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা। সর্বদা একা-একা খেলছে বলে যে শিশু স্বার্থপর ও অহংবাদী হয়ে বেড়ে উঠবে এই স্তরে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তাকে এ-সময়ে নিজ মনেই খেলতে দেয়া উচিত, তবে সেইসঙ্গে এদিকেও খেয়াল রাখা দরকার যে এই প্রথম স্তরটি যেন খুব বেশি দীর্ঘায়ত হবার মতো প্রশ্রয় না-পায় এবং যথোপযুক্ত অনুকূল মুহূর্তেই যেন এটি দ্বিতীয় স্তরকে জায়গা ছেড়ে দেয়। প্রথম স্তরে শিশু দল বেঁধে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে না; প্রায়ই তাকে খেলার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখা যায় এবং সাথীদের শরিক হতে পারে এমন কোনো সাধারণ স্বার্থের বন্ধনও খুঁজে পেতে সে অপারগ হয় এটাও লক্ষ্য করা যায়। তাই তাকে এ-বয়সে একা-একা খেলা করতে দেয়া উচিত ও তার ওপর খেলার সঙ্গী জোর করে চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়, কেননা এ-ধরনের যে-কোনো জবরদস্তি শিশুর খেলার মেজাজটাই নষ্ট করে দিতে সাহায্য করবে মাত্র এবং এর ফলে ঝগড়াঝাঁটিতে ও শিশুর মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করা হবে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে একেবারে বাচ্চাবয়সে যে-শিশু যত বেশি একা-একা খেলাধুলো করতে চায় ভবিষ্যতে সে তত ভালো বন্ধু হয়ে বেড়ে উঠবে। প্রাক্-

স্কুল পর্যায়ে শিশু অত্যন্ত বেশি গায়ে পড়ে ঝগড়াঝাঁটি করতে চায় ও অনেক-কিছু নিজের দখলে নিতে চায়। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে অবলম্বনীয় সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে বাচ্চাকে তার এই মারমুখী ভাব প্রকাশ করার ও তার 'দখলদারি' প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধনের যথাসম্ভব কম সুযোগ দেয়া। শিশু যদি নিজ মনে খেলাধুলো করে তাহলে বুঝতে হবে সে তার নিজস্ব সম্ভাব্য ক্ষমতাগুলি বিকশিত করে তুলছে: বাড়িয়ে তুলছে তার কল্পনাশক্তি, কোনো কিছু নির্মাণের ক্ষমতা, সংগঠনের দক্ষতা, ইত্যাদি যা কিছু জীবনে অত্যন্ত কার্যকর সে-সবই। কিন্তু আপনি যদি শিশুকে খেলাধুলোর জন্যে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে শিশুর দঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, তাতেই-যে তার মারমুখী ভাব ও স্বার্থপরতার প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হবে তা নয়।

যে-বয়সে শিশুর একলা খেলার প্রবণতা খেলার সাথীদের সম্পর্কে আগ্রহ ও দল বেঁধে খেলার ইচ্ছাকে জায়গা ছেড়ে দেয় সেটা সব শিশুর পক্ষে একরকম হয় না, শিশুতে-শিশুতে এই বয়সটার যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। খানিকটা পরিমাণে কঠিন এই পালাবদলের ব্যাপারটা যাতে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে ও সবচেয়ে সুবিধাজনকভাবে ঘটে তার জন্যে শিশুকে সাহায্য করা দরকার। শিশুর সঙ্গী ও খেলার সাথীদের গোষ্ঠীর বিস্তৃতিসাধন যাতে যতটা সম্ভব সর্বাঙ্গীণ আনন্দদায়ক পরিবেশে সংঘটিত হয় তা দেখা একান্ত আবশ্যক।

শিশুদের খেলাধুলোর দ্বিতীয় স্তরটি বাবা-মায়ের পক্ষে পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কেননা ওই সময়ে তারা আর বাবা-মাদের সতর্ক চোখের সামনে খেলাধুলো করে

না বরং বিস্তৃততর সামাজিক ভূখণ্ডে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় স্তরটি চালু থাকে ছেলেমেয়েদের এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ তাদের ইশকুল-জীবনের প্রথম কয়েকটা বছরও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইশকুলে যাওয়া শুরু করার পর শিশু পরিচিত হয় সঙ্গীসাথীদের ব্যাপ্ত একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে, সে গিয়ে পড়ে ব্যাপকতর আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা পরিধিতে এবং খেলাধুলোর ও অন্যান্য নানা কাজকর্মের জটিলতর একটা ভূখণ্ডে। আবার সেইসঙ্গে সে পরিচিত হয়ে ওঠে আগে-থেকে-তৈরি, অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট একটি সংগঠন, একটি অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট যথাযথ রুটিন এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য ও পথনির্দেশনার সঙ্গে। খেলাধুলোর এই দ্বিতীয় স্তরে শিশু ইতিমধ্যে সমাজের একজন হয়ে ওঠে, তবে সে-সমাজ তখনও পর্যন্ত শিশুদের সমাজই থেকে যায়, কঠোর শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে চিহ্নিত হয় না তা। উপরোক্ত এই দু'টি নতুন উপাদান সংযোজিত করে ইশকুলই ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর তৃতীয় স্তরে উন্নয়নের পালাবদলে বাহন হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় স্তরে উন্নীত হবার পর ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র খেলাধুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, শ্রমসাধ্য কাজ ও ক্রমিক শিক্ষালাভের পরিপ্রেক্ষিতেও যৌথজীবনে শরিকের ভূমিকা গ্রহণ করে। একারণেই এই বিশেষ স্তরে ও বয়সে খেলাধুলোর ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত কঠোরতর যৌথজীবনের চারিত্র্যলক্ষণে চিহ্নিত হয়ে ওঠে এবং ক্রমে তা পরিণত হয় বহিরঙ্গনের ক্রীড়ায় ও প্রতিযোগিতায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, খেলাধুলো এই সময়ে বালক বা বালিকার শারীরিক

প্রশিক্ষণলাভের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট নানা লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, সংযুক্ত হয় নানা নিয়মকানুনের সঙ্গে এবং সবথেকে যা গুরুত্বপূর্ণ সেই যৌথ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যৌথজীবনের নিয়মশৃঙ্খলা-বোধের সঙ্গে।

খেলাধুলোর অভ্যাসের ক্রমবিকাশে লক্ষণীয় এই তিনটি স্তরেই শিশুর বাবা-মায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অসম্ভবরকমের গুরুত্বপূর্ণ। এটা অবশ্য সত্যি যে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় উপরোক্ত ওই প্রথম স্তরেই, যখন শিশু নিজ পরিবার ছাড়া আর কোনো যৌথজীবনের শরিক হয় না এবং নিজের বাবা-মায়ের পথনির্দেশক প্রভাব ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবের বড়-একটা সংস্পর্শে আসে না। তবে শিশুর জীবনের পরবর্তী দুটো স্তরেও বাবা-মায়ের প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী ও অত্যন্ত উপকারী হতে কোনো বাধা নেই।

পূর্ববর্ণিত ওই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতেই খেলাধুলোর সময়ে শিশুদের লক্ষ্য যাতে বিশুদ্ধ চোখে-দেখার আনন্দ ও নিছক সহজ-সরল সুখে সীমাবদ্ধ না-থেকে তারও বেশি অর্থপূর্ণ আনন্দ অর্জনের অভিমুখে ধাবিত হয় তার দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য। বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করার মনোভাবকে এবং কল্পনাশক্তি ও নতুন-নতুন ধ্যানধারণার পরিচর্যাকে উৎসাহদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হলে বাবা-মাকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে তাঁদের সন্তান ততদিনে সমাজের একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শুধুমাত্র ঠিকমতো খেলাধুলো করতে পারার যোগ্যতা ছাড়াও তাঁদের সন্তানের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করা চলে। সন্তানের কাছ থেকে এই সময়ের মধ্যে

অন্তত এটুকু তাঁরা আশা করতে পারেন যে সে সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ

...প্রথম কথা যা বাবা-মা'দের মনে রাখা দরকার তা হল এই যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা শ্রমসাধ্য কাজের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজের সদস্য হতে চলেছে, ফলে ওই সমাজে তাদের গুরুত্ব, নাগরিক হিসেবে তাদের মূল্য সম্পূর্ণত নির্ভর করবে কতখানি পরিমাণে তারা সামাজিক শ্রমের অংশীদার হতে সমর্থ হবে, কতখানি পরিমাণে অমনধারা কাজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবে তারা — তার ওপর। উপরোক্ত এই শর্তগুলি তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনধারণের মানেরও নির্ণায়ক হবে, কেননা আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে 'কমপক্ষে প্রত্যেকের নিজ-নিজ যোগ্যতা থেকে শুরু করে পরিণামে প্রত্যেকের বিশিষ্ট কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী' নাগরিকদের বৈষয়িক চাহিদা মেটানো হবে। আমরা ভালোই জানি যে সকল মানুষকেই প্রকৃতি কাজ করার পক্ষে কমবেশি একই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী করে গড়ে তুলেছে, অথচ কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কিছু-কিছু লোক ভালোভাবে কাজ করতে সমর্থ, কিন্তু অন্যেরা তত ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, কিছু লোক সবচেয়ে সরল ধরনের কাজ করে উঠতে পারে আবার অন্যেরা তার চেয়ে জটিলতর অর্থাৎ বেশি মূল্যবান কাজ সমাধা করতে সমর্থ। মানুষের কাজ

করার ক্ষমতার এই তারতম্যের দায় কিন্তু তা বলে প্রকৃতির ওপর চাপানো চলে না, ক্ষমতার এই তারতম্য আসলে লালিত হয় ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে, বিশেষ করে তার শিশুবয়সে।

অতএব এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কাজের প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিবিশেষের কাজ করার সামর্থ্যের লালন কেবল ভবিষ্যতের সু- বা কু-নাগরিক গড়ার প্রশিক্ষণমাত্রই নয়, এটি এমন একটি বস্তু যা ওই নাগরিকের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মান ও তার ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধায়কও বটে।

এটা অবশ্য ঠিক যে একটি পরিবারের মধ্যে কোনো একটি শিশুকে আমরা যাকে বিশেষ যোগ্যতা বলছি সেই ধরনের কাজের বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ দেয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। পরিবারের পক্ষে শিশুকে বিশেষীকৃত পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়, এ-ধরনের বিশেষীকৃত পেশায় প্রশিক্ষণ কোনো ছেলে বা মেয়ে পেতে পারে কোনো-না-কোনো ধরনের জন-প্রতিষ্ঠানে, স্কুলে, ফ্যাক্টরিতে কিংবা অফিসে, কিংবা বিশেষীকৃত পাঠক্রম অনুসরণ করে। শিশু অমুক বা তমুক বিশেষ পেশার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করুক পরিবারের পক্ষ থেকে এর জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করাটাই মস্ত একটা ভুল হবে। আগেকার কালে ঠিক এটাই ছিল কিন্তু পারিবারিক প্রথা: তখন বাপ মুচি হলে ছেলেকে তিনি মুচির পেশাই শেখাতেন, বাপ ছুতোর হলে ছেলেকে শেখানো হোত ছুতোরের বৃত্তি। মেয়ে-সন্তানদের তখন সর্বদাই গৃহিণীর ভূমিকা পালনের জন্যে তৈরি করা হোত, তারা-যে আর কোনো পেশা নিতে পারে সেকথা তারা কিংবা বাড়ির কেউ এমন কি চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। একমাত্র অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের

পেশাগত যোগ্যতার ব্যাপারটা রাষ্ট্রের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নানা ধরনের পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে বেশ কিছুসংখ্যক বড় ও উপকরণাদিতে সুসজ্জিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

তবে বাবা-মা'দের অবশ্য কোনো কারণেই একথা ভাবা উচিত হবে না যে বাড়িতে শিশুর লালনপালনের সঙ্গে তার পেশাগত গুণাবলী অর্জনের কোনো সম্পর্কই নেই। পারিবারিক পটভূমিতে শিশু-বয়সে কাজের মধ্যে দিয়ে যে-শিক্ষালাভ করে থাকে মানুষ সেটাই তার ভবিষ্যৎ পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের পক্ষে অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ। যে-শিশুকে পরিবারের মধ্যে কাজের মারফত যথাযথ শিক্ষা দেয়া হয় সে কিন্তু পরে তার বিশেষীকৃত পেশাগত প্রশিক্ষণলাভের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বেশি সফল হবেই। যে-সব ছেলেমেয়ে পরিবারে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করে নি পরবর্তী জীবনে তারা ভালোরকম পেশাগত দক্ষতা অর্জনের অধিকারী হবে না, পদে-পদে ব্যর্থতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে তাদের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা অপটু কর্মী হিসেবে প্রমাণিত হবে।

...পরিবারের মধ্যে কাজের মারফত শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে সবচেয়ে জোর দিয়ে নিচের পদ্ধতিটি অবলম্বনের সুপারিশ করা যেতে পারে: শিশুদের এমন সুনির্দিষ্ট কিছু-কিছু কাজের দায়িত্ব দিতে হবে যে-সব কাজ তারা কোনো বিশেষ ধরনের কাজের পদ্ধতি কিংবা যন্ত্রপাতির সাহায্যে করে উঠতে সমর্থ হয়। এসব কাজ-যে স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ এক বা দু'দিনে সমাধা করার মতো হতে হবে তার

কোনো মানে নেই। এগ্নলি আরও অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ হতে ক্ষতি নেই, যেমন এসব কয়েক মাস, এমন কি কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এক্ষেত্রে যা গ্নর্ত্বপ্নর্ণ তা হল শিশ্নকে কাজটি সম্প্নর্ণ করার পদ্ধতি নির্বাচনে মোটের ওপর স্বাধীনতা দিতে হবে এবং কাজটি স্নষ্ঠুভাবে সমাধা করা ও তার গ্নণগত মান বজায় রাখার জন্যে সে-যে কিছ্ন পরিমাণে দায়ী এটা তাকে অন্নভব করতে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু কম কার্যকর হবে যদি শিশ্নটিকে বলা হয় যে 'এই নাও ঝাঁটা, এখন ঘরখানা এভাবে সাফ কর দেখি', ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভালো হয় যদি শিশ্নকে বেশ দীর্ঘ একটা সময় ধরে বিশেষ একখানা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও গ্নছিয়ে রাখার ভার দেয়া হয় এবং কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে কী করে নিষ্পন্ন করা যায় তার ভার ওই শিশ্নর ওপরই ছেড়ে রাখা হয় ও এই সিদ্ধান্তের জন্যে সে নিজেই-যে দায়ী এটা তাকে ব্নঝতে দেয়া হয়। অর্থাৎ, উপরোক্ত প্রথম উদাহরণ অন্নযায়ী শিশ্নটিকে দেয়া হল নিছক একটা কায়িক পরিশ্রমের কাজ আর তারপর তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হল একটা সংগঠনম্নলক দায়িত্ব। এই দ্বিতীয় কাজটি হল উন্নত ধরনের ও অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যত বেশি জটিল ও স্বনির্ভর ধরনের কাজের দায়িত্ব শিশ্নকে দেয়ার জন্যে বেছে নেয়া হবে শিক্ষাদানগত দ্ণষ্টিকোণ থেকে তা তত বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে। বহ্ন বাবা-মা এই য্নক্তিগ্নলো হিসেবের মধ্যে ধরেন না, শিশ্নদের তাঁরা নানারকম কাজ করতে দেন বটে, তবে সে-কাজগ্নলো সাধারণত হয়ে থাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ধরনের। তাঁরা ছেলেমেয়েদের সাধারণত এটা-ওটা ছোটখাট জিনিস কিনতে

দোকানে পাঠিয়ে থাকেন, তবে এর চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি তাঁরা বাচ্চাদের সুনির্দিষ্ট নিয়মিত কাজের ভার দেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা যদি ছেলেমেয়েদের ওপর এই দায়িত্ব দেন যে তাদের নজর রাখতে হবে বাড়িতে যেন সর্বদাই সাবান কিংবা টুথ পাউডারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকে তাহলে খুব ভালো হয়।

সংসারের কাজে খুব ছেলেবেলা থেকে শিশুর হাত লাগানো একান্ত প্রয়োজন। এ-কাজটা খেলাচ্ছলে শুরু হওয়া উচিত। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে তার খেলনা-পুতুলের ভালোরকম দেখাশোনা করা, তার খেলনার আলমারি ও খেলার জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছগাছ করে রাখা একান্তভাবে তারই দায়িত্ব। এই কাজের কথাটা তাকে বলতে হবে বিশদভাবে নয়, একেবারে মোটামুটি। যেমন, বলতে হবে যে তার খেলার জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে এবং কোনো কিছু যেন সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ও ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে না-থাকে ও খেলনাগুলোয় যাতে ধুলো না-জমে সেটা তাকে দেখতে হবে। অবশ্যই পরিষ্কার করার ও গুছনোর কিছু-কিছু ধরন বাচ্চাকে দেখিয়ে দেয়া চলতে পারে বৈকি, তবে তা মোটামুটি হওয়া চাই। বাচ্চা যদি বলে যে জিনিসপত্রের ধুলোঝাড়ার জন্যে একটুকরো ন্যাকড়া চাই এবং তেমন ন্যাকড়া যদি সে মায়ের কাছে চায়, যদি সে বলে যে প্রয়োজনীয় ন্যাকড়াটা স্বাস্থ্যরক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী হওয়া চাই এবং মায়ের দেয়া প্রথম ন্যাকড়ার টুকরোটা ফিরিয়ে দিয়ে আরও ভালো একটা টুকরো যদি সে চায়, তবে তো বলতে হবে সেটা আরও ভালো কথা।

বাচ্চার ভাঙা খেলনাপাতি মেরামতের জন্যেও এই একই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের সুপারিশ করা চলে, অর্থাৎ খেলনা সারানোর এই কাজটা তার সাধ্যের মধ্যে থাকলে শিশুকে তা অবশ্যই করতে দেয়া উচিত। তবে অবশ্য এ-কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি তাকে যুগিয়ে দিতে হবে।

শিশু যতই বড় হয়ে উঠবে তার ওপর ন্যস্ত কাজের এইসব দায়দায়িত্ব ততই ক্রমশ জটিলতর হয়ে ওঠা উচিত এবং এর মধ্যে খেলার ছলের মাত্রাটাও তত কমে যাওয়া দরকার। বাচ্চাদের ওপর যে করণীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলে তার একটা তালিকা নিচে দেয়া হল। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি স্বতন্ত্র পরিবারের বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজন, যা নাকি অবশ্যই তাদের জীবনধারণের অবস্থা ও পরিবেশ এবং পরিবারভুক্ত শিশুদের বয়স অনুসারে পৃথক রকমের হতে বাধ্য, তার সঙ্গে এই তালিকাটিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে অথবা এটির সঙ্গে সংযোজন করে নিতে হবে আরও কিছু দায়দায়িত্ব।

১) ঘরে অথবা বাড়িতে সংরক্ষিত গাছপালায় জল দেয়া।

২) জানলার তাকগুলোর ধুলো ঝাড়া।

৩) খাওয়ার সময় টেবিল সাজানো।

৪) নুন-মরিচের আর সরষে-গোলার পাত্রগুলি ভরা আছে কিনা তা দেখা।

৫) বাবার লেখার টেবিলের ধুলো ঝেড়ে তা পরিষ্কার রাখা।

৬) বই রাখার তাক কিংবা গোটা একটা বইয়ের আলমারি গুছিয়ে রাখার দিকে নজর দেয়া।

৭) খবরের কাগজ কিনে এনে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় তা সাজিয়ে রাখা এবং পুরনো থেকে নতুন কাগজ আলাদা করে রাখা।

৮) পরিবারের পোষা জীবজন্তুদের খেতে দেয়া।

৯) ওয়াশবেসিন পরিষ্কার রাখা ও সাজিয়েগুছিয়ে রাখার দিকে দৃষ্টি দেয়া। নজর রাখা — যাতে সাবান, টুথ পাউডার ও বাবার দাড়ি কামানোর ব্লেড সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে।

১০) কোনো একটা বিশেষ ঘর কিংবা ঘরের কোনো একটা নির্দিষ্ট কোণ পুরোপুরি পরিষ্কার রাখার দিকে নজর দেয়া।

১১) জামার যে-সব বোতাম ছিঁড়ে গেছে সেখানে-সেখানে নতুন বোতাম বসানো এবং এ-কাজের জন্যে সর্বদাই হাতের কাছে নতুন বোতাম, ছুঁচসুতো ইত্যাদি মজুত রাখা।

১২) খাবার ঘরের বাসনপত্রের দেরাজ বা আলমারিটি গুছিয়ে রাখা।

১৩) নিজের জামাকাপড় অথবা ছোট কোনো ভাই থাকলে তার কিংবা বাবা-মায়ের মধ্যে কারো একজনের জামাকাপড় কাচা।

১৪) কোনো একখানা ঘর ছবি, পোস্টকার্ড বা আঁকা ছবির রঙিন কপি দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব নেয়া।

১৫) পরিবারের যদি কোনো নিজস্ব সব্জিখেত বা ফুলবাগান থাকে তাহলে বীজ বোনাই শুধু নয়, খেত নিড়নো, জল দেয়া ও ফল বা ফুল হলে তা সংগ্রহ করার জন্যেও ওই খেত বা বাগানের একাংশের দেখাশোনার দায়িত্ব বাচ্চার ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

১৬) বাড়িতে যাতে সব সময়েই কিছু-না-কিছু ফুল ফুলদানিতে সাজানো থাকে তা দেখা এবং মাঝেসাঝে ফুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালানো (এই কাজটি অবশ্য অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের পক্ষেই উপযুক্ত)।

১৭) বাড়িতে যদি টেলিফোন থাকে তাহলে বাচ্চাকে ভার দেয়া যেতে পারে যে টেলিফোন বাজলেই সে যাতে ধরে ও সাড়া দেয়। তাকে পরিবারের আত্মীয়-বন্ধুদের টেলিফোন-নম্বরের একটি তালিকা তৈরিরও ভার দেয়া যায়।

১৮) পরিবারের লোকজন ঘনঘন যেসব জায়গায় গিয়ে থাকেন বিশেষ করে সেই সব জায়গা দিয়ে যেসব রুটের ট্রাম যাতায়াত করে তাদের একটা তালিকা তৈরির ভারও বাচ্চাকে দেয়া যেতে পারে।

১৯) অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বলা যেতে পারে গোটা পরিবারটির একত্রে থিয়েটর ও সিনেমা দেখার ব্যাপারটা তাদের নিজেদের চেষ্টায় সংগঠিত করতে, শহরে কোথায় কোন নাটকের অভিনয় ও ফিল্‌ম দেখানো হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে, প্রয়োজনীয় টিকেট সংগ্রহ করতে ও তা সাবধানে নিজেদের কাছে রেখে দিতে, ইত্যাদি।

২০) পরিবারের ওষুধের বাক্সটি গুছিয়ে রাখা ও যখন যে-ওষুধ ফুরিয়ে যাবে তখন ফের তা কিনে বাক্সয় যথাস্থানে রেখে দেয়া।

২১) ফ্ল্যাটে যাতে ছারপোকা, মাছি, ইত্যাদি পোকামাকড় দেখা না-দেয় সেদিকে নজর রাখা এবং পোকামাকড় দেখা দিলে অবিলম্বে তা মারার জন্যে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠা।

২২) সংসারের বিশেষ-বিশেষ কাজে মা-বোনকে সাহায্য করা।

প্রত্যেকটি পরিবারেই এ-ধরনের এমন বহু কাজ থাকে যা আমাদের এই উদ্দেশ্যপূরণের পক্ষে উপযোগী, মোটামুটি আগ্রহোদ্দীপক এবং যা শিশুর সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে। এটা অবশ্য ঠিক যে শিশুর ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে তাকে ভারগ্রস্ত করে তোলা উচিত নয়, তবে সেইসঙ্গে এটাও দেখা দরকার যে বাবা-মায়ের ও বাচ্চার কাজের চাপের মধ্যে খুব বেশি ফারাক যেন চোখে না-পড়ে। বাবা কিংবা মাকে সংসারের কাজে যদি খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় তাহলে বাচ্চাদের তাঁদেরকে সাহায্য করার অভ্যাস আয়ত্ত করানো একান্ত আবশ্যক। এর উল্‌টো ব্যাপারটাই সাধারণত বড় বেশি করে চোখে পড়ে: দেখা যায় পরিবারে যদি কোনো পরিচারিকা থাকে তাহলে ছেলেমেয়েরা যে-সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের চাহিদা বেশ ভালোভাবে মেটাতে সমর্থ সেক্ষেত্রেও তারা ওই দাসীর ওপর প্রায়ই নির্ভর করতে শেখে। বাবা-মা'দের কিন্তু উচিত হবে এ-ব্যাপারে কড়া দৃষ্টি রাখা, এবং যে-সমস্ত কাজ ছেলেমেয়েরা সত্যিসত্যিই নিজেদের হাতে করতে সমর্থ ও যা তাদের করা উচিত তেমন কাজ যেন কোনোক্রমেই বাড়ির দাসী ইত্যাদিকে দিয়ে করানো না-হয় তা দেখা।

এ-প্রসঙ্গে এ-কথাটা মনে রাখা সর্বদাই প্রয়োজন যে ছেলেমেয়েরা ইশকুলে যেতে শুরু করার পর তাদের বাড়িতে টাস্কের চাপ বেশ ভারি হয়ে দাঁড়ায়। এটা অবশ্যই ঠিক যে তাদের এই স্কুলের কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে গণ্য করতে হবে ও এই কাজকে প্রধান স্থান ছেড়ে দিতে হবে। ছেলেমেয়েদেরও এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে দিতে

হবে যে যখন তারা স্কুলের টাস্ক ইত্যাদি সমাধা করছে তখন তারা-যে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নিজের-নিজের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ একটা কাজ করছে তা-ই নয়, সামাজিক অর্থেও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছে। এটা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে ইশকুলে তাদের পড়াশুনো কেমন চলছে তার জন্যে তাদের-যে কেবল নিজের-নিজের বাবা-মা'দের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে তাই নয়, খোদ রাষ্ট্রের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। অপরদিকে আবার কেবলমাত্র স্কুলের কাজকে তার যথাযোগ্য স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্য সবরকম সাংসারিক ইত্যাদি কাজের প্রতি অবহেলা দেখানোটাও উচিত হবে না। স্কুলের দায়দায়িত্বকে এইভাবে পৃথক ও বিশিষ্ট করে দেখাটা শুধু-যে বিপজ্জনক তাই নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদের মনে তাদের পারিবারিক যৌথের জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম সম্বন্ধেও পরম অবজ্ঞার একটা ভাবের সঞ্চার করে থাকে। পরিবারের মধ্যে সর্বদাই যৌথ জীবনের ঘনিষ্ঠ একটা আবহাওয়ার প্রাধান্য থাকা দরকার এবং যত ঘনঘন সম্ভব পরিবারের লোকজনদের একে অপরকে নানা ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসা উচিত।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিশুর মধ্যে সংসারের অমুক-বা-তমুক কাজ করার প্রয়াস জাগিয়ে তোলার জন্যে কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে ও তা করা উচিত হবে? বলা বাহুল্য, এই ধরনের প্রয়োগ-পদ্ধতির সংখ্যা বহুব্যাপক হতে পারে। একেবারে শিশুবয়সে বাচ্চাকে অবশ্য অনেক-কিছু কাজের ধরন দেখিয়ে দেয়া যেতে পারে বা আভাসে-ইঙ্গিতেও বোঝানো চলে, তবে এক্ষেত্রে একেবারে আদর্শ পদ্ধতি বলে যা মনে হয় তা হল এই যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট ধরনের

কাজ-যে শিশুকে নিজ হাতে করতে হবে এটা যেন সে নিজে থেকেই বুঝে উঠতে পারে; কাজটা বাবা কিংবা মায়ের করে ওঠার মতো যথেষ্ট সময় নেই এটা লক্ষ্য করে শিশু যেন তার নিজস্ব পারিবারিক যৌথের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে নিজে থেকেই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে শেখে। শ্রমসাধ্য কাজের প্রতি এই স্পৃহা এবং নিজের পারিবারিক যৌথের নানা চাহিদার ব্যাপারে মনোযোগ জাগিয়ে তোলাই হল সত্যিকার সোভিয়েত নাগরিক হিসেবে সুশিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক উপায়।

এমনটি অবশ্য প্রায়ই ঘটতে পারে যে অভিজ্ঞতার অভাব ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সীমিত বোধশক্তির দরুন তার পক্ষে সংসারের কী-কী কাজ করা দরকার শিশু হয়তো নিজে থেকে তা বুঝে না-ও উঠতে পারে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের কর্তব্য হবে বাচ্চাকে আভাসে-ইঙ্গিতে বা মৃদুভাবে কাজটা-যে করা দরকার তা বুঝিয়ে দেয়া এবং আলোচ্য কাজটি সম্পর্কে বাচ্চার মনোভঙ্গি ও সচেতনা গড়ে তোলার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা ও কাজটি সমাধা করার ব্যাপারে হাত লাগাতে উৎসাহিত করা। আলোচ্য কাজ সম্পর্কে সোজাসুজি কারিগরি কৌতূহল জাগিয়ে তুলে প্রায়শই এটা সবচেয়ে ভালোভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব, তবে বলা বাহুল্য এই পদ্ধতিটি কখনোই অতিরিক্ত পরিমাণে বা বাড়াবাড়ি করে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না। যে-সমস্ত কাজ বিশেষ করে শিশুর মনে আগ্রহের সঞ্চার করছে না এবং আপাতদৃষ্টিতে যা একঘেয়ে বলে বোধ হচ্ছে সে-সব কাজও যথারীতি নিষ্পন্ন করতে শিশুকে শেখানো দরকার। সাধারণভাবে ছেলেমেয়েকে এমনভাবে লালন করা উচিত যাতে যে-কাজ সে করতে যাচ্ছে তার প্রধান-প্রধান দিকগুলি,

যেমন তার প্রয়োজনীয়তা, তার কার্যকরতা ইত্যাদি, সে-কাজ কতখানি আগ্রহোদ্দীপক সেই চিন্তার চেয়ে বেশি করে সেই ছেলে বা মেয়ের চোখে পড়ে। অপ্রীতিকর কাজও যাতে ধৈর্য ধরে, গঁইগাঁই না-করে বা নাকি কান্না না-কেঁদে বাচ্চা নিষ্পন্ন করতে পারে তার মধ্যে সেই বিশেষ ক্ষমতাটা বাবা-মায়ের জাগিয়ে তোলা উচিত। এটা করা সম্ভব হলে পরবর্তী জীবনে দেখা যাবে যে শিশু যত বড় হয়ে উঠবে ততই সে কোনো বিশেষ কাজের সামাজিক মূল্য স্পষ্ট করে বোঝার পর কাজটা যতই অপ্রীতিকর হোক-না কেন তা নিষ্পন্ন করে আনন্দ পাবে।

যে-সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মতো যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনের চাহিদা কিংবা আগ্রহের মতো উপাদানের অভাব ঘটছে, সে-সব ক্ষেত্রে অবশ্য অনুরোধ-উপরোধের আশ্রয় নেয়া চলতে পারে। অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের চেয়ে অনুরোধ জানানোর পার্থক্যটা এইখানে যে এক্ষেত্রে শিশুর পক্ষে কাজটা করা বা না-করার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকে। এই ধরনের অনুরোধ এমনভাবে জানাতে হবে যাতে বাচ্চার মনে এই ধারণা জন্মায় যে সে নিতান্তই নিজের ইচ্ছেয় অনুরোধটা রাখছে, কোনোরকম পীড়াপীড়ি বা চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হচ্ছে না তাকে। যেমন, অনুরোধটা এভাবে জানানো যেতে পারে: 'খোকা (বা খুকু) তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। যদিও কাজটা তোমার পক্ষে কঠিন হবে আর তাছাড়া তোমার আরও অনেক কাজ করার আছে তা-ও জানি, তবু...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনুরোধ জানানোটা হল সবচেয়ে সেরা ও সবথেকে নরম পন্থা তবু এ-পদ্ধতিও ঘনঘন ব্যবহার করা উচিত হবে না।

অনুরোধ জানানোর পদ্ধতি সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো যেখানে আপনি জানেন যে শিশু ওই অনুরোধ রাখতে পেরে খুশি হবে। এ-ব্যাপারটায় যদি কখনও আপনার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত বেশি চলতি ধরনের নির্দেশদান — তবে শান্ত, প্রত্যয়শীল কণ্ঠে ও সংক্ষিপ্তভাবে নির্দেশদানের — পদ্ধতি অবলম্বন করুন। শিশুর খুব অল্প বয়স থেকে তাকে অনুরোধ জানানো ও নির্দেশ দেয়ার এই দুটি পদ্ধতি যদি সঠিক সময়ের ব্যবধানে ও পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন এবং বিশেষ করে শিশুর ব্যক্তিগত উদ্যোগকে জাগিয়ে তোলা যদি সম্ভব হয় এবং নিজে থেকে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ও নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল কাজ নিষ্পন্ন করতে যদি শেখান শিশুকে আপনি তাহলে দেখতে পাবেন যে সে আজ্ঞানুবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় সকল কাজ সম্পন্ন করছে। তবে শিক্ষাদানের এই বিশেষ দিকটি যদি অবহেলিত হয় তাহলে কিন্তু বাবা-মাকে থেকে-থেকেই কাজ করার জন্যে ছেলেমেয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হতে হবে।

চাপ সৃষ্টি বা জবরদস্তি নানা রকমের হতে পারে — একই নির্দেশের সরল সাধারণ পুনরাবৃত্তি থেকে শুরু করে ঝাঁঝালো হুকুমজারির গলায় তার পুনরাবৃত্তি পর্যন্ত। মোট কথা, শারীরিক জবরদস্তি প্রয়োগের কখনোই কোনো দরকার পড়ে না, কেননা তা বিন্দুমাত্র উপকারে আসে না বরং তা সাধারণভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে শিশুর মনে একটা ঘৃণার ভাবেরই সঞ্চার করতে চায়।

তথাকথিত অলস ছেলেপিলেকে বাগ মানাতে গিয়ে বাবা-মায়েরা প্রায়ই মুশকিলে পড়ে যান। এখানে এটা বলা দরকার যে কুঁড়েমি, অর্থাৎ কাজ করার ব্যাপারে বিমুখতার,

কারণ নিতান্তই দুটো-চারটে ক্ষেত্রে মাত্র অস্বাস্থ্য, শারীরিক দুর্বলতা কিংবা মানসিক ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। কারণটা সত্যিই তাই হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াই সবচেয়ে ভালো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের অলসতা বৃদ্ধির মূলে থাকে তাদের ভ্রান্ত লালনপালন: অর্থাৎ একেবারে শিশুকাল থেকে বাচ্চার মধ্যে কর্মোদ্যমের সঞ্চার না-ঘটানো, কী করে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয় তাকে তা না-শেখানো এবং পরিবারের নানা ব্যাপারে তার মনে আগ্রহ না-জাগিয়ে তোলা, ইত্যাকার কারণে শিশু কাজ করার ব্যাপারে ও কীভাবে সর্বদা কাজ করে আনন্দ পেতে হয় তাতেও অভ্যস্ত হয় না। শিশুর আলস্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটিমাত্র উপায়ই আছে আর তা হল ক্রমে-ক্রমে তাকে কাজের ক্ষেত্রে টেনে আনা, ক্রমশ তার মধ্যে জাগিয়ে তোলা কাজ করার আগ্রহ।

...এখন কাজের গুণগত মান সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলা দরকার। কাজের গুণগত মান অর্জন একেবারে নির্ধারক গুরুত্বের একটা ব্যাপার। কাজ করলেই তার গুণগত উঁচু মান সর্বদাই দৃঢ়ভাবে দাবি করা উচিত। অবশ্য শিশুরা ওই বয়সে এতটা অনভিজ্ঞ ও শারীরিক শক্তিতে প্রায়ই এত অপটু হয় যে নিখুঁতভাবে কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব বাচ্চার কাছ থেকে কাজের এমন ধরনের মানই দাবি করা উচিত যা সে অর্জন করতে সক্ষম, যা তার শারীরিক ক্ষমতা ও বোধশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

এ-সমস্ত ক্ষেত্রে খারাপভাবে কাজ করার জন্যে শিশুকে ভর্ৎসনা করে ও ধমক দিয়ে তাকে লজ্জা দেয়ার দরকার করে না। শুধু তাকে সহজ ও শান্তভাবে এটুকু বললেই

চলবে যে কাজটা সন্তোষজনকভাবে নিষ্পন্ন করা হয় নি, কাজেই সেটা ফিরেফিরতি আবার করতে হবে কিংবা তার কিছু-কিছু দোষত্রুটির সংশোধন ঘটাতে হবে অথবা আবার পুরোপুরি কেঁচে-গণ্ডূষ করা দরকার। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা-মা'দের কখনোই বাচ্চার হয়ে গোটা কাজটা করে দেয়া উচিত হবে না। তবে এক-আধটা ক্ষেত্রে বড়জোর কাজটার সেই অংশটুকু তাঁরা করে দিতে পারেন যেটুকু নাকি স্পষ্টতই শিশুর সাধ্যের বাইরে বলে বোঝা যাবে। এইভাবে তখন তাঁরা শিশুর ওপর অমন একটা কাজ চাপানোর প্রাথমিক ভুলটুকু সংশোধন করে নিতে পারেন।

বাবা-মা'দের বিশেষ করে অনুরোধ করব যে বাচ্চাদের ওপর কাজের ভার দিতে গিয়ে তাঁরা যেন পুরস্কার বা শাস্তি কোনো কিছুই দেয়ার ব্যবস্থা না-করেন। কাজের দায়িত্ব অর্পণ ও তা সম্পন্ন করা এমনিতেই শিশুর পক্ষে খুশি ও আনন্দের উৎস হয়ে ওঠা উচিত। কাজটা সে-যে ভালোভাবে নিষ্পন্ন করেছে এর স্বীকৃতিই শিশুর কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে গণ্য হওয়া কর্তব্য। কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বাচ্চা যে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও মাথা খাটানোর পরিচয় দিয়েছে সে ব্যাপারে আপনাদের তারিফ ও উৎসাহদানই বাচ্চার কাছে পুরস্কার বলে গণ্য হবে। তবে এমন কি এই মৌখিক তারিফের বাড়াবাড়ি করাটাও উচিত হবে না। বিশেষ করে আপনাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের সামনে বাচ্চার কাজের জন্যে তাকে প্রশংসা করাটা সযত্নে এড়িয়ে চলা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল খারাপভাবে কাজ করা কিংবা একেবারে কাজ না-করার জন্যে অন্যান্যদের উপস্থিতিতে শিশুকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে চলা। কাজের ব্যাপারে শিশুর

এরকম গাফিলতি দেখা গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল এটা দেখা যে কাজটা শেষপর্যন্ত যেন বাচ্চাটি সম্পূর্ণ করে।

যৌন-বিষয়ক শিক্ষা

যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যাপারটি বাবা-মা কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির একটি বলে গণ্য হয়ে থাকে। বস্তুত, এমন খুব কম প্রশ্নই আছে যা এর মতো এত বেশি লজ্জাসংকোচ, বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত মতামতের শিকার হয়ে থাকে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে প্রথমে যা মনে হয় বিষয়টি কিন্তু মোটেই তত কঠিন নয় এবং বহু পরিবারেই খুব সহজে ও কোনোরকম দুশ্চিন্তিত আত্মানুসন্ধান ইত্যাদি ছাড়াই এ-সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। একমাত্র তখনই এ-সমস্যাটি কঠিন হয়ে দেখা দেয় যখন এটিকে অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিচার করা হয় এবং যখন এর ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ ক'রে শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নাদির প্রধান অংশ থেকে একে পৃথক করে নেয়া হয়।

পরিবারের মধ্যে যৌন-বিষয়ক শিক্ষা একমাত্র তখনই সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে যখন বাবা-মাদের এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে যে এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন লক্ষ্যে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যদি তাঁদের কাছে এটা পরিষ্কার থাকে যে এ-বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের কোন লক্ষ্যে তাঁরা পোঁছে দিতে চান, তাহলে ওই লক্ষ্যে পোঁছনোর পথও তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

...আমাদের যৌনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক নীতিবোধ আমাদের কাছে কতখানি কী দাবি করে থাকে? এক কথায় এই নীতিবোধের দাবি হল, আমাদের প্রত্যেকের, প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে তার যৌনজীবনকে তার জীবনযাত্রার অন্ততপক্ষে অন্য দুটি দিকের সঙ্গে অনবরত সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে। এই দু'টি দিক আর কিছুই নয়, তা হল আমাদের প্রত্যেকের পরিবার ও প্রত্যেকের প্রেম। উপরোক্ত নীতিবোধ একমাত্র সেই যৌনজীবনকেই নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় যার ভিত্তি হল পারস্পরিক ভালোবাসা ও যা পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এই যৌনজীবনের ভিত্তি হওয়া দরকার স্ত্রী-পুরুষের এমন এক ধরনের খোলাখুলি বৈধ মিলন যার দ্বিবিধ লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকবে মানবিক সুখ অর্জন এবং সন্তানধারণ ও লালনের দিকে।

যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত উপরোক্ত এই বক্তব্যই তা স্পষ্ট করে তুলছে। ছেলেমেয়েদের এমনভাবে আমাদের শিক্ষিত করে তোলা দরকার যাতে তারা পারস্পরিক প্রেমের পটভূমিতেই যৌন-জীপনযাপনে সত্যিকার আনন্দ ও সম্ভোগের সন্ধান পায় এবং একমাত্র পরিবারের মধ্যেই এধরনের সুখ, ভালোবাসা ও সম্ভোগ অর্জনযোগ্য বলে জ্ঞান করে।

আমাদের শিশুদের যৌন-বিষয়ে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পর্কিত শিক্ষাদানের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার সময়ে আমাদের তা অবশ্যই আলোচনা করতে হবে প্রেমের ও পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকার পশ্চাৎপটেই। এছাড়া অন্য কোনো ধরনের যৌন-বিষয়ক

শিক্ষা ক্ষতিকর ও সমাজবিরোধ হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। প্রতিটি অভিভাবক, প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত তাঁদের সন্তানদের এমনভাবে লালন করা যাতে ভবিষ্যতের এইসব নাগরিককে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের এতখানি উপযোগী করে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় যে তারা একমাত্র বিবাহিত প্রেমের জীবনের পটভূমিতেই সত্যিকার সুখ খুঁজে পায় এবং একমাত্র ওই পটভূমিতেই যৌনজীবনের আনন্দ, সম্ভোগ ইত্যাদির সন্ধান করে। বাবা-মায়েরা যদি তাঁদের দৃষ্টি এধরনের লক্ষ্যে নিবদ্ধ না-রাখেন, কিংবা যদি তাঁরা এমন লক্ষ্যে উপনীত না-হতে পারেন, তাহলে তাঁদের সন্তানেরা-যে ভবিষ্যতে অনিয়মিত যৌনজীবন যাপন করবে এটা স্বতঃসিদ্ধ এবং ফলত এ-সমস্ত জীবন হবে যত ধরনের সম্ভব নাটকীয়তা, মানসিক বিপর্যয় ও নানারকম নোংরামিতে পূর্ণ এবং তা সমাজের পক্ষেও যত-না উপকারী তার চেয়ে অনেকগুণে বেশি হবে ক্ষতিকর।

...এমন কি প্রেম ও পারিবারিক জীবনের প্রশ্নেও যে-কোনো মানুষের সামগ্রিক মানসিক বিকাশের মান গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, তার রাজনৈতিক ও নীতিবোধ-সম্পর্কিত মতামতগুলি, তার শিক্ষার মান, তার কর্মক্ষমতা, তার সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি তার আনুগত্য এবং দেশবাসী মানুষজনের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ, ইত্যাদি। অতএব, এমন ধারণা পোষণ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে যে ভবিষ্যৎ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটির যৌনজীবন শৈশব থেকেই প্রতি পদক্ষেপে অনবরত একটু-একটু করে তার ভবিষ্যৎ রূপের আদলে ঢালাই হতে থাকবে এবং এমনটি ঘটতে থাকবে বাবা-মা কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকা তার যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না-দেয়া

সত্ত্বেও। 'আলস্যই সকল প্রকার পাপের উৎস' এই প্রাচীন প্রবাদটি উপরোক্ত সাধারণ নিয়মেরই প্রমাণ দিচ্ছে। অবশ্য, আলস্য ছাড়া পাপের অন্য উৎসেরও অভাব নেই: সঠিক সামাজিক আচরণ থেকে মানুষের সকল প্রকার বিচ্যুতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাকে সমাজের মধ্যে বাস সত্ত্বেও কলুষিত আচরণের পথে, বিশেষ করে যৌনজীবনে এলোমেলো আচরণের পথে টেনে নিয়ে যায়।

অতএব এটা স্বতই স্পষ্ট যে যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বনই-যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুপালনের ও শিশুকে শিক্ষাদানের মোটামুটি ছকটিই, এ-সম্পর্কিত পরিস্থিতির সমগ্র ছবিটিই।

অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে এমন কিছু-কিছু অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি ও কলাকৌশলও আছে যা নাকি যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। তবে কিছু-কিছু লোক আবার এইসব বিশেষ পদ্ধতি ও কলাকৌশলের ওপর অতিরিক্ত রকমের মূল্য আরোপ করে থাকেন এবং এগুলিকে সৃষ্টিশীল শিক্ষাবিজ্ঞানগত তত্ত্বের সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রকাশ বলে গণ্য করেন।

তাই বিশেষ জোর দিয়ে কথাটা এইখানে বলা দরকার যে যৌন-বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপারে উপরোক্ত ওইসব বিশেষ ধরনের সুপারিশের মধ্যেই এমন কিছু-কিছু অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রয়োগ-পদ্ধতি ইত্যাদি নিহিত আছে যেগুলিকে খুবই সতর্কভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আগেকার কালে যৌন-বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপারে প্রভূত মনোযোগ দেয়া হোত। অনেকেই তখন মনে করত যে যৌন-বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির

একটি, কেননা তাদের মতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে যৌন-ব্যাপারটি একটা নির্ধারক স্থান দখল করে আছে এবং মানুষের সকল আচার-আচরণ যৌন-সম্পর্কিত মনোভঙ্গির দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত 'তত্ত্বগত' উপপাদ্যের প্রবক্তারা এটাও দেখাবার চেষ্টা করতেন যে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সকল রকমের শিক্ষাই নাকি মূলত যৌন-বিষয়ক শিক্ষা।

এই সমস্ত 'তত্ত্বকথা'র অনেকগুলিই এখন অবশ্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে এবং যে-সব বইতে ওই সমস্ত 'তত্ত্ব'এর টীকা-ভাষ্য বিধৃত ছিল সেগুলির ওপর শুধুই ধুলো জমছে এখন। পাঠক সাধারণের ওপর ওই সব বইয়ের প্রভাবও এখন যৎসামান্য। তবু, এসব সত্ত্বেও, উপরোক্ত মতাদর্শগুলির অনেকখানিই সমাজের একটা ব্যাপ্ত অংশের মধ্যে চারিয়ে গেছে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক সব ধ্যানধারণার জন্ম দিয়েছে।

আগেকার দিনে সবচেয়ে বেশি করে লোকে আগবাড়া হয়ে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইত যে তাদের বাচ্চারা যেন বিশেষরকমের যুক্তিসঙ্গত পথ অনুসরণ করে নিজ-নিজ যৌনজীবনের জন্যে প্রস্তুত হয়, যাতে তারা যৌন-ব্যাপারে কোনো কিছুকেই 'লজ্জাকর' বা রহস্যময় বলে জ্ঞান না-করে। এই উদ্দেশ্যে বাবা-মায়েরা তখন ছেলেমেয়েদের কাছে যৌন-ব্যাপারের সকল রহস্যের দ্বারোন্মোচনে ও সন্তান উৎপাদনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত লোক তখন 'পরম বিতৃষ্ণা'ভরে সেইসব 'হাবাগবাদের' কথা উল্লেখ করতেন যারা নাকি মা-ষষ্ঠীর কৃপা ও সন্তান উৎপাদনের অন্যান্য আজগবি কারকের কাহিনী ফেঁদে ছেলেমেয়েদের ঠকাত। সে-সময়ে এটা ধরে

নেয়া হোত যে, কোনো শিশুর কাছে যদি সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলা হয় এবং যৌন-ব্যাপারে-যে লজ্জাকর কোনো কিছু আছে তা যদি সে না-বুঝতে শেখে, তাহলেই বুঝতে হবে যে সঠিকভাবে যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের কাজটি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।

আমার বক্তব্য এই যে এ-ধরনের শলা-পরামর্শ খুবই সাবধানে কানে নিতে হবে। যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের প্রশ্নগুলি অনেক বেশি ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে সংশোধনের অতীত কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না-হয়। এটা সত্যি, শিশুরা প্রায়ই এমন প্রশ্ন করে থাকে যে বাচ্চা জন্মায় কেমন করে। তবে এ-ব্যাপারে শিশুর কৌতূহল প্রকাশ পেলে তা থেকে এটা বোঝায় না যে অত অল্প বয়সেই তার কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে না-বোঝালে চলবে না। কেননা এটাও মনে রাখতে হবে যে শিশুর জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে একমাত্র যৌন-বিষয়ক প্রশ্নগুলির ব্যাপারেই-যে ফাঁক থেকে যায় তা নয়। দুনিয়ার অন্যান্য ব্যাপারেরও অনেক-কিছু তখনও পর্যন্ত তার জ্ঞানের চতুঃসীমার অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু তাই বলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুর অনধিগম্য নানা বিষয়ের জ্ঞান চাপিয়ে আমরা তো তার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি না?

যতই যাই হোক, তিন বছরের একটি বাচ্চাকে আমরা তো আর বোঝাতে বসি না যে বাতাসে উত্তাপের হেরফের হয় কেন কিংবা কেনই-বা বছরের দিনগুলো একবার করে বড় ও একবার করে ছোট হতে থাকে। সেই রকম সাত বছর বয়সের কোনো ছেলে বা মেয়েকে এরোপ্লেনের এঞ্জিনের গঠন যথাযথ ও বিশদভাবে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি না, তা সেই ছেলে বা মেয়ে ওই ব্যাপার জানবার জন্যে যতই আগ্রহ

দেখাক-না কেন। ছেলেমেয়েদের জ্ঞানগর্ভ যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করার একটা উপযুক্ত সময় থাকে, তাই তাদের কিছু-কিছু প্রশ্নের জবাবে নিচের কথাগুলো বললে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি বা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় না। যেমন, যদি তখন তাদের বলেন, 'তোমরা এখন খুবই ছোট তো, যখন আরও বড় হবে তখন এই ব্যাপারটা জানতে পারবে।'

এইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে কচি বাচ্চারা যৌন-ব্যাপারে বিশেষরকম ও একটানা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না। বস্তুত যদি তারা তা করে তাহলে সেটা একটু আশ্চর্য ব্যাপার বলে গণ্য করতে হবে। এ-ধরনের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মনে তীব্র কৌতূহলের সঞ্চার ঘটে একমাত্র বয়ঃসন্ধিকালে, যৌবনারম্ভের সময়ে, তবে ততদিনে যৌন-ব্যাপারটা তাদের কাছে আর রহস্যময় ঠেকে না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম যে শিশুর আকস্মিক কোনো প্রশ্নকে অছিলা হিসেবে ধরে নিয়ে 'মানবজন্মের রহস্য'কে ফাঁস করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠার পক্ষে তেমন কোনো জরুরি তাগিদ নেই। শিশুর তরফে এ-ধরনের কোনো প্রশ্ন তোলা হলে তা যৌন-ব্যাপারে তার বিশেষরকম তীব্র আগ্রহের পরিচয় বলে গণ্য করা উচিত নয় এবং এ-সমস্ত 'রহস্য' সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস করে না-দিলে শিশু-যে সেজন্যে মনে ভারি কষ্ট পাবে কিংবা দুশ্চিন্তিত হয়ে উঠবে তা-ও নয়। বাবা কিংবা মা যদি এমন ধরনের প্রশ্ন মৃদু হেসে কিংবা এক-আধটুকু রসিকতা করে কৌশলে এড়িয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে তাঁদের বাচ্চা শিগ্‌গিরই নিজের প্রশ্ন ভুলে অন্য কোনো ব্যাপারে মেতে উঠবে। তবে আপনারা যদি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার

সম্পর্কের সবচেয়ে গোপন ব্যাপারগুলি নিয়ে শিশুর সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা শুরু করে দেন, তাহলে কিন্তু যৌন-ব্যাপারটিতেই তার অতিরিক্ত কৌতূহল জাগিয়ে তুলবেন এবং একটু-বেশি অল্প বয়সেই সে-ব্যাপারে তার কল্পনায় সুড়সুড়ি দেবেন আপনারা। কেননা এ-ব্যাপারে ওই বয়সে তাকে আপনারা যা শেখাবেন সেই জ্ঞান তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহার্য হয়ে থাকবে, কিন্তু এ-উপলক্ষে তার কল্পনায় যে-ধাক্কাটি লাগাবেন আপনারা তা কিন্তু যৌন-ব্যাপারে অপরিণত বয়সেই তার মাথা ঘামানোর খোরাক যোগাতে পারে।

শিশু যদি তার বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে মানবজন্মের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে বাবা-মায়ের কাছ থেকে তা গোপন রাখে তবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তিত হবার কোনো দরকার নেই। এ-ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা কোনো দিক থেকেই সাংঘাতিক কিছু নয়। শিশুকেও এ-বিষয়ে অভ্যস্ত হতে হবে যে মানুষের জীবনে এমন অনেক দিক আছে যা তার একান্ত অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং যেসব ব্যাপার নিয়ে যে-কোনো লোকের সঙ্গে আলাপ করা চলে না কিংবা যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা চলে না। ক্রমে শিশু যখন বুঝতে শিখবে যে অন্যান্য মানুষের জীবনেও একটা অন্তরঙ্গ গোপন দিক আছে এবং বুঝবে যে জীবনে এমন কিছু-কিছু ব্যাপার আছে যা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না-করাই সমীচীন, একমাত্র তখনই, শিশুর সেই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেই যৌন-বিষয়টি তার সামনে উত্থাপন করা চলতে পারে। আর তখন এ-বিষয়ে বাপের সঙ্গে ছেলের কিংবা মায়ের সঙ্গে মেয়ের কথাবার্তা চলতে পারে নির্জনে, একান্তভাবে দু-জনের মধ্যেই। ছেলেমেয়েদের ওই বিশেষ

বয়সে এ-ধরনের আলোচনা যুক্তিসঙ্গতই হবে, কেননা কৈশোরে বয়ঃসন্ধিকালে নবজাগ্রত যৌন-উদ্দীপনার সঙ্গে এই আলোচনার সময়টা খাপ খেয়ে গেলে তাতে কিশোর বা কিশোরীটি প্রত্যক্ষভাবে উপকৃতই হবে। ছেলেমেয়েদের ওই বিশেষ বয়সে এ-ধরনের কথাবার্তার ফলাফল ক্ষতিকর হতে পারে না, কেননা তখন বাবা-মা ও ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষই বোঝেন যে আলোচনাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত এবং এমন আলোচনার ফলাফল আলোচ্য কিশোর বা কিশোরীটির পক্ষে সরাসরি উপকারী ও সহায়ক। এ-ধরনের আলোচনার সময় বাবা কিংবা মাকে অবশ্যই ছেলে বা মেয়ের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিশেষ করে যৌন-বিষয়ক নৈতিকতার দিকগুলির কথাও উল্লেখ করতে হবে।

ছেলেমেয়ের বয়ঃসন্ধিকালে তাদের সঙ্গে এ-ধরনের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় যে এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা কিন্তু ভুল হবে। সঠিকভাবে বলতে গেলে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এ-ধরনের আলোচনা ইত্যাদি যদি কোনো ডাক্তার করেন কিংবা স্কুলগুলিতে বিশেষভাবে আয়োজিত বক্তৃতামালার মধ্যে দিয়ে এ-কাজ নিষ্পন্ন হয় তাহলে তা অনেকগুণে ভালো হয়। এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে বাবা-মা'দের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ সর্বদাই পারস্পরিক আস্থা ও সূক্ষ্ম সুকুমার আচরণের ভিত্তিতে এবং নৈতিক শুদ্ধতার আবহাওয়ায় ঘটুক। কিন্তু উপরোক্ত অস্বস্তিকর বিষয়গুলি নিয়ে খুব বেশি খোলাখুলি আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈতিক শুদ্ধতার ওই আবহাওয়াকে নষ্টও করে দিতে পারে।

ছেলেমেয়েদের অত্যধিক অল্প বয়সে তাদের সঙ্গে যৌন-বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে অন্যান্য ধরনের আপত্তিও তোলা যেতে পারে। যেমন, এ-ধরনের প্রশ্ন নিয়ে অকালে খোলাখুলি আলোচনা চালালে তার ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন-ব্যাপারে স্থূল এক ধরনের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি তৈরি হতে পারে এবং প্রাপ্তবয়স্করা কখনও-কখনও তাদের অত্যন্ত গোপন যৌন-অভিজ্ঞতার কাহিনী যেরকম হালকা চটুল ভঙ্গিতে বর্ণনা করে থাকে সেই রকম বেপরোয়া বিশ্বনিন্দকের একটা দৃষ্টিভঙ্গির বীজও তাদের মনে উপ্ত হওয়া সম্ভব।

যৌন-ব্যাপারটা নিয়ে এরকম চটুল চালের আলোচনা বাচ্চা ছেলেমেয়ের কাছে গোটা ব্যাপারটাকে নিছক শারীরতত্ত্বগত একটা ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারে। যৌন-বিষয়ক ধারণাটি তখন ভালোবাসার বোধের সঙ্গে সংযুক্ত ও সেই বোধে উদ্দীপিত হয়ে উপস্থাপিত হয় না, অথচ ভালোবাসার এই বোধের মধ্যেই কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা ও সামাজিক দিক থেকে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত।

স্ত্রী-পুরুষের প্রেম সম্পর্কে শিশুর মনে স্পষ্ট ধারণার অভাব থাকা অবস্থায় তার বাবা-মা কীভাবে, কোন ভাষায় অতটুকু শিশুকে বুঝিয়ে উঠবেন যে ভালোবাসা যৌন-সম্পর্ককে মহত্তর করে তুলতে সমর্থ? এর অর্থ তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে অপরিণত শিশুর কাছে এ-ধরনের আলোচনার অবতারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিছক শারীরতত্ত্বেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

তবে যদি যৌন-জীবন নিয়ে আলোচনা সন্তানদের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায় ও উপযুক্ত

সময়ে তার সূত্রপাত ঘটানো যায় তাহলে অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পটভূমিতেই সে-আলোচনা বিশদ করার সম্ভাবনা থাকে এবং এর ফলে কিশোর-কিশোরীদের মনে যৌন-জীবনের তাৎপর্যের ব্যাপারে এমন গভীর এক শ্রদ্ধাবোধের উল্লেখ ঘটানো চলে, যার মধ্যে নিহিত থাকবে একাধারে নান্দনিক, মানবিক ও সামাজিক দিক থেকে সচেতনার সমৃদ্ধ সম্ভার। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের ব্যাপারটি ততদিনে এইসব কিশোর-কিশোরী বুঝতে শেখে সাহিত্যপাঠ, তাদের আশপাশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সমাজকে পর্যবেক্ষণের মারফত। বস্তুত, বাবা-মা'দের উচিত তাঁদের ছেলেমেয়েরা উপরোক্ত ওই সমস্ত সূত্র থেকে প্রেম সম্বন্ধে এই সময়ের মধ্যেই যে-জ্ঞান ও ধ্যানধারণার সঞ্চয় সংগ্রহ করেছে তাকেই তাদের যৌন-বিষয়ক শিক্ষার সূত্রপাত হিসেবে গ্রহণ করা।

সঠিকভাবে বলতে গেলে যৌন-বিষয়ক শিক্ষা হওয়া উচিত 'প্রেমের ব্যাপারে পাঠ গ্রহণ'এর সমার্থক। অর্থাৎ, এই শিক্ষাদানের মারফত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুগভীর, সমুন্নত অনুভবক্ষমতাকে, আমাদের জীবন, কামনা-বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে গঠিত অনন্য একটি সত্তা সম্বন্ধে বোধের ভিত্তিতে সমৃদ্ধ অনুভবশক্তিকে লালিত ও বিকশিত করে তুলতে হবে। তবে যৌন-বিষয়ক এই শিক্ষাদানকে পরিচালিত করতে হবে নিছক শারীরতত্ত্ব-সম্পর্কিত দিকগুলির অতিরিক্ত-রকমের খোলামেলা কিংবা মূলত অবিবেকী বিশ্লেষণ বাদ দিয়েই।

বাবা-মায়েরা কিভাবে যৌন-বিষয়ক এই শিক্ষাদানের কাজ শুরু করবেন? এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল চোখের সামনে বর্তমান জলজ্যান্ত উদাহরণ। সন্তানের বাবা-

মায়ের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ, সমর্থনজ্ঞাপন ও বিবেচনাবোধের প্রকাশ, পারস্পরিক কোমল আচরণ ও স্নেহমমতার নির্বাধ অভিব্যক্তি — এ-সমস্ত সম্পর্কে ওই ছেলেমেয়েরা তাদের স্মরণকাল বরাবর আগাগোড়া যদি অবহিত থাকে তাহলে এই উদাহরণটিই অত্যন্ত জোরালো নীতিশিক্ষামূলক একটি উপাদান হিসেবে কাজ করতে সমর্থ এবং এটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গভীর ও সুন্দর সম্পর্কের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল শিশুর ভালোবাসতে পারার ক্ষমতাটিকেই সযত্নে লালন করে তোলা। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশু যদি নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন, যেখানে সে লেখাপড়া শিখছে সেই ইশকুল এবং নিজের দেশকে ভালোবাসতে না-শেখে, স্বার্থপরতা যদি তার চরিত্রে শিকড়ের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে, তাহলে পরবর্তী জীবনে তার মনোনীত মেয়েটিকে সে-যে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারবে সেটাও অত্যন্ত সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত লোকজনের মধ্যে প্রায়ই অত্যন্ত জোরালো যৌনকামনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু দেখা যায় যে-সব মেয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হচ্ছে তাদের সে যথোচিত মর্যাদা দেয় না, তাদের আবেগ ও মননশীলতার সামর্থ্যকে কিছুমাত্র মূল্য দেয় না কিংবা শেষোক্ত এই গুণগুলির প্রতি এতটুকু মনোযোগ পর্যন্ত দেয় না সে। এর ফলেই বোঝা যায় কেন এসমস্ত লোক স্থায়ী হার্দ সম্পর্ক গড়ে না-তুলে ফুল থেকে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় এবং কেন তাদের জীবনযাপন সরাসরি লাম্পট্য থেকে খুব বেশি তফাত হয় না। অবশ্য, বলা বাহুল্য, এটা শুধু-যে পুরুষের ক্ষেত্রেই

সম্ভব হতে পারে তা নয়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হতে বাধা নেই।

শিশুকালে বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে নিষ্কাম ভালোবাসার আস্বাদ গ্রহণ, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি দীর্ঘদিন অনুরক্ত থাকার অভিজ্ঞতা এবং একেবারে শিশুবয়স থেকে সযত্নে লালিত দেশপ্রেমের চেতনাই হল সমকক্ষ মানুষ ও বন্ধু হিসেবে (নিছক যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় হিসেবে নয়!) মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ও সামাজিক দিক থেকে সচেতন মনোভঙ্গি গড়ে ওঠার সর্বোত্তম উপায়। আর এ-ধরনের মনোভঙ্গির বিকাশ না-ঘটলে যৌনপ্রবৃত্তিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এই জন্যেই বাবা-মা'দের আমি বিশেষভাবে পরামর্শ দিতে চাই যে তাঁরা যেন চারপাশের লোকজন ও সমগ্রভাবে সমাজ সম্পর্কে শিশুর অনুভব ও মনোভঙ্গির বিষয়টির দিকে বেশ কিছুটা মনোযোগ দিতে কার্পণ্য না-করেন। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বাবা-মায়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক যে শিশুর যেন বন্ধুবান্ধব (যথা, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ও খেলার সাথীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) থাকে, উপরোক্তদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কটা যেন তাৎক্ষণিক ও স্বার্থপরতায় ভরা না-হয় এবং সে যেন তার ওই বন্ধুদের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ব্যাপারে মনোযোগী হয়। বাবা-মায়ের কর্তব্য হবে যতটা শিশুবয়স থেকে সম্ভব ছেলেপিলের মনে তাদের বাস যে-গ্রামে বা শহরে সেই গ্রাম বা শহর সম্পর্কে, তাদের বাবারা যেসব কলকারখানায় কাজ করেন সেগুলি সম্পর্কে এবং পরে গোটা দেশ, তার ইতিহাস ও দেশের মহৎ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে

তোলা। বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র মৌখিক আলাপ-আলোচনা এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, শিশুর নিজের চোখে অনেক-কিছু দেখা ও নিজের কানে অনেক-কিছু শোনা দরকার, তাকে এমন চিন্তা-ভাবনার খোরাক যোগানো প্রয়োজন যাতে সে নিজে থেকেই সূক্ষ্ম নান্দনিক অনুভবনশীলতাকে বিকশিত করে তুলতে পারে। সাহিত্যপাঠ, মাঝে-মাঝে থিয়েটর ও সিনেমায় যাওয়া, এ-সবই বাবা-মা'দের সাহায্য করে থাকে উপরোক্ত এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলায়।

এ-ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যৌন-বিষয়ক ইতিবাচক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একটি সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে বাধা নেই। এ-ধরনের শিক্ষা এমন সব চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বপ্রকাশক গুণাবলী বিকশিত করে তুলবে যা যৌথ-জীবনযাত্রায় ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তে থাকা অবশ্য-প্রয়োজনীয়, আর যেসব স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই ধরনের গুণাবলী সুষম বিকাশ লাভ করবে তাঁরা-যে যৌনজীবনের ক্ষেত্রেও সমুন্নত নৈতিক আদর্শের মান অনুসরণ করে চলবেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদিক থেকে পারিবারিক জীবনে একটি সঠিক, সুপ্রতিষ্ঠিত রুটিন অনুসরণও ইতিবাচক প্রভাববিস্তারে সমর্থ। যে-ছেলে বা মেয়ে সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, অনিয়মিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা যার সামান্যই, সে পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার আবাল্যপরিচিত ধরনধারণই-যে মেনে চলবে এটাই স্বাভাবিক।

সঠিক পারিবারিক রুটিন অনুসরণের অন্যান্য, আরও সুনির্দিষ্ট বৃহত্তর তাৎপর্যও আছে। বিশৃঙ্খল যৌন-

জীবনযাপন প্রায়ই শুরু হয়ে যায় অলসতা, একঘেয়েমি, শূন্যতাবোধ ও সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত অবকাশযাপনের ফলে ও ছেলেমেয়ের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ আচমকা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে যাওয়ায়। অতএব বাবা-মা'দের জানা উচিত ছেলেমেয়েরা কার-কার সঙ্গে তাদের সময় কাটাচ্ছে এবং তাদের নানা বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কোন-কোন ব্যাপারে তাদের আগ্রহের ও প্রবণতার মিল আছে। পরিশেষে সু-নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক রুটিন পরিবারভুক্ত শিশুর শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করে তোলে, আর এটা যদি নিশ্চিত হয় তাহলে অপরিণত বয়সে শিশুর যৌন-অভিজ্ঞতা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। যথানির্দিষ্ট সময়ে বিছানায় শুতে যাওয়া ও বিছানা ছেড়ে ওঠা এবং বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে আলস্য উপভোগ থেকে বিরত থাকা শিশুদের নৈতিক ও যৌন-আচরণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যাপারে এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিশুর ওপর উপযুক্ত পরিমাণে দায়িত্ব ও কাজের ভার চাপিয়ে দেয়া। আমার আগেকার বক্তৃতাগুলিতে এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে বটে, তবে যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যাপারেও এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শর্ত। বাবা-মা যদি তাঁদের সন্তানের জীবনযাত্রাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করার দিকে সতর্ক নজর রাখেন যাতে শিশু প্রতিদিন সন্ধে লাগাদ মিষ্টি-মিষ্টি আরামদায়ক (তবে অতিরিক্ত নয়) একটা ক্লান্তির ভাব অনুভব করে, প্রতিদিন সকালে ওই পুরো দিনটি জুড়ে তাকে কোন-কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে তার একটা ধারণা যদি তাকে দেয়া হয়, তাহলে তা শিশুর

কল্পনাকে সঠিকভাবে উত্তেজিত করে তোলা ও সারাটা দিন ধরে তার কর্মক্ষমতাকে সুষমভাবে ব্যয় করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হয়ে দেখা দেয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তুচ্ছ, অবসন্ন আলস্যযাপনের জন্যে শিশু না-অনুভব করবে শারীরিক বা মানসিক তাগিদ, না অমন আলস্যে, অপ্রয়োজনীয় কল্পনাবিলাসে ও অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ে সময়ক্ষেপ করবে সে। যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে তাদের প্রথম শৈশব অতিবাহিত করে যথাযথ, সু-নিয়ন্ত্রিত একটি নিয়মনির্ঘণ্ট অনুযায়ী, তারা সাধারণত অমন একটি রুটিন অনুযায়ীই জীবনযাপনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে, ওই ধরনের রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা এবং চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সুনিয়মিত ও যথাযথ একটা রূপ নেয়।

খেলাধুলো হল এইরকম অপর একটি ব্যাপার যা যথাযথ শিক্ষার অবিভাজ্য একটি অঙ্গ হিসেবে যৌন-বিকাশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। সঠিকভাবে সংগঠিত খেলাধুলোর আসর, বিশেষ করে স্কেটিং, স্কীয়িং, নৌকো বাওয়া এবং প্রতিদিনকার ব্যায়াম এক্ষেত্রে যারপরনাই উপকারী। বস্তুত এসব এত স্পষ্টতই উপকারী যে এ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দেয়ার দরকার পড়ে না।

শিক্ষাদানের এই সমস্ত কলাকৌশল ও নীতি আপাতদৃষ্টিতে যদিও প্রত্যক্ষভাবে যৌন-বিষয়ক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তবু এই সবকিছুই ওই শেষোক্ত শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে থাকে। কারণ এগুলি শিশুর চরিত্রগঠনে সহায়তা করে ও এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক অভিজ্ঞতাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে ও তা থেকে লাভবান হতে সাহায্য করে শিশুদের। বস্তুত, যৌন-বিষয়ক

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত কলাকৌশল ও নীতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ সব শিক্ষা-সংক্রান্ত হাতিয়ার।

একমাত্র এইসব নীতি ও পদ্ধতি যদি বাড়িতে পরিবারের মধ্যে প্রয়োগ করা যায় তবেই বাবা-মা দেখতে পাবেন যে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাঁদের বালক ও কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েদের ওপর কার্যকর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করা সহজতর হচ্ছে। তবে ওপরে উল্লিখিত পরিবেশ যদি সৃষ্টি করা না-হয়, অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষ ও যৌথ-জীবনযাত্রার সঙ্গে কীভাবে নিজেকে অন্বিত করতে হয় তা যদি না-শেখানো হয় শিশুকে, যদি তার জীবন নিয়মিত কোনো রুটিন অনুসরণ করে না-চলে এবং যদি সেই শিশু খেলাধুলোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না-রাখে, তাহলে কোনো কথাবার্তা— তা সে যতই সময়োপযোগী ও সারবান হোক-না কেন — কখনোই আকাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না।

যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই এ-ধরনের আলাপ-আলোচনা স্বাভাবিকভাবে শুরু করতে হবে। বাবা-মায়ের পক্ষে কখনোই উচিত হবে না ছেলেমেয়ের সুনির্দিষ্ট আচরণের উল্লেখ না-করে তাদের কাছে এই ধরনের কথাবার্তা পাড়া অথবা উপযুক্ত সময়ের আগে কোনো কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা করা। তবে এই একই সঙ্গে বাবা-মায়ের পক্ষে এটা অপরিহার্য একটা কর্তব্য হবে যে শিশুর আচরণের বাঁধাধরা রীতি থেকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও সামান্য যে-কোনো বিচ্যুতিকেও ঠাহর করে দেখা ও শিশুর কাছে তার উল্লেখ করা এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁদের এই কর্তব্যে কখনও অবহেলা না-করা। এটা না করলে তাঁদের কিন্তু সম্মুখীন হতে হবে বিরূপ ভবিতব্যের।

এই সমস্ত কথাবার্তার সূত্রপাত নিচের যে-কোনো এক

বা একাধিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে করা যেতে পারে। যেমন, বাচ্চাদের হঠাৎ কানে-আসা বেপরোয়া অবিবেকী সংলাপ বা তার কোনো বাক্যাংশ, অন্য কোনো লোকের পরিবারে ঝামেলা বা বিপর্যয় ঘটলে সে-সম্পর্কে বাচ্চাদের অস্বাভাবিক মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে ওঠা, হঠাৎ সামনে প্রেমিকযুগল পড়লে তাদের সম্পর্কে সন্দেহজনক এবং পুরোপুরি স্বাস্থ্যকর নয় এমন মনোভাব প্রকাশ করা, তরুণী মেয়েদের সঙ্গে এমন ধরনের ছ্যাবলামিতে মেতে ওঠা যার সঙ্গে যৌন-কৌতূহল স্পষ্টতই জড়িত, মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমবোধের অভাব, সাজসজ্জা নিয়ে বেশিরকম মাথা ঘামানো, একটু অল্প বয়সেই এঁচোড়ে-পাকা প্রেমের ভান করা এবং যে-সমস্ত বইতে যৌন-ব্যাপারগুলো বেশিরকম বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সব বই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে কৈশোরে পা দিয়েছে তাদের সঙ্গে এরকম কথাবার্তা বলার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাদের বাবা-মা'দের ধ্যানধারণা, আমাদের যৌনজীবন ও যৌন-বিষয়ক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নানা বিষয়ের ও দিকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণদান, যৌন-ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ, আপনাদের ছেলেমেয়েদের পরিচিত অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যেকার সম্পর্কের উদাহরণ উল্লেখ করা, ইত্যাদি নানা বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তবে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বেলায় এ-ধরনের আলোচনা সংক্ষিপ্ততর হওয়া দরকার এবং এই আলোচনার মধ্যে সরাসরি নিষেধ করা ও ধমক দেয়া, আচরণ আরও যথাযথ করে তোলার জন্যে সরলভাবে দাবি জানানো,

ইত্যাদির জন্যে সময়ে-সময়ে জায়গা ছেড়ে দিলেও কোনো ক্ষতি নেই।

পরিবারের বাইরে কোনো লোক যদি যৌন-সমস্যা নিয়ে নাকানিচোবানি খায় তাহলে সে-ধরনের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ 'আলোচনা'র ব্যবস্থা করার চেয়ে সে-সম্পর্কে বাবা-মায়ের সরাসরি মন্তব্য ছেলেমেয়ের ওপর অনেকগুণে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই ধরনের মন্তব্য করার সময় বাবা-মা বেশ খোলাখুলি তীব্রভাষায় নিন্দে করতে ও এমন কি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেন, আবার সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারেন যে তাঁদের ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য রকম আচরণ প্রত্যাশা করেন এবং এটাও বুঝিয়ে দিতে পারেন, তারা-যে এরকম ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের আচরণ করবে সে-ব্যাপারে তাঁরা এতই নিশ্চিত যে এ-প্রসঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কথা উঠতেই পারে না। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের বলার দরকার করে না যে 'কখনও এমন কাজ কোরো না, এটা অন্যায়'। বস্তু, এমন উক্তি মোটেই করা উচিত নয়। বরং এর চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি জোর দিয়ে একথা বলেন যে 'আমি জানি, তুমি কখনও অমন কাজ করতে পার না, তুমি মোটেই তেমন ছেলে (বা মেয়ে) নও'।

পরিবার ও শিশুলালন*

...আমাদের সকলের কাছেই আগ্রহোদ্দীপক এই প্রশ্নটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত মূল নীতিগুলির কয়েকটি সম্পর্কেও অল্প দু-চার কথা বলতে চাই আমি। আমার মনে হয় এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আপনাদের ভাবনাচিন্তা শুরু করার ব্যাপারে মতদ্বৈধ ও মতবৈষম্যকে অপেক্ষাকৃত সীমিত করে আনায় সাহায্য করবে। কিন্তু কেন একথা বলছি? এর কারণটা খুবই সোজা: আমার 'জীবনজয়ের পথে' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগলেন,

---

* 'ওব্‌শেচস্ত্‌ভেন্নিত্‌সা' পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিসে পত্রিকার পাঠকপাঠিকাদের জন্যে আয়োজিত এক সভায় ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে আন্তন মাকারেঙ্কো উপরোক্ত এই বিষয়টি নিয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হল।

সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন নানা ধরনের সামাজিক পটভূমির তরুণতর ও বয়স্ক পুরুষদের প্রতিনিধিরা। এ'রা সকলেই খ‌ুঁজছিলেন নতুন সোভিয়েত নৈতিকতার আদলগুলি, সকলেই এ'রা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নিজেদের জীবনে ওই নৈতিকতা মেনে চলতে। আমার কাছে এ'দের জিজ্ঞাস্য ছিল, কীভাবে ওই নতুন নীতিশাস্ত্রসম্মত জীবন শুরু করতে পারেন এ'রা।

ভাবুন একবার, এক তরুণ ভূতত্ত্ববিৎ তো একবার আমায় জিজ্ঞাসা করেই বসলেন: 'আমাকে হয় ককেশাসে আর নয়তো সাইবেরিয়ায় গবেষণার কাজে পাঠানো হচ্ছে, তা কোন জায়গাটা আমার বেছে নেয়া উচিত?' আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলুম কাজটা যেখানে সবচেয়ে কঠিন সেখানে যেতে। এরপর তিনি পামির-অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সম্প্রতি এক চিঠি লিখে তিনি আমাকে উপরোক্ত ওই পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আমার 'বাবা-মা'র জন্যে বই' প্রকাশিত হওয়ার পর আরও ঘনঘন যে-সব সাক্ষাৎপ্রার্থী আমার কাছে আসতে থাকলেন তাঁরা ছিলেন সেই ধরনের অভিভাবক-অভিভাবিকা যাঁরা নাকি সন্তানলালনের ব্যাপারে তেমন সফল হচ্ছিলেন না। বস্তুত, যে-সব ছেলেপিলে ভালোভাবে মানুষ হচ্ছিল তাদের বাবা-মা'দের আমার কাছে আসার কারণই-বা কী থাকতে পারে? প্রায়ই এমন ঘটেছে যে বাবা-মায়ের সংকটের কথা আমায় শুনতে হয়েছে আর তা প্রায়শই এই ধরনের: 'আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পার্টির সদস্য এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়। আমি এঞ্জিনিয়র, আমার স্ত্রী শিক্ষিকা। আমাদের একটি চমৎকার ছেলে আছে, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে

না। সে মাকে গালাগালি দেয়, থেকে-থেকে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, এমন কি আমাদের ঘরের জিনিসপত্রও উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে। এখন কী কর্তব্য, বলুন? আমরা সর্বদাই ছেলেটাকে ভালোভাবে মানুষ করে তুলতে সচেষ্ট থেকেছি, তার প্রয়োজন মেটানোর দিকে কড়া নজর রেখেছি। ছেলের নিজস্ব একখানা ঘর আছে, যতকিছু তার চাহিদা হতে পারে সেই মতো আগাগোড়াই তাকে পুতুল-খেলনা যোগানো হয়েছে, সর্বদাই তার ভালোরকম খাওয়াপরার বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং যথেষ্ট খেলাধুলো-আমোদপ্রমোদ উপভোগের সুযোগসুবিধে পেয়েছে সে। এখন, পনেরো বছর বয়সে সে চাইলেই সিনেমা বা থিয়েটরের টিকেট, এমন কি বাইসিক্‌ল পর্যন্ত পেতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেখুন: আমরা দু'জন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ, দুর্ভাগ্যজনক উত্তরাধিকারের প্রশ্নও উঠতে পারে না এক্ষেত্রে। তাহলে? আমাদের ছেলে এত খারাপ হয়ে গেল কেন?'

বক্তব্য শুনে আমি মা-টিকে জিজ্ঞাসা করলুম: 'আপনি কি আপনার ছেলের বিছানা নিজে পেতে দেন? আর তা রোজই?'

'হ্যাঁ, রোজই।'

'কিন্তু একথাটা কি কখনও আপনার মাথায় উদয় হয় নি যে আপনি ছেলেকে তার নিজের বিছানা পেতে নিতে বললেও পারেন?'

এবার আমি বাপটির দিকে ফিরে শুধোলুম: 'আপনি কি আপনার ছেলের জুতো সাফ করে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

শুনে আমি তাঁদের বললুম: 'বিদায়, আর দয়া করে এ-ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে আর কারও কাছে যাবেন না।

তার চেয়ে কোনো পার্কে ঢুকে একটা নির্জন দেখে বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করুন ছেলেকে আপনারা কী তৈরি করেছেন, আর তারপর নিজেদেরই প্রশ্ন করুন, এর জন্যে সত্যিসত্যি দায়ী কে! নিজেদেরই আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের ছেলে অমন বাঁদর তৈরি হল কেন? তাহলেই আপনারা তার উত্তর এবং ছেলেকে সাহায্য করার উপায়ও খুঁজে পাবেন।'

যতই যাই হোক, সর্বদাই যদি কেউ-না-কেউ তার জুতো সাফ করে দেয় আর সকালে রোজ তার বিছানা তোলে তাহলে সত্যিসত্যিই কোনো ছোকরা ভালো থাকে কী করে?

আমার 'বাবা-মা'র জন্যে বই'এর দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য এই সমস্যাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে সমস্যাটি হল এই যে মানুষ সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হয়ে, কাজ করার ও পড়াশুনা করার যথেষ্ট যোগ্যতা নিয়ে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েও — অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণভাবে যাঁরা বুঝদার ও কর্মক্ষম যোগ্য লোক, সামাজিক দায়দায়িত্ব যাঁরা বিবেকবুদ্ধিসম্মতভাবে যথাসাধ্য পালন করে থাকেন এবং যাঁরা গোটা একটা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিভাগ, ফ্যাক্টরি কিংবা অন্য কোনো সংগঠন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত, যাঁরা ব্যাপক ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র মানুষের সঙ্গে সহকর্মী, বন্ধু বা পরিচিত জন হিসেবে স্বাভাবিক সম্পর্কে বজায় রেখে চলতে সমর্থ — এমন সমস্ত মানুষজন তাঁদের নিজেদের ছেলেপিলেদের সম্মুখীন হলে দৈনন্দিন সরল সাধারণ জীবনযাপনের সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা হারিয়ে বসেন কেন? এর কারণ আর কিছুই নয় তা হল এই যে এই বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এঁরা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বসেন, নিজেদের জীবনের

অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যান, ওই বয়স পর্যন্ত সঞ্চিত যুক্তিবুদ্ধি ও বিচারবিবেচনা প্রয়োগের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এঁদের। ছেলেমেয়েদের উপস্থিতিতে এঁরা যেন থমকে যান, অত্যন্ত সহজ সাধারণ পরিস্থিতিতে এমন কি স্বাভাবিকভাবে আচরণ পর্যন্ত করতে অপারগ হন ও প্রায় 'অস্বাভাবিক' হয়ে ওঠেন। কিন্তু এমনটা কেন ঘটে? এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁদের পিতৃ-বা মাতৃস্নেহই এর কারণ। অথচ এই মানবিক ভালোবাসাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবেগের প্রকাশ, যা নাকি রীতিমতো অলৌকিক কান্ডকারখানা ঘটাতে সমর্থ, যা সৃষ্টি করতে পারে নতুন মানুষ, মানবজাতির মহত্তম যত ঐশ্বর্য...

এই সিদ্ধান্তটিকে যদি আমরা আরও কিছুটা সঠিকভাবে সুনির্দিষ্ট করে তুলতে চাই তাহলে তা সংক্ষেপে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা চলে: কুইনিন কিংবা খাদ্যের মতো ভালোবাসাও অতিরিক্ত মাত্রায় বিলনো উচিত নয়। কেউই খানদশেক আস্ত পাঁউরুটি পেটে পুরে গর্ব করে একথা বলতে পারে না যে সে বেশ পরিতোষ সহকারে ভোজন করেছে। ভালোবাসাও তেমনই মাত্রা রেখে বণ্টন করা উচিত।

বহুদিকবিশিষ্ট শিক্ষার যে-কোনো দিকই আমরা বিবেচনা করে দেখি-না কেন, সর্বক্ষেত্রেই সেই এক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের — সে প্রশ্ন হল মাত্রা ও সংযমের, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তা হল সর্বোত্তম মধ্যপন্থার অনুসন্ধান। কথাটা হয়তো কিছুটা অপ্রীতিকর ঠেকতে পারে। মনে হতে পারে, এই মধ্যপন্থাটা কী বস্তু? গড়পড়তা মানুষই-বা কী চিজ? বহু শিক্ষক-

শিক্ষিকা যাঁরা সর্বদা ‘ভাবাবেশের’ ঘোরে লিখে থাকেন ও চিন্তা করে থাকেন তাঁরা বারবার আমার এই ভুলটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। তাঁরা বলে আসছেন: বাপু হে, তুমি যদি সর্বোত্তম মধ্যপন্থার কথাই প্রচার করতে থাক তবে তো তুমি ঠিক সেই ধরনের সাধারণ গড়পড়তা মানুষ তৈরি করবে — যারা না-হবে মন্দ না-হবে ভালো, না-বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আবার না-অযোগ্য, অর্থাৎ এক কথায় স্রেফ সাধারণ বিবর্ণ সব মানুষ।

এইসব আপত্তি আমাকে সংকল্পসাধনে কখনও ভয় দেখাতে বা নিবৃত্ত করতে পারে নি। তা যদি করতে পারত তাহলে হয়তো আমি ফিরেফিরতি পরীক্ষা করে দেখতুম সত্যি ভুল করছি কিনা, গড়পড়তা সাধারণ মানুষ ছাড়া সত্যিই আর কিছু তৈরি করছি না কিনা। তাহলে এ-ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত হতে হোত যে আমার পদ্ধতি মধ্যপন্থা অনুসরণের উপযোগী বলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমার কাজকর্মের ফলে শুধুই এমন সাধারণ নীরস মানুষ তৈরি হচ্ছে কিনা, যাদের সঙ্গ একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর এবং পয়সাকড়ি উপার্জনের দিক থেকে সচ্ছলতা অর্জনের উপযোগী হলেও মহত্ত্বের ছোঁয়াচ-লাগা কোনো কিছু সৃষ্টিতে যারা অসমর্থ কিংবা যারা সত্যিকার অনুপ্রাণিত আবেগের মানসিক অভিজ্ঞতালাভে বঞ্চিত। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে এ-সবই আমি তার আগে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমার কাটানো বত্রিশটা বছর ও দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে কাটানো গত আটটা বছরের ফলাফল পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলুম যে আমার শিক্ষাপদ্ধতি সঠিক এবং তা পরিবারের পটভূমিতে শিশুলালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অবশ্য 'মধ্যপন্থা' শব্দটির পরিবর্তে অন্য শব্দ-যে ব্যবহার করা না-যায় এমন নয়, তবে নীতি হিসেবে শিশুলালনের ক্ষেত্রে এই পথটি অপরিহার্যই থেকে যাচ্ছে। আমাদের ওপর এযুগে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে খাঁটি মানুষ গড়ে তোলার, যারা নাকি মহৎ কীর্তি অর্জনের, মহৎ কর্ম সম্পাদনের ও মহৎ অনুভবক্ষমতার অধিকারী হবে, যারা নাকি একদিকে আমাদের যুগের বীর নায়ক হয়ে উঠতে পারবে আবার অপরদিকে 'একবাটি উদ্দীপনার দুধে এককোঁটা হামবড়াইয়ের বিরক্তিকর চোনা' ফেলার কাজটা এড়িয়ে যেতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ, তারা এমন মানুষ হবে না যারা নিজেদের জন্যে এক কানাকড়িরও সংস্থান না-রেখে সর্বস্ব ত্যাগ করতে সমর্থ, আর তারপর তারা-যে কত উদারহৃদয় তা-ই জাহির করে বেড়াতে তৎপর। এমন কি আমাদের সেই আদর্শ, যার সঙ্গে সত্যিসত্যি কারো কোনো মতদ্বৈধ বা বিবাদ থাকতে পারে না, সেখানেও কোনো এক ধরনের একটি মধ্যপন্থার, কিছুটা সংযমের, কিছুটা মাত্রাবোধের একটি নীতি নিহিত আছে। 'মধ্যপন্থা' এই শব্দটি কেন-যে আমাকে বিচলিত করতে পারে নি তা আমি ক্রমে-ক্রমে উপলব্ধি করতে পেরেছি। অবশ্য কেউ যদি এমন কথা বলেন যে 'মধ্যপন্থা' কথাটির মধ্যে শাদা ও কালোর মিশ্রণের একটা ইঙ্গিত নিহিত আছে, তাহলে বলতে হয় শাদা ও কালোর মিশ্রণের ফলাফল নিছক ধূসর রঙ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এই জাতীয় 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন কিন্তু মারাত্মক রকমের ভুল হবে। তবে শব্দের ব্যবহার নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি না-করে আমরা যদি উদ্দিষ্ট মানুষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে কোন ধরনের মানুষকে আমরা সবচেয়ে চমৎকার,

সবচেয়ে আদর্শ বলে জ্ঞান করি, আমাদের ছেলেপিলেরা ওই ধরনের মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই। আর আমরা যদি এই পথ থেকে সরে না-দাঁড়াই এবং অযথা 'বাগাড়ম্বরপূর্ণ দার্শনিকতা'র কথার ফুলঝুরিতে বিভ্রান্ত না-হই, তাহলে আমাদের ছেলেপিলেরা ঠিক কেমনটি হয়ে বেড়ে উঠুক তা আমরা সর্বদাই স্বচ্ছন্দে বলতে পারব। প্রত্যেকেই তাহলে বলতে পারবেন: আশা করি আমার ছেলে মহৎ কীর্তি অর্জনের ক্ষমতা রাখবে, সে হবে মহৎ হৃদয়, গভীর তীব্র আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক সত্যিকার সমুন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এবং সেইসঙ্গে এ-ও আশা করি যে আমার ছেলে এমন এক দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষ হবে না যে নাকি তথাকথিত 'মায়াদয়া'র প্রমাণ রাখতে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দারিদ্র্যে ডুববে, তারপর স্ত্রী-পুত্রদের নিদারুণ অভাবের মধ্যে ফেলে যাবে ও নিজেকেই নিজে আত্মিক ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করবে।

আমাদের মহান প্রলেতারীয় বিপ্লব আমাদের সকলের জন্যে যে-মানবিক সুখের দৃঢ় সংস্থান করে রেখেছে এবং যা বছরে-বছরে ক্রমশ স্ফীত হয়ে চলেছে তা সকল মানুষেরই অধিগত হওয়া দরকার। আবার সেইসঙ্গে আমার বা ব্যক্তিবিশেষেরও এই সুখের অংশভাক হওয়ার একটা অধিকার আছে। আমি অবশ্যই বীর নায়ক হতে চাই ও উল্লেখ্য কীর্তি অর্জন করতে চাই, রাষ্ট্র ও সমাজকে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই দিতে চাই আমি, আবার এই একই সঙ্গে ব্যক্তিগত সুখেরও আস্বাদ পেতে আমি ব্যগ্র। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও এইভাবে চিন্তা করতে শেখাতে হবে। প্রয়োজন হবে যখন-তখন পেছনদিকে না-তাকিয়ে, বাছবিচার বা লাভ-লোকসানের হিসেব নিয়ে মাথা না-

ঘামিয়ে, সুখ না দুঃখ ভোগ করতে হবে তার সম্ভাবনা নিক্তিতে না-মেপে ত্যাগস্বীকারের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে তাদের, আবার অপরদিকে তাদের অধিকার থাকবে সুখসম্ভোগেও।

দুর্ভাগ্যবশত যদিও এই ব্যাপারটি আমি খুব খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি নি, তবে চতুর্দিকেই একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে আর তা হচ্ছে এই যে সুখী বাপ-মায়ের সন্তানরাই সবচেয়ে চমৎকার হয়ে বেড়ে ওঠে... তদুপরি, সুখী বাপ-মা বলতে আমি মোটেই সেইসব দম্পতিকে বোঝাচ্ছি না যাঁদের দখলে এমন সমস্ত ফ্ল্যাট আছে যেখানে গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যেখানে বাথরুম ও অন্যান্য সকল প্রকার সুখসুবিধের বন্দোবস্ত আছে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আমার চারপাশে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা পাঁচ-ঘরের একেকখানা ফ্ল্যাটের মালিক আর সেইসব ফ্ল্যাটে গ্যাস ও ঠান্ডা-গরম কলের জলের সরবরাহ আছে ও দু'জন করে ঝি বা চাকর সেখানে হামেহাল বহাল আছে। অথচ ওইসব লোকের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু নেই। দেখা যাবে, হয় কর্মস্থলে এরা মোটেই ভালোমতো কাজকর্ম করে উঠতে পারছে না, আর না হয় বাপ-মা ছেলেপিলে সকলে মিলেই উঠে-পড়ে লেগে গেছে ষষ্ঠ আরেকখানা ঘর কিংবা গ্রামাঞ্চলে একখানা বাগানবাড়ি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অন্যপক্ষে আমি এমন কিছু সুখী লোক দেখেছি যাঁদের বহুতর বৈষয়িক সম্পদের ঘাটতি আছে। বস্তুত, আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে। নিজেকে আমি খুবই ভাগ্যবান ও সুখী লোক বলেই মনে করি, অথচ আমার এই সুখ কোনোরকম বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। আপনাদেরও জীবনের

সবচেয়ে সুখের দিনগুলির কথা একবার স্মরণ করুন। আজ পেছন ফিরে তাকালে দেখবেন, জীবনের অনেক-কিছু ভালোমন্দ ছাড়া, আরাম-আয়েসের অনেক-কিছু বাদ দিয়েই হয়তো তখন চলতে হয়েছে আপনাদের, তবু আপনাদের হৃদ্‌যন্ত্রগুলি তখন চলেছে একসঙ্গে তালে-তালে, মনমেজাজ থেকেছে আশা-আকাঙ্ক্ষায় খুশিতে ভর পুর হয়ে আর ভবিষ্যৎ লোভানি দিয়েছে মহত্ত্বে উত্তরণের।

এই ধরনের বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগের বিপুল সম্ভাবনা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং এই দৃঢ়বিশ্বাস যে এ-সুখ অধিগত করা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে — এই সবকিছুই আমাদের বিপ্লবের অবদান এবং এটা নিশ্চিত করেছে এখন যে-সোভিয়েত সমাজে আমরা বাস করছি সেই সমাজব্যবস্থা। আমাদের সোভিয়েত স্ত্রী-পুরুষের সুখের সন্ধান মিলবে আমাদের জনগণের ঐক্যের মধ্যে, পার্টির প্রতি আমাদের আনুগত্যে। আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে চিন্তায় ও কর্মে সৎ এবং পার্টির প্রতি অনুগত থাকতে, কেননা সুখ অর্জনের অপরিহার্য একটি সহায়ক বস্তু হল সেই আত্মবিশ্বাস যে আমরা প্রত্যেকে সৎ জীবন যাপন করছি, আমাদের কারও এমন হীন, গোপন প্রবৃত্তি কিছু নেই যা লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে রাখা দরকার, কোনোরকম ধূর্তামি, ষড়্‌যন্ত্র বা অপর কোনো পাপের শরিক আমরা কেউ নই। এই ধরনের মনখোলা, সৎ লোকের যে-সুখ তা শুধু-যে সেই লোকটিকেই জীবনটা গুরুত্বপূর্ণভাবে শুরু করার প্রেরণা যোগায় তা-ই নয়, সবচেয়ে বেশি করে তা সহায়ক হয় লোকটির ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে। এই জন্যেই আপনাদের বলি, যদি আপনারা চান যে ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠুক তাহলে

নিজেরা সুখী জীবন যাপন করতে শিখুন। এ-ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবেন না, আপনাদের সকল বিশেষ দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার পূর্ণমাত্রায় সদ্‌ব্যবহার করুন, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের সুপরামর্শ কাজে লাগান এবং সবাইকে নানাভাবে সাহায্য করুন যাতে সত্যিকার মানবিক সুখ উপভোগে অধিকার জন্মায়। কখনও-কখনও এমন দেখা যায় যে সুখের সন্ধানী মানুষ বিচ্ছিন্ন টুকরোটাকরা পাথর সংগ্রহের জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালায় যাতে সেইসব পাথর জড় করে শেষপর্যন্ত সে নিজের সুখের প্রাসাদ বানানোয় হাত লাগাতে পারে। একটা পর্যায়ে আমি নিজেই এই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করেছিলুম। ভেবেছিলুম, যদি এইরকম টুকরোটাকরা 'পাথর' কুড়োই তাহলে তা নিজে থেকে প্রকৃত সুখের দ্যোতক না-হলেও পরে তা সুখের প্রাসাদ গড়ার ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এমন ধারণা মোটেও সত্যি নয়। ভবিষ্যৎ সুখের প্রাসাদের ভিত্তি গড়ার জন্যে এমন সব পাথরের সংগ্রহ অতি দ্রুত আমাদের নিজেদের মাথাতেই ভেঙে পড়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

সুখী বাবা-মায়েরা, যাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ব্যাপারে সুখী, যাঁরা সুখে জীবনযাপন করে থাকেন এবং জানেন কী করে সেই সুখের ভাগ নেয়া যায়, সব সময়েই তাঁরা এমন সব সন্তান লালন করে থাকেন যাদের নিয়ে গর্ববোধ করা যায় এবং সঠিকভাবে পরিবার লালনে তাঁরা সর্বদাই সফল হয়ে থাকেন।

এ-আলোচনার একেবারে গোড়ায় আমি যে-সূত্রের কথা উল্লেখ করেছিলুম তার মূল এখানেই নিহিত। অর্থাৎ, শিক্ষক ও উপদেষ্টা হিসেবে সর্বোত্তম একটি মধ্যপন্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। এই 'মধ্যপন্থা' অবস্থিত **সমাজকে আমরা**

যা দিই আমাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ও সমাজের কাছ থেকে আমরা যা নিই, অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত সুখ, তার মাঝামাঝি। বাড়িতে শিশুলালনের যে-কোনো পদ্ধতিই আমরা বেছে নিই-না কেন, অমন একটি সর্বোত্তম মধ্যপন্থা খুঁজে বের করা কিন্তু ভারি দরকারি। আর এই উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিমিতিবোধের একটা মনোভাব গড়ে তোলার চর্চাটাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখন সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলির একটি, অর্থাৎ শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নটি (আমি লক্ষ্য করেছি যে সাধারণত এটিই সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলির অন্যতম বলে গণ্য করা হয়) নিয়ে আলোচনা করা যাক। একই সঙ্গে একদিকে কঠোর হওয়া আবার অপরদিকে রাশ আলগা দেয়া — এটি হল গিয়ে সেই ধরনের চিরকালীন একটি সমস্যা...

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে লোকে কড়া হওয়া ও রাশ আলগা দেয়া এই দুই আচরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না।অথচ শিশুলালনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একান্তই অপরিহার্য। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই বিশেষ ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত সকলপ্রকার তাৎপর্য সম্পর্কে ভালোরকম জানাশোনা আছে এমন সব লোকও মনে করেন যে, হ্যাঁ, এ তো ঠিকই, এমন একটা সীমারেখা নিশ্চয়ই থাকা উচিত যেখানে পৌঁছে রাশ আলগা দেয়ার মেজাজ ছেড়ে কড়া হওয়া দরকার। তবে এটা করা দরকার বাচ্চার বয়স যখন ছয় কিংবা সাত বছর হবে। তার আগে এই ধরনের এত সীমারেখা মেনে চলা বা বাছবিচারের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ আসল ব্যাপার হল এই যে সাবালকের চরিত্রের ভিত্তিটি তৈরি হয়ে যায় তার শিশুকালে: পাঁচ বছর বয়স হবার আগে আমরা তার জন্যে যতটুকু যা করি তাই-ই কিন্তু হল

গিয়ে তার লালনের ৯০ শতাংশ। যদিও এর পরেও **শিশুকে শিক্ষাদানের কাজ চলতেই থাকে এবং তার চরিত্রের উ'চিয়ে-থাকা কোণগুলোর ঘষামাজাও চলে,** তবু প্রধানত যে-কাজটুকু তখন বাকি থাকে তা হল আপনার আগের পরিশ্রমের ফসল কেটে ঘরে তোলা। কেননা যে-সব ফুল ফোটানোর পরিচর্যা দিয়ে আপনি কাজ শুরু করেছিলেন সেগুলি ওই পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই ফুটে যায়। এই জন্যেই শিশুর পাঁচ বছর বয়সের আগেই ওই কড়া হওয়া ও রাশ আলগা দেয়ার কার্যক্রমের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। প্রায়ই এটা দেখতে পাওয়া যায় যে শিশুকে তার খামখেয়াল ও বদমেজাজ নিয়ে ঘনঘন মেতে উঠতে দেয়া হয় আর সারাদিন ধরে সে চিল-চিৎকার করতে থাকে, আবার অন্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তাকে একেবারেই কাঁদতে দেয়া হয় না। আবার কোনো-কোনো ছেলে বা মেয়ে দেখা যায় সর্বদাই অস্থির-চঞ্চল হয়ে রয়েছে, সবকিছু ধরে টানাটানি করছে, একের-পর-এক অন্তহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেছে, একমুহূর্ত কাউকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। আবার তৃতীয় আরেক ধরনের এমন ছেলেপিলেও দেখা যায় যাদের কাঠের পুতুলের মতো নির্জীব ও বশ্যবাধ্য হয়ে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবে এই তৃতীয় ধরনের শিশুলালনের পদ্ধতির সাক্ষাৎ আমাদের পরিবারগুলিতে খুবই কম মেলে।

উপরোক্ত এই তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কড়া হওয়া ও রাশ আলগা দেয়ার বরাদ্দ স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়ার অভাব ঘটছে। একথা বলাই বাহুল্য যে শিশুর বয়স পাঁচ, ছয় বা সাত বছর হবার মধ্যেই পরিবারে সব সময়ে এক ধরনের একটি সর্বোত্তম মধ্যপন্থা, উপরোক্ত ওই

দুই চরম আচরণের মধ্যে এক ধরনের একটা সামঞ্জস্য অর্জন করা দরকার।

লোকে প্রায়ই আমার এই কথায় আপত্তি জানিয়ে থাকে এই বলে যে আমি কড়া হওয়ার ব্যাপারে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের ওপর জোর দিয়ে থাকি, অথচ শিশুদের নাকি একেবারে কোনোরকম কড়া হওয়ার ভাব না-দেখিয়েই দিব্যি মানুষ করা চলে। এদের বক্তব্য এই যে বাবা-মা যদি সবকিছু কাজ বুদ্ধি খাটিয়ে ও মমতার পরিচয় দিয়ে করতে পারেন তাহলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আচরণে কখনও কোনো ব্যাপারে কড়া না-হয়েও দিব্যি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন তাঁরা।

এখানে বলা দরকার যে কড়া হওয়া বলতে আমি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করা কিংবা হিস্টিরিয়ার রুগীর মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করা বোঝাতে চাই নি। বরং উলটো... কড়া হওয়াটা একমাত্র তখনই কিছুমাত্র ফল দেয় যখন তা হিস্টিরিয়ার লক্ষণ থেকে মুক্ত থাকে।

হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি শিখেছি, কীভাবে খুব শান্তসুরে কথা বলেও কড়া হওয়ার ভাব প্রকাশ করা যায়। এমন রীতিমতো সৌজন্যসহকারে, নরম গলায় ও শান্তভাবে আমি একদা কথা বলতে পারতুম যা শুনে আমার কলোনির বাসিন্দারা ফ্যাকাশে মেরে যেত। কড়া হওয়া বলতে কখনোই এটা ধরে নেয়া হচ্ছে না যে গলা চড়িয়ে ধমক দিতে হবে বা চিৎকার-চেঁচামেচি করতে হবে। এ-সমস্ত জিনিস নিতান্তই বাড়তি। উলটোপক্ষে বরং শান্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ভাব এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নরম গলায় প্রকাশ করতে পারলে তা অবিশ্বাস্যরকমের গভীরভাবে মনে দাগ কাটতে সমর্থ। 'বেরিয়ে যাও' কথাদুটোও মনে দাগ কাটে

বটে, তবে যদি বলা যায় 'দয়া করে ঘর থেকে যাও দেখি' তাতেও কিন্তু একই রকম ফল ফলবে এবং হয়তো বেশ কিছুটা বেশিই ফল দেখা যাবে।

এক্ষেত্রে প্রথম নিয়ম হল আচরণের কোনো এক ধরনের নিয়মিত একটা মান নির্ধারণ করে ফেলা, বিশেষ করে যখন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে বাচ্চার জীবনগঠনে আপনি কতখানি পরিমাণে হস্তক্ষেপ করতে চান। এটা অত্যন্ত গুরুতর একটা প্রশ্ন অথচ পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এর সমাধান খোঁজা হয় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ ধরে। শিশুকে কতখানি মাত্রায় স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া উচিত, কতদূর পর্যন্ত তাকে 'হাতে ধরে চালনা করা' দরকার, কতখানি ও কোন সীমা পর্যন্ত তাকে আপনা থেকে চলতে দেয়া যেতে পারে, কী-কী তার পক্ষে নিষিদ্ধ করা ও কোন-কোন সিদ্ধান্ত নেবার ভার তার ওপর ছেড়ে রাখা কর্তব্য — এইসব সমস্যাই এই প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত।

ধরুন, একটি ছোট্ট ছেলে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছে। আর আপনি সারাক্ষণই পেছন থেকে চেঁচামেচি জুড়েছেন — ওদিকে যেও না, সেদিকে যেও না, ইত্যাদি। এখন, এমন করাটা কতখানি ঠিক? শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়াটা এক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে এটা ঠিকই, তবু শিশুকে যদি প্রতিবার কোনো কিছু করার আগে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়, কোনো কিছু করতে হলেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিতে হয় ও তারপর আপনাদের কথামতো চলতে হয় তাকে, তাহলে তো তার নিজস্ব উদ্যোগ, মাথা খাটানো ও কী করে ঝুঁকি নিতে হয় তা শেখার সকল সুযোগের দফারফা হয়ে যায়। এটাও তো মোটেই সুখকর কোনো জিনিস নয়।

আমি এইমাত্র 'ঝুঁকি নেয়া' কথাটা ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, বাচ্চার সাত-আট বছর বয়স হলেই তাকে মাঝেসাঝে ঝুঁকি নেয়া শিখতে দিতে হবে। এবিষয়ে আপনাদের সচেতন থাকতে হবে ও বাচ্চার কিছু পরিমাণে ঝুঁকি নেয়া অনুমোদন করতে হবে, যাতে আমাদের সন্তান মনোবল সঞ্চয় করে উঠতে পারে, যাতে প্রতিটি কৃতকর্মের জন্যে সে আপনাদের দায়ী করতে অভ্যস্ত না-হয়, যাতে সে না-বলতে শেখে যে 'মা এটা করতে বলেছেন, বাবা ওটা করতে বলেছেন, ওঁরাই সবকিছু জানেন, আমাকে যেমন বলা হয় আমি তেমন করি।' শিশুর জীবনে আপনাদের হস্তক্ষেপ যদি এমন চরম আকার ধারণ করে তাহলে কিন্তু আপনাদের সন্তান কোনোদিনই খাঁটি অর্থে মানুষ হবে না। এর ফলে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে সে স্বকীয় সিদ্ধান্ত কিংবা ঝুঁকি নিতে অপারগ নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়াবে, আর নয়তো অন্যপক্ষে আপনাদের চাপের কাছে বেশ কিছুদিন ধরে নতিস্বীকার করে যেতে-যেতে হঠাৎ একদিন তার ভেতরে ক্রিয়াশীল ভাবনাচিন্তাগুলি কিছুতেই আর চাপা থাকতে না-পেরে আচমকা ফেটে পড়বে আর তখন সবকিছুর পরিণতি ঘটবে পারিবারিক কেলেঙ্কারি ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে। তখন আপনারাই বলতে থাকবেন, 'কী জানি, দিব্যি তো ও সুবোধ শিষ্ট ভালো ছেলে ছিল, তারপর হঠাৎ কী-যে হল ওর কে জানে!' বস্তুত, আগাগোড়াই ওর ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছিল, কিন্তু প্রকৃতি ছেলেটিকে যে-সহনক্ষমতার অধিকারী করেছিল এবং যা ওর বয়স ও শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছিল তা-ও কাজ করছিল ভেতরে-ভেতরে... আর তাই প্রথমে ও চাপকে ঠেকাবার চেষ্টা করছিল

গোপনে, কিন্তু তারপর আর কোনো বাধাই বাগ মানাতে পারল না তা...

এছাড়া প্রায়ই যেমনটি নজরে পড়ে তেমন এর বিপরীত চরম উদাহরণেরও সাক্ষাৎ মেলে। বাবা-মায়েরা যখন এই নীতি অনুসরণ করে চলেন যে বাচ্চাকে তার নিজস্ব উদ্যোগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশের ও সে যা খুশি করতে চায় তা-ই করতে দেয়ার পুরো সুযোগ দেয়া দরকার, তখন তাঁদের সন্তানেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চিন্তাভাবনা করা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখে। অনেকে মনে করেন যে এরকম পরিস্থিতিতে শিশুর মধ্যে জোরালো ইচ্ছাশক্তির জন্ম হয়। আসলে কিন্তু মোটেই তা হয় না, সত্যিকার ইচ্ছাশক্তি মোটেই এভাবে জন্ম নেয় না। কারণ সত্যিকার ইচ্ছাশক্তি কোনো কিছু চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষমতাকেই বোঝায় না, তা আরও অনেক বেশি কিছুকে বোঝায়। যেমন, এ-ইচ্ছাশক্তি তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে কোনো কিছু ত্যাগ করতে নিজেকে বাধ্য করার ক্ষমতাও বোঝায়। সরল বাসনাকামনা ও তার চাহিদা মেটানোর চেয়ে ইচ্ছাশক্তি আরও বড় কিছু ব্যাপার। ইচ্ছাশক্তি হল কামনা করা ও তার পাশাপাশি কামনাকে দমন করা, একই সঙ্গে কিছু চাওয়া ও কিছু প্রত্যাখ্যান করা। যদি আপনাদের সন্তান কেবলমাত্র নিজের কামনাবাসনা পূরণের জন্যেই আত্মনিয়োগ করে এবং কখনও সেই কামনাবাসনাকে সংযত করার জন্যে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ না-করে, তাহলে কোনোদিনও সে মহৎ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হবে না। ব্রেক কষার কলকব্জা ছাড়া মোটরগাড়ির অস্তিত্ব সম্ভব নয়, সংযমের ব্রেক ছাড়া ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না।

আমার কমিউনের ছেলেপিলেরা এইসব ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গে ভালোরকমই পরিচিত ছিল। কখনও-কখনও আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতুম: 'তোমরা ব্রেক কষলে না কেন? তোমরা তো জানতে যে আরও অনেক ধীরে-ধীরে তোমাদের এগনো উচিত ছিল।' আবার কখনও আমি শুধোতুম: 'হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে ছিলে কেন? কেন নিজেরাই এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও নি? কী করতে হবে আমি তা না-বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কী ছিল?'

শিশুদের মধ্যে সময়মতো থামতে পারা ও আত্মসংবরণ করতে পারার ক্ষমতাকে বিকশিত করে তোলা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য এটা খুব সহজ কাজ নয়। আমার 'বাবা-মা'র জন্যে বই'টিতে এই বিষয়টি নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

এই একই সঙ্গে শিশুর মধ্যে অপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বিকশিত করে তোলা একান্ত আবশ্যক। সত্যি কথা বলতে কী, এই শেষোক্ত ক্ষমতাটির বিকাশসাধন তেমন কঠিন কাজ নয়। এটি হল, নানা বিচিত্র পরিস্থিতিতে শিশুকে সহনশীল হতে ও যথাযথ আচরণ করতে শেখানো। নানা ঘটনায়, প্রায় তুচ্ছ খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে অসংখ্যবার এই প্রয়োজনটি প্রধান হয়ে দেখা দেয়। একেবারে নিতান্ত শিশুকালেই আপনার বাচ্চাকে এ-ব্যাপারে সচেতন করে তুলুন যে নতুন-নতুন পরিস্থিতিতে সঠিক, যথাযথ আচরণ আয়ত্ত করতে পারা প্রত্যেকের পক্ষেই কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাটি হয়তো কিছু একটা বলছে এমন সময়, ধরা যাক, নতুন কেউ এসে ঘরে ঢুকলেন। কিংবা আরও ভালো হয় যদি ধরে নিই যে আগন্তুক সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন কোনো লোক নন, তবে বাচ্চাটির পরিচিত জগৎ, অর্থাৎ তার

ঘনিষ্ঠ পারিবারিক মহলের বাইরেকার কেউ — যেমন, বেড়াতে-আসা কোনো প্রতিবেশী, কোনো নিমন্ত্রিত অতিথি, কাকী-মাসি কিংবা ঠাকুমা-দিদিমাদের মধ্যে কেউ। এহেন অবস্থায় বাচ্চার এটা বুঝতে শেখা দরকার যে এই নতুন পরিবেশে সে কী বলবে আর কী বলবে না (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা উপস্থিত থাকলে বুড়ো বয়স নিয়ে কোনোরকম আলোচনা না-করাই বাঞ্ছনীয়, কেননা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বিশেষ করে এরকম আলোচনা পছন্দ করেন না। শিশুর এটাও শেখা দরকার যে নতুন কোনো আগন্তুক ঘরে এলে তিনি কী বলছেন প্রথমে সেটাই শোনা প্রয়োজন ও একমাত্র তারপরই সে নিজে ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে)। তারা ঠিক কোন ধরনের লোকজনের মধ্যে আছে এটা ধরতে পারা এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরতে পারার ক্ষমতা— শিশুদের পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ এবং এটিকে লালন করে তোলা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা তেমন কঠিন কাজ নয়। উপরোক্ত ধরনের দুটো-তিনটে পরিস্থিতির কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে আপনার ছেলে কিংবা মেয়ের সঙ্গে তা-ই নিয়ে আলাপ করলেই যথেষ্ট হবে। তারপরই দেখতে পাবেন এ-ব্যাপারে আপনার উৎসাহ যোগানোর ফল ফলতে শুরু করেছে। যথাযথ আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা — যার এমন ক্ষমতা আছে তার পক্ষে ও তার চারপাশে যারা আছে তাদের পক্ষেও — যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনই উপকারীও বটে।

পরিবারের পটভূমিতে এ-কাজটা যে-ধরনের, কমিউনে আমার পক্ষে এটা ছিল তার চেয়ে আরও অনেক কঠিন কাজ। কমিউনে বাস করত বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে, ফলে পরিস্থিতিটাও সেখানে ছিল অনেক বেশি গোলমেলে।

ছেলেমেয়েরা সর্বদাই সেখানে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসত : পরিচিত-অপরিচিত বহুতর মানুষ সর্বদাই আসত-যেত সেখানে, এঞ্জিনিয়ররা, শ্রমিকরা, বাড়ি-তৈরির জনমজুররা আসা-যাওয়া করতেন। তাছাড়া কমিউন পরিদর্শন করতে সব সময়েই লোকজন আসত এবং জায়গাটা প্রায়ই হয়ে দাঁড়াত পর্যটন বা প্রমোদভ্রমণের লক্ষ্যস্থল। এমন কি এইরকম একটা জায়গাতেও ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি মোটের ওপর ভালোই ফল পেয়েছিলুম। অতএব পারিবারিক পরিবেশে আরও তাড়াতাড়ি ও আরও ভালো ফল পাওয়া উচিত। যে-কোনো মানুষের পক্ষেই তার চারপাশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়ে সেইমতো চলার ক্ষমতা অর্জন করা যে-কোনো জায়গাতেই একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যেমন, দৌড়ে রাস্তা পার হবার সময় যে-কোনো বাচ্চা ছেলেকেও বুঝে নিতে হয় যে রাস্তাটা দিয়ে কী রকম পথচারী ও গাড়িঘোড়া যাতায়াত করছে, কে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে, ইত্যাদি। তেমনই কাজের সময়ও ছেলেটিকে বুঝতে হয় যে কোন-কোন কাজের প্রকৃতি ও পরিবেশ সবচেয়ে বিপজ্জনক কিংবা কোন-কোন ধরনের কাজ সবচেয়ে নিরাপদ। পরিবেশ বুঝে চলতে পারার এই ক্ষমতা শিশুর আয়ত্তে এলে তা সর্বদাই শিশুকে সাহায্য করবে বুঝে উঠতে যে কখন তাকে সাহস দেখাতে হবে ও পুরোদমে উদ্যমকে প্রয়োগ করতে হবে আবার কখনই-বা তাকে সাহস, উদ্যম এসব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আজকে অবশ্য এ-সবই আমি একটু অতিসরলীকৃত করে ব্যাখ্যা করছি, তবে এটা ঠিক যে হাতে-কলমে কাজে লাগানোর সময়ে অবস্থা বুঝে চলতে পারাটা এমন ধরনের

একটা ক্ষমতা হিসেবে দেখা দেয় যার সঙ্গে অকথিত বহু সূক্ষ্ম তারতম্য ও সূক্ষ্মতর বহু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জড়িত থাকে।

একটা উদাহরণ দেখিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। ধরুন, আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্যে তারা ভারি ব্যস্ত। এখানেও কিন্তু ভালোবাসার প্রকাশের বেলাতেও ক্রিয়া ও লাগাম-কষা ক্রিয়ার সেই একই আইন সমানভাবে প্রযোজ্য। পনেরো-ষোল বছরের তরুণী মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে দেখা হয়ে গেলে (তা সে তার আগের গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে প্রথম পরিচয় ও সর্বসাকুল্যে বার-দুয়েক মাত্র দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকলেও) তৃতীয় এই সাক্ষাতেই বহুদিনের পুরনো ও দীর্ঘদিনের হারানো বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার মতো করে যেভাবে তারা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না-পেরে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় (তরুণী মেয়েদের আবার এ-কাজে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়) তা বেশ দৃষ্টিকটুই ঠেকে। বলা বাহুল্য, এ দৃশ্য দেখলে যে-কোনো লোকেরই মনে হতে পারে, সত্যিই কি ওরা দু'জন অত গভীরভাবে পরস্পরের প্রতি আসক্ত? আসলে প্রায়শই কিন্তু দেখা যায় এইসব মেয়ের আবেগ বেশ কিছুটা কাল্পনিক, এরা আবেগ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে এবং কখনও-কখনও আবেগের এই ধরনের প্রকাশটা মৃদু একটা বিবেকহীন মনোভাবের রূপ নেয়, তা ভালোবাসার আবেগের আন্তরিকতাশূন্য আদিখ্যেতার প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়।

ছেলেপিলে আছে এমন বহু পরিবারের সঙ্গে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পরিচিত। আপনারা জানেন ছেলেপিলেরা

নিজেদের পরিবারের মধ্যে আবেগ প্রকাশ করে কীভাবে। কিছু-কিছু পরিবারে এই আবেগপ্রকাশের ব্যাপারটা-যে অন্তহীন পারস্পরিক আলিঙ্গন ও ভালোবাসার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশের চেহারা নেয় তা-ও নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। এসব ক্ষেত্রে আবেগের এই প্রকাশটা অনবরত, এতই অনবরত ঘটতে থাকে যে সন্দেহ জাগে বাহ্য এই আড়ম্বরের আড়ালে সত্যিকার ভালোবাসার চেয়ে ভালোবাসার আবেগ নিয়ে খেলা করার প্রবণতাটাই হয়তো লুকিয়ে আছে।

আবার অন্য কিছু-কিছু পরিবারে পরস্পরের প্রতি নিরাবেগ ঠান্ডা আচরণটাই দেখা যায় প্রচলিত রীতি। দেখে মনে হয় যেন সেখানে পরিবারের প্রতিটি লোকই নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে চলেছে। হয়তো দেখা গেল ছেলে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে নেহাতই না-জানালে নয় এমন নিষ্প্রাণ গলায় প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে নিজের ধান্দায় চলে গেল। ভাবখানা এইরকম দেখাল সে যেন তার সঙ্গে পরিবারের বাকি লোকদের তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নেই। একমাত্র দুর্লভ কয়েকটি প্রীতিকর ক্ষেত্রেই এ-জিনিসটা লক্ষ্য করা সম্ভব যে বাহ্যত সংযত পারিবারিক সম্পর্কের একটা আবহাওয়ায় হঠাৎ কেউ একজন পরিবারের অপর কারো দিকে প্রেম বা প্রীতিপূর্ণ চোখে এক-ঝলক তাকালেন, আর তারপর দেখতে-দেখতে সেই প্রীতির ঝল্‌কানি হঠাৎই একসময় নিবে গেল। সেইসব পরিবারের মধ্যেই এরকম আচরণের সাক্ষাৎ মিলবে যেখানে ছেলেমেয়েরা সত্যিসত্যিই তাদের মা-বাবাকে ভালোবাসে। শিশুর মধ্যে একাধারে আবেগ অনুভবের ও সেই আবেগের প্রকাশকে সংযত রাখতে পারার ক্ষমতাকে লালিত ও বিকশিত করে তুলতে পারা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানবিক ভালোবাসা

যাতে নিছক বাহ্য আড়ম্বর কিংবা আলিঙ্গন ইত্যাদির নিচে চাপা পড়ে হারিয়ে না-যায় তা দেখাই এর উদ্দেশ্য। বাবা-মায়ের প্রতি গভীর আবেগসমৃদ্ধ আসক্তি সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারার উপরোক্ত এই ক্ষমতা শিশুর মধ্যে মহৎ মানবহৃদয় বিকশিত করে তোলার চর্যার পক্ষে একেবারে ভিত্তিস্বরূপ বলা চলে।

কমিউনের ছেলেমেয়েরা আমাকে তাদের বাপের মতোই ভালোবাসত, তবু আমি এমন একটা আবহাওয়া সেখানে গড়ে তুলতে পেরেছিলুম যা ছিল ভালোবাসার মৌখিক প্রকাশ কিংবা ভাবপ্রবণ ভঙ্গি ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক এই ধরনের আচরণের ফলে ভারগ্রস্ত হয়ে ওঠে নি কখনও। ওখানকার ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক, সহজ ও সংযত ভঙ্গিতে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে শিখেছিল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং যথাযথ বাহ্য আচরণে ছেলেপিলেকে শিক্ষিত করে তোলে বলেই-যে শুধু তা-ই নয়, এই শিক্ষার চর্চা আন্তরিক অনুপ্রাণনা অনুভবের ক্ষমতাকেও টিকিয়ে রাখে এবং যা সর্বদাই যে-কোনো মানুষের অশেষ উপকারে আসে তার সেই আত্মসংযমের হাতিয়ারগুলিকেও গড়ে তোলে এই শিক্ষা।

এ-প্রসঙ্গে মানবিক আচরণের মান বজায় রাখার যে-মৌল নীতি সেই পরিমিতিবোধের কথায় ফের ফিরে আসা সময়োপযোগী হবে।

কাজকর্মের ও বৈষয়িক নানা সম্পর্কের জটিল ক্ষেত্রেও এই পরিমিতিবোধ প্রধান হয়ে দেখা দেয়। একই বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বাস করেন এমন একদল মহিলা সম্প্রতি আমার সঙ্গে দেখা করেন। ওই বাড়িরই একাধিক ফ্ল্যাটকে কেন্দ্র করে অল্পদিন আগে একটি নাটকীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত

হয়। বাড়িটির দুটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা দুই পরিবারের মধ্যে বেশ বন্ধুসম্পর্ক ছিল, দুটি পরিবারেই ছেলেপিলে ছিল। একটি পরিবারের ছেলে কিশোর ইউরাকে (বয়স চোদ্দ বছর) অনুমতি না-নিয়ে বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র বা টাকাকড়ি সরানোর দায়ে কিছুদিন থেকেই তার বাড়িতে সন্দেহ করা হচ্ছিল। অপর পরিবারটিও এই ঘটনার কথা জানত।

এর কিছুদিন পরে ওই বন্ধু-পরিবারটির ফ্ল্যাট থেকে একবাক্স দামি ড্রইংয়ের যন্ত্রপাতি উধাও হয়ে গেল। এই পরিবারটির ফ্ল্যাটেও ইউরার ঘনঘন গতায়াত ছিল, নিজেকে সে পরিবারেই একজন বলে গণ্য করত। ওই ছেলেটি ছাড়া বাড়িতে সে-সময়ে এমন কেউ ছিল না যে-নাকি ড্রইংয়ের যন্ত্রপাতিগুলো সরাতে পারত। ফলে সন্দেহ গিয়ে পড়ল ওরই ওপর। অতঃপর ওই দুটি পরিবার রীতিমতো শিক্ষিত, ভব্যসভ্য ও নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ, এবং সত্যি বলতে কী প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়েই, মেতে উঠল চোরধরার কাজে। ওরা মনে করল, যা-ই ঘটুক-না কেন ইউরা ড্রইংয়ের যন্ত্রপাতির বাক্সটা সত্যিই চুরি করেছে কিনা এটা প্রমাণ করতেই হবে। গোটা তিনটে মাস ধরে এই চিন্তাটা ছাড়া ওদের মাথায় আর কিছুই ছিল না। এটা অবশ্য সত্যি যে এ-কাজে সাহায্য করার জন্যে তারা গোয়েন্দাকুকুর সহ মিলিসিয়াকে কিংবা বাইরের অপর কাউকে ডাকে নি, তবে সবকিছু মিলিয়ে দেখে ও সর্বত্র খোঁজ করে, পরস্পরকে জেরা করে-করে জেরবার করে তুলে, সাক্ষীসাবুদ খুঁজে বের করে এবং গোপন শলাপরামর্শ চালিয়ে ইউরাকে একেবারে অস্থির করে তুলল। অবশেষে তারা দাবি জানাতে লাগল, ইউরা স্বীকার করুক যে সে

চুরি করেছে, স্বীকার করলে ইউরাকে-যে শাস্তি পেতে হবে না সেকথাও জানিয়ে দিল তারা।

ইউরার বাপ তো বুক চাপড়াতে শুরু করলেন। ছেলের কাছে এই বলে অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন তিনি যে সে তাঁকে দয়া করুক, একবার মুখ ফুটে বলুক যে সে চোর, নাকি চোর নয়!

ছেলেটার অবস্থাও-যে একটু ভাবা দরকার, এ-চিন্তা কিন্তু কারও মাথাতেই ছিল না। সকল মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ইউরার বাপ। তাঁকে এই মর্মান্তিক যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার করা দরকার, এইটেই সকলের মনে হচ্ছিল।

অবশেষে সবাই মিলে আমার কাছে এলেন ওঁরা। অতঃপর আর কী করণীয়, এই ছিল ওঁদের জিজ্ঞাস্য। সবাই জানালেন, এভাবে আর বাঁচা সম্ভব নয় ওঁদের পক্ষে।

ছেলেটিকে এনে আমার সঙ্গে দেখা করাতে বললুম। লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের মতলব ভালো না মন্দ সর্বদাই-যে তা আমি বুঝতে পারি তা নয়, তবু কিছু না-বুঝেও ছেলেটিকে আমি বললুম: 'তুমি কিছুই চুরি কর নি। ড্রইংয়ের যন্ত্রপাতিও তুমি মোটেও সরাও নি। লোককে এব্যাপারে কখ্‌খনো তোমাকে জেরা করতে দেবে না।'

এরপর অপর একবার আলাদা করে ডেকে পাঠিয়ে ছেলেটির বাবা-মাকে আমি এই বলে ধমকে দিলুম যে 'এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা বরাবরের মতো বন্ধ করুন দেখি! ছেলে চোর কি চোর নয় এই প্রশ্নটা আপনাদের পেয়ে বসেছে দেখছি। আপনারা এমন আচরণ করছেন যেন আপনারা একটা গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়ছেন আর কীভাবে

কাহিনীটা শেষ হবে, কে আসল চোর, তা জানবার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছেন। এই কৌতূহলের ইতি টানুন তো এইবার! আপনাদের এই খ্যাপামির অবসরে আপনাদের ছেলের গোটা ভবিষ্যৎটা-যে গোল্লায় যেতে বসেছে। সে আগে নিজেদের ঘর থেকে কিছু-একটা জিনিস সরিয়েছে, এবারও হয়তো জিনিসটা নিয়েছে সে। ওর মধ্যে আবারও এই প্রবণতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু ওকে এই ব্যাধি থেকে সারিয়ে তোলা আপনাদেরই কাজ। এই চুরির ঘটনাটা এতদিনে ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো, আর সবচেয়ে ভালো কাজ হবে নিজেদের আর ছেলেটাকে যন্ত্রণা দেয়ার হাত থেকে রেহাই দেয়া।'

তবে যদি আপনি নিজের চোখে আপনার সন্তানকে চুরি করতে দেখেন, যদি আপনি তার চুরির ঘটনাটা প্রমাণ করতে পারেন এবং মনে করেন যে ব্যাপারটা নিয়ে কিছু-একটা বলা অবশ্যই দরকার, তাহলে, এমন কিছু-কিছু ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা তার কাছে উত্থাপন করে তার একটা ফয়সলা করে ফেলা বস্তুত সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণই বটে। অবশ্য আপনার হাতে যদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না-থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কর্তব্য হবে অন্য লোকের সন্দেহের চোরাচাউনি থেকে নিজের সন্তানকে রক্ষা করা। অবশ্য তা সত্ত্বেও নিজের চোখকান খোলা রাখা দরকার ও আপনার সন্তান কী করছে না-করছে সেদিকেও আগের থেকে বেশি করে নজর রাখা প্রয়োজন।

দ্জের্জিন্স্কি উৎপাদনী কমিউনের সদস্য এক প্রাক্তন বারবনিতা একবার কী-একটা জিনিস যেন চুরি করে। আমি এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলুম যে সে ঠিকই চুরি করেছে। এটাও আমি বুঝতে পারছিলুম যে কলোনির অপর সকল

বাসিন্দাও এব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিল যে সে-ই চুরি করেছে। ফলে মেয়েটা বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। এখন, আমার পক্ষে যা করার ছিল তা হল ব্যাপারটার চূড়ান্ত একটা ফয়সলা করে ফেলা। আমি জানতুম যে মেয়েটা চুরিবিদ্যেয় অভ্যস্ত ছিল, কাজেই এই চুরিটা তার পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো কাজ ছিল না। অতএব আমরা যদি তাকে শুধোতুম যে সে অমন একটা বেহায়ার মতো কাজ কীভাবে করে উঠতে পারল তাহলে সে-কথায় তার মন গলত সামান্যই। অতঃপর এই সবকিছু মনে-মনে তোলাপাড়া করে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করত এমন সব ছেলেপিলে নিয়ে গঠিত দলপতি-পরিষদকে বললুম যে তারা যেন মেয়েটাকে অযথা টানাহেঁচড়া করা থেকে রেহাই দেয়, কেননা আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে সে চুরি করে নি এবং তার চুরি করা সম্বন্ধে তাদেরও হাতে কোনো প্রমাণ নেই।

একথা শুনে দলপতি-পরিষদের ছেলেমেয়েরা প্রথমটা প্রতিবাদ জানাতে ও চেঁচামেচি করতে লাগল, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার কথাই রইল এবং ওরা ওইখানেই ব্যাপারটার ইতি টেনে দিল।

আর তারপর কী হল বলে মনে করেন? প্রথমে তো মেয়েটি সাংঘাতিক নার্ভাস হয়ে পড়ল এবং মুখে একটা আন্তরিক বিভ্রান্ত ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটা মোটেই বোকা ছিল না। সে যে-কাজ করেছিল তাতে কোনো রাখঢাকও ছিল না। কাজেই আমি তাকে বিশ্বাস করেছি দেখে সে রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ভাবছিল, সত্যিই কি তাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি? কিন্তু কী করেই-বা আমার পক্ষে তা করা সম্ভব? ভাবছিল,

আমি অভিনয় করছি না তো? নাকি, সত্যিই তার সততায় আমার আস্থা জন্মেছে? ওই সময় থেকে যখনই কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে কাউকে কোথাও পাঠাবার দরকার হোত তখনই আমি মেয়েটির ওপর সে-কাজের ভার দিতে লাগলুম।

এইভাবে মাসখানেক চলল। এই একমাস ওর ওপর আমার আস্থার দরুন মর্মবেদনা ভোগ করে চলল ও। তারপর, মাসখানেক বাদে একদিন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। চোখের জলে ভাসছিল মেয়েটি, ভালো করে কথাই সরছিল না মুখে। ও বলল: 'আপনের দয়া আমি ভুলতি পারব্য না। সবাই মিলি যখন আমারে দুষতেছেল তখন একমাত্তর আপনেই আমার পক্ষ নিয়িছেলেন।'

আর একমাত্র তখনই আমি ওকে বললুম: 'আমি জানতুম চুরিটা তুমিই করেছিলে। এতে কোনো ভুল নেই। এ-ব্যাপারে এখনও আমি স্থিরনিশ্চিত, তখনও তাই ছিলুম। তবে এও জানি যে এরপর আর কোনোদিন তুমি চুরি করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, এ-ব্যাপারে কাউকে কোনোদিন একটি কথাও আমি বলব না। আমরা ধরে নিতে পারি, তুমি চুরি কর নি এবং আমাদের মধ্যে এই কথাবার্তা-যে হয়েছে এটাও কেউ জানবে না।'

বলা বাহুল্য, এরপর আর কোনোদিনই সে কিছু চুরি করে নি।

এই ধরনের কৌশল অবলম্বনও কিন্তু সৎ, আন্তরিক কৌশল। কেননা এ-ধরনের কৌশল অবলম্বনের ভিত্তি হল পরিমিতিবোধ এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও এমন কৌশল অনায়াসেই অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে পরিবারের মধ্যে ঘনঘন সত্যের অপলাপ ঘটানো ঠিক হবে না।

ছেলেমেয়েদের কাছে সর্বদাই সত্যি কথা বলা উচিত, সাধারণভাবে এটাই হল তর্কাতীত নিয়ম। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের কাছে অসত্যভাষণ ছাড়া উপায় থাকে না, এটাও ঠিক। যেখানে আপনি নিশ্চিত যে বাচ্চা কোনো কিছু চুরি করেছে অথচ আপনি তা হাতেনাতে প্রমাণ করতে পারছেন না, এমন ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা বা ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। আবার অন্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যখন আপনি বাচ্চার চুরি করা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং আপনার হাতে তার তর্কাতীত প্রমাণও বর্তমান, তখনও বাচ্চার ওপর আপনার সক্রিয় আস্থা ও বিশ্বাসকে যতভাবে পারেন প্রকট করে তুলুন। আর মেনে চলুন আপনার পরিমিতিবোধকে। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে শিশুর ব্যক্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে মাত্রা বজায় না-রেখে কিছুতেই আপনি রাশছাড়া আবেগ, ক্রোধ ও ঘৃণা এবং আপনার মনে জমে-থাকা নানা কথা প্রকাশ করতে পারেন না।

ছেলেপিলেরা যাতে চুরি করতে অভ্যস্ত না-হয় এমনভাবে তাদের মানুষ করে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ চারিত্র্যবল গড়ে তোলা, যেমন, সাহস, সংযম, আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও বিপদ-বাধা কাটিয়ে ওঠার মতো মনোবল। অন্যলোকের ধনসম্পত্তি সম্পর্কে বাচ্চাদের মনে শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তোলা এদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ কাজ। আপনাদের ঘরদোর যদি সর্বদা সাজানোগোছানো থাকে এবং কোথায় কোন জিনিসটি আছে বাবা-মায়েরা যদি তার হিসেব রাখেন তাহলে কখনোই বাড়িতে চুরি হতে পারে না। কোথায়-কোথায় আপনারা জিনিসপত্র রাখছেন সে-সম্পর্কে আপনাদের নিজেদেরই যদি কোনো ধারণা না-থাকে, বালিশের নিচে

মনিব্যাগ রেখে তা ভুলে যাওয়া, টাকা-পয়সা আলমারির দেরাজে অথবা খাবারঘরের সাইডবোর্ডে দিনের-পর-দিন ফেলে রাখা, ইত্যাদি যদি আপনাদের রেওয়াজ হয়, তাহলে আপনাদের ছেলেপিলেরা-যে চুরিচামারি শুরু করবে এতে আর আশ্চর্য কী। বাড়িতে আপনাদের সবকিছু জিনিসপত্র যদি এলোমেলোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তাহলে বাড়িব বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে পর্যন্ত বুঝতে শেখে যে এটা বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছু নয়। সে যখন দেখে যে জিনিসপত্রের দিকে সাধারণভাবে আপনাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তখন সে নিশ্চিত হয় যে সেই বিশৃঙ্খল স্তূপের মধ্যে থেকে সামান্য ছোটখাট জিনিস হাতিয়ে নিলে তা আপনাদের নজরে পড়বে না।

শিশু যখন প্রথম চুরি করতে শুরু করে তখন সেটা মোটেই চুরির ব্যাপার হয় না, সেটা হয় নেহাতই 'না-বলে নেয়া'র ব্যাপার। তারপর ক্রমে-ক্রমে এটা অভ্যেসে পরিণত হয় আর তখন তা সত্যিসত্যিই চুরি হয়ে দাঁড়ায়। কোন-কোন জিনিস বিনা অনুমতিতে সে নিতে পারে এবং কোন-কোন জিনিস তাকে চেয়ে নিতে হবে এটা যদি আপনাদের সন্তান পরিষ্কার বুঝতে শেখে তাহলে সে কোনোদিন চুরি করবে না। যদি কোনো মিষ্টি কেক বা অন্য কোনো খাবারদাবার দুপুরের খাওয়া কিংবা কোনো উৎসবের ভোজের শেষে চাবিবন্ধ করে তুলে না-রেখে খাবারঘরের সাইডবোর্ডের ওপর এমনিই রাখা থাকে তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তা নিতে বাচ্চাকে কেউ বারণ করছে না। তবু কোনো বাচ্চা যদি কাউকে কিছু না-বলে তা লুকিয়ে নেয় তাহলে তাকে চুরিই বলতে হবে। আপনারা যদি বাড়িতে এই ধরনের নিয়মকানুনের একটা ছাঁদ গড়ে তুলতে

পারেন এবং ছেলেমেয়েরা যাতে আগে না-বলে কোনো কিছু না-নেয় তার একটা পাকা ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো হয়। এমন কি আগে থেকে অনুমতি না-নিয়ে জিনিসটা নেবার পর প্রতিবার যদি ছেলেমেয়েরা আপনাদের তা জানায় তাহলে সেটাও ভালো বলতে হবে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও চুরির অভ্যেস না-জন্মানোরই সম্ভাবনা বেশি।

অবশ্য আপনারা যদি বাচ্চাকে প্রায় কোনোরকম খাবারদাবারই হাতে তুলে না-দেন এবং এমন কি এক-টুকরো কেক পর্যন্ত চেয়ে বাচ্চা যদি বোঝে যে তার পক্ষে ওই কেকের টুকরোটা পাওয়া বা না-পাওয়া পুরোটাই ভাগ্যের ব্যাপার, তাহলে তার এই অনিশ্চিত অবস্থাটাও কখনও-কখনও তাকে চুরি করতে উৎসাহ যোগাতে পারে। বাচ্চাকে যদি আপনারা সবকিছু নিজের খুশিমতো নিতে বা করতে দেন, কিংবা তার উলটো, বাড়িতে কোনো কিছু নেয়ার অনুমতি যদি বাচ্চা না-পায়, যদি তার কোনো কিছুতে একেবারেই স্বাধীনতা না-থাকে এবং সামান্য কোনো কিছু করতে হলেই যদি তাকে পদে-পদে অনুমতি নিতে হয়, তাহলে এই উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু চুরির অভ্যেস জন্মানো অসম্ভব নয়।

উপরন্তু এ-বিষয়ে নজর রাখা খুবই দরকারি যে বাড়িটা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানোগোছানো থাকে, সবকিছু ঠিকমতো ঝাড়ামোছা হয় এবং যতসব বাড়তি, ভাঙাচোরা ও ছড়ানো-ছিটনো জঞ্জাল বাড়ি থেকে ঝাঁটিয়ে দূর করে দেয়া হয়। এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার, বস্তুত শুনে যতটা মনে হয় তার চেয়ে অনেকগুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ি যদি এমন একগাদা জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে থাকে যা লোকের হাঁটাচলার পথে

বাধার সৃষ্টি করে অথচ যা দূর করে ফেলে দিতেও মায়া হয় (হয় সেগুলোর তখনও পর্যন্ত কিছুটা ব্যবহারিক মূল্য আছে বলে কিংবা তারা কারও-না-কারও মনে পুরনো স্মৃতির উদ্রেক করে বলে), ফলে সেগুলো যদি ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে, পুরনো কাপড়চোপড় ও পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া কার্পেট যদি আলমারি বা বাক্সবন্দী হয়ে জমে থাকে তাদের হাত থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় আপনারা স্রেফ তা ভেবে উঠতে পারছেন না বলে, তাহলে এমন সমস্ত পরিবারের শিশুরা নির্ঘাত অপরিচ্ছন্ন অভ্যেস নিয়ে বড় হয়ে উঠবে এবং তাদের নিজেদের কিংবা অন্য লোকের জিনিসপত্র সম্পর্কে তাদের মনে কোনোদিন এতটুকু দায়িত্ববোধ জন্মাবে না। যদি আপনাদের বাড়িতে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই সাজানো থাকে, সত্যিসত্যিই যা কাজে লাগে এবং কোনো-না-কোনো দিক থেকে যা ব্যবহারযোগ্য ও উপকারী এমন সব জিনিস, সেগুলো যদি নেহাতই পুরনো, জীর্ণ নোংরা আবর্জনার স্তূপমাত্র না-হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের বাড়িতে চুরির অভ্যেসের সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম হবে। আপনাদের নিজেদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ — যা নাকি প্রকাশ পাবে বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে কেনা জিনিসপত্রের যত্নে ও তত্ত্বতদারকিতে কিংবা কারও কোনো কাজে আসবে না বুঝে বাজে জঞ্জাল বাড়ি থেকে দূর করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতি আপনাদের এই মমতা ও দায়িত্ববোধ একমাত্র তখনই সঞ্চারিত হবে আপনাদের সন্তানের মধ্যে আর তা প্রকাশ পাবে গৃহস্থালির জিনিসপত্র সম্পর্কে শিশুর মর্যাদাদানের মধ্যে দিয়ে। চুরির বিরুদ্ধে এটাই তখন প্রতিষেধকের কাজ করবে।

আগেই বলেছি, শিক্ষাদাতা হিসেবে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে যা আমি গণ্য করি তা হল রাশ আলগা দেয়া ও কড়া হওয়া, নরম ভাব ও কাজ আদায় করে নেয়ার মনোভাব এই উভয়প্রকার ক্ষেত্রেই এবং বৈষয়িক ধনসম্পদ ও ঘরগৃহস্থালি সম্পর্কে বাবা-মা'দের মনোভাবের বেলাতেও সেই এক পরিমিতি বা মাত্রাবোধ জাগিয়ে তোলা। এটি হল শিক্ষাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সর্বত্র এই নীতি অনুসরণের দাবি জানাই।

এ-প্রসঙ্গে ফের একবার আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে শিশুরা যখন একেবারে যথাযথভাবে এইমতো লালিত হবে, তখন এবং একমাত্র তখনই, মহৎ ধৈর্য প্রদর্শনের যোগ্য ভবিষ্যৎ স্ত্রী-পুরুষকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে, যারা নাকি কখনও অনুযোগ করবে না বা নাকে কাঁদবে না এবং যারা মহৎ কীর্তি অর্জনে সমর্থ হবে। কারণ একমাত্র এই জাতীয় চারিত্র্যগঠনের মধ্যে দিয়েই ইচ্ছাশক্তি শাণিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু সমস্যা আছে আর সে-ব্যাপারে আমরা অবশ্যই পরামর্শ চাই। এইসব সমস্যা নিয়ে আন্তন মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেতে সকলেই আমরা আগ্রহী।

আমার দুই ছেলে। তারা দু'জনে হুবহু একই পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে অথচ দেখা যাচ্ছে দু'জনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওদের একজনের টাকাকড়ির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ

দেখা যায় না, অথচ অপরজন টাকাপয়সা দেখলে তা না হাতিয়ে পারে না। চাবিতালা লাগিয়েও এ-ব্যাপারে কোনো সুবিধে হচ্ছে না। আমাদের পরিবার কঠোর পরিশ্রমী ও পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তবু জ্যামের বোতল দৈবক্রমে যদি বাইরে পড়ে থাকে তাহলে এই দ্বিতীয় ছেলেটা তা চেটেপুটে খেয়ে শেষ করবেই। যদি কেউ ভুলে বাইরে মনিব্যাগ ফেলে রাখে তাহলে তাতে এমন কি তিরিশ-চল্লিশ রুব্‌ল থাকলেও সব টাকাটাই ও হাতিয়ে নেবে-যে এতে কোনো ভুল নেই।

সত্যি বলতে কী, ছেলেটার মনটা কিন্তু ভালো। বাইরের লোকের কাছ থেকে ও কখনও কিছু নেয় না আর তাদের জন্যে নিজের যা আছে তা দরাজ হাতে খরচ করতেও কসুর করে না। ওকে নিয়ে-যে কী করি তা ভেবে পাই না। এবিষয়ে কোনো কথা তুললেই ওর বাবা চটে-মটে একশা হয়ে যায়। ছেলেটার বয়স ষোল বছর, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, দেখলে ওকে আঠারো বছরের ছেলে বলে ঠেকে। ওর বড় ভাই কম্‌সমোলের সদস্য, কিন্তু ছোটটির কম্‌সমোলের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ছেলেটার চেহারা দেখতেও ভারি সুন্দর। মেয়েদের ও খুব পছন্দ করে। স্কুলের পড়াশুনোও ও মোটেই করতে চায় না। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে এপর্যন্ত পড়াশুনোয় ওর যৎসামান্যই উন্নতি ঘটতে দেখা গেছে। প্রতি বছর ক্লাসের শেষ পরীক্ষায় ওর রিপোর্টে সেই একই মন্তব্য লেখা থাকে — 'মাঝারি'। খাটাখাটুনি পছন্দ করে না ছেলেটা, কোনো কাজ শুরু করে তা শেষ করার মতো ধৈর্য নেই ওর।

ওকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে ও পড়াশুনো করতে চায় কিনা, তাহলে ও বলবে হ্যাঁ, কিন্তু যদি বলেন যে

তাহলে ও মন দিয়ে পড়াশুনো করছে না কেন, ও কিন্তু তার কোনো জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে। আবার যদি কখনও আমরা বলি যে ওর চাকরিতে ঢোকা উচিত, পড়াশুনো না-করতে চাইলে এটাই একমাত্র পথ এবং যদি জিজ্ঞাসা করি যে জীবনে ও কী হতে চায়, তাহলে ও জবাব দেয়, জানি না।

ছেলেটা ফুটবল ভালোবাসে। রাত্রে ও প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে, রাত তিনটের আগে বড় একটা বাড়ি আসে না। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলে ও প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়।

অপরিচিত লোকের সামনে ও উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলে না কিংবা মুখ খারাপ করে না, কিন্তু বাড়িতে সর্বদা তা-ই করে। তার ওপর সেই চুরির অভ্যেস তো আছেই। ওকে নিয়ে কী-যে করি আমরা! ওর বাবা বলেন, না-না ও কিছু নেয় না, কিন্তু আমি তো ভালোই জানি যে ও পয়সাকড়ি নেয়। ওর বাবা ওর ওপর আস্থার ভাব দেখিয়ে কিছু-একটা সুফল পেতে চান, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওতে কিছুই লাভ হয় নি। এখন ও ইশকুলের সবচেয়ে উঁচুর আগের ক্লাসটায় উঠেছে।

উত্তর: আপনার মুখ থেকে বিবরণ শুনে আপনার পশ্নের উত্তর দেয়া অসম্ভব। ছেলেটির সঙ্গে মুখোমুখি যদি আমার দেখা হোত তাহলে তার সঙ্গে কথা বলে তবে আপনাকে কিছু হয়তো পরামর্শ দিতে পারতুম। কিন্তু আপনাদের পরিবারের পরিস্থিতি না-জেনে কিংবা আপনারা কথাবলার ভঙ্গি, গলার স্বর ও অন্যান্য নানা ব্যাপারে কোথায় কী ভুল করছেন তা না-বুঝে, আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রকৃতি ও আপনাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ছাঁদও না-

জেনেবুঝে আমি আপনাকে উপদেশ দেবার দায়িত্ব নিতে পারি না।

তবে সাধারণভাবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে অবস্থা মোটেই উৎসাহজনক ঠেকছে না। আমার লেখা 'বাবা-মা'র জন্যে বই'তে ছোট ছেলেমেয়েদের কীভাবে মানুষ করতে হবে ও তাদের শিক্ষা দিতে হবে তার ওপরই আমি জোর দিয়েছি, কীভাবে পুরনো শিক্ষা ভুলিয়ে নতুন করে শিক্ষা দিতে হবে তার ওপর নয়। না আমার ওই বইতে না আজকের আলোচনায় কোথাওই আমি পুনঃশিক্ষাদানের সমস্যার ওপর তেমন জোর দিই নি। কেননা, পরিবারের পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কোনো ছেলে বা মেয়েকে তার পুরনো শিক্ষা ভুলিয়ে পুনঃশিক্ষা দিতে হলে যে যৌথজীবনে সেই ছেলে বা মেয়েটি বাস করে সেখানকার আচার-আচরণের সাধারণ ঢঙটিই বদলানো একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। যে-কোনো উৎপাদনভিত্তিক কমিউনে আপনার ছেলে থাকলে তাকে চালনা করা খুব সহজ হোত, কেননা সে লিখতে-পড়তে জানে, স্বাভাবিক চরিত্রের এবং দেখতে-শুনতেও ভালো। অথচ তাকে নিয়েই বাড়িতে আপনারা সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, বুঝতে পারছেন না ঠিক কী করবেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনারা এক-ধরনের চরম আচরণ থেকে আরেক ধরনের চরম আচরণের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করছেন, কখনও এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছেন তো কখনও ওই পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। তবে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে যদি আপনারা আমায় আপনাদের বাড়িতে আসতে বলেন এবং আমি আপনাদের ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পাই, তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কোনো একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এরকম

বহু পরিবার আছেন যাঁরা শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্যে আমায় তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। এটাকে আমার কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে আমি মনে করি, কেননা একাজ আমার পর্যবেক্ষণের পরিধিবিস্তারে সাহায্য করে থাকে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আমাকে আপনাদের বাড়িতে ডাকতে লজ্জা পাবেন না। কেননা, আপনি যদি আমার মুখাপেক্ষী হন ও আমি যদি আপনাদের খানিকটা সাহায্য দিতে পারি তাহলে আপনিও যেমন আমাকে সাহায্য করবেন আমিও তেমনি আপনার সাহায্যে আসব।

প্রশ্ন: আমার একটি ছ'বছরের মেয়ে আছে। আমি চাই যে সে সৎ এবং সাহসী মেয়ে হয়ে গড়ে উঠুক, কিন্তু আমার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং তাকে কোনোরকম ভয়দেখানো থেকে আমি বিরত থাকা সত্ত্বেও মেয়ে আমার ভারি ভিতু হয়ে উঠছে। প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় সে আমায় জিজ্ঞাসা করবেই সেদিন রাত্রে সে কী-কী স্বপ্ন দেখবে। মনে হয়, স্বপ্ন দেখতে ও ভয় পায়। আর রাত্রে স্বপ্ন দেখা শুরু করলেই মেয়েটা জেগে ওঠে।

মেয়েটাকে সাহসী করে তুলতে কীভাবে চেষ্টা করা উচিত আমার? চেষ্টা তো আমি বিলক্ষণই করে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হচ্ছে না-যে।

উত্তর: আপনার অত দুশ্চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ওই বয়সের অনেক বাচ্চা মেয়েই অত্যন্ত সহজে প্রভাবিত হয় ও ভীষণ ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। ছ-সাত বছরের বাচ্চা মেয়ে সাধারণত একটু ভিতুই হয়, কিন্তু এগারো বছর বয়স হতে-না-হতে সেই মেয়েই এমন মন্দা মেয়ে হয়ে দাঁড়ায় যে তখন তাকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে।

এমনও হতে পারে যে আপনার এমন কিছু প্রতিবেশিনী আছেন যাঁরা মেয়েটিকে নানারকম ভয়ের গল্প শুনিয়ে থাকেন। আচ্ছা, বলুন তো, মেয়েটি ঠিক কোন জিনিসকে ভয় পায়?

আপনি ঠিক কোন ধরনের ভয় পাওয়ার বিরুদ্ধে তা আমি স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছি না। অনেকসময়ই দেখা যায় যে এটা আর কিছু নয় নিছক বাড়াবাড়িরকমের কল্পনাপ্রবণতার সমস্যামাত্র।

তা যদি হয় তাহলে যে-কোনো ডাক্তারই আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবেন। মেয়েটির আচরণ সম্বন্ধে আপনি যা বিবরণ দিলেন তা মোটেই যথেষ্ট নয়, কাজেই আপনার বাচ্চা মেয়েকে নিজের চোখে না-দেখে আমার পক্ষে পরামর্শ দেয়াটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে। ঠিক আছে, আমি একদিন আপনাদের বাড়িতে এসে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করব। ইতিমধ্যে আপনি একজন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়।

প্রশ্ন: আচ্ছা, বলুন তো, এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের কীভাবে চলা উচিত? বাড়িতে আমাদের বাচ্চা ছেলেটিকে আমরা শেখাই কী তার করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। সু-অভ্যাস আয়ত্ত করার জন্যে তাকে উৎসাহিত করি আমরা। তাকে বাড়ির বাইরে গিয়ে অন্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলতেও দিই, অর্থাৎ সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মিশতে তাকে বাধা দিই না। এ-সবই করে যাচ্ছি যদিও আমরা জানি যে ছেলেটা নানা ধরনের ছেলেপিলের সংস্পর্শে আসছে, হয়তো শিগ্‌গিরই মুখখারাপ করতে শুরু করবে ও এবং এও জানি যে-ছেলেদের সঙ্গে ও মিশছে তারা চুরিচামারি নিয়ে আলোচনা

করে থাকে। অথচ আমরা বাচ্চাটার বাইরে গিয়ে খেলাধুলো করা বন্ধ করে দিতেও পারি না। তা করতে হলে ওকে বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে রাখতে হয়, ওর ওপর সদাসর্বদা নজর রাখতে হয় এবং ওর সবকিছু আনন্দ মাটি করে দিতে হয়। এদিকে বাইরে ছেলেটাকে খেলতে দেয়াও বিপজ্জনক, কারণ আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির উঠোনে অন্যান্য বাড়ির ছেলেপিলের সঙ্গে খেলাধুলো করার ফলে নানা ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব।

উত্তর: বাচ্চাকে বাইরের ক্ষতিকর প্রভাবের কবল থেকে বাঁচিয়ে চলা সব সময়েই একটা কঠিন সমস্যা। কিছুকাল আগে এক সুপরিচিত ফরাসি রাজনীতিবিৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনে আসেন। অন্যান্য জায়গার মতো আমাদের কমিউনটিও তিনি ঘুরে দেখেন। কমিউন পরিদর্শন করে তাঁর খুবই ভালো লাগে এবং যখন কমিউনের ব্যান্ডপার্টি বীটোফেন-সঙ্গীত বাজায় তখন তিনি আর চোখের জল রাখতে পারেন না। রাস্তা থেকে কুড়নো ছেলেরা-যে তাঁকে বীটোফেন বাজিয়ে শোনাতে পারে এটা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। এর ফলে কমিউনটির কাজকর্ম আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি।

সব দেখেশুনে তিনি বললেন, 'সবকিছুই এখানে চমৎকার, তবে একটা ব্যাপার আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। পুরনো চোর ও বাচ্চা ভবঘুরেদের পাশাপাশি স্বাভাবিক, সৎ ছেলেপিলেদের এখানে আপনারা মানুষ করছেন ও বেড়ে উঠতে দিচ্ছেন কী করে?'

এর জবাবে আমি সেদিন সংক্ষেপে বলেছিলুম: 'কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে কি খারাপ লোকের পাশাপাশি ভালো লোক বাস করে না?'

আসলে আদর্শ মানুষের সমাজে বসবাসের উপযোগী করে ছেলেপিলেদের আমাদের মানুষ করা উচিত নয়। ছেলেপিলেদের যদি আপনারা এভাবে মানুষ করেন তাহলে মা-বাবার আশ্রয় ছেড়ে বিপুল বিশ্বজগতে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু জীবনটা তাদের কাছে কটুস্বাদে ভরে যাবে। আপনাদের সন্তানদের সকল ধরনের ও সকল জাতের মানুষের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা দরকার। এইসব লোকজনের সঙ্গে তাদের বনিবনা করে চলা শিখতে হবে, এদের বিরুদ্ধে দরকারমতো রুখে দাঁড়ানোও জানতে হবে। আসলে যত বেশি নানা পথ ও মতের মানুষে পরিবৃত হয়ে থাকবে আপনাদের ছেলেপিলেরা ততই মঙ্গল। ছেলে বা মেয়েকে অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাড়ির মধ্যে আটকে থাকতে বাধ্য করার চেয়ে ক্ষতিকর কাজ বাবা-মা'দের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। এ জিনিস হতে দিলে সেই ছেলে বা মেয়ে 'ডিমে তা দেয়ার নিরাপদ পারিবারিক যন্ত্র'এ থাকতে এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়বে যে পরে যে-কেউ তাকে ঠকাতে কিংবা জব্দ করতে সমর্থ হবে। কাজেই তাকে শেখাতে হবে কী করে নিজে থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হয়, আর এটা শিক্ষা দেয়ার আদর্শ উপায় হল আপনাদের পারিবারিক জীবনেরই, সুরটিকে উঁচু তারে ও নীতিগত উঁচু মানে বেঁধে নেয়া। এই সুর ও জীবনের মানটি যদি উঁচু হয়, ছেলে বা মেয়ের ওপর মা হিসেবে যদি আপনার সত্যিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যদি আপনার ছেলে বা মেয়ে বিশ্বাস করে যে তার মা হিসেবে সবচেয়ে চমৎকার, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণা, সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবচেয়ে হাসিখুশি মেজাজের আবার সেইসঙ্গে সবচেয়ে রাশভারি, তাহলে তার মাথায় আপনার

ধ্যানধারণাকে ঢোকাতে হাতুড়ি পেটাপিটি করতে হবে না, কেননা বুঝতে হবে সে আপনাকে মহিয়সী মানবীর পাদপীঠে বসিয়ে রেখেছে এবং তার ওপর আপনার কর্তৃত্ব চরমে পৌঁছেছে। কিন্তু এর বিপরীতে যদি আপনি তাকে অনুরোধ-উপরোধ ও স্তোকবাক্যে ভোলানোর চেষ্টায় মাতেন তাহলে ছেলে বা মেয়ে ভাবতে শুরু করবে যে তার ওপর আপনার কর্তৃত্ব হয়তো অতটা অলঙ্ঘ্য নয়। বুঝিয়েসুঝিয়ে কর্তৃত্ব কায়েমের চেষ্টার ফল হয় এই-ই। বরং খুব সহজভাবে বলুন যে তার জানা উচিত কী তাকে করতে হবে আর কী না-হবে। তবু যদি সে নিজের মতে চলতে থাকে তাহলে তার কাছে কৈফিয়ত দাবি করুন। যখন আপনি ছেলে বা মেয়েকে বলবেন যে তার অমুক বা তমুক কাজটা করা উচিত নয়, তখন কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না-রেখে দৃঢ়ভাবে সেইমর্মে নির্দেশ জারি করুন, আর সেটাই তখন আপনার ছেলের আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষমতা বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হয়ে দেখা দেবে।

যে-ছেলেটির সঙ্গে আপনার ছেলে খেলাধুলো করে যদি সেই ছেলেটি অবাঞ্ছিত চরিত্রের হয় তাহলে আপনার ছেলেকে তার সঙ্গে খেলা করতে নিষেধ না-করে আপনি বরং ওই অপর ছেলেটিকে ভালো করে জানবার চেষ্টা করুন যাতে আপনি আবিষ্কার করতে পারেন যে তার ত্রুটিগুলো ঠিক কী-কী এবং কোন-কোন ধরনে সেগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে। ছেলেটির ওপর কোনোরকম চাপ দেবার বা প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করবেন না, বরং আপনার শান্ত আত্ম-প্রত্যয় দিয়ে তার মনে রেখাপাত করুন, যাতে আপনার নিজের ছেলেও বুঝতে পারে যে সেও-যে অপর ছেলেটির মতো বখে যেতে পারে এমন ভয়ে আপনি অকারণে পীড়িত

নন। এক্ষেত্রে এমন আচরণ কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ও মানসিক অনুভূতির দিক থেকে দুটি ছেলেকেই আপনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার কাজটুকুই করবে না, এটা আপনার পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতারও প্রকাশ এবং আপনার নিজের ছেলেকে ও দরকারমতো অন্যান্য ছেলেপিলেকেও সাহায্য করার একটা সুযোগ এ এনে দেবে। এটা যদি করতে পারেন তাহলে আপনার ছেলেও সাহসের সঙ্গে আপনার সবল চারিত্র্যের উদাহরণ অনুসরণ করবে এবং আপনাকে আর তার ওপর নৈতিবাচক প্রভাব পড়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না। কারণ সে এরপর বিন্দুমাত্র অসুবিধে বোধ না-করে সকল কু-প্রভাব অতিক্রম করে চলতে সমর্থ হবে।

প্রশ্ন: আমার এগারো বছরের ছেলেটির বাবা-মা'র সঙ্গে আচরণ একেবারে আদর্শস্থানীয়। সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখনও সে তার মাকে রাত্রে বিরক্ত করতে চায় না। বলে, 'থাক, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি নিজেই যা করার করে নেব'খন।'

ছেলেটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। স্কুলে ওর ক্লাসের শিক্ষিকা মাঝে-মাঝে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেপিলেকে ওর পাশে বসান। এতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন আমার ছেলের মধ্যে কিছুটা অপ্রীতিকর ভাবভঙ্গি প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে। সে এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে, যেমন, 'জানো, আমার সর্বশেষ 'রক্ষণাধীন' ছেলেটা আজ ক্লাসে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। ওকে এবার খুব সম্ভব সরিয়ে নেয়া হবে আর তারপর সম্ভবত পেত্রভ কিংবা ইভানভকে আমার পাশে বসানো হবে। তাদেরও একটু দেখা দরকার, বুঝলে না।'

আমি এখন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, ক্লাসের এই

ধরনের বন্দোবস্তটা ছেলেটার পক্ষে ভালো হচ্ছে কিনা, কিংবা কীভাবে ওকে বুঝিয়ে বলা যাবে যে এখনও ও শিক্ষকের পর্যায়ে ওঠে নি, ছাত্রই আছে।

এছাড়া আরও একটা ঘটনার কথা বলি। এককালে আমার ঘনঘন যাতায়াত ছিল এমন একটি পরিবারে একটি বাচ্চা বেশ ভালোই মানুষ হয়ে উঠছিল। বাচ্চাটিকে তার আঠারো মাস বয়স থেকেই জানতাম। ছেলেটির মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। ওর বাবা ছিলেন অভিনেতা, মা সংসারের কাজকর্ম দেখতেন। ছেলেটির বারো বছর বয়সের সময় ওর বাবা মারা যান। তারপরও কিছুদিন ও আগের মতোই ভদ্র, সভ্যভব্য হয়ে ছিল। ছেলেটির ছোট বোনও অল্পবয়সে ভারি মিষ্টি ছিল আর তার দাদা সে-সময়ে সর্বদা তাকে সামলে নিয়ে বেড়াত। কিন্তু এখন ছেলেটি কি বোন কি মা কারও প্রতি কোনোরকম বিবেচনা দেখাতে প্রস্তুত নয়। এটা কী করে হল যে বাপ মারা যাওয়ার পর বছর ষোল বয়স হতে-না-হতে অমন সুন্দর ছেলেটি হঠাৎ একদিন বিগড়ে গেল আর স্থূল, উদ্ধত প্রকৃতির হয়ে দাঁড়াল? কেননা বাপ না-থাকলেও মা তো তাঁর ছেলেমেয়েদের গভীরভাবে ভালোবাসেন। তাঁর যা-কিছু ছিল সবই তিনি দিয়েছেন তাদের। প্রায়ই এমন হয়েছে যে তিনি নিজে না-খেয়ে রয়েছেন কিন্তু ছেলের পেটভরা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

উত্তর: মা যদি সর্বস্ব ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দেন এবং মুখের খাবার পর্যন্ত দিয়ে দেন ছেলেকে তাহলে বলব, তিনি ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় করেছেন। বরং ছেলেরই উচিত মাকে তার নিজের খাবারটা দিয়ে দেয়া, মায়ের জন্যে ত্যাগস্বীকার করা উচিত ছেলেরই। আপনি যে-পরিবারটির কথা বললেন

সেখানে মায়েরই রণমূর্তি ধরা উচিত। তবে এই লড়াইটা-যে বেশ কঠিন হবে তা বলাই বাহুল্য।

আমি সর্বদাই বলে থাকি যে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উচিত ট্রামে বয়স্কদের বসার জায়গা ছেড়ে দেয়া। এটাই হল সঠিক আচরণ, তবু এ নিয়েও প্রায়ই বাপ-মা'দের সঙ্গে আমাকে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক করতে হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে পরিবারে যা-কিছু সেরা জিনিস তা সর্বপ্রথম বাবা-মায়েরই পাওয়া উচিত। যদি পরিবারের কেউ কয়েক গজ সিল্ককাপড় পায়, তাহলে তা মায়ের পোশাক তৈরির কাজেই লাগা উচিত। যদি পরিবারের খরচখরচা বাদে শ'খানেক রুব্‌ল বেঁচে যায় এবং যদি সে-বাবদে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে পরিবারের বাবা-মা না ছেলেপিলেরা ভোল্‌গা-মস্ক্‌ভা খালবরাবর স্টিমারভ্রমণ উপভোগে বেরুবেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যদি সবাই ঠিক করে যে প্রথমে বাবা-মা ও পরে সম্ভব হলে ছেলেপিলেরা ওই স্টিমারভ্রমণে যাবেন। এর অর্থ কিন্তু মোটেই এ নয় যে বাবা-মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভালোমন্দের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন না। আপনারা নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের ভালোরকম যত্ন নিতে পারেন, তবে তা অবশ্যই এমনভাবে নিতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে যে বাবা-মায়ের সম্পর্কে বিবেচনাটা সর্বাগ্রে স্থান পায়।

প্রায়ই ছেলেপিলের এ-ধরনের যুক্তিতর্কের কথা কানে এসেছে আমার। যথা, কম্‌সমোলের এক কিশোরী সদস্য এবং একেবারে পয়লা নম্বরের ছাত্রী একটি মেয়ে মা না মেয়ে কার জন্যে একপ্রস্থ নতুন পোশাক তৈরি করা হবে তা নিয়ে দু'জনে আলোচনার সময়ে মাকে বলছে: 'পোশাক দিয়ে

তোমার কী হবে? তোমার তো আটত্রিশ বছর বয়স হল, জীবন তো প্রায় খতম হবার মুখে। বরং আমার এখন বয়স অল্প, সারাটা জীবন আমার সামনে পড়ে আছে!’

আর আপনার ছেলে, সেই ‘মাস্টার-ছাত্র’ সম্বন্ধে আমি কী বলতে পারি বলুন? স্কুল এবং স্বয়ং শিক্ষিকাই এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন যখন? কাজটা তাঁরা কী করছেন তা তো তাঁদেরই উপলব্ধি করার কথা।

কমিউনে থাকতে আমি নিজেই ছেলেপিলেদের বলতুম যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের ওপর নজর রাখতে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এ-ধরনের কৌশল একটু অন্যভাবে প্রবর্তন করা উচিত, সাধারণ ছকটাই এর একটু অন্যরকম হওয়া দরকার। যেমন, আমি কখনও সকলের সামনে বলতুম না যে অমুক-অমুক ছাত্রছাত্রী ভালো এবং অমুক-অমুক খারাপ। বরং বলতুম: ‘তোমরা এই-এই কাজ কর নি, কাজেই আমি তোমাদের ওপর বাড়তি কিছু কাজ চাপাচ্ছি। তা হল এই যে এই পিছিয়ে-পড়া ছেলেটিকে তোমাদের সাহায্য করতে হবে। মনে রেখ, ছেলেটির ভালোরকম উন্নতি দেখাতে হবে কিন্তু, তা না হলে তার জন্যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।’

অতএব যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং আপনার ছেলেকে যদি বলা হয় তার ক্লাসের বন্ধুকে সাহায্য করতে, তাহলে সে নিজেকে আর শিক্ষক বলে মনে করবে না বরং তার ওপর ন্যস্ত একটা কাজের দায়িত্ব সরলভাবে পালন করবে মাত্র।

এক্ষেত্রে আপনার পক্ষে যা দুর্ভাগ্যজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে, ক্লাসের আরও কিছু-কিছু ছেলের ওপর এই এক-ধরনের কাজের ভার না-দিয়ে শুধুমাত্র আপনার ছেলেকে

বেছে নেয়া হয়েছে। যদি ক্লাসের কয়েকজন ছেলে মিলে একসঙ্গে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের সাহায্য করার ভার পেত, তাহলে কেউই এ নিয়ে অহঙ্কার করার মতো কিছু পেত না এবং নিজেকে শিক্ষক মনে করত না। এই সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা যে-ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন তার ওপর। এসব ক্ষেত্রে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নিখুঁত নিয়ম বলে কিছু নেই। যদি আপনার ছেলে একারণে অহঙ্কারী হয়ে উঠতে থাকে, তাহলে তা খুবই ক্ষতিকর ব্যাপার হবে। তাকে তাহলে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এ-ব্যাপারে তার শিক্ষিকা কিছুটা ভুল করেছেন, কেননা কাজটা ঠিকভাবে করার জন্যে তার নিজেকেই নিজে খানিকটা গড়েপিটে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

শিক্ষাদান: বাড়িতে ও স্কুলে*

বাড়িতে ও স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যাপারটা এমনই একটা ব্যাপক আলোচনাযোগ্য বিষয় যে শুধুমাত্র এক সন্ধে ধরে আলোচনার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময় এর জন্যে ব্যয় করা চলতে পারে। এমন কি তাতেও এ-আলোচনার ইতি টানা অসম্ভব। একটা সন্ধেয় আমরা যতটুকু যা করতে পারি তা হচ্ছে এ-বিষয়ের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর অল্প কিছু-কিছু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া। শিক্ষাদানের সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে এটি সম্ভবত একটি যে-ক্ষেত্রটিতে আমি বিশেষজ্ঞের জ্ঞান দাবি করতে পারি না। কেন একথা বলছি? আমার জীবনের পশ্চাৎপটের বিবরণ দিয়ে কথাটা আমায় ব্যাখ্যা করতে দিন।

আমি একজন শিক্ষক। সতেরো বছর বয়স থেকেই

---

* এই বক্তৃতাটি মাকারেঙ্কো দেন ১৯৩৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মস্কোর ফ্রুঞ্জে মহল্লার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাবে।

শিক্ষকতা আমার পেশা। শিক্ষকজীবনের প্রথম ষোল বছর আমি রেলওয়ে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের একটা স্কুলে পড়িয়েছি। আমি নিজে শ্রমিকের সন্তান। আমার বাবা যে-ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন সেখানেই আমি শিক্ষকতা করতুম। ওখানেই ষোল বছর আমি পড়িয়ে এসেছি। এ-সবই ঘটেছে বিপ্লবের আগে, পুরনো ধরনের সেই স্কুলটিতে।

একটিমাত্র শ্রমিক-বসতির শ্রমিকদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখানো হোত ওই ফ্যাক্টরি-স্কুলটিতে। আর সেখানে প্রথম দিকে আমি ছিলুম সাধারণ শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক। আমি নিজেও ছিলুম শ্রমিকদের ওই যৌথ সংস্থার একজন সদস্য, ওখানকারই একটি শ্রমিক-পরিবারের ছেলে। আমার ছাত্রছাত্রীরা এবং আমার বাবা-মা সকলেই ছিলেন একই ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছোট্ট একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-সমাজের অংশ।

আগে যা বললুম এই সবকিছুর সরল অর্থ এই যে আমার সামনে বহুব্যাপক, অবাধ সুযোগসুবিধের দরজা ছিল উন্মুক্ত। আমি বরং বলব মস্কোয় এ-ব্যাপারে আপনাদের সুযোগসুবিধে অনেক কম, কেননা আপনাদের স্কুলগুলো যে-সব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় তাদের মধ্যে সাধারণ ঐক্যসূত্র হল মাত্র শহরের যে-মহল্লাগুলিতে তারা বাস করে সেই বসতগুলিই।

ওইসব ছেলেমেয়ের বাবা-মায়েরা কিন্তু স্কুলপিছু একেকটি শ্রমযৌথের অন্তর্ভুক্ত নন। ছাত্রছাত্রীদের পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার সম্ভাবনা সেকালে আমার যতটা ছিল একালে আপনাদের ততটা নয় বলেই মনে হয়। তবু বলব একটা দারুণ সুযোগের ফল আপনারা ভোগ করছেন, আর তা হল সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত থাকা। আমি কিন্তু শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি এই নবযুগের উদয় ঘটবার আগে, সেকালের পুরনো স্বৈরশাসিত রুশদেশে।

১৯১৭ সালের পর নিয়তি আমাকে ছাত্রছাত্রীদের পরিবারবর্গের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আর তারপর ষোল বছর ধরে যে-সব ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি কাজ করেছি তারাও ছিল পিতৃমাতৃহীন অনাথ ও পরিবারবিচ্ছিন্ন। এইসব ছেলেপিলের কারো বাবা কিংবা মায়ের সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের পরিবারবর্গের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পেরেছি, তবে সোভিয়েত রাশিয়ায় আমায় প্রধানত কাজ করতে হয়েছে এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেখানে আমার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েরা ওই সব প্রতিষ্ঠানেই বসবাস করত এবং তারা 'নীতিগতভাবেই' পরিবারের ধারণাটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করত না।

এখানে আমি একটা বিশেষ আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটা ভারি কৌতূহলোদ্দীপক একটা পরিবেশে ঘটেছিল।

খার্‌কভের দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনটি নিয়ে একখানি চলচ্চিত্র তোলার উদ্দেশ্যে কোনো একটি ফিল্‌ম-ইউনিটের তরফ থেকে একজন ক্যামেরাম্যান একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। লোকটি ছিলেন ভারি চটপটে ছোটখাট চেহারার এক বৃদ্ধ। ইনি ছিলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা সর্বদাই বোঝেন ঠিক কোথায় কোন জিনিসটি খুঁজে পেতে হয়, সব সময়েই সব জিনিস যাঁরা নজর করে দেখেন, যাঁরা ভারি প্রাণচঞ্চল এবং অত্যন্ত দ্রুত লক্ষ্যবেধে পটু।

লোকটি কমিউন পরিদর্শন করে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মনে হল যা দেখছেন তাই-ই ভালো লেগে যাচ্ছে তাঁর। তারপর কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমি যখন তাঁর সঙ্গে আমার অফিসঘরে বসে আলোচনা করছি, তখন হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে জনেক ব্যক্তি হুড়মুড় করে ওই ঘরে ঢুকে পড়লেন। লোকটির ধরনধারণ দেখে মোটামুটি শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছিল আর এ-ও বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি সদ্য ট্রেন থেকে নেমে এসেছেন। পথপরিক্রমার ফলে আগাপাছতলা ধুলোমাখা অবস্থায় ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন: 'আমি মেলিতোপল থেকে আসছি। খবর পেয়েছি যে আমার ছেলে ভাসিয়া স্তলিয়ারভ এখানে আছে।'

'হ্যাঁ, ওই নামে আমাদের একটি ছেলে আছে বটে।'

'আমি হলাম গিয়ে তার বাবা। ছেলেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। গত ছ'মাস ধরে ওকে খুঁজছি আমি। অবশেষে জানতে পেরেছি যে ও এখানে আপনার কাছে আছে। তাই ওকে নিতে এসেছি।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি উত্তেজিত হয়ে আছেন। কথা বলতে গিয়ে ওঁর গলা কাঁপছিল।

'ভাসিয়াকে দয়া করে একটু ডেকে দেবেন?'

ভাসিয়া এল। চোদ্দ বছরের ছেলে ভাসিয়া তার আগে ছ'মাস ধরে কমিউনের বাসিন্দা হয়ে ছিল। কমিউনের ইউনিফর্ম-পরা অবস্থায় ও এসে দাঁড়াল। সুন্দর ধরনধারণ, চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে, এসে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা সামনের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। দেখেছ, তোমার বাবা এসেছেন।'

'আমার বাবা?'

এরপর সব আদবকায়দা জলাঞ্জলি দিয়ে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল যে বাপ-ছেলে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

প্রথম দর্শনের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-সম্ভাষণ শেষ হলে পর ছেলেটি তার পোশাকের ভাঁজ ঠিক করতে লাগল। বাপ জানতে চাইলেন ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তিনি পাবেন কিনা।

'স্বচ্ছন্দে। তবে ও বাড়ি ফিরে যাবে কিনা সেটা আপনার ছেলেই ঠিক করবে। ও যা ঠিক করবে তা-ই হবে। ও যদি আপনার সঙ্গে যেতে চায় তো যাক, কোনো আপত্তি নেই।'

আর যে-ছেলে ঠিক এর আগের মুহূর্তে অঝোরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছিল সে হঠাৎ লাল হয়ে উঠে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললে: 'না। আমি যাচ্ছি না।'

'সে কী! তোমার বাবা তোমায় নিতে এসেছেন-যে!'

'তাহলেও আমি যাচ্ছি না।'

বাপ এবার ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে বললেন: 'তার মানে? যাচ্ছিস না মানে কী?'

'মানে, যাচ্ছি না।'

'কেন?'

'আমি যাচ্ছি না, এই হল গিয়ে মোট কথা!'

'কিন্তু তুমি যেতে চাইছ না কেন বল তো? তোমার বাবা নিজে তোমায় নিতে এসেছেন, নয় কি?'

'আমি যেতে চাই না। এ-জায়গা ছেড়ে আমি যাব না।'

ওর বাপ এবার রেগে উঠলেন। বললেন: 'তুই চাস আর না-চাস আমি তোকে নিয়ে যাবই।'

একথা শ্নে কমিউনের দলপতিরা এবার বাধা দিয়ে বলল: 'আপনি ইচ্ছা করলেই এখান থেকে কাউরে নিয়ে যেতে পারেন না। ও হল গিয়ে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের সদস্য। আপনি যে-ই হোন-না কেন, বড় জোর আপনি ওর মত নিতে পারেন। ও নিজে থেকে যদি যেতে চায় তাইলে যেতে পারে, আর যদি না-চায় তাইলে যাবে না।'

ভাসিয়ার বাবা এবার একখানা আরামকেদারায় এলিয়ে পড়লেন। ফের কান্নাকাটি চেঁচামেচির পালা চলল, আর সবাই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সবাই মিলে ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। একগ্লাস জলও ওঁকে খেতে দেয়া হল। কিছ্টা ঠান্ডা হবার পর তিনি বললেন: 'ভাসিয়াকে একবার ডাকুন।'

বললুম, 'না। ওকে ফের এখন ডাকব না।'

তবে উনি ছেলেকে ডাকতে চাইছিলেন বিদায় নেবার জন্যে। তাই শেষপর্যন্ত আমি রাজি হলুম। একজন সংবাদবাহককে পাঠালুম ভাসিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে সে তার বাবাকে 'বিদায়' জানাতে চায় কিনা। ফলে ভাসিয়া ফের এল আর ফের একবার সে আর তার বাবা পরস্পরের গলা ধরে কান্নাকাটি করতে, চুমো খেতে আর আলিঙ্গন করতে শ্রু করল। এ-সবের পালা চুকলে ভাসিয়া শ্ধোল:

'এবার আমি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, যাও। সরে পড়।'

ছেলেটা ঘর ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু আমি আরও ঘণ্টা-দুই তার বাপের সঙ্গে কাটালুম। আর ভদ্রলোক সেই আরামকেদারাখানায় বসে অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে আর ফ্ঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। একবার শান্ত হন তো ফের

একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন — এইভাবে চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে ভাসিয়াকে না-নিয়েই ফেরে যেতে হল তাঁকে।

এই গোটা গল্পের মধ্যে সবচেয়ে 'নাটকীয়' ঘটনাটা হল এই যে সেই ক্যামেরাম্যান ভদ্রলোক গোটা ব্যাপারটা দেখে হকচকিয়ে গেলেও বাপ আর ছেলে যতক্ষণ কান্নাকাটি আর পরস্পর চুম্বন-আলিঙ্গনে ব্যস্ত রইল ততক্ষণ সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে থেকে পুরো ব্যাপারটাই ক্যামেরায় তুলে নিলেন আর নিজের এই কারদানিতে নিজেই ভারি খুশি হয়ে উঠলেন।

বললেন: 'আমাদের, ক্যামেরাম্যানদের, বরাতে জীবনে এক-আধবারই মাত্র এমন সুযোগ ঘটে!'

পরিবার ও পরিবারের মধ্যে সন্তানলালনের বিচারে ওপরের এই সবকিছুর তাৎপর্যটুকুর দিকে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

...ভালো-মন্দ নানারকমেরই পরিবার আছে, কিন্তু কোনো পরিবার-যে ঠিকঠিকভাবে শিশুসন্তানকে লালন করে তুলবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একথা আমরা মোটেই বলতে পারি না যে কোনো পরিবার ঠিক যেমনটি চায় সেইভাবে পরিবারস্থ শিশুদের মানুষ করে তুলতে পারবেই। পরিবারের মধ্যে শিশুলালনের ব্যাপারটিকে সংগঠিত করা দরকার এবং এই সংগঠনের উৎপত্তিস্থল হওয়া উচিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেকটি স্কুলের। বাড়িতে-বাড়িতে শিশুলালনের ব্যাপারে স্কুলগুলির পরিচালকের ভূমিকা পালন করা কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সংগঠন গড়া কিংবা এই তদারকির কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে কী করে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। বাপ-মা'দের কেবলমাত্র সভাসমিতিতে

একত্র করে অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্যে তাঁদের সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে বলাটাই যথাযথ অর্থে পরিচালনা করা কিংবা সংগঠন গড়া বোঝায় না।

এই কাজে বাবা-মা'দের পক্ষে কোন জিনিসটা সহায়ক হতে পারে এবং কীভাবে তাঁদের সাহায্য করা যেতে পারে? খারাপ অভিভাবক, অর্থাৎ যে-অভিভাবক তাঁর সন্তানদের যথাযথভাবে লালন করতে অসমর্থ, তাঁকে অবশ্য সর্বদাই ইতিকর্তব্য শেখানো যেতে পারে, যেমন সাহায্য করা চলে খারাপ শিক্ষককে তাঁর কাজ আরও ভালোভাবে করার ব্যাপারে।

প্রসঙ্গত বলি, যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকা তেমনই এমন বহু বাবা-মা আছেন যাঁরা বাচ্চাদের সঙ্গে এমন কি ঠিকভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ যদি আপনা থেকে না-আসে, তাহলে তার চর্চা করা খুবই প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুল ও কলেজগুলিতে এই ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারটা উপেক্ষিত হয়ে আসছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করার প্রতিটি কলেজে ও স্কুলে ভবিষ্যৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয়ার জন্যে যাতে একজন করে বিশেষ ধরনের বক্তৃতাকৌশল-বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হয় আমার সাধ্যে থাকলে সেটা আমি দেখবই। এটা-যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।

প্রথম যখন শিক্ষকতার কাজ শুরু করি তখন আমাকেও এ-ব্যাপারে অনেক-কিছু শিখতে হয়েছিল। কোথায়-যে আমার ভুল হচ্ছে তা ধরতে না-পেরে আমি তখন পরামর্শের জন্যে এক অভিজ্ঞ অভিনেতার শরণাপন্ন হই।

সব শুনে তিনি আমায় বললেন, 'আপনার কণ্ঠস্বর-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা দরকার।'

'কী বলতে চান? কণ্ঠস্বর-নিয়ন্ত্রণ মানে? আমি তো আর গান গাইতে যাচ্ছি না, তাই-না?'

'না, আপনি গান গাইবেন না বটে, তবে আপনাকে এমনভাবে কথা বলা শিখতে হবে যাতে তা কার্যকর হয়।'

এঁর কাছে আমি কিছুদিন শিক্ষানবিশী করি আর তখন আমি বুঝতে পারি প্রশিক্ষণ-পাওয়া কণ্ঠস্বরের তাৎপর্য কতখানি। কথাবলার সময় একজনের গলায় ঠিক কেমন সুরটি ফুটছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তুমি এখন যেতে পার' এই সরল বাক্যটি মোটেই তেমন সরল নয়, বিশেষ করে বাক্যটি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে যখন আপনি টের পান যে সেটি প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা যেতে পারে। যদি আপনি চান তাহলে ওই সহজ সরল বাক্যটিতেও যারপরনাই বিষ ঢেলে দেয়া খুবই সম্ভব।

এটা একটা খুবই জটিল সমস্যা। যদি আপনার কণ্ঠস্বর উপযুক্তরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না-হয় তাহলে আপনি অবশ্যই নানারকম অসুবিধের সম্মুখীন হবেন। বাচ্চাদের নিয়ে যাঁদের কাজ করতে হয় তাঁরা কণ্ঠস্বরের প্রশিক্ষণ থেকে নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। কিছু-কিছু বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের তাৎক্ষণিক মেজাজ থেকে গলার স্বরকে পৃথক করে না-ফেলার 'বিলাসিতা'টুকু উপভোগ করে থাকেন। এটা কিন্তু একেবারে ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি। আপনার মনমেজাজ যেমনই হোক-না কেন, গলার স্বর আপনার অপরিবর্তিত, দৃঢ় ও পরিষ্কার থাকা দরকার।

মেজাজ আপনার কণ্ঠস্বরের যেন কোনো পরিবর্তন না-ঘটায়। যেমন, ধরুন, আপনারা কিছুতেই বলতে পারবেন

না এই মুহূর্তে আমার মেজাজ ঠিক কেমন অবস্থায় আছে। কে জানে, হয়তো মনে-মনে আমি গভীর কষ্ট অনুভব করছি, কিংবা হয়তো এখনই আমি দারুণ একটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ব্যাপারস্যাপার যেমনই ঘটুক-না কেন, কথা বলার সময় আমার এমনভাবে তা বলা উচিত যাতে আমি যা বলছি প্রত্যেকেই তা কান পেতে শোনেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার আগে প্রতিটি বাবা-মা এবং প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার উচিত হবে নিজেকে নিজের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা, যাতে তাঁর মেজাজটা আচরণের উপরিতলের নিচে চাপা থাকে। আসলে যতটা মনে হয় কাজটা করতে পারা কিন্তু ততটা কঠিন নয়।

তিন-তিনটে বছর আমায় জঙ্গলের মধ্যে, তদুপরি চোর-ডাকাত-বদমায়েসে থিকথিক করছে এমন সব জঙ্গল-এলাকায়, বাস করতে হওয়ায় মেজাজ নিয়ে আয়েস করার সময় আমার ছিল কোথায়? মেজাজের খেয়াল আমাকে পেয়ে বসুক তাকে সে ক্ষমতা দেয়ার অধিকারই-বা আমার কী ছিল? ফলে মনমেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তখনই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠি এবং ক্রমশ এটা উপলব্ধি করি যে ব্যাপারটা আসলে খুবই সোজা। কেবল এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয় যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিজের মুখ, চোখ, গলার স্বর যাকে বলে স্বশাসিত তাই যাতে থাকে তা দেখা। শিক্ষক বা শিক্ষিকার মুখে সর্বদা খুশির ভাবটি প্রকটিত থাকা দরকার এবং এটা আশা করা যেতে পারে যে বাবা-মায়েরাও এই বিশেষ মুখভাবটি ফুটিয়ে রাখতে পারবেন।

ধরা যাক, আপনাদের মধ্যে কেউ এইমাত্র একখানা অপ্রীতিকর চিঠি পেয়েছেন। চিঠিখানা হয়তো আপনার

প্রিয়জন কেউ লিখেছে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর চিঠিখানা কি আপনার গোটা মাসের শিক্ষাদানের কাজের ফলাফলটুকু নষ্ট করে দেবে? কোনো প্রিয়জনই (বিশেষ করে সেই লোক তো বটেই যে হয়তো আপনার যথার্থ প্রীতিলাভের যোগ্যই নয়) এর যোগ্য নয়, তাছাড়া আপনার পক্ষে অমন একখানা অপ্রীতিকর চিঠি পাওয়ার ফল হয়তো ভালোই হবে, কেননা তা আপনার মোহভঙ্গে সাহায্য করবে।

কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ, মুখচোখের চেহারা, যেভাবে আমরা দাঁড়িয়ে উঠি বা বসি — এই সবকিছুই শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম দৃষ্টিতে যা তুচ্ছ, ছোটখাট কায়দাকৌশলের ব্যাপার বলে মনে হয় সে-সবই কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরাও এই ক্ষমতাগুলো আয়ত্ত করলে ভালো করবেন।

সম্প্রতি একটি ছেলের বাপ আমার কাছে এসে বললেন: 'আমি একজন কমিউনিস্ট ও কারখানার শ্রমিক। আমার একটি ছেলে আছে, কিন্তু সে বড় অবাধ্য। আমি তারে কোনো এট্টা কাজ করতি বলেছিলাম, কিন্তু সে আমার কথায় কান দিল না। ফের দ্বিতীয়বার তারে কাজটা করার কথা বললাম, কিন্তু সে কোনো পাত্তাই দিল না। তৃতীয়বার ফের তারে বললাম, তবু কোনো ফল হল্য না। এখন ওরে নিয়ি কী করি বলেন দেখি?'

ছেলের বাপকে বসতে বলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলুম।

বললুম: 'আচ্ছা, আমাকে দেখান দেখি ছেলের সঙ্গে আপনি কীভাবে কথা বলেছেন।'

'এইভাবে...'

‘আচ্ছা, ওই কথাগুলোই আপনি এভাবে বলার চেষ্টা করুন দেখি।’

‘ওভাবে পারব্য না।’

‘দেখুন-না, চেষ্টা করে দেখুন-না একবার।’

সেদিন আধঘণ্টা ধরে তাঁকে দিয়ে কথাগুলো বলানো অভ্যেস করালুম। তারপর দেখলুম, ঠিকঠিকভাবে নির্দেশ দেয়া তিনি দিব্যি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিলেন। ব্যাপারটা ছিল কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করা আর কিছুই না।

বাবা-মায়েরা স্কুলগুলির কাছ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সাহায্য পেতে পারেন। তবে প্রতিটি স্কুল যদি এমন একেকটি ঐক্যবদ্ধ যৌথ সংস্থার রূপ নেয় যা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কী তার চাহিদা সে-সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং এই চাহিদাগুলিকে বেশ পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করতে পারে একমাত্র তাহলেই এটা সম্ভব।

বাবা-মা’দের সাহায্য করার এটা হল একটা উপায়। এছাড়া আরও অন্যান্য উপায়ও আছে। তার জন্যে পারিবারিক জীবনযাত্রার বিশদ অনুধাবন প্রয়োজন, আর প্রয়োজন নেতিবাচক চারিত্র্যলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পেছনে কী-কী কারণ বর্তমান সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা। তবে আমার এই আলোচনার জন্যে সময় এত বেশি নয় যে প্রতিটি পরিবার এ-ব্যাপারে তার কর্তব্যগুলি যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেজন্যে তাকে সাহায্য দেয়ার সবক’টি পদ্ধতির একটা তালিকা এখানে দিতে পারি।

...আজকের আলোচনায় আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এর পরের প্রশ্নটি হল, ফলপ্রদ অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে পরিবার পরিচালনার ব্যাপারটি। খুব ছোটবেলা থেকেই শিশুদের এই অর্থনৈতিক ইউনিটের সদস্য হিসেবে গড়ে

তোলার জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। তাদের জানা উচিত পরিবারটির আয়ের উৎস কী, পরিবারটি কী-কী জিনিসপত্র কিনে থাকে এবং কেনই-বা কিছু জিনিস কেনা হয় আর কিছু জিনিস না-কিনে বাদ দিয়ে চলা হয়, ইত্যাদি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ধরা যাক বছর পাঁচেক বয়স থেকেই, শিশুকে এই অর্থনৈতিক ইউনিটের ক্রিয়াকলাপের আবর্তে টেনে নেয়া দরকার। পরিবারের যৌথ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে শিশুর মনে একটা দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা উচিত। অবশ্যই এটা কোনো আনুষ্ঠানিক ধরনের দায়িত্ব হবে না, এটা হবে তার নিজের জীবন ও পরিবারের জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ব্যাপারে জড়িত হওয়ার মধ্যে দিয়ে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠা। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহলে শিশুর জীবনযাত্রার মানও নিম্নগামী হবে। শিশুলালনের ব্যাপারে এই দিকটি কোনো কারণেই উপেক্ষা করলে চলবে না।

পরিশেষে, যা সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন সেই সুখদুঃখের প্রশ্নটির আলোচনায় আসা যাক।

সাধারণত বাবা-মায়েরা বলে থাকেন যে তাঁরা নিজ-নিজ সন্তানদের সর্বাগ্রে স্থান দেন, সন্তানদের স্বার্থে তাঁরা সবকিছু, এমন কি নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত, বিসর্জন দিয়ে থাকেন।

নিজেদের এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়াটা বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের যা দিয়ে থাকেন তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক উপহারের সামিল। এটা এমনই এক মারাত্মক উপহার যে আমি আর কালবিলম্ব না-করে এখনই বলতে চাই — যদি আপনি আপনার বাচ্চার জীবন বিষময় করে

তুলতে চান তাহলে তাকে বেশ বড় একপাত্র আপনার নিজের সুখরস পান করতে দিন, আর দেখতে হবে না নিশ্চিত আপনি ওই পূর্বোক্ত লক্ষ্যে পেঁছে যাবেন।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে এইভাবে: কখনোই, কোনো মূল্যেই, বাচ্চাদের জন্যে কোনোরকম ত্যাগস্বীকার করা চলবে না। বরং উলটোপক্ষে, বাচ্চাকেই বাবা-মায়ের জন্যে জীবনে কিছু-কিছু ছাড়তে হবে।

কিছু-কিছু মেয়ে তাদের মায়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে থাকে তা নিশ্চয়ই আপনারা শুনে থাকবেন। তারা বলে: 'তোমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছে মা, আর আমি তো জীবনের কিছুই এখনও দেখি নি।'

মাত্র তিরিশ বছর বয়সী মায়েদেরও তাঁদের মেয়েদের কাছে এই ধরনের কথা শুনতে হয়:

'তোমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছে আর আমার এখনও শুরুই হয় নি, কাজেই সবকিছু আমারই পাওয়া উচিত, তোমার এখন নতুন কিছুর দরকার ফুরিয়েছে।'

অথচ হওয়া উচিত এর উল্‌টোটাই। অল্পবয়সী মেয়েদেরই বরং মনে করা উচিত: 'আমার সামনে এখন গোটা জীবন পড়ে আছে, কিন্তু মা গো তোমার সামনে আছে তার চেয়ে বেশ অল্প কয়েকটা বছর, কাজেই তোমারই উচিত বাকি জীবনটা পুরোপুরি ভোগ করে নেয়া।'

একারণেই 'বাবা-মা'র জন্যে বই'তে আমি সরাসরি লিখেছি যে নতুন পোশাক বানাতে হলে তা পরিবারে মায়েদের জন্যেই আগে বানানো উচিত।

শিশুদের মধ্যে যদি আমরা তাদের বাবা-মা'দের সুখী করার তাগিদটা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি তাহলে তাতে তাদের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। শিশুরা প্রথমত ও

প্রধানত তাদের বাবা-মা'দের সুখের কথাই ভাবুক, বাবা-মায়েরা তাদের সুখের বিষয়ে কী ভাবছেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তাদের। আমরা সাবালক, বয়স্ক লোক, আমরা কী ভাবব তা আমরাই জানি।

যদি আপনার বাড়তি খরচ করার মতো অর্থ থাকে আর মা না মেয়ে কার নতুন পোশাক কেনার জন্যে সেই অর্থ ব্যয় করবেন এ-নিয়ে যদি আপনি ভাবনায় পড়ে থাকেন, তাহলে বলব এ-নিয়ে মোটেই দ্বিধা করবেন না, সোজা গিয়ে মায়ের জন্যে পোশাক কিনে আনুন।

বাচ্চাদের এটা বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে সুখসম্ভোগে প্রথম অধিকার হচ্ছে বাবা-মায়েরই। রাষ্ট্রের কথা তো বাদই দিলুম, মায়েদের কিংবা মেয়েদের কারও পক্ষেই এমন সন্তানলালনে কোনো ফল নেই যারা নাকি তাদের মায়েদের সুখসম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করবে। ছেলেমেয়েরা বাবা কিংবা মায়ের সুখে বড় রকমের ভাগ বসিয়ে বেড়ে উঠছে এটা দেখাও একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

আমাদের কমিউনে আমরা দু'লক্ষ রুব্‌ল প্রমোদভ্রমণ ও শিক্ষামূলক অভিযানের জন্যে এবং চল্লিশ হাজার রুব্‌ল থিয়েটরের টিকেট কেনার জন্যে ব্যয় করতুম। এ-ধরনের কাজে ছেলেমেয়েদের জন্যে পয়সা খরচা নিয়ে কখনও কার্পণ্য করা হোত না। তবে যখন নতুন জামাকাপড় কেনার প্রশ্ন উঠত তখন আমরা সর্বদাই এই নিয়ম মেনে চলতুম যে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের গায়ে যে-জামাকাপড় ছোট হয়ে গেছে তা অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েদের পরতে দেয়া হবে। ছোট ছেলেমেয়েরা ভালোই জানত যে তারা নতুন জামাকাপড় পাবে না, কেবলমাত্র এক-আধটুকু অদলবদল-করা পোশাকের আশা করতে পারে তারা। এটা ঠিক যে বড়

ছেলেমেয়েরা তাদের জামাকাপড় পরে-পরে জীর্ণ করে ফেলা পর্যন্ত অনায়াসেই অপেক্ষা করতে পারতুম আমরা আর তারপর সে-সব জামা ফেলেও দিতে পারতুম, কিন্তু এ-নীতি আমরা কখনও অনুসরণ করে চলি নি। বড় ছেলেমেয়েরা তাদের পোশাক-আশাক জীর্ণ করে ফেলার মতো অত দীর্ঘদিন ধরে কখনও পরত না, কিছুদিন পরার পরই সেগুলিকে ছোটদের উপযোগী করে অদলবদল করে নেয়া হোত।

আচ্ছা, বলুন-না, চোদ্দ বছর বয়সেই কোনো মেয়েকে যদি সিল্‌কের পোশাকে মুড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার সতেরো-আঠারো বছর বয়স হলে তাকে আগের চেয়ে আর কী আহামরি পোশাক দেয়া যেতে পারে?

এর উল্‌টোরকম আচরণ করলে পরিবারে তার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে? এর ফলে মেয়ে হয়তো কোনোদিন ভাবতে শুরু করবে: আমি মাত্র একটা পোশাক পেয়েছি আর মা পেল তিন-তিনটে পোশাক।

বাবা-মায়ের প্রতি দরদ দেখাতে শিশুদের শেখানো দরকার, বাবা কিংবা মায়ের শখসাধ না-মেটা পর্যন্ত তাদের নিজেদের কিছু-কিছু সুখসুবিধে ত্যাগ করার সহজ ও স্বাভাবিক একটা ইচ্ছে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

আজ আমার যা বলার পরিকল্পনা ছিল এখানেই তার ইতি টানা যেতে পারে।

হয়তো আপনাদের মধ্যে কারও-কারও কিছু-কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আছে?

প্রশ্ন: আচ্ছা, দ্জের্জিন্স্কি কমিউন কি এখনও বর্তমান আছে? তা যদি থাকে তাহলে কার ওপর তার

পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে এবং আজকাল আপনার সঙ্গেই-বা তার যোগাযোগ কতখানি?

উত্তর: আমি ছেড়ে দেবার পর দ্জের্জিন্স্কি কমিউন আরও দু'বছর টিকে ছিল, তারপর কমিউনটি ভেঙে দেয়া হয়। কিন্তু কেন তা ভেঙে দেয়া হল? কারণ, কমিউনের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বাসিন্দারা টেক্নিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে চলে গেল এবং কমিউনে যে-ফ্যাক্টরিটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হল। কমিউনের সকল বাসিন্দাই তারপর চমৎকার ফল দেখিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করেছে।

হ্যাঁ, আমি আমার সেদিনকার সেইসব প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বই-কি।

...আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এইসব যোগাযোগের ফলে আমার পক্ষে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বটে। যতই যাই হোক, কমিউনে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বড় কম ছিল না। ওদের সকলকেই আমার মনে আছে বটে, তবে ওদের মধ্যে কে-যে কাকে বিয়ে করেছিল আর ওদের ছেলেপিলে-যে কার ক'টি তা মনে নেই। অথচ ওদের কাছে চিঠি লিখতে হলে আমার সে-সবেরও উল্লেখ করা দরকার হয়ে পড়ে।

তাছাড়া এর অর্থ প্রতি সপ্তাহে কাজের দিনগুলোর মধ্যে পুরো একটা করে দিন আমাকে ওই চিঠিলেখার কাজে ব্যয় করতে হয়, ফলে আমার অবস্থা বেশ সঙ্গিন হয়ে ওঠে। আমি অবশ্য এতে নারাজ হই না, কেননা আমি ছাড়া ওদের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। আমি ছাড়া আর কার মুখাপেক্ষীই-বা হবে ওরা! তবু এই চিঠির বন্যার

সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে সময়ে-সময়ে তা আমার কাছে রীতিমতো বোঝার সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

সময়ে-সময়ে দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনের প্রাক্তন কোনো-কোনো সদস্য মস্কোতেও এসে উপস্থিত হয়। আর তারা স্টেশন থেকে সরাসরি আমার কাছে এসে হাজির হয়ে যায়। কখনও-কখনও কেউ-কেউ গোটা একটা মাসও থেকে যায় আমার কাছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে মহা খুশি হয়ে সে হয়তো জানিয়ে দেয়: 'আন্তন সেমিওনভিচ, আমি কিন্তু মাসখানেক থাকতে এসেছি!' আর তখন আমি বুঝে পাই না কী-যে করব, স্ত্রীর জন্যে দুঃখবোধ না-করেও থাকতে পারি না। সারাটা সময়ই হোটেল চালিয়ে যাবে সে এতটা তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। আমার অতিথিদের খেতে দিতে হচ্ছে বলে-যে আমি অস্বস্তি বোধ করি তা নয়, সমস্যাটা হল এই যে অতিথি বাড়িতে থাকলে আমার স্ত্রীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়।

তবু বলি: 'ঠিক আছে, এসেইছ যখন তখন ভেতরে এস, আরাম কর। গালিয়া, আমাদের বাড়িতে এক অতিথি এসেছে।'

'কে?'

'ভিতিয়া বগ্‌দানোভিচ।'

'এই-যে ভিতিয়া, কী খবর?'

এরপর দিন-দুই থাকার পরই ছেলেটা বলতে শুরু করে যে তাকে এবার একটা হোটেল খুঁজে নিতে হয় আর আমি তাকে বলি আমাদের বাড়িতেই থেকে যেতে আর হোটেল খোঁজা নিয়ে মাথা না-ঘামাতে।

আরও দিন-তিনেক থাকবার পর সে ফের ওই কথাটা তোলে। বলে, সে ভাবছে একবার লেনিনগ্রাদে একটা চক্কর

দিয়ে এলে মন্দ হয় না। আর আমি তাকে ফের বলি অমন করার কোনো দরকার নেই, ও বরং আমাদের কাছেই থেকে যাক।

আর তারপর যখন সময় আসে তরুণ ছেলেটির চলে যাবার তখন তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে আমার ভারি কষ্ট হয়। বলি: 'তোমার উচিত মস্কোয় এসে থাকা। এখানে কাজ পেতে তোমার অসুবিধে হবে না আর তাছাড়া আমাদের এখানে থাকতেও পারবে।'

প্রায় সব ক্ষেত্রেই কমিউনের ছেলেমেয়েরা পরবর্তী জীবনে খুবই উন্নতি করেছে। তাই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার কাছে সময়-সময় সমস্যা হয়ে দেখা দিলেও তা আমার সত্যিসত্যিই মহা আনন্দের উৎস। অবশ্য, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওদের মধ্যে অল্প কিছু তরুণতরুণীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমাকে যখন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া হল তখন সুদূর ভ্‌রাঙ্গেল দ্বীপ থেকে একখানা বেতার-বার্তা আমার হাতে এসে পৌঁছুল। বেতার-বার্তাটা পাঠিয়েছিল মিতিয়া জেভেলি। 'জীবনজয়ের পথে' বইটির মাধ্যমে এই ছেলেটির সঙ্গে আপনারা সকলেই পরিচিত আছেন।

আজই আমি আরও একখানা অভিনন্দনপত্র পেলুম। এটি পাঠিয়েছে 'সম্মানসূচক পদকপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়র ওরিসেঙ্কো (গুত্‌)'।

প্রশ্ন: শারীরিক শাস্তিপ্রদান সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী?

উত্তর: আগের মতো এখনও আমি শারীরিক শাস্তিদানের বিরোধী। এটা এমন এক ধরনের শাস্তিদানের পদ্ধতি যা আমার কাছে অসহ্য ঠেকে। এমন একটিও পরিবার আমি

দেখি নি যেখানে শারীরিক শাস্তি দেয়ার ফলে কোনোরকম ইতিবাচক ফল দেখা গেছে।

অবশ্য এটা স্বীকার্য যে মা যখন সময়ে-সময়ে তাঁর কোলের বাচ্চাকে চড়টা-চাপ্পড়টা মারেন তখন তাকেও আমি এই শারীরিক শাস্তিদানের পর্যায়ে ফেলি না। দু'-তিন বছরের একটা বাচ্চা তার কী বিপদ ঘটতে যাচ্ছে না-যাচ্ছে তা বোঝে কিনা সন্দেহ, আর তাই মা যখন এমন বাচ্চাকে চড়টা-আশটা মারেন তখন তিনি যতটা-না তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কাজটা করেন তার চেয়ে বেশি করে নিজের উদ্বেগ প্রকাশের জন্যেই তা করেন। তবে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকে মারধর করা মানে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব প্রকাশ করা ছাড়া কিছু নয়। এই ঘটনাটা এমন কি ছেলের সঙ্গে তার বাপ-মায়ের ইতিবাচক সম্পর্কের অবসানও বোঝাতে পারে।

দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে ছেলেপিলেরা কখনও মারামারি করত না। এ-প্রসঙ্গে এই ঘটনাটার কথা আমার ভারি পরিষ্কার মনে পড়ে। আমরা তখন বাতুমি থেকে প্রমোদভ্রমণের একটা জাহাজে চেপে ক্রিমিয়ায় ফিরছি। জাহাজের গোটা ওপরের ডেক আমরা দখল করে নিয়েছিলুম। জাহাজের অপর সব যাত্রীও আমাদের প্রতি প্রসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের সাজপোশাক বেশ সুন্দর ছিল, ভালো একটা ব্যান্ডপার্টি ছিল আমাদের এবং তারা থেকে-থেকেই কন্সার্টের ব্যবস্থা করছিল। অন্য যাত্রীরা ও জাহাজের নাবিকরা সবাই আমাদের বাজনা বেশ উপভোগও করছিল। তারপর হল কী, হঠাৎ একদিন সকালে প্রাতরাশের পরে-পরেই এবং ইয়াল্তায় আমাদের জাহাজ ভিড়বার ঠিক আগেই অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের মধ্যে একজন তার চেয়ে বয়সে ছোট অপর

একটি ছেলের মাথায় টিনের একটা কৌটো দিয়ে মারল। এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল, কমিউনে তার আগে এমন ঘটনার কথা আর কখনও শোনা যায় নি। আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম। ভাবলুম, কী করা যায়? আর তারপরই আমার কানে এল সভার আহ্বান জানিয়ে বিউগ্‌ল-সংকেতের আওয়াজ।

'কেন? বিউগ্‌ল-সংকেত কেন?'

'ডিউটিরত দলপতি অমনে হুকুম দিয়েছে বলে।'

'কিন্তু কেন? কিসের জন্যে?'

'তাতি কী এস্যে যায়? আপনে সবারে একত্তর হবার হুকুম দেন-না ক্যানে।'

'আচ্ছা, তারপর।'

ইতিমধ্যে ছেলেরা সবাই এসে জড়ো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার কী-যে করণীয় তা ভেবে পাচ্ছিলুম না।

এইমর্মে একটা প্রস্তাব এল যে দোষী ছেলেটিকে জাহাজ থেকে ইয়াল্‌তায় নামিয়ে দেয়া হোক এবং এইভাবে তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরকালের মতো ছিন্ন করা হোক।

সমবেত ছেলেদের দিকে ভালো করে এক-নজর তাকালুম। এতে কারও কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হল না। শুধোলুম, 'ব্যাপারখানা কী? তোমরা ঠাট্টা জুড়ে দিলে নাকি? সত্যিসত্যিই তোমরা এটা চাইছ? কিন্তু কী করে চাইতে পার তা? ঠিক আছে, ও না হয় কাউকে মেরেছে, কিন্তু তাই বলে অমন একটা অপরাধে কাউকে কি কমিউন থেকে দূর করে দেয়া চলে?'

'এখন ওসব আলোচনা করার সময় না। ব্যাপারটা ভোটে দেয়া হোক।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' আমি প্রতিবাদ জানালুম।

আর এরপর ছেলেরা বলে বসল: 'একটা প্রস্তাব এসেছে যে আন্তন সেমিওনভিচের কথা বলার অধিকার হরণ করা হোক।'

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ঠিক ওই প্রস্তাবই ওরা গ্রহণ করে বসল। তবু আমি কোনোরকমে বলার সুযোগ করে নিয়ে বললুম: 'আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। আমি তোমাদের দলপতি। ইচ্ছে করলে ঘণ্টা-পাঁচেক তোমাদের সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করে রাখতে পারি। আমরা এখন কমিউনে আমাদের স্বস্থানে নেই যে তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ এ-নিয়ে আমি কথাবার্তা চালাব। কিন্তু তোমরা আমার কথাবলার অধিকার কেড়ে নিতে পার কী করে?'

'ঠিক আছে, তাইলে আপনার কী বলার আছে বলেন।'

কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার কীই-বা বলার ছিল? ওরা অবশেষে ভোট নিতে শুরু করল আর দেখা গেল ওদের প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে একমত যে দোষী ছেলেটিকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হোক। তারপর এইমর্মে অপর একটা প্রস্তাবও উঠল যে ছেলেটির সঙ্গে অপর কেউ যদি জাহাজ থেকে নামে তাহলে তারও আর ফেরার দরকার নেই।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রী ও নাবিকদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিনিধিদল এইসময়ে ছেলেটির সপক্ষে ওকালতি করতে এল। কিন্তু ছেলেরা তাদের স্রেফ জানিয়ে দিল:

'না-না, আমরা কী করতেছি তা আমরা ভালোই বুঝি।'

ইয়ালতায় জাহাজ ভেড়ার পর ছেলেমেয়েদের একজনও জাহাজ থেকে নামল না, যদিও জায়গাটা দেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে তার আগে থেকে প্রতীক্ষা করছিল তারা। শহরটা একবার ঘুরে দেখা, রাস্তাঘাটে একবার হেঁটেচলে বেড়ানো — এ-সবের জন্যে তারা ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, তবু একজনও

কেউ জাহাজ থেকে নামার নাম করল না। ডিউটিরত দলপতি দোষী ছেলেটিকে খালি শুকনো গলায় জানিয়ে দিল: 'আচ্ছা, এবার তুই নেমে যেতে পারিস।'

ছেলেটা নেমে গেল।

এরপর আমরা যখন খারকভে গিয়ে পেঁছিলুম, তখন দেখলুম রেলওয়ে স্টেশনের সামনের চত্বরটায় ছেলেটা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের ছেলেরা গাড়িতে মালপত্র তুলছিল যখন, তখনও সে কাছে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিভরে আমাদের লক্ষ্য করছিল। ভারপ্রাপ্ত দলপতি ওকে চত্বর ছেড়ে চলে যেতে বলল, জানাল, ও চলে না-গেলে গাড়িতে মাল তোলা বন্ধ থাকবে।

ছেলেটা তখনকার মতো সরে গেল বটে, তবে দিন-তিনেক পরে ফের সে কমিউনে এসে উদয় হল। বলল, আমার সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। দরজায় ডিউটিরত পাহারাদার কিন্তু ওকে ঢুকতে দিতে নারাজ হল।

'কিন্তু তোমরা তো সবাইরে ঢুকতি দাও।'

'হ্যাঁ, দিই। তবে একমাত্র তোরে বাদ দিয়ি।

'তাহলে আন্তন সেমিওনভিচরে এখেনে ডাক।'

'না, পারব না।'

যাই হোক, শেষপর্যন্ত পাহারাদার নরম হয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেল।

বললুম, 'কী চাও তুমি?'

'একটা সাধারণ সভা ডাকেন।'

'ঠিক আছে।'

সন্ধে পর্যন্ত আমার অফিসেই বসে রইল ও। তারপর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় ওর পক্ষ নিয়ে আমি সকলের কাছে আবেদন জানালুম। কমিউনের সকল বাসিন্দাই

কথা না-বলে ওর দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। আমি জানতে চাইলুম, কারও কিছু বলার আছে কিনা। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলুম তারা যাতে কিছু বলে, কিন্তু সবাই মুচকি হেসে চুপ করে রইল। রকমসকম দেখে আমি ভাবলুম, কে জানে, হয়তো ওরা ছেলেটাকে কমিউনে থাকতে দেবে। এরপর ভোট দেয়ার ডাক পড়ল। সভার চেয়ারম্যান বলল যারা আমার প্রস্তাবের পক্ষে তারা যেন হাত তোলে, কিন্তু একখানা হাতও উঠতে দেখা গেল না। এরপর 'কে-কে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে' এই প্রশ্নের জবাবে দেখা গেল সর্বসম্মতভাবে সকলে একমত।

পরদিন ছেলেটা ফের ফিরে এল। বলল: 'ওরা আমারে এমনধারা কঠিন শাস্তি দিতি পারে না। ফের একটা সাধারণ সভা ডাকেন, আমি এ-কাজের একটা ভালোমতন কৈফিয়ত শুনতি চাই।'

ওইদিন সন্ধেবেলাতেই ফের একবার সাধারণ সভা ডাকা হল।

আমি সবাইকে জানালুম, 'ও তোমাদের এ-কাজের একটা কৈফিয়ত শুনতে চায়।'

'ঠিক আছে। আলেক্সেয়েভ, তুই ব্যাপারটা বুঝায়ে বল্ ওরে।'

আলেক্সেয়েভ দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করল: 'জাহাজের উপর গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের চোখের সামনি (কেননা, সকল শহরের লোক ওই জাহাজে উপস্থিত ছিল, তাই) আর মাঝিমাল্লাদেরও সামনি তুই নিতান্ত তুচ্ছ কারণে ওই ছেলেটার মাথায় টিনের বাড়ি মেরেছিস। এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ, এর জন্যে আমরা তোরে কোনোদিন ক্ষমা করব না। আমাদের পরে আর যারা নূতন

ছেলেপিলে এখেনে আসবে তারাও তোরে কোনোদিন ক্ষমা করবে না।'

দুর্ভাগা ছেলেটা ছেড়ে চলে গেল। তখন যারা কমিউনে ছিল এমন বহু ছেলেপিলেও তারপর কমিউন ছেড়ে চলে গেছে আর তাদের জায়গায় নতুন-নতুন আরও বহু ছেলে এসেছে। এমন কি পরে যারা এসেছে সেই নতুন ছেলেদেরও অনেকসময় বলতে শুনেছি: 'জ্ভিয়াগিনেত্সের বেলায় যে-নীতি মেনে চলা হয়েছিল, এখনও সেই নীতি মান্য করা লাগবে।' এই নতুন ছেলেরা জ্ভিয়াগিনেত্সকে চোখে দেখে নি, কিন্তু তার ব্যাপার সবই জানত।

কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, কমরেডস, মারামারি সম্পর্কে কমিউনের ছেলেপিলেদের মনোভাব কী ছিল! তারা-যে কড়া নীতি গ্রহণ করেছিল শিক্ষক হিসেবে আমি তার নিন্দা করি, কিন্তু তাদের বন্ধু হিসেবে এ-নীতিকে আমি নিন্দা করতে পারি না, বরং মনে হয় কিছুটা যেন তা বুঝতে পারি।

শাস্তিটা অবশ্যই খুব কঠোর হয়েছিল, তবু সব সত্ত্বেও সেটা ছিল যুক্তিসঙ্গত। যৌথ প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই আমরা কোনো হানাহানি-মারামারি ঘটতে দিতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও নিশ্চিতভাবে শারীরিক শাস্তিদানের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন: আপনার কমিউনে তো সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেমেয়েও বেশ কিছু ছিল। তা, এইসব ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কী রকম ছিল?

উত্তর: ভারি কঠিন প্রশ্ন। ঠিকঠিকভাবে এর জবাব দিতে গেলে অনেক বেশি সময়ের দরকার। বিষয়টা নিয়ে আমি আমার বইয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমি

এ-নিয়ে অল্প দু'চারটে কথা বলব। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে অবশ্যই বে-আইনী করা চলে না, তবে আঠারো বছরের ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রেমে পড়া ও সরাসরি বিয়ে করতে দেয়াও যেতে পারে না। এ-ধরনের বিয়ে কখনোই সুখের হয় না। আমার পরিচালনাধীন যৌথ সংস্থাটির ঐক্যবদ্ধ ও ঘনসন্নিবিষ্ট প্রকৃতি এবং আমার প্রতি তরুণ ছেলেমেয়েদের আস্থা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ে-সময়ে আমি ওখানকার মেয়েদের একত্র করে অল্পবয়সী মেয়েদের কেমন আচরণ করা উচিত সে-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে তাদের বোঝাতুম। তারপর আমি ছেলেদের জড়ো করতুম বক্তৃতা শোনার জন্যে। ছেলেদের বেলায় আমি যত-না তাদের বোঝাতুম তার চেয়ে বেশি করে তাদের কাছ থেকে দাবি করতুম আচরণের বিশেষ ধরনের কিছু আদর্শ এবং দায়িত্ববোধ।

এই সমস্ত প্রয়াসে আমি সমর্থন ও সাহায্য পেতুম কম্‌সমোল সংগঠন, পার্টি-সংগঠন ও অবশ্যই পাইওনিয়র সংগঠনের কাছ থেকে। এছাড়া কমিউনের সাধারণ সভার কাছ থেকেও সমর্থন জুটে যেত।

এই সমস্ত কারণে এ-ব্যাপারে কোনো কিছু গণ্ডগোল ঘটে নি, কোনো নাটকীয় ঘটনা বা বিয়োগান্ত নাটকের অনুষ্ঠান হয় নি, বরং সবকিছু ঠিক-ঠিক চলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানতুম যে ক্রাভ্‌চেঙ্কো দনিয়াকে এবং দনিয়া ক্রাভ্‌চেঙ্কোকে ভালোবাসে। কমিউনে থাকতে সর্বদাই তারা অবসর-সময় একসঙ্গে কাটাত, একসঙ্গে বেড়াতে যেত, কিন্তু এসবের মধ্যে অন্যায় আচরণ কিছু থাকত না। কমিউনে তাদের থাকার পুরো সময়টা পূরণ করে দু'জনেই তারা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ঢোকে। এর তিন বছর পরে

তারা অবশেষে পরস্পর বিয়ে করে। ওই সময়ে কমিউনে এসে তারা জানায় যে তারা বিয়ে করতে যাচ্ছে। দলপতিরা তাদের এই সিদ্ধান্তকে সানন্দে হাততালি দিয়ে সমর্থন করে, কেননা তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং তারা বিয়ের জন্যে পুরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছিল।

প্রশ্ন: প্রাক্-স্কুল পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের মনস্তাত্ত্বিক গড়ন সম্বন্ধে আপনি এত বেশি খোঁজখবর পেলেন কী করে?

উত্তর: আমার নিজের কোনো ছেলেপিলে নেই, তবে আমার পালিত ছেলেমেয়ে আছে বই-কি। কমিউনে শিক্ষক ও কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আমরা একটি কিন্ডারগার্টেন খুলেছিলুম। এই কিন্ডারগার্টেনটি সংগঠিত করেছিলুম আমি, আমিই তার তদারকি করতুম। ওই সময়ে বেশ কিছুসংখ্যক প্রাক্-স্কুল পর্যায়ের ছেলেমেয়েকে আমি সত্যিসত্যিই ভালোভাবে চিনতুম আর তাদের ভালোও বাসতুম প্রাণ ঢেলে। অতএব ওই বয়সের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হলেও কিছুটা-যে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমার অভিজ্ঞতা*

আমি-যে আপনাদের বিশেষ মূল্যবান কোনো কথা বলতে পারব তার সম্ভাবনা কিন্তু নিতান্তই অল্প। আমি মনে করি যেমন আপনাদের সহকর্মীদের মধ্যে যে-কারও কাছ থেকে তেমনই আপনাদের কাছ থেকেও অনেক-কিছু শেখার আছে। আপনারা নিজেরাই চমৎকার সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং প্রথম শ্রেণীর নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

আপনাদের কাছে আমার যা বলার আছে আমার ধারণা তা আপনাদের কাজে লাগবে একমাত্র আপনাদের মধ্যে সাড়া জাগানোর, নতুন-নতুন ধ্যানধারণার কিংবা সম্ভবত প্রতিবাদ ও আপত্তি জানানোর প্রেরণা হিসেবে। কেননা, আমার

---

* আন্তন মাকারেঙ্কো এই লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন ১৯৩৮ সালের ২০ অক্টোবর তারিখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগকৌশলে প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্কুল ও অনাথাশ্রয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ইনস্টিটিউটে।

অভিজ্ঞতা কিছুটা অসাধারণ ধরনের এবং সম্ভবত আপনাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মিল যৎসামান্যই। হয়তো তফাত এইটুকুই যে আমার কপাল আপনাদের থেকে সামান্য কিছু ভালো।

এ-কারণে আমি আগে থেকেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। আমার কথাকে রোগপ্রতিষেধনের ব্যবস্থাপত্র কিংবা বাধ্যবাধকতামূলক যুক্তিতর্ক বা আইন বলে মোটেই গণ্য করবেন না। যদিও আমাকে পরপর ষোলটি বছর গৃহহীন অনাথ শিশুদের এক কলোনিতে কাটাতে হয়েছে, তবু আমি বলতে পারি না যে কোনো চূড়ান্ত ধ্যানধারণায় আমি পৌঁছুতে পেরেছি। আমি এখনও শিখছি, এখনও আমার ধ্যানধারণা ক্রমে-ক্রমে গড়ে উঠছে। আশা করি যেমন আপনাদের ক্ষেত্রে তেমনই আমার বেলাতেও কথাটা সত্যি।

বহু সমস্যাই আমি যখন তুলাদণ্ডে চাপিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে যাব, তখন আমাকে প্রায়শই হয়তো তাদের সমাধানে আপনাদের কিংবা আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

অতএব আমি আপনাদের কাছে যা বলতে চলেছি তাকে মোটেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করবেন না। একমাত্র একটা বড়রকমের প্রামাণ্য গ্রন্থে কিংবা মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধাদিতে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত ইত্যাদি টানা যেতে পারে। আমি কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তাদিতে পৌঁছুই নি, কাজেই এক সহকর্মী যেমন অপর সহকর্মীকে সম্বোধন করে থাকে, সেইভাবে আমার অভিজ্ঞতাসঞ্চিত কিছু প্রমাণসাপেক্ষ উপপাদ্য ও পূর্ববোধ আপনাদের সামনে পেশ করার অনুমতি দিন। কেননা,

আমি যা পেশ করব তাকে যত-না সিদ্ধান্ত বলা চলবে তার চেয়ে বেশি করে বলা চলবে আমার পূর্ববোধ।

আমি ভালোই জানি যে আমার চিন্তাভাবনা শিক্ষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই হয়েছে এবং এও বুঝি যে আমায় যদি অন্যরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হোত তাহলে আমার চিন্তাভাবনাও অন্য ছাঁচে ঢালাই হওয়া অসম্ভব ছিল না।

আমার অভিজ্ঞতা খুবই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। আট বছর ধরে আমি ছিলুম কিশোর অপরাধীদের জন্যে গড়ে-তোলা গোর্কি কলোনির ভারপ্রাপ্ত, আর আরও আট বছর ভারপ্রাপ্ত ছিলুম দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি উৎপাদন-সংক্রান্ত কমিউনের। দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনটি অবশ্য কিশোর অপরাধীদের মানুষ করে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একেবারে তার সূচনায় আমি কিছু গৃহহীন অনাথ ছেলেপিলে সেখানে পাঠিয়েছিলুম বটে, তবে আমার শেষ চার বছর সেখানে থাকার সময় প্রায় সব নতুন আগন্তুক ছেলেপিলেই ছিল সমস্যাপীড়িত পরিবারগুলি থেকে আগত।

এখনই যে-তিন ধরনের ছেলেপিলের কথা বললুম — অর্থাৎ, অপরাধী, গৃহহীন অনাথ ও সমস্যা-প্রপীড়িত পরিবারগুলি থেকে আগত ছেলেপিলে — এদের মধ্যে কোন ধরনের ছেলেপিলেকে গড়েপিটে তোলা সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করেন? এদের মধ্যে বেছে নেয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়, তবু সব দিক বিবেচনা করে আমি বলব, মানুষ করা সবচেয়ে কঠিন অসুখী পরিবার থেকে আসা ছেলেপিলেদের। অন্ততপক্ষে অসরল, অদ্ভুত আর বিকৃত চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় এই শেষোক্ত ধরনের ছেলেপিলেদের

মানুষ করতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছে।

অথচ ওই সময়ের মধ্যে শিক্ষকতার পেশার কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করার বিচারে আমি কিন্তু আগের চেয়ে বেশি পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলুম। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ছিল এই যে, ওরই মধ্যে আমার হাতের পাঁচ হিসেবে ছেলেমেয়েদের এমন একটা যৌথ সংস্থা গড়ে উঠেছিল যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আরও ষোল বছর আগে এবং যে-যৌথের তৈরি ঐতিহ্যের ইতিহাসও ছিল ষোল বছরের পুরনো।

একমাত্র এই যৌথ সংস্থার দৌলতেই অসুখী পরিবার-গুলি থেকে আসা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কাজটা আমার পক্ষে সহজতর ঠেকেছিল। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমাকে যখন কিশোর অপরাধীদের প্রথম দলটির মধ্যে কাজ করতে পাঠানো হয় আমার সেই তখনকার কাজের চেয়ে অন্তত উপরোক্ত কাজটা ছিল সহজতর।

উপরোক্ত ওই তিন ধরনের ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমি এমন একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এমন কি আমার কাছেও তা কিছুটা স্ববিরোধী ঠেকে। সিদ্ধান্তটি হল এই যে, আমার মনে হয় মানুষ করা কঠিন এমন ছেলেপিলে বলে কোনো বস্তু নেই। তদুপরি এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যাপারটাকে সরাসরি একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মনোভাবও নেই।

এ-সিদ্ধান্তের মধ্যে আমার যে-বক্তব্য নিহিত তা হল, সামাজিক নৈতিকতার আদর্শ ছক ও ওই নৈতিকতার মান

থেকে নানা ধরনের বিচ্যুতি — এদের মধ্যে পার্থক্য যৎসামান্য, প্রায় উপেক্ষণীয় বলা চলে।

এ-থেকে আমি আরও একটা সিদ্ধান্তে এসেছি, অবশ্য এটি সম্পর্কে আমি অতটা প্রত্যয়ী নই। এটি হল, চরিত্রের তথাকথিত পুনর্নির্মাণ অথবা সংশোধন ধীরেসুস্থে, ক্রমশ, দীর্ঘদিন ধরে ঘটানো উচিত নয়।

আমার এই ধারণা জন্মেছে যে সমাজবিরোধী ধরনধারণ, অর্থাৎ আমাদের সমাজে যা গ্রহণযোগ্য নয় এমন কিছু অভিজ্ঞতা, এবং স্বাভাবিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য যেহেতু অত্যন্ত যৎসামান্য, সেইহেতু এই তারতম্যের ফাঁকটুকু যথাসম্ভব দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া খুবই বাস্তব সম্মত।

অবশ্য আমি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে আলোচ্য মতটা হুবহু এইভাবে প্রকাশ করাটা উচিত হল কিনা। এরকম একটা তত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব কিনা সে-ব্যাপারেও আমি খুব নিশ্চিত নই, তবে এ-ব্যাপারে এ-পর্যন্ত আমি যে-ফলাফল পেয়েছি তা-যে ঠিক সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।

গত পাঁচ বছর ধরে আমি যখন দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে বাগ-মানানো কঠিন ও বিচিত্র মেজাজী চরিত্রের একগাদা ছেলেপিলে নিয়ে কাজ করেছি তখন কিন্তু আমি এমন সব চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তন ঘটতে দেখি নি। সাধারণ অর্থে যে বিবর্তন ঘটে থাকে সে-বিষয়ে আমি অবহিত, এবং বিবর্তন অর্থে আমরা বুঝি বিকাশ, উন্নতি, এইসব। অর্থাৎ, একটি ছেলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পাস করে উঠবে, তারপর উঠবে পঞ্চম শ্রেণীতে, ইত্যাদি। আর এইভাবে তার মনের দিগন্ত প্রসারিত হবে, সে অতিরিক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা

অর্জন করবে। তারপরে সে গিয়ে কাজ শুরু করবে কোনো ফ্যাক্টরিতে, জ্ঞান ও বিদ্যার ক্ষেত্রে যোগ্যতা সে বাড়িয়ে তুলবে, অর্জন করবে নানা সামাজিক যোগ্যতা।

কিন্তু এই-যে বিকাশ এ তো সাধারণ বাড়বাড়ন্তের ব্যাপার, দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিকৃত কোনো চরিত্রের সামাজিক নৈতিকতার মান অনুযায়ী বিবর্তনের ব্যাপার এটা নয়।

একথা বলে আমি কিন্তু মোটেই এটা বোঝাতে চাইছি না যে বিকৃত চরিত্র ও প্রথাসিদ্ধ ধরনধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ-দিয়ে আমি অবশ্যই বোঝাতে চাই যে সুচিন্তিত স্বেচ্ছাকৃত উপায়াদির, অথবা বিস্ফোরণ কথাটা যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে তার-ই সাহায্যে, চরিত্র-সংশোধনের কাজ অনেক ভালোভাবে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

এই বিস্ফোরণ কথাটা ব্যবহার করে আমি কিন্তু মোটেই এমন একটা পরিস্থিতি বোঝাতে চাই না যেখানে কোনো লোকের বসার জায়গার নিচে ডিনামাইট বসিয়ে তার ফিউজের তারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় আর লক্ষ্যবস্তুটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবার আগেই তার জন্যে অপেক্ষা না-করে গোটা ব্যাপারটার সংগঠক প্ররোচনাকারী পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায়।

আসলে ওই শব্দটি ব্যবহার করে আমি এমন একটা মুহূর্তকে বোঝাতে চাই যে-মুহূর্ত আচমকা কারও ওপর চাপসৃষ্টি করতে সমর্থ, যে-মুহূর্ত চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে মানুষের সকল বাসনাকামনা ও আশাআকাঙ্ক্ষাকে একেবারে রূপান্তরিত করে দিতে পারে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের বাহ্য আকৃতি দেখে আমি একদা এতটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলুম যে পরে এই সমস্ত

'বিস্ফোরণ'এর উপায়-উপকরণাদি ও এর ফলে বিকৃত যতসব চরিত্রের বিবর্তনের প্রশ্নটি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দিই। অতঃপর ক্রমে-ক্রমে আমি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ি যে এই 'বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি'টিকে (এর পরিবর্তে অপর কোনো সন্তোষজনক শব্দ ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না) শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিশেষজ্ঞরা একটা কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতে পারেন। হয়তো তাঁরা এই পদ্ধতিটির আরও যথাযথ একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও খুঁজে বের করতে পারবেন। আমি অন্তত এখনও পর্যন্ত তা করে উঠতে পারি নি।

এখন আমি আমার স্বচক্ষে দেখা এমন কিছু-কিছু ঘটনার বিবরণ দেব যা আমাকে উপরোক্ত ধরনে চিন্তা করতে ও পদ্ধতিটিকে পরবর্তী সময়ে নিজের কাজে লাগাতে বাধ্য করেছে।

গত ১৯৩১ সালে কমিউনটির জন্যে নির্ধারিত বাসিন্দার সংখ্যা পুরোপুরি পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমাকে আরও অনেক ছেলে কমিউনে ভরতি করে নিতে হয়। এইভাবে ১৫০ জন ছেলেপিলের ওপর আরও ১৫০ জনকে নিতে হয়। কার্যত মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে বেশ কিছু বাড়তি ছেলেকে কমিউনে জায়গা করে দিতে হয় আমায়।

ইতিপূর্বেই কমিউন-বাসিন্দাদের বেশ একটা সু-সংগঠিত কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সেখানে। আগেকার ওই ১৫০টি ছেলেমেয়ের মধ্যে চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সের ৯০ জন ছিল কম্‌সমোল-সদস্য আর বাদবাকি ছিল পাইওনিয়র।

এরা ছিল পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন, দৃঢ়-সংবদ্ধ একটা গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল তাক লাগানোর মতো,

টানটান ও যথাযথ, সকলেই ছিল তারা চমৎকার কাজের ছেলেমেয়ে, নিজেদের কমিউন ও তার শৃঙ্খলা নিয়ে গর্ববোধ করত তারা। কায়িক কিংবা মানসিক দিক থেকে দুরূহ কিছুটা দায়িত্বের নানা কাজের ভারও দেয়া চলত তাদের ওপর।

আমার সেদিনকার নতুন রঙরুটদের মনে যতটা সম্ভব গভীরভাবে দাগ কাটার জন্যে এই পদ্ধতিটিকেই সেদিন আমি কাজে লাগিয়েছিলুম।

অবশ্য, বলা বাহুল্য; আরও কিছু উপায়-উপকরণও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। যেমন, এজমালি শোবার ঘর, কাজের ঘর, ক্লাসরুম, ইত্যাদি ঘরগুলো সাজিয়েগুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা, তাদের অলঙ্করণ, সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র ইত্যাদি যেখানে যেটি দরকার সেটি ঠিকঠিক সেখানে সাজানো — এর ওপরও দারুণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

আর্থিক দিক থেকে কমিউনটি স্বনির্ভর ছিল বলে কমিউনের সদস্যদেরও থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ছিল ভালো।

এইভাবেই আমরা সর্বদা নতুন রঙ্রুটদের আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হতুম। এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর বিনা-টিকেটের যাত্রী ছেলেপিলেদের আমাদের জিম্মায় পেঁছে দেয়া হোত। সরকারিভাবে এদেরই ভর্তি করে নেয়ার অধিকার ছিল আমাদের। মস্কো থেকে মিনেরালনিয়ে ভোদি, মস্কো থেকে সোচি এবং মস্কো থেকে কিস্লভোদ্স্ক-গামী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো চেপেই আসত আমার কমিউনের ভবিষ্যৎ সদস্যরা।

আর এইসব এক্সপ্রেস ট্রেন খার্কভের ওপর দিয়ে যেত রাত্রিবেলা এবং আমরা রাত্রেও স্টেশনে গিয়ে বাচ্চাদের সংগ্রহ করতুম।

সাত-আটজন কমিউন-সদস্যের একটা ঝাঁক এই উদ্দেশ্যে কমিউন থেকে যাত্রা করে বাচ্চাদের সংগ্রহ করে আনত। এদের মধ্যে একজনকে আবার এই ঝাঁকের দলপতি নিযুক্ত করা হোত ওই বিশেষ রাত্রের জন্যে। বিশেষভাবে নিযুক্ত এই দলপতিটি তার বাহিনীর কাজের জন্যে দায়ী থাকত এবং কাজটা চুকে গেলে সব সময়েই সে-সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে আসত।

এই সংগ্রাহক বাহিনীগুলি রঙরুট ছেলেদের ট্রেনের ছাদ কিংবা পায়খানা থেকে খুঁজে-পেতে বের করত কিংবা ট্রেনের কামরাগুলোর তলা থেকে টেনেহিঁচড়ে এনে তুলত প্ল্যাটফর্মে। একারণে এই সংগ্রহের কাজে তাদের সময় লেগে যেত দুই থেকে তিন ঘণ্টা। সংগ্রাহক বাহিনীর ছেলেরা তথাকথিত এই 'ট্রেনযাত্রী'দের লুকনোর জায়গা আবিষ্কারের ব্যাপারে ছিল সিদ্ধহস্ত। ওদের মতো এ-ব্যাপারে অত পটুত্ব দেখানো আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন স্থানীয় জন-কমিশারিয়েতের কর্মচারিরা ও ট্রেনের গার্ডরা স্টেশনে আমার বসার জন্যে একখানা বিশেষ ঘরের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমি এইসব নতুন রঙরুট নিয়ে প্রথম সভার অনুষ্ঠান করতুম।

বস্তুত এই সভা নতুন ছেলেদের কমিউনে যোগ দেয়ার জন্যে উপরোধ-অনুরোধ করার জন্যে-যে ডাকা হোত তা নয়। বরং কমিউনের ছেলেরা সভায় দাঁড়িয়ে নতুন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে অনেকটা এই ধরনের কথাবার্তা বলত। যেমন:

'প্রিয় কমরেডরা, আমাদের কমিউনে লোকের ভারি অভাব। আমরা একটা নূতন ফ্যাক্টরি তৈরি করতেছি, তাই আমাদের একাজে সাহায্য করার জন্যি আমরা তোমাদেরে ডাকতি এসেছি।'

গৃহহীন অনাথ ছেলেরা নিশ্চিত বিশ্বাস করত যে ব্যাপারটা তাই-ই। কেননা, ওইসঙ্গে তাদের একথাও বলা হোত যে 'তোমাদের মধ্যি যারা আমাদের সাথে যেতি চায় না তারা ফের গিয়ি ট্রেনে চাপতি পারে।'

আর এরপরই, আমি যাকে এইমাত্র বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছি, সেই তাক লাগানোর পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতুম আমরা।

সাধারণত ওই নতুন ছেলেরা আমাদের নির্মাণকর্মে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যেত আর রাত্রের মতো আমাদের সঙ্গে ওই ঘরেই থেকে যেত। আর পরদিন বেলা বারোটার সময় ব্যান্ডপার্টি (ষাটখানা পেতলের তৈরি বাজনা সহ আমাদের মস্ত বড় ও সত্যিই চমৎকার একটা ব্যান্ডপার্টি ছিল) ও পতাকা নিয়ে গোটা কমিউনটিই নতুন রঙরুটদের অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে চলে আসত। কমিউনের এই ছেলেমেয়েদের পরনে থাকত সেদিন শাদা কলার সহ তাদের সবচেয়ে সেরা পোশাক, জামার হাতায় এমব্রয়ডারি-করা কমিউনের নামের আদ্যক্ষরগুলি ঝলমলিয়ে তোলা সহ যতটা জমকালো সাজপোশাক করা যায় তা-ই করত তারা। তারপর স্টেশনের সামনের চত্বরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ত। আর তারপর সেই অপর বা নতুন 'বাহিনী'টি গায়ের লম্বা-লম্বা ঢোলা জ্যাকেটগুলো দু'হাতে সাপটিয়ে ধরে, খালি-পাগুলো সলজ্জভাবে খাটো-খাটো করে ফেলতে-ফেলতে চত্বরটায় নেমে আসত যখন তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ডবাদ্য

শুরু হয়ে যেত আর নতুন ছেলেরা দেখতে পেত যে বাকি সবাই অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে, যেন ওরা আমাদের প্রিয়তম বন্ধু, আমরা ওদের সম্মুখীন হতুম বাজনা বাজিয়ে আর উৎসব-দিনের কুচকাওয়াজের সম্মান দেখিয়ে।

এরপর সামনে এসে সার বেঁধে দাঁড়াত কম্‌সমোলের সদস্যরা, আর তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে যেত নতুন রঙরুটরা।

গোটা দলটা তারপর কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলত একেক সারিতে আট-আট জন করে, গাম্ভীর্যপূর্ণ জাঁকজমকের সঙ্গে।

এসব দেখেশুনে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে জল এসে যেত একেবারে। তবে আমরা জানতুম, এতে ভাবোচ্ছ্বাসের কিছু নেই, এর গোটা ব্যাপারটাই হল কায়দাকৌশলের প্রয়োগমাত্র।

এরপর নতুন রঙরুটদের চালনা করে কমিউনে নিয়ে এসে প্রথমেই তাদের পাঠিয়ে দেয়া হোত স্নানের ঘরে। আর সেখান থেকে স্নান সেরে যখন তারা বেরিয়ে আসত তখন দেখা যেত তাদের মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা, শরীর দিব্যি ঘষামাজা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ঠিক আমাদের ছেলেদের মতো তাদেরও পরনে শাদা কলারওয়ালা একপ্রস্থ করে স্যুট।

অতঃপর তাদের আদি অকৃত্রিম পোশাকগুলো ময়লা-ফেলা একখানা চাকালাগানো ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দাহকার্য সম্পন্ন করা হোত।

ওইদিনের জন্যে ডিউটিরত দু'জন উঠোন-ঝাড়ুদার এরপর ঝাঁটা-হাতে এসে পড়ত এবং সব ছাই ঝাঁট দিয়ে বালতি করে তুলে নিয়ে যেত।

আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই গোটা ব্যাপারটাকে মস্ত একটা রসিকতা বলে গণ্য করতেন, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যাদের জন্যে সংগঠিত করা হোত তাদের মনে কিন্তু তা অসম্ভব জোরালো একটা ছাপ রেখে যেত চোখ-ধাঁধানো একটা অনুষ্ঠান হিসেবে। ব্যাপারটার প্রতীকী তাৎপর্যও তাদের চোখ এড়াত না।

ওই সমস্ত ট্রেন থেকে আমি যতগুলি গৃহহীন অনাথ ছোকরাকে সে-সময়ে নামিয়ে নিয়েছিলুম তাদের মধ্যে বড়জোর দুটি কি তিনটি নাম আমি উল্লেখ করতে পারি যারা শেষপর্যন্ত সঠিক পথে জীবনের মোড় নেয় নি।

এছাড়া বাদবাকি সকলে কোনোদিন ভুলতে পারে নি স্টেশনে তাদের অমন রাজকীয় অভ্যর্থনা, পোশাক নিয়ে সেই বহ্বুৎসব, সেইসব নতুন এজমালি শোবার ঘর, তার আগে পর্যন্ত তারা যে-ধরনের আচরণ পেতে অনভ্যস্ত ছিল সেই ধরনের সদয় ব্যবহার এবং তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন সেই শৃঙ্খলা। বাকি সারা জীবন তাদের মনে এসবের গভীর ছাপ রয়ে যাবে।

'বিস্ফোরণ ঘটানোর' পদ্ধতি* বলে আমি যার উল্লেখ করেছি, এ-পর্যন্ত সেই পদ্ধতি প্রয়োগের একটিমাত্র ঘটনার উদাহরণই দিয়েছি।

---

* এই পদ্ধতি একদা শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। 'বিস্ফোরণ ঘটানোর' পদ্ধতি প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার যে মাকারেঙ্কো এই পদ্ধতি নিয়ে একমাত্র পুনঃশিক্ষাদান-প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন। সঠিকভাবে সংগঠিত শিক্ষার ক্ষেত্রে চরিত্রের 'পুনর্নির্মাণ' বা 'পুনর্বিন্যাস'এর প্রয়োজনই ঘটে না। এই বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে ধরলে ঘটানোর' পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বেশ সংকীর্ণ হয়ে আসে।

পুনঃশিক্ষাদানের যে-পদ্ধতি আমি প্রয়োগ করেছি তাতে আগাগোড়াই উপরোক্ত ওই বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজটি ফিরে-ফিরে বারবার করতে হয়েছে ও তাকে আরও বিশদ করে তুলতে হয়েছে।

আমার ওই পুনঃশিক্ষাদান-পদ্ধতির ভিত্তি ছিল প্রথমত ও প্রধানত ছেলেমেয়েদের যৌথ জীবন।

দুঃখের বিষয়, যৌথ জীবন বলতে সত্যিই-যে কী বোঝায় এবং বিশেষ করে পুনঃশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠনে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের একটি যৌথ-যে ঠিক কেমনটি হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো বই-ই লেখা হল না।

অথচ এ-ধরনের বই অবশ্যই লেখা উচিত এবং উপরোক্ত ধরনের যৌথ জীবন-পরিবেশের প্রকৃতি নিয়েও গবেষণা চালানো উচিত।

এ-ধরনের যৌথ জীবন-পরিবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই যে-জিনিসটি উল্লেখ করা দরকার তা হল, এই যৌথ জীবন কোনোক্রমেই একটা জটলামাত্র নয়। এ হল সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করার জন্যে সতর্কভাবে পরিকল্পিত ও কার্যকর একটি সংগঠন।

এরকম একটি যৌথ সংস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করা দরকার যাতে তা ক্রমশ একটি সামাজিক ইউনিট হিসেবে গড়ে ওঠে। এটি যাতে সব সময়েই একটি যৌথ হিসেবে টিকে থাকে এবং কখনও নিছক একটা জন-জটলায় পরিণত না-হয় তা দেখা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবত এটাই হল শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজের সবচেয়ে দুরূহ অংশ। বলা বাহুল্য, আমি কখনও এমন আর একটিও যৌথের সন্ধান পাই নি যা

নাকি আমার গড়ে-তোলা যৌথটির সদৃশ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এটা আমি আমার নিজ কাজের প্রশংসা হিসেবে বলছি না, এটা নিছক বাস্তব ঘটনার বিবৃতিমাত্র।

এ-প্রসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে একমাত্র আমিই উপরোক্ত ওই যৌথটি গড়ে তুলি নি। যৌথটি গড়ে তোলার সঙ্গে আরও যে-সমস্ত ব্যাপার জড়িত ছিল তার সবকিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যাবে, তাছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও যে আমি সমগ্র বিষয়টির প্রতি সত্যিই সুবিচার করতে পারব তা-ও নয়।

যৌথ জীবন-পরিবেশটির সত্যিকার সংগঠন শুরু হয় তখনই যখন ওই যৌথের মধ্যেও প্রাথমিক যৌথ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বিষয়টি নিয়ে এককালে আমি বহু চিন্তা করেছি। যৌথটি সংগঠনের বহু বিভিন্ন বিচিত্র পদ্ধতির পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। অবশেষে আমি নিচের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

প্রাথমিক যৌথ — অর্থাৎ যে-যৌথকে আর ক্ষুদ্রতর ইউনিটে বা গোষ্ঠীতে ভাঙা চলে না — তাতে সাত জনের কম কিংবা পনেরো জনের বেশি লোক থাকতে পারে না। এটা-যে কেন তা আমি বলতে পারব না, কেননা এ-বিষয়টা নিয়ে আমি খুব বিশদভাবে কিছু ভেবে দেখি নি। এ-ব্যাপারে যতটুকু আমি জানি তা হল এই যে কোনো প্রাথমিক যৌথে যদি সাত জনের চেয়ে কম লোক থাকে তাহলে তা একটা বন্ধুগোষ্ঠী বা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটা উপদল হিসেবে গড়ে ওঠে।

অপরদিকে পনেরো জনের বেশি লোক নিয়ে তৈরি একটা প্রাথমিক যৌথ সব সময়েই দুটো গোষ্ঠীতে

দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে চায়, দেখা যায় যৌথটির মধ্যে সদাসর্বদা একটা বিভাজক রেখা বর্তমান।

আমি একমাত্র তাকেই আদর্শ প্রাথমিক একটি যৌথ বলে মনে করি যা একই সঙ্গে নিজের মধ্যেকার দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত আবার যা এটাও বোঝে যে যৌথটি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে-নেয়া নিছক একটা বন্ধুগোষ্ঠী নয়, সেটি একটি সামাজিক ব্যাপার, সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা, কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব নির্বাহক্ষম একটি যৌথ এবং একটি সংগঠনও। ভেবেচিন্তে গুছিয়ে লিখে না-জানিয়ে এসব ছোট্ট এরকম একটা ভাষণে ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন।

আমার কাছে বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক হল সেই লোকটির ভূমিকা, যাকে নাকি ওই প্রাথমিক যৌথ পরিচালনার ভার দেয়া হয়েছে ও যৌথটির সবকিছুর জন্যে দায়ী করা হচ্ছে।

এই ধরনের কমিউনগুলিতে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে কাজ করার সময় আগাগোড়া আমি এই অত্যন্ত জটিল সমস্যাটি সমাধানের পথ খুঁজে এসেছি এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই প্রাথমিক যৌথের নেতৃত্বে এমন একজন অবিসংবাদী ব্যক্তির থাকা উচিত যাঁর সঙ্গে অবশ্যই স্বৈরশাসকের কোনো সাদৃশ্য থাকবে না অথচ সদস্যরা যৌথের পক্ষে যে-কাজকর্ম চালাবেন তার যাবতীয় দায়িত্ব উপরোক্ত নেতার ওপর ন্যস্ত থাকবে।

এছাড়া অপর একটি ব্যাপারকেও পরবর্তী কালে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝেছি। তা হল, এই ধরনের যৌথের অস্তিত্ব কতদিন টিকিয়ে রাখাটা আদর্শসম্মত হবে।

আমি নিজে প্রাথমিক যৌথ সংগঠনকে সাত থেকে আট বছর ধরে অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি। দশ থেকে পনেরো জনের মতো ছেলেমেয়ের

একটি দল সাত থেকে আট বছর একটি প্রাথমিক যৌথ গঠন করে রেখেছিল এবং এই যৌথের জনসংখ্যায় কখনোই পঁচিশ শতাংশের বেশি হারে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সবসুদ্ধ যৌথটিতে ছিল বারোজন সদস্য এবং আট বছরে মাত্র তিনবার তাতে পরিবর্তন ঘটেছিল — তিনজন সদস্য যৌথটি ছেড়ে যায় ও তিনজন নতুন সদস্য যৌথের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আগে থেকেই আমি অনুমান করেছিলুম যে এই সমস্ত যৌথ সংগঠন ভারি আগ্রহোদ্দীপক বলে প্রমাণিত হবে। পরে সত্যিই দেখলুম আমার এই প্রত্যাশার পূরণ ঘটেছে। যৌথগুলি এই অর্থে আগ্রহোদ্দীপক বলে প্রমাণিত হল যখন দেখা গেল অগ্রগতি ও বিবর্তনের বিচারে, কাজকর্মের উঁচু মান, আস্থার আবহাওয়া, হাসিখুশি ভাব ও স্থিতিস্থাপকতার আদর্শ স্থাপন করার দিক থেকে তারা রীতিমতো উল্লেখ্য হয়ে উঠল। প্রাথমিক যৌথ হিসেবেই তাদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা গেল। এই যৌথগুলি পরিচালনা করত একজনমাত্র দলপতি। পরে এই দলপতিকে বলা হোত ব্রিগেডিয়ার।

গোড়ার দিকে রেওয়াজ ছিল এইরকম প্রত্যেকটি প্রাথমিক যৌথের নেতৃত্বে সবচেয়ে যোগ্য, প্রাণশক্তিতে অদম্য ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এমন একেকটি ছেলে কিংবা মেয়েকে নিযুক্ত করা যে নাকি হুকুম দেয়া, নাছোড়বান্দাভাবে জিদ ধরা কিংবা চাপ দিয়ে কাজ করানোর সময় তার নেতৃত্বাধীন সবাইকে ভালোরকম বশে রাখতে সমর্থ।

তবে আমার দীর্ঘ ষোল বছরের অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে দলপতি হিসেবে হুকুম দেয়ার পক্ষে

উপযুক্ত সবচেয়ে জোরালো ব্যক্তিত্বকে নির্বাচিত করার উপরোক্ত ওই প্রবণতা কীভাবে আস্তে-আস্তে অপর একটি প্রবণতায় রূপান্তরিত হল। শেষোক্ত এই প্রবণতাটি হচ্ছে, প্রাথমিক যৌথ কিংবা বাহিনীর (সাধারণত প্রাথমিক যৌথকে আমার কমিউনগুলিতে বাহিনীই বলা হোত) প্রধান হিসেবে বয়স্ক সদস্যদের মধ্যে এমন একজনকে বেছে নেয়া যে নাকি তার নিজস্ব বিশেষ কোনো গুণের জন্যে কমরেডদের থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র না-ও হতে পারে।

প্রায় আমার অজান্তে এবং শিক্ষক হিসেবে আমার নির্দিষ্ট করে দেয়া লক্ষ্যনিরপেক্ষভাবেই বলতে গেলে ওই ষোল বছরে এই পরিবর্তনটি ঘটে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষক হিসেবে বেশ একটা গর্ববোধ নিয়েই আমি বুঝেছিলুম যে কমিউনের সদস্যদের মধ্যে যে-কারোকে আমি এই নিশ্চিত ধারণা নিয়ে যে-কোনো কাজের ভার দিতে পারি যে সে কাজটি প্রশংসনীয়ভাবে সমাধা করবেই।

এখন আমার এতটা সময় কিংবা সুযোগ নেই যে বাচ্চাদের এই কৌতূহলোদ্দীপক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সব কথা আপনাদের সবিস্তারে জানাব — কীভাবে বাচ্চাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র নেতাদের ভূমিকায় অভিনয় করতেই-যে পটু ছিল তা নয়, সত্যিসত্যিই নেতৃত্ব দিতে, সবচেয়ে বলশালী কিংবা উদ্ভাবনী বুদ্ধিতে সবচেয়ে দক্ষ কিংবা এমন কি ইচ্ছাশক্তির দিক থেকেও সবচেয়ে প্রবল না-হয়েও গোটা যৌথ সংগঠনকে নিজেদের পাশে-পাশে রেখে চালনা করতেও পাকাপোক্ত ছিল তারা। অন্যদের থেকে এদের বৈশিষ্ট্য ছিল কেবলমাত্র এদের ওপর ন্যস্ত কর্তৃত্বের জোরটুকুতেই এবং এদের দায়িত্বজ্ঞানে। অর্থাৎ

অন্যদের থেকে এদের পার্থক্য ছিল নেহাতই একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে।

১৯৩৩ সালে ইউক্রেন সরকার আমাকে আহ্বান জানালেন একটা অত্যন্ত কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্যে কমিউন থেকে আন্দাজ এক শো জনের মতো সদস্য দিতে। এই কাজের জন্যে আমার কমিউনের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একটানা কয়েক মাস কমিউনের বাইরে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে থেকে পরিশ্রম করার কথা ছিল।

অথচ এ-কাজের জন্যে কমিউনের সেরা সদস্যদের পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা এই সেরা সদস্য বলতে সাধারণত সবচেয়ে উঁচু দুটি ক্লাসের ছেলেমেয়েদের বোঝাত, অথচ তারাই ছিল সাধারণভাবে আমার সবচেয়ে কুশলী কর্মী আর আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়ায় আমাদের কমিউনে লোকবলের ব্যাপারটা ছিল একেবারে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এইসব কুশলী কর্মী আমাদের ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ওয়র্কশপের ভারপ্রাপ্ত ছিল।

অতএব আমি করলুম কী, মাঝের ক্লাসগুলো থেকে ছেলেমেয়েদের বেছে নিলুম, তাদের মধ্যে থেকেই একদল দলপতি ঠিক করে দিলুম আর তারপর গোটা দলটাকে কয়েকটা বাহিনীতে দিলুম ভাগ করে। বলা বাহুল্য, আমি রীতিমতো একটা বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছিলুম। কেননা, আমি নিজে ওদের সঙ্গে যাচ্ছিলুম না এবং শুধুমাত্র রান্নাবান্নার তত্ত্বাবধানের জন্যে একজনকে দেয়া ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অন্য কাউকেও ওদের সঙ্গে পাঠাচ্ছিলুম না।

এখানে বলা দরকার যে ওই ছেলেমেয়েরা আলোচ্য কাজটা চমৎকারভাবে নিষ্পন্ন করেছিল এবং বাহিনীগুলির

যে-দলপতিদের আমি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই খেয়ালখুশিমাফিক বেছে দিয়েছিলুম তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, তাদের কর্তৃত্বের সীমারেখাটা কোথায় ও তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের মাত্রা কতখানি সে-সম্পর্কে তারা চমৎকার অবহিত।

কর্তৃত্ববোধের এই সুনির্দিষ্ট মাত্রা ও গুরুতর দায়িত্ববোধ বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্যে অবশ্যই বেশ কিছু সময়ের দরকার। আমি বলব, এ-জিনিস মাত্র দু'-এক বছরের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব এমন কোনো যৌথ সংগঠন আছে কিনা সন্দেহ।

যৌথ সংগঠনের মধ্যে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আগ্রহোদ্দীপক ও মসৃণভাবে সচল শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে চার থেকে পাঁচ বছর সময় দরকার।

এক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিমাণে খাটুনি ও অনেকখানি মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

এ-কাজের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ঘটলে শুধু-যে প্রাথমিক যৌথগুলি সংগঠিত করে তোলা যায় তা-ই নয়, বড় একটি যৌথ সংগঠনের মধ্যে সামাজিক দিক থেকে পরস্পর-নির্ভরশীলতাও গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

বাহিনীই ছিল আমার প্রাথমিক যৌথ সংগঠন।

গোড়ার দিকে বাহিনীগুলি আমি সংগঠিত করি সেইসব ছেলেমেয়েকে নিয়ে যারা একসঙ্গে পড়াশুনো ও কাজকর্ম করত।

পরে আমি ঠিক করলুম যে ছোট ও বড় ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা রাখা দরকার। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য আমি বুঝতে পারলুম যে এটা ব্যবস্থা হিসেবে ভালো নয়।

পরিশেষে বাহিনীগুলো এমনভাবে সংগঠিত করা হল যাতে প্রতিটি বাহিনীতেই কিছু একেবারে বাচ্চা ছেলেপিলে ও কিছু সতেরো-আঠারো বছরের তরুণতরুণীকে একত্র রাখা যায়।

শেষের এই সিদ্ধান্তে আমি পেঁছিলুম এ-কারণে যে আমার মনে হল, যতটা সম্ভব পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এমন একেকটা যৌথ গড়াই ছেলেমেয়েদের লালন করা ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যের দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী হবে। এর ফলে সত্যিসত্যিই কার্যক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছোট বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানের ভার নেয়ার, ছোট বাচ্ছাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধাভক্তি করতে শেখার এবং কমরেডসুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমস্ত রকমফের বিকশিত হয়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধে মিলে গিয়েছিল।

সমস্ত ব্যাপারটার তাৎপর্য ছিল এইখানে যে সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এর ফলে কিছুটা অন্তর্মুখ ধরনের বিচ্ছিন্ন একটা দলে ভাগ করে আলাদাভাবে রাখা হল না, আবার এর দৌলতে বড় ছেলেমেয়েরাও নিজেদের মধ্যে সন্দেহজনক গালগপ্পে মেতে সময় কাটানোর সুযোগ পেল না, কেননা তাদের বাধ্য হতে হল ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও তত্ত্বতল্লাস করতে।

এ-প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার হল সাময়িক কর্তৃত্বের প্রশ্নটি। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে একটা তুচ্ছ বিষয় বলে মনে হতে পারে, তবু আমার কাছে কমিউনে ও বাইরের জীবনে বহুসংখ্যক আগ্রহোদ্দীপক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করার পক্ষে এটা একটা ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটা ছিল আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিদিন করবার মতো

কাজ নিয়মিতভাবে নির্বাচন করা, আমার রক্ষণাধীন নানা ধরনের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই কাজগুলি ভাগবাঁটোয়ারা করে দেয়া এবং কাজ সমাধা হলে আমাকে তার রিপোর্ট দেয়া।

পরিশেষে, যৌথ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ছিল বড় একটি যৌথ সংগঠন পরিচালনার সামগ্রিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা।

কমিউনগুলিতে কাজের গোটা ষোলটা বছর ধরেই আমি এই ধরনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলেছি। এরা নির্বাচিত হোত বাহিনীগুলির দলপতি হিসেবে এবং সমগ্রভাবে নিজের-নিজের বাহিনী সম্পর্কে দায়িত্বশীল থাকত। এছাড়া এমন সব ছেলেপিলে নিয়ে গঠন করা হোত দলপতি-পরিষদ।

এই পরিচালন-সংগঠনটি তৈরি করা নিয়ে বরাবরই আপত্তি উঠতে দেখেছি আমি এবং সে-আপত্তি শুধু-যে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাক্ষেত্রের অধ্যাপকরাই করেছেন তা নয়, সাংবাদিক ও লেখকরাও এতে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে ব্যাপারটা বড্ড বেশি ফৌজী কায়দার এবং এতে ব্যারাক আর কুচকাওয়াজের মাঠের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, ওঁদের মধ্যে খুব কম জনই এই ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে তত্ত্বতল্লাস করতে আগ্রহী হয়েছেন।

আসলে দলপতি-পরিষদ ছিল একটা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ পরিচালন-সংগঠন। তার কারণ নিম্নরূপ: কলোনিতে ছিল মোট আটাশটি বাহিনী, অর্থাৎ এর অর্থ আটাশ জন দলপতি... দলপতি-পরিষদ তার নিজস্ব কাজের একটা ফিরিস্তি তৈরি করুক, আমি কখনোই এর

সপক্ষে ছিলুম না। আমার কাজের জন্যে আমি যাদের কাছে দায়ী ছিলুম উচ্চতর সেই সংগঠনগুলি বারবার এ-ব্যাপারে আমাকে চাপ দিলেও আমি কখনোই দলপতি-পরিষদের কাজের জন্যে কোনো একটিও কর্মতালিকা ছকে দিই নি বা তা উপস্থাপিত করি নি। আসলে পরিষদটি ছিল এমন একটি পরিচালন-সংগঠন যা প্রতিদিন উপস্থিত হচ্ছে এমন সমস্ত সুনির্দিষ্ট কাজ ও সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাত এবং, বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম ও তজ্জনিত সমস্যাদি কোনো পরিকল্পনার মধ্যে আগে থেকে ছকে দেয়া অসম্ভব ছিল।

শেষ আট থেকে দশ বছর আমার কমিউনে থাকার সময়ে দেখা গিয়েছিল এই দলপতি-পরিষদ সংগঠন হিসেবে নিজেকে কত বেশি পরিমাণে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও নমনীয় হতে পারে।

আমার কাজে তখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই আমি দলপতিদের সভা বসাতে পারতুম।

দলপতিদের একত্র জমায়েত হবার জন্যে বিউগ্‌ল-সংকেত জানানো হোত তখন। সংকেতটা ছিল তিনটে হ্রস্ব আওয়াজের সমষ্টি। সংকেতটা একবারমাত্র বাজানোই যথেষ্ট ছিল। যাতে দলপতিদের কেউ গাফিলতি করে সময় নষ্ট করার অভ্যেসে না ভোগে এবং সংকেত শোনামাত্র সরাসরি পরিষদের সভায় এসে উপস্থিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে কখনও তাদের দু'বার বিউগ্‌ল-সংকেত শোনানো হোত না।

আর এই বিউগ্‌ল-সংকেত কানে যাওয়া মাত্র দলপতিরা যে যেখানেই থাকুক-না কেন — তা সে ক্লাসরুমে, বাইরের

কোনো কাজে কিংবা স্নানের ঘরে — সেখান থেকেই ফিটফাট হয়ে সেজে তারা সভায় ছ্যুটে চলে আসত।

প্রথম-প্রথম এত দ্রুত তাদের সমবেত করা একটু কঠিন হোত, কিন্তু পরে এটা তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। এটা ছিল সত্যিকার একটা যৌথ প্রতিবর্তের ব্যাপার।

যদি আমার কোনো সহকারী এমন একটা পরিষদের সভা ডাকত, তাহলে বিউগ্‌ল-সংকেত শোনামাত্র আমি নিজেও আমার পক্ষে যত তাড়াতাড়ি দৌড়নো সম্ভব তত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সভায় পেঁাছে যেতুম।

এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্তের মতো ব্যাপার। দায়দায়িত্ব পালনের জন্যে আমাকেও দৌড়ঝাঁপ করতে হোত।

এই সমস্ত সভায় বক্তাদের জন্যে আমরা একটা বেশ মজার আইন জারি করেছিল্যুম। তা হল এই যে কাউকে একেক বারে এক-মিনিটের বেশি বলতে দেয়া হবে না। কেউ এর চেয়ে বেশি সময় বললে তাকে ‘বাচাল’ বলে গণ্য করা হোত আর কেউ তার বক্তৃতা শ্যুনতে চাইত না। অনেক সময় এই ধরনের সভার অন্যুষ্ঠান আমাদের করতে হোত কাজের ফাঁকে বিরতির সময়ে আর তা সারতে হোত পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে।

দলপতি-পরিষদের একদিনের সভার এক চালাক চেয়ার-ম্যান একবার একটা বালিঘড়ি সবাইকে দেখিয়ে বলল যে একেক দানা বালি পাত্রটার ওপর থেকে নিচে পড়তে যত সময় লাগে তার মধ্যে গোটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে ফেলা সম্ভব আর কাচের পাত্রটায় আছে দ্যু’-হাজার দানা বালি। এর অর্থ, যে-কেউ ইচ্ছে করলে তার জন্যে নির্দিষ্ট এক-

মিনিটের মধ্যে অনায়াসে দু’-হাজারটা শব্দ বলে ফেলতে পারে। আর অতগুলো শব্দ নিশ্চয়ই একজনের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত! সেই থেকেই ওই নিয়মটা একেবারে ‘আইন’এ পরিণত হয়ে গেল।

কলোনিতে সাধারণভাবে প্রচলিত দশ-ক্লাসের একটা স্কুল ছিল, আর সেটা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ীই সংগঠিত হয়েছিল।

এছাড়া আমাদের ছিল একটা ফ্যাক্টরি। সেখানে সব ছেলেমেয়েই দৈনিক চার ঘণ্টা করে কাজ করত। প্রতিটি কাজের দিনের ব্যাপ্তি ছিল ন’-ঘণ্টার, তার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা কাটাতে হোত স্কুলে আর চার ঘণ্টা ফ্যাক্টরিতে।

এছাড়া আমাদের বাইরের কোনো ঝাড়ুদার ছিল না, প্রতিদিন সকালবেলা ছেলেমেয়েদেরই সারা বাড়ির ঘরের মেঝে ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে সাফ করতে হোত। ধুলো বস্তুটার প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল বাড়িটাতে, বিশেষ করে কখনও-কখনও দিনে এমন কি তিন থেকে চারটে করে প্রতিনিধিদল আমাদের কমিউন পরিদর্শন করতে আসত বলে এই নিয়ম করা হয়েছিল। ফলে সবকিছুই একেবারে আনকোরা নতুন পিনের মতো ঝকঝকে-তকতকে করে রাখতে হোত।

ওপরের এইসব বাঁধাধরা নিয়মিত কাজকর্ম ছাড়াও আমাদের থেকে-থেকেই উৎপাদন-সম্পর্কিত সভা, কম্‌সমোল-সদস্যদের সভা, পাওনিয়রদের জমায়েত, ব্যায়ামক্রীড়ার প্রদর্শনী, ইত্যাদিতেও যোগ দিতে হোত। নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও সময় ছিল না আমাদের। তবে আশা রাখি যে ভবিষ্যতে সম্ভবত কাজের চাপ কিছুটা কমবে, কিছুটা ফাঁকা সময় পাওয়া যাবে, আর তখন সময়-সূচির

প্রতিটি মিনিট পর্যন্ত আগে থেকে ছকে দেয়ার দরকার করবে না।

আমরা যখন দলপতি-পরিষদের সভা ডাকতুম তখন দেখা যেত কিছু-কিছু দলপতি সভায় উপস্থিত থাকতে পারছে না কিংবা কোনো-না-কোনো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে কাজ করছে বলে সে-কাজে ছেদ ঘটাতে পারছে না। সেজন্যে পরে কোনো দলপতি সভায় যেতে না-পারলে তার বদলে তার সহকারীর সেখানে যাওয়াটা একটা রীতি ও কালক্রমে এটা 'আইন' হয়ে দাঁড়াল। আর সহকারীর পক্ষেও যাওয়া সম্ভব না-হলে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর অন্য যে-কোনো সদস্য বদলি হিসেবে সেখানে যেতে পারত।

সাধারণত প্রতিটি বাহিনীর সকল সদস্যই এটা জানত যে একটা বিশেষ দিনে যদি দলপতি-পরিষদের সভা বসে তবে সেদিন অমুক বা তমুক সদস্য সভায় যাবে। ক্রমশ দলপতি-পরিষদের সভাগুলোয় অমুক ইভানোভ বা তমুক পেত্রোভ উপস্থিত আছে কিনা সেটা নয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ইত্যাদি বাহিনীর প্রতিনিধি উপস্থিত আছে কিনা সেটা খোঁজ করাই রীতি হয়ে দাঁড়াল।

দলপতি-পরিষদের পক্ষে বাহিনীগুলির প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে দলপতি-পরিষদ ক্রমশ রূপ নিল বাহিনীসমূহের পরিষদে। অমুক বা তমুক বাহিনীর কোন বিশেষ সদস্য সভায় এসেছে এটা আর আমাদের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ থাকল না। বড় কথা হয়ে দাঁড়াল, প্রতিটি বাহিনী থেকে কেউ-না-কেউ, কমিউনের কোনো-না-কোনো সদস্য সভায় উপস্থিত হয়েছে।

তবে পরিষদের সভায় যখন কোনো গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোত তখন অবশ্য এ-বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখতুম যাতে সব দলপতিই সশরীরে সভায় আসে। কেননা, দলপতিরা তাদের নিজ-নিজ বাহিনী থেকে নির্বাচিত হোত না, তারা নির্বাচিত হোত কমিউনের সর্বসাধারণের পরিষদ থেকে।

এই সমস্ত রীতিপদ্ধতি আমরা ক্রমশ গড়ে তুলেছিলুম এই জন্যে যে দলপতি-পরিষদকে শুধুমাত্র সাধারণভাবে সমগ্র কমিউনের কাছেই নয়, প্রতিটি বাহিনীর কাছেও যাতে ওই বিশেষ বাহিনীর শুধু নয় গোটা কমিউনেরই ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের পরিষদ বলে ঠেকে। প্রতিটি বাহিনীর কাছে এই দলপতি-পরিষদ ছিল উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সামিল।

আলোচ্য ওই ষোল বছর ধরে দলপতি-পরিষদ আগাগোড়াই আমাকে আমার কাজে সাহায্য করে এসেছে। এজন্যে আমি পরিষদের কাছে গভীরভাবে ঋণী। এই সংগঠনটির প্রতি আমার আন্তরিক ও গভীর শ্রদ্ধা আছে। এটি কালক্রমে বিকশিত ও পরিবর্তিত হলেও সব সময়ে একই রকম ঐক্যবদ্ধভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ও একই লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কাজ করে গেছে।

এ-প্রসঙ্গে আমি আপনাদের দৃষ্টি কয়েকটি ব্যাপারের দিকে নিবদ্ধ করতে চাই।

আমরা, বয়স্ক সাবালকরা, নিজেদের বড্ড বেশি বুদ্ধিমান বলে ঠাওরাই, সর্বদাই ভাবি আমাদের জ্ঞান না-জানি কতই বেশি, সর্বদাই জানি কোনদিকে যাচ্ছি আমরা, আমরা সবকিছুই বুঝে ফেলেছি, ইত্যাদি। আর যখনই আমরা কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানে ঢুকি এবং কোনো নতুন

কাজের ভার পাই, তখনই আমরা আগে থেকে যা-কিছু আছে তা নাকচ করে দিই, বদলে দিই সবকিছু।

একারণেই আমাদের তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রে শিক্ষা-সংক্রান্ত যে-কাজকর্ম মাত্র বিশ বছরেরও কম সময় আগে সত্যিসত্যিই চালু হয়েছে, তা নানারকম প্রবণতা ও পদ্ধতির ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে ও ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়ে ওঠার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কমিউনে ষোল বছর কাটানোর একেবারে শেষে পেঁছে তবেই আমি টের পেয়েছি এই বিপর্যয়ের মূলটা কোথায়। আমি উপলব্ধি করেছি যে ঐতিহ্যকে—কিংবা বলা যেতে পারে, যাঁরা চার, পাঁচ অথবা ছ'বছর আগে শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়েছেন, কিছু-না-কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন যাঁরা ও নানা ব্যাপারের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন আমাদের পূর্বতন সেই পুরুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে—এমন যথেষ্ট পরিমাণে মূল্য দেয়া দরকার যাতে সেই প্রাক্তন পুরুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে অত সহজে নাকচ করার ব্যাপারটা এড়িয়ে চলা যায়।

এই সবকিছু বলার পরও নির্ভয়ে বলতে পারি যে পূর্বোক্ত ওই কমিউনটিতে এমন বহুসংখ্যক কৌতূহলোদ্দীপক, অভিনব ও যথাযথ নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল যে ওখানে কর্মরত কোনো কর্মচারি বিনা ক্লেশে এক-মুহূর্তের নোটিশেই কমিউন পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারতেন।

...হ্যাঁ, যা বলছিলুম। এবার শৃঙ্খলার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

আপনারা যদি আমার 'জীবনজয়ের পথে' বইটি পড়ে থাকেন তাহলে স্মরণ করতে পারবেন যে এই শৃঙ্খলারক্ষার

সমস্যা নিয়ে আলোচনা দিয়েই বইটি আমি শুরু করেছি। আমার রক্ষণাধীন একটি ছেলেকে মারধর করার ঘটনাটা স্মরণ করার মধ্যে দিয়েই বইটির শুরু।

'জীবনজয়ের পথে' বইতে আলোচ্য ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যখন অনেকের কাছ থেকেই এই অভিযোগ শোনা গেল যে আমি নাকি ছেলেপিলেদের মারধর করার সুপারিশ করেছি তখন একেবারে তাজ্জব বনে না-গিয়ে পারি নি।

আসলে 'জীবনজয়ের পথে' বই থেকে অমন ধরনের সিদ্ধান্ত টানার কোনো ভিত্তিই নেই। ব্যাপারটা বরং উল্‌টোই। এই ঘটনাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত করুণ একটা অভিজ্ঞতার দ্যোতক, আর তা এই অর্থে নয় যে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম, বরং এইজন্যে যে আমি নই যে-ছেলেটিকে আমি মেরেছিলুম সেই জাদোরভই ওই গোটা ব্যাপারটার একটা সদুত্তর খুঁজে পেয়েছিল। আমি-যে কতখানি হতাশার পঙ্কে ডুবে গিয়েছিলুম তা বোঝার মতো শক্তি ও সাহস ও নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল আর আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল সাহায্যের হাত।

মোটমাট ব্যাপারটা থেকে যে-শুভ ফল পাওয়া গিয়েছিল তা আমি যে-পদ্ধতি সেদিন প্রয়োগ করেছিলুম মোটেই তার ফলাফল নয়, যে-ছেলেটিকে আমি সেদিন শারীরিক শাস্তি দিয়েছিলুম এটা ছিল তারই মধ্যে আকস্মিকভাবে মানবিক গুণাবলী মূর্ত হয়ে ওঠার পরিণাম। অবশ্য এমন ব্যক্তিবিশেষের দেখা মেলার ভাগ্য সচরাচর সকলের হয় না, যাকে নাকি আঘাত করার পর সে আপনার দিকে পালটা বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে দেবে, বলবে আপনাকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত এবং কার্যত তাই-ই করবে সে। তবু আমি ছিলুম

সেই দুর্লভ ভাগ্যবানদের একজন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম।*

অবশ্য, বলা বাহুল্য, আমার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমি শৃঙ্খলা কায়েম করার অমন ধরনের একটা পদ্ধতির ওপর, বলপ্রয়োগের ওপর, ভিত্তি করে গড়ে তুলতে পারতুম না। আসলে আমি শৃঙ্খলা কায়েমের এমন একটা ব্যবস্থার সন্ধান পাই, যার প্রকৃত পরিচয় আমি আমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'বাঁচতে শেখা'য় একটা রূপরেখার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছি।

ওই উপন্যাসে আমি এমন এক কড়া, লৌহদৃঢ় ও সত্যিকার কঠিন শৃঙ্খলা কায়েমের কথা লিখেছি যা নাকি আদর্শ এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ। আর এটা একমাত্র আমাদের এই সোভিয়েত পিতৃভূমিতেই সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। এই ধরনের শৃঙ্খলার একটা ছাঁদ তৈরি করতে

---

* 'জীবনজয়ের পথে' বইটিতে জাদোরভকে জড়িয়ে উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে মাকারেঙ্কো নিম্নোক্ত মন্তব্যটি করেন: 'এই পুরো ব্যাপারটায় ওরা-যে মারের কথাটা মনে রেখেছে তা নয়, ওরা মনে করে রেখেছে একটা মানুষের প্রচণ্ড আবেগকে, প্রবল ক্রোধকে। ওরা ভালোই জানে, সেদিন গায়ে হাত তোলার দরকার ছিল না আমার, অনায়াসে জাদোরভকে সংশোধনের অযোগ্য বলে কমিশনের কাছে তাকে ফেরত পাঠাতে পারতুম, আর নানাভাবে বাকি সকলের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারতুম। কিন্তু আমি এ-সব কিছুই করলুম না, উলটো এমন একটা পথ বেছে নিলুম যা আমার নিজের পক্ষেই বিপজ্জনক ছিল। তবু এই শেষের পথটা ছিল মানবোচিত, আমলাতান্ত্রিক নয়। তাছাড়া, যতই যাই হোক, আমাদের এই কলোনিতে থাকা ওদের সত্যিই দরকার। এছাড়া অন্য কোনো কিছু করা ওদের পক্ষেও অত সহজ নয়। আর ওরা তো দেখছে আমরা ওদের জন্যে কী রকম কাজ করছি।'

গেলে যে-পরিমাণ খাটতে হবে তা খুবই কঠোর। আর এর জন্যে দরকার সৃষ্টিশীল কর্মশক্তি ও সত্যিকার অনুপ্রেরণা, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও জবরদস্ত ব্যক্তিত্ব। এ-কাজ যে করতে যাবে তাকে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে।

কাজটা কঠিন এজন্যেও বটে যে এক্ষেত্রে সাফল্য আসে খুবই ধীরে-ধীরে ও একটু-একটু করে। এবং অগ্রগতির মাত্রা হয়ে ওঠে প্রায় দুর্লক্ষ্য। এ-কাজে সামনের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারণের ক্ষমতা থাকা চাই, যেন আজকের দিনটিকে দেখছি এইভাবে পরিবেশকে অতিক্রম করে সবকিছু দেখতে পারা চাই।

এ-ধরনের শৃঙ্খলা কায়েমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি ভালোই অবহিত। তা হল গভীর সচেতনা এবং আচরণের অত্যন্ত কঠোর ও প্রায় যন্ত্রসুলভ যথাযথ মানের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান ছাড়া কিছু নয়।

এমন কোনো উন্নতিসাধক শৃঙ্খলাচর্চার কথা আমি কল্পনা করতে পারি না যা কেবলমাত্র মানুষের বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে শৃঙ্খলাবিধান অসম্ভব ব্যাপার এবং এ-বস্তু সর্বদাই নিছক নৈতিক ছুৎমার্গে পরিণত হতে চায়। এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিচর্চার ওপর বড্ড বাড়াবাড়িরকম নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, প্রতিটি কাজকে যে-কোনো দুটি বিকল্পের একটি হিসেবে দেখে এবং কোনটিকে-যে বেছে নেয়া হবে তা নিয়ে সর্বদাই ইতস্তত করতে থাকে।

ব্যক্তিবিশেষের বিবেক ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর না-করে যে-শৃঙ্খলার চর্চা করা হয় তা সর্বদাই মাত্রাতিরিক্ত যুক্তিবাদী ধরনের হয়ে থাকে। এমন শৃঙ্খলার চর্চা যে-কোনো যৌথ সংস্থায় আচরণের ছাঁদকে বদলে দেবে এবং

শেষপর্যন্ত একটার-পর-একটা বিসংবাদ, সমস্যা ও মন-কষাকষির সৃষ্টি করতে থাকবে।

আবার এর বিপরীত ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রথা, অন্ধবিশ্বাস, অনুশাসন ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে-তোলা শৃঙ্খলাচর্চার ফলে পরিচালকের ভূমিকা নেয় যে-ব্যক্তি তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও যান্ত্রিকভাবে নতিস্বীকারের প্রবণতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা।

আমাদের শৃঙ্খলাচর্চার সঙ্গে উপরোক্ত ওই দুটি ধরনেরই মিল নেই। এই শৃঙ্খলাচর্চা ছিল একাধারে বিবেকপরায়ণতা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কীভাবে আমাদের আচরণ করা উচিত সে-সম্বন্ধে সর্বজনস্বীকৃত গভীর একটা বোধ এবং সেইসঙ্গে যাতে কোনোরকম বাদ-বিসংবাদ, ভুল-বোঝাবুঝি, ওজর-আপত্তি, গাফিলতি ও ফাঁকা বুলি আওড়ানো, ইত্যাদির অবকাশ নেই এমন পুরোপুরি নিখুঁত বাহ্য ধরনধারণের একটা সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ। শৃঙ্খলা কায়েমের একটিই ব্যবস্থার মধ্যে দু'রকম উপাদানের এমন একটা সামঞ্জস্য অর্জন রীতিমতো কষ্টসাধ্য।

আমার গড়া যৌথ সংস্থা যে এমন সামঞ্জস্যবিধানে সফল হয়েছিল তা নিছক আমার দৌলতে নয়, নানা অনুকূল ঘটনা ও বহু ব্যক্তির মিলিত প্রয়াসের ফলেও বটে।

কিন্তু বিবেকপরায়ণতার সঙ্গে শৃঙ্খলা কায়েমের যথাযথ পদ্ধতিগুলির এমন একীকরণ সম্ভব হল কোন উপায়ে?

আসলে ব্যাপারটার সঙ্গে বহু জিনিস জড়িত ছিল। শেষ বিচারে দেখা গেছে যে সকল পদ্ধতি ও সব রকম কলাকৌশল এই উদ্দেশ্যটি সফল করে তুলতে সাহায্য যুগিয়েছে। আমাদের ওই পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলাচর্চা সফলভাবে কাজ সমাধা করার একটা পূর্বশর্ত ছিল না। আমাদের দেশে

সাধারণত লোকে ভাবে যে উপরোক্ত ওই জাতীয় শৃঙ্খলা কায়েম করা ভালোভাবে কাজ করার পক্ষে বুঝি অপরিহার্য একটা পূর্বশর্ত। আমি কিন্তু সম্প্রতি এটা উপলব্ধি করেছি যে খাঁটি শৃঙ্খলাবোধ কাজের পূর্বশর্ত হতে পারে না, গোটা একটা কর্মসূচি নির্বাহ করা এবং নানারকম পদ্ধতি প্রয়োগের গোটা একটা ব্যবস্থার ফলাফলমাত্র হতে পারে তা। শৃঙ্খলা কখনোই একটা কর্মপদ্ধতি নয়, কখনোই তা একটা পদ্ধতি হতে পারে না। যখনই শৃঙ্খলাকে একটা কর্মপদ্ধতি বলে গণ্য করা হয় তখনই তা বিনা ব্যতিক্রমে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। তা কেবল গোটা একটা কর্মসূচির সামগ্রিক ফলাফলমাত্র হতে পারে।

শৃঙ্খলা হল একটা যৌথ সংগঠনের বাইরের অবয়বের ব্যাপার। শৃঙ্খলা হল যৌথের কণ্ঠস্বর, তার সৌন্দর্য, তার গতিময়তা, তার ভাবভঙ্গি, তার আত্মবিশ্বাস। যা কিছু যৌথটির নিজস্ব বলতে আছে তাই-ই শেষপর্যন্ত শৃঙ্খলার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

শৃঙ্খলা হল গভীর অর্থে রাজনৈতিক একটা ব্যাপার। এটা এমন একটা জিনিস যাকে সোভিয়েত নাগরিকের পক্ষে আত্মচেতনার নামান্তর বলে আমরা উল্লেখ করতে পারি। এখন আমি এ-কথাটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে শিখেছি।

আমি আপনাদের বলতে পারি যে গত ওই ষোল বছরের জীবনে এই মহা-গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ বা সমাধানের ইঙ্গিতটি ধরতে পারা আমার পক্ষে একদমই সম্ভব হয় নি, আমি আবিষ্কারই করতে পারি নি এই সূত্রটি যা নাকি সবকিছুকে তাদের যথাযোগ্য জায়গায় স্থান করে দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে পারে।

অতএব শৃঙ্খলাবিধানকে শিক্ষাদানের উপায় হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। আমি বরং শৃঙ্খলাকে শিক্ষার ফলাফল বলতে পারি।* যখন কেউ একজন বিশেষ একটা কাজের কথা বলে এবং অপর কেউ প্রথম জনের যা বলার আছে তার সবটুকু মন দিয়ে শোনে, একমাত্র তখনই-যে শিক্ষার এই ফলাফলটা টের পাওয়া যায় তা নয়। যখন কোনো এক ব্যক্তি অন্য কারও উপদেশ ছাড়া নিজে থেকেই বোঝে যে কীভাবে তার কাজ করা উচিত তখনও শিক্ষার এই ফলাফলটা অনুভব করা যায় বই-কি।

কমিউনে ছেলেমেয়েরা বলত যে কোনো একজন কতটা শৃঙ্খলাপরায়ণ তা অন্যের সামনে ওই ব্যক্তিবিশেষের আচরণ কিংবা তার হুকুম তামিল করার ধরন অথবা তার ওপর যে-কাজের ভার দেয়া হয়েছে সেই কাজটি করার পদ্ধতি দিয়ে তারা বিচার করবে না। সে কী করছে তা-যে অন্য লোকে জানে এ-ব্যাপারটা অবগত না-থাকলে সেই ব্যক্তিবিশেষ কীভাবে কাজ করে থাকে তা-ই তারা দেখতে চায়।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক কেউ একজন নকশা-কাটা কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে দেখতে পেল মেঝের ওপর এক-টুকরো বাজে কাগজ পড়ে আছে। এখন, কেউ হয়তো তাকে দেখছে না এবং সে-ও হয়তো কাউকে কাছেপিঠে দেখতে পাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও সে মেঝে

---

* পরে অবশ্য মাকারেঙ্কো এই সূত্রটিকে কিছুটা বদলেছিলেন, অর্থাৎ শৃঙ্খলা শিক্ষার ফলাফল না শিক্ষার উপায় এ-নিয়ে পার্থক্য নির্দেশের একটু বেশি জবরদস্তি চেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন। পরে তিনি লিখেছেন: ‘সবচেয়ে বড় কথা শৃঙ্খলাবিধান শিক্ষাদানের উপায় নয়, শিক্ষাদান-পদ্ধতির ফলাফলমাত্র, তবে একমাত্র পরে তা শিক্ষাদানের উপায় হয়ে থাকে।’ (‘শিক্ষা-বিষয়ে আমার মতামত’)।

থেকে ওই বাজে কাগজের টুকরোটা কুড়িয়ে নেবে কিনা সেটাই হল এক্ষেত্রে বড় কথা। তবু যদি সে কাগজটা কুড়িয়ে নেয় ও তারপর যথাস্থানে সেটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় এবং তখনও যদি কেউ তাকে লক্ষ্য না-করে — হ্যাঁ, তাহলে অবশ্য বলা যেতে পারে যে লোকটি সত্যিই শৃঙ্খলাপরায়ণ।

কমিউনে প্রতিদিন ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার বা দলপতির আচরণে এই শেষের ধরনের শৃঙ্খলাবোধটিই বিশেষরকম স্পষ্ট হয়ে সবার চোখে ধরা পড়ত।

কমিউনে এই কাজটি যারা করত তারা সাধারণত ছেলে বা মেয়ে ব্রিগেডিয়ার বা দলপতি হোত। কমিউনের সবচেয়ে বয়স্ক ছেলেমেয়েরা সাধারণত এ-কাজ করত না, কেননা সবচেয়ে বয়স্ক কম্‌সমোল-সদস্যদের, কম্‌সমোল কমিটির সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের ওপর এর চেয়ে আরও বেশি দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্মের ভার ন্যস্ত থাকত। যেমন, তাদের মধ্যে কারও-কারও ওপর ভার থাকত আমাদের দেয়ালপত্রিকা সম্পাদনা করে বের করার, অন্যেরা তদারকি করত আমাদের কমিউনের ফ্যাক্টরির ওয়ার্কশপগুলো, নকশা-তৈরির অফিসের কাজকর্ম, কম্‌সমোল সংগঠনের কাজকর্ম এবং ওদেরই মধ্যে একজনকে আবার হতে হোত কম্‌সমোলের সেক্রেটারি। অন্যপক্ষে ছেলে ও মেয়েদের বাহিনীগুলোর পূর্বোক্ত দলপতিরা হোত মাত্র পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সের যতসব ছেলেমেয়ে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শেষোক্ত এই ছেলেমেয়েদের অপরকে শাস্তি দেবার অধিকার থাকত না। কমিউনে এদের অন্য কোনো বিশেষ অধিকারও-যে থাকত তা নয়। তবে প্রতিদিনের ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার ওই বিশেষ দিনটির মতো কমিউনের ভারপ্রাপ্ত হোত।

ওই সময়ে বিশেষ করে শৃঙ্খলারক্ষার জন্যে ভারপ্রাপ্ত কোনো বয়স্ক শিক্ষক বা শিক্ষিকা আমাদের ছিলেন না। সেই ১৯৩০ সাল থেকেই আমি এরকম শিক্ষক নিযুক্ত করার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে চলতে মনস্থ করি। ইশকুলে পড়াবার জন্যেই শুধুমাত্র তারপর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হোত, বয়স্ক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করার আর দরকার পড়ছিল না। এরপর পুরো আট বছর ধরে একজনও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না-রেখেই কমিউনটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলে।

প্রতিদিন ভোর ছ'টা থেকে মাঝরাত্রি কিংবা মাঝরাত্রি থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত কমিউনে যা-কিছু ঘটত তার জন্যে দায়ী থাকত এই ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার। ওই বিশেষ দিনটিতে কাজের সময়সূচি যাতে সবাই যথাযথ ও নিয়মিতভাবে মেনে চলে, সবকিছু যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানোগোছানো থাকে, অতিথি-অভ্যাগতদের যাতে ঠিকমতো আপ্যায়ন করা হয়, খাবারদাবার যাতে ঠিকসময়ে ও ঠিকমতো দেয়া হয়, ওই বিশেষ দিনটিতে যদি কোনো প্রমোদভ্রমণ বা বনভোজনের কর্মসূচি থাকে তাহলে যাতে ঠিকমতো তা প্রতিপালিত হয় কিংবা অন্য কোনো অতিরিক্ত কাজের পরিকল্পনা থাকলে তা-ও যাতে যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয় — এই সবকিছুর জন্যেই ওই ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার দায়ী থাকত। একমাত্র রাত্রেই ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার ঘুমনোর অধিকার পেত।

কমিউনের সাধারণ সভা একমাত্র তাকেই হুকুম জারি করার অধিকার দিত। ক্রমশ এই অধিকার একটা ভারি জটিল ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ-অধিকার অর্জন করে প্রত্যেকেই দারুণ গর্ববোধ করত এবং এতটুকু ইতস্তত না-করে এই ঐতিহ্য মেনে চলত।

এইসব পনেরো বছরের ছেলেমেয়েরা এমন কি সবচেয়ে বয়স্ক কম্‌সমোল-সদস্যকে কিংবা কমিউনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সদস্যকে পর্যন্ত এক-মুহূর্ত ইতস্তত না-করে বলতে পারত — ন্যাতাটা তুলে নিয়ে মেঝেয়-পড়ে-থাকা জলটুকু মুছে নিন।

আর, যাই হোক-না কেন, তার হুকুম সবাইকেই মেনে চলতে হোত। যাকেই হুকুম করা হোত সে-ই বলতে বাধ্য থাকত: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কমরেড ব্রিগেডিয়ার!'

কেউ যদি জলটুকু মুছে নিত কিন্তু ওই 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কমরেড ব্রিগেডিয়ার' না-বলত, তাহলে সে-যে ঠিকমতো হুকুম তামিল করেছে তা বোঝাত না।

ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে বসে-বসে কথাবলার হুকুম ছিল না, একমাত্র খাড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে কথা বলা যেত। কমিউনের সদস্যদের ব্রিগেডিয়ারের হুকুমে আপত্তি জানানোরও অধিকার ছিল না। তারা আমার সঙ্গে তর্ক করতে পারত, যে-কোনো বাহিনীর দলপতি বা ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গেও তর্ক করতে বাধা ছিল না, কিন্তু ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে তর্ক জোড়ার অধিকার ছিল না কারও। কেননা, সাধারণভাবে এটা মনে করা হোত যে এই শেষোক্ত ব্রিগেডিয়ারকে অনেক কাজ করতে হয়, কাজেই প্রত্যেকেই যদি কথায়-কথায় তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় তাহলে সে-বেচারা তো কাজের স্তূপে একেবারে চাপাই পড়ে যাবে।

এমন কি ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার যদি কোনো বিশেষ কাজটি করার বেঠিক কোনো উপায় বাতলে দিত তাহলেও তার সেই হুকুম তামিল করা কমিউন-সদস্যদের কর্তব্য বলে গণ্য হোত। অন্ততপক্ষে কাজটি করার চেষ্টা চালানো

এবং ব্রিগেডিয়ারের সমাধান-যে বেঠিক তা ভুলে যাওয়া কর্তব্য বলে গণ্য ছিল।

এমন কি আমারও অধিকার ছিল না ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের পেশ-করা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তার ঠিক-বেঠিক যাচাই করার।

সে হয়তো রিপোর্ট দিল যে অমুক বাহিনীতে অমুক ব্যাপার ঘটেছে। সকলের উপস্থিতিতে স্যালুট দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে রিপোর্ট পেশ করল। আর সেই রিপোর্ট পেশ করার সময় অন্য সবাইকেই তা দাঁড়িয়ে শুনতে হল।

আর তখন যদি কোনো ব্যাপারের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ জাগত তাহলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে ডাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনো অধিকার ছিল না আমার। সে-কাজটাকে তাহলে ব্রিগেডিয়ারকে চরম অপমানের সামিল বলে গণ্য করা হোত।

এ-ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই নিচের এই ঐতিহ্যটি গড়ে উঠেছিল: ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার আগের দিন যে-ব্যক্তিটিকে কোনো ব্যাপারে দোষারোপ করেছিল সে পরদিন অবশ্য বলতে পারত যে ব্রিগেডিয়ার 'বাজে ধাপ্পা' দিয়েছে। কিন্তু তাকে কথাটা এমনভাবে বলতে হোত যাতে সেটা আমি না-শুনতে পাই, কেননা অমনধারা কথাবার্তা কানে এলে আমাকে সেই ছেলেটিকে কয়েদ করতে হোত। এমন কি ব্রিগেডিয়ার যদি সত্যিসত্যিই 'বাজে ধাপ্পা' দিত, তাহলেও আমার উপস্থিতিতে অন্য ছেলেদের সেকথা বলার সাহস ছিল না। কেননা, ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার ওই আলোচ্য সময়ে গোটা কমিউনের কাজকর্মের জন্যে দায়ী ছিল আর আমরাও তাকে মেনে চলতে বাধ্য ছিলুম।

তবে পরের দিন অবশ্য যে-কেউ এগিয়ে এসে বলতে পারত যে আগের দিনের ওই ব্রিগেডিয়ার দুর্বল চরিত্রের লোক এবং তাকে যেন ওই ডিউটিতে আর বহাল করা না-হয়। কিন্তু তার আগের দিন ব্রিগেডিয়ার রিপোর্ট পেশ করার সময় কাউকেই কোনো কথা বলতে দেয়া হোত না। এই প্রথা অনর্থক ঝগড়াঝাঁটি এড়াতে আমাদের সাহায্য করেছিল।

এক্ষেত্রে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এইটে যে ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের পেশ-করা রিপোর্ট কখনও যাচাই করে দেখা হোত না। প্রতি সন্ধেয় ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার আমার কাছে ওই বিশেষ দিনটিতে কে কী করেছে তার রিপোর্ট পেশ করত এবং এমন একটা দিনের কথাও মনে পড়ে না যেদিন আমাকে মিথ্যে খবর দেয়া হয়েছে। মিথ্যে কথা বলা ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল।

ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ার বাইরে এমনিই ঘুরে বেড়ানোর সময় যদি তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত আর সে যদি তখন আমাকে কোনো ব্যাপারে কিছু বলত তাহলে সেদিনকার সন্ধেবেলার মিটিঙে আমি সে-ব্যাপারটা যাচাই করে নিতে পারতুম। কিন্তু অন্যদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যদি সে কিছু বলত আমায় তাহলে তার খবরের সত্যিমিথ্যে যাচাই করে দেখার কোনো প্রশ্নই ছিল না। এ-প্রসঙ্গে কমিউনের সদস্যরা প্রায়ই বলত: 'কিন্তু ও তো কথাটা আন্তন সেমিওনভিচরে গোপনে বলে নাই, কথাটা বলার সময় ওনারা তো বাগানে বসি আরাম করতিছিলেন না। কথাটা ও সবার সামনি রিপোর্ট পেশ করার সময় স্যাল্যুট দিতি-দিতি বলেছে। কাজেই ও মিথ্যা কথা কয়

কেমন করে? অমন অবস্থায় কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে না।’

ছেলেমেয়েরা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে গোটা পরিস্থিতি এবং ডিউটিরত ব্রিগেডিয়ারের দায়িত্বজ্ঞান তার পক্ষে বানিয়ে বলা বা মিথ্যে কথা বলা একেবারে অসম্ভব করে তোলে। এটাই একটা নৈতিক আইনের সামিল ছিল, অতএব সত্যিমিথ্যে যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন পড়ত না।

এই হল গিয়ে শিক্ষাদানের অর্জিত ফলাফল, যাকে এক কথায় শৃঙ্খলা আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি বলেন কোন-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে তবেই এমন ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে, তাহলে বলব, একটি যৌথকে স্ব-নির্ধারিত একটি সংগঠন হিসেবে পরিচালনা করা এবং শিক্ষাদানের দক্ষতার মধ্যে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

শিক্ষাদানের দক্ষতা একটা মস্ত বড় গুরুত্বের ব্যাপার। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে এই দক্ষতার ব্যাপারটাকে সময় কিংবা মনোযোগ দেয়ার যোগ্য কোনো বিষয় বলেই কেউ মনে করেন না। স্পষ্ট কথা বলতে গেলে, শিক্ষাদানের দক্ষতা-যে কী ব্যাপার তাই-ই জানেন না তাঁরা। বর্তমানে অবস্থা যা তাতে এই দক্ষতার ব্যাপারটাকে সত্যিসত্যিই অপেশাদারের ব্যাপার আখ্যা দেয়া চলতে পারে আর আমার পক্ষেও তা অস্বীকার করার কিছু নেই।

এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে আমাকেও বহু বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়েছে। বিশেষ করে এইজন্যেও তা ঘটেছে যে নিজেকে আমি কখনোই প্রতিভাবান শিক্ষক বলে মনে করি নি। সত্যি কথা বলতে কী, এখনও আমি নিজেকে তা মনে করি না, কেননা সত্যিই তা যদি হতুম আমি তাহলে

কখনোই সমস্যাটা নিয়ে এত বেশি সময় আমাকে মাথা ঘামাতে হোত না, এত বেশি ভুলভ্রান্তি ঘটত না এবং বাধার সম্মুখীন হয়ে এত বেশি পিছু হটতেও হোত না আমাকে।

এখনও পর্যন্ত এটা আমার গভীর বিশ্বাস যে আমি সম্ভবত ছাঁচে-ঢালা, গড়পড়তা, সাধারণ একজন শিক্ষকের চেয়ে বেশি কিছু নই। এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করার মতো কোনো যুক্তিও নেই। তবু, তা সত্ত্বেও, শিক্ষাদানের দক্ষতা অর্জনে আমি সমর্থ হয়েছি, আর এটাই হল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

শিক্ষকতায় দক্ষতা ও ওস্তাদি কোনো হৃদয়বান পরিশ্রমী প্রতিভার বিশেষ ধরনের শিল্পকৌশল নয়। তবে এটা হল গিয়ে একটা বিশেষ বিষয় যা ডাক্তার কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ যেভাবে তাঁদের বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন সেইভাবে আয়ত্ত করা শিখতে হয়। নেহাত জড়বুদ্ধির মানুষ না-হলে যে-কোনো লোক ডাক্তারিবিদ্যা শিখতে পারে ও রোগীর রোগ সারাতে পারে, তেমনই নেহাত জড়বুদ্ধি না-হলে যে-কোনো ব্যক্তি সঙ্গীতচর্চা করে সঙ্গীতজ্ঞও হতে পারে। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ পেশাটা ভালো করে আয়ত্ত করবে আবার কেউ তেমন পারবে না; যন্ত্রপাতির গুণাগুণ, পাঠক্রম, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে এই ব্যাপারটা। অথচ শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদানের জন্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার, অর্থাৎ তা শেখার, কোনো সুযোগসুবিধে নেই।

কিন্তু শিক্ষাদানের দক্ষতা বস্তুটা কী? এখানে আমি শিশুলালন ও তার শিক্ষাদানের ব্যাপার দুটোর মধ্যে একটা ফারাক টানতে চাই। আমি জানি, প্রতিটি শিক্ষা-বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আমার এই মনোভাবে আপত্তি জানাবেন। তবু আমি বিশ্বাস করি যে শিশুলালনের প্রক্রিয়াকে

যুক্তিসঙ্গতভাবেই পৃথক করে দেখা দরকার। বস্তুত, শিশুলালন বা ছেলেপিলে মানুষ করার দক্ষতাকে আলাদাভাবে বিচার করা চলতে পারে।

দেখতে শেখার ক্ষমতা, সরাসরি দেখতে শেখার ক্ষমতাই, বিকশিত করে তোলা সম্ভব এবং বস্তুত তা প্রয়োজনীয়ও। শিশুলালনের ব্যাপারে কাজ করতে গেলে এটা একেবারে অপরিহার্য। এই ধরনের কাজে যে-কারও মুখ, যে-কোনো শিশুর মুখ দেখে তার মনের কথা ধরতে পারার ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এই ধরনের 'মনের কথা ধরা'র ব্যাপারটা একটা বিশেষ পাঠক্রমের কাঠামোর মধ্যে ধরিয়ে সে-ব্যাপারে শিক্ষাদান পর্যন্তও চলতে পারে। কারও মুখ দেখে সে-মুখের অন্তরালে আবেগ-অনুভূতির কোন প্রক্রিয়া চলেছে তা ধরতে শেখার মধ্যে বিশেষ কোনো অতীন্দ্রিয় বা সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার করে না।

শিক্ষাদানের দক্ষতার অপর একটি অঙ্গ হল কণ্ঠস্বর-নিয়ন্ত্রণ এবং বস্তুত সেইসঙ্গে মুখভঙ্গির নিয়ন্ত্রণও বটে।

আজ আপনাদের শ্রদ্ধেয় ডিরেক্টরকে আমার সামনে একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে শুনলুম। লোকের সঙ্গে অমনভাবে কথা বলতে আমি অনেককেই শুনি নি। আমি তোষামোদ করব না, বলব না যে ছেলেপিলেদের সঙ্গে কথা বলায় তাঁর দারুণ দক্ষতা আছে। তবে এ-ও ঠিক যে ছেলেটির সঙ্গে তাঁর এই-যে কথাবলার ধরন, এটাই হল শিক্ষাদানের দক্ষতার একটা নমুনা। উনি ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন রাগত গলায় এবং ছেলেটিও ধরতে পারল যে উনি রেগে গেছেন, খেপে গেছেন একেবারে। আর ওখানে ঠিক এটারই

জানান দেয়া দরকার ছিল। আমার কাছে এই ব্যাপারটা শিক্ষাদানের দক্ষতার পরিচয় বলে মনে হয়েছে। আমি দেখলুম, ডিরেক্টর চমৎকার অভিনয় করলেন।

অভিনয় না-করে শিক্ষকের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। যিনি অভিনয় করতে অপারগ তিনি কখনোই শিক্ষক হতে পারবেন না। আমাদের পক্ষে নিজেদের মনমেজাজের ওপর নির্ভর করে শিক্ষকতা করা এবং আমাদের যথার্থ মানসিক আবেগ ও দুশিচন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ছেলেপিলে মানুষ করা একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়। যতই যাই হোক, আমরা মানুষ তো বটে। কাজেই অন্যান্য পেশার লোক যদি নিজেদের মানসিক দুঃখকষ্টের শিকার না-হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, তবে আমাদের পক্ষেও তা সম্ভব হওয়া উচিত।

অবশ্য কখনও-কখনও কোনো বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে এটা দেখানোরও দরকার হতে পারে যে আমরা যেন অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। আর এজন্যেও অভিনয় করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অবশ্য তাই বলে বাড়তি নাটুকেপনা দেখানোর-যে দরকার আছে তা মোটেই নয়। শিক্ষকের এই অভিনয় এবং শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব — এ-দুয়ের মধ্যে কোনো এক ধরনের একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। ব্যাপারটা নিছক অর্থহীন কোনো খেলা নয়, নিছক কারিগরি কৌশল দেখানোরও প্রশ্ন নয় এটা। আমাদের নিজেদেরই আবেগময় ব্যক্তিত্বের গভীর গহনে যে-সমস্ত প্রক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে আছে একে তারই একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন হতে হবে। আর ছাত্রছাত্রীদের কাছে এইসব আবেগগত প্রক্রিয়াই প্রকাশ পাবে ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদির রূপ নিয়ে।

এ-ব্যাপারে আমি নিজে ওস্তাদ হয়ে উঠলুম একমাত্র তখনই, যখন 'এদিকে এস' এই কথাদুটো আমি পনেরো থেকে বিশরকম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করতে শিখলুম, যখন আমি মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে কথাদুটোর উচ্চারণে বিশরকমের অল্পবিস্তর বিভিন্ন বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে সমর্থ হলুম। ওই সময়ের মধ্যে আমার আর এ ভয় রইল না যে এমন কেউ থাকতে পারে যাকে কাছে আসতে বললেও সেকথা সে মানবে না বা তার কাছে কী-যে চাওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে-ব্যাপারে সে অবহিত হয়ে উঠবে না।

আমাদের মধ্যে যারা শিশুলালনের কাজে নিরত তাদের পক্ষে পদে-পদে এই ধরনের ক্ষমতা দেখানোর দরকার হয়ে পড়ে এবং তাও আবার সর্বদাই-যে ব্যক্তিযুগলের পরিবেশে — অর্থাৎ যেখানে কেবলমাত্র আমি শিক্ষক ও তুমি ছাত্র আমরা এই দু'জনেই আছি — তা নয়। এই পরিবেশ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটার সময় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

এমন কি সেইসব অবস্থায় যেখানে কেউ আপনার দিকে তাকাচ্ছেও না পর্যন্ত সেখানেও শিক্ষক হিসেবে আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব আছে। কথাটাকে আজগবি বলে উড়িয়ে দেবেন না।

এমনও হয়েছে যে কখনও-কখনও আমি হয়তো আমার পড়ার ঘরে একা বসে আছি আর কমিউনের ছেলেপিলেরা হয় নিজের-নিজের কাজকর্ম করছে আর নয়তো পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আছে। আর হয়তো এমন হল যে কারও ওপর রেগে গিয়ে চোটপাট করার পর তখনই সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে দিয়ে আরও একটা কাজ আমায় করিয়ে নিতে হবে। এ-

সমস্ত ক্ষেত্রে এমন একটা সুনির্দিষ্ট মুখভঙ্গি আমি অবলম্বন করতুম যে তারপর যারাই আমাকে দেখত সকলের ওপরই আমার ওই ভঙ্গির প্রভাব পড়ত। যেমন কেউ হয়তো এরপর আমার ঘরে ঢুকল আর তারপর ফিরে গিয়ে কিংবা এমন কি পথে যেতে-যেতেই অন্য কাউকে আমাকে দেখার প্রতিক্রিয়াটা ফিস্‌ফিস করে জানিয়ে দিল এবং এরপর দেখতে-দেখতে পরিস্থিতিটা সকলের কাছেই কিছু পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যেত।

এর অর্থ এ নয় যে কোনো এক ব্যক্তির মেজাজ গোটা কমিউনের মেজাজকে একই তারে বেঁধে দিত। মেজাজ নিয়ন্ত্রণ-যে কত গুরুত্বপূর্ণ শুধু সেটা বোঝাবার জন্যেই এটা বলা।

ধরা যাক, আমি যদি ওই সময়ে পড়ার ঘরে বসে রাগ-রাগ ভাব না-দেখিয়ে কাঁদতুম কিংবা ফোঁপাতে থাকতুম তাহলে সে-ব্যাপারটাও দেখতে-দেখতে সবাই জানতে পেরে যেত এবং তারও এক ধরনের একটা ফল ফলতে দেখা যেত।

এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সবকিছু মনোযোগের ব্যাপার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যেমন, আপনি প্রতিদিন নিয়মিত দাড়ি কামান কিনা কিংবা জুতো পরিষ্কার করেন কিনা সে-ব্যাপারেও এটা সত্যি। যে-শিক্ষক পকেট থেকে নোংরা দোমড়ানো-মোচড়ানো রুমাল ছাত্রছাত্রীদের সামনে বের করতে পারেন তিনি শিক্ষক নামের আর যোগ্য থাকেন না। শিক্ষক থাকতে গেলে তাঁর পক্ষে ভালো হয় যদি তিনি কোনো একটা লুকনো কোণে সরে গিয়ে নাক ঝাড়েন এবং তখন কেউ তাঁকে যাতে না-দেখে সে-সম্বন্ধে সাবধান হন।

সুনির্দিষ্ট কিছু-কিছু পদ্ধতি উদ্‌ভাবনের পক্ষে শিক্ষাদানের এই দক্ষতা খুবই কাজে লাগে। এ-সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে আমি প্রায়ই পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, যে-ছেলেপিলেরা অন্যায় কিছু করত তাদের অনায়াসেই আমি পড়ার ঘরে ডেকে নিয়ে ধমকধামক দিতে পারতুম, তবু আমি কোনোদিন ওভাবে কাজ করি নি। আমি করতুম কী, যে-ছেলে বা মেয়েকে আমার দরকার তাকে একখানা চিরকুট পাঠিয়ে দিয়ে তাতে লিখে দিতুম যে সে যেন অতি অবশ্যই ওইদিন রাত্রে — ধরা যাক, এগারোটার সময় — এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি-যে বিশেষ করে তাকে কিছু বলার মতলবে এটা করতুম তা কিন্তু নয়, তবে আমি জানতুম এতে সে বিচলিত হয়ে পড়বে, রাত এগারোটা পর্যন্ত ইতিউতি পায়চারি করে বেড়াবে আর তাকে আমি কী কথা বলতে পারি তা-ই নিয়ে জল্পনাকল্পনা করবে। জানতুম, ওই রাত এগারোটার আগে পর্যন্ত সে নিজেই ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর বকবক করবে, তার বন্ধুরাও এ-নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করতে ছাড়বে না, আর তারপর যতক্ষণে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ততক্ষণে মনে-মনে পুরো তৈরি হয়ে যাবে সে। আর তখন আমার পক্ষে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেয়ার দরকারই করবে না। তখন শুধু এইটুকুই বললে চলবে যে 'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।' তবে ততক্ষণে এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারব যে এমন একটা মানসিক প্রক্রিয়া আমি চালু করে দিতে পেরেছি যার ফলাফল ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমার মনে হয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে এই ব্যাপারটা নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষার ক্লাস শুরু করা

উচিত। যেমন ধরুন, আমাকে বলা উচিত: 'মাকারেঙ্কো, তুমি এখন এই পরীক্ষাটা চালাও দেখি। ধর, একটি ছেলে তিন রুব্ল চুরি করেছে। তুমি এখন এই চুরির কথাটা তার কাছে পাড় দেখি। তুমি এই ছেলেটির সঙ্গে কীভাবে কথা বল আমরা তা শুনব, তারপর আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব তুমি কেমনভাবে কথাটা ছেলেটিকে বললে — ঠিকমতো, না অক্ষমভাবে।'

আমাদের কলেজগুলিতে এ-ধরনের ব্যাপার শেখানো হয় না, অথচ চুরি করেছে এমন সন্দেহ করে কোনো ছেলেকে জেরা করা অত্যন্ত কঠিন একটা ব্যাপার, বিশেষ করে সত্যিই ছেলেটি চুরি করেছে কিনা তার যখন প্রমাণ পাওয়া যায় নি তখন তো বটেই। এক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে শুধু-যে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ কিংবা মুখভাবের নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা দেখানোর দরকার পড়ে তা-ই নয়, তাঁকে ব্যুৎপত্তি দেখাতে হয় ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত উপায়ে কারণ দেখে কার্য নির্ণয়ের ব্যাপারেও।

...আমার সহকর্মী, কমরেড ও কমিউনের অন্যান্য কর্ম-চারিদের সঙ্গেও মিলেমিশে সব সময়ে আমি এইরকম সব ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্যে খাটাখাটুনি করতুম। এ-সব প্রশ্ন নিয়ে সবাই মিলে আলোচনাও করতুম আমরা, তবে আমরা কখনও কারও বক্তৃতার নোট নিতুম না।

অপর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা শিক্ষকরা কাজে লাগাতে পারেন তা হল — খেলা। আমার মতে, খেলাকে বাচ্চার ক্রিয়াকলাপের শুধুমাত্র একটা অংশ জ্ঞান করা কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার ফল। বাচ্চার কাছে খেলা তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের নামান্তর, এমন কি যখন সে গুরুতর কোনো কাজে লিপ্ত থাকে তখনও সে-যে তা খেলাচ্ছলে করবে

এমনটিই হওয়া উচিত। আমরা, সাবালকরাও কিন্তু সময়-সময় খেলা করার এই তাগিদ অনুভব করে থাকি। তা না হলে কেন কিছু-কিছু লোক লেস-বসানো জামার কলার পছন্দ করেন, অথচ অন্যেরা তা করেন না তা বলুন তো? কেনই-বা আমরা সুতীর পোশাকের বদলে রেশমী ক্রেপ-কাপড়ের তৈরি পোশাক পছন্দ করি? কেন কিছু-কিছু লোক ফৌজী ইউনিফর্ম পরে আনন্দ পান? আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউ নেই যিনি কর্নেলের ইউনিফর্ম পরে বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব করবেন না। কিন্তু ফৌজী ইউনিফর্মের প্রতি আমাদের এমন আকর্ষণ বোধ করার কারণ কী? তার কারণ, এর মধ্যে খেলার একটা ব্যাপার নিহিত।

আচ্ছা, বলুন তো, কেন আমরা সোনার জলে বাঁধাই-করা সুন্দর-সুন্দর বই আমাদের বুককেসের ওপরদিকের তাকগুলোয় রাখি আর কম ঝলমলে বইগুলো রাখি নিচের তাকে? এর কারণ, আমরা শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান বইপ্রেমিক বলে নিজেদের জাহির করে একটু মজা পাই, তাই তো?

বাচ্চাদেরও এইরকম মজার-মজার খেলা করা, যা নয় তারা তারই মতো হওয়ার ভান বা অভিনয় করার নেশাটা ভারি জবর। আর তাদের এই খেলার নেশায় ইন্ধনও যোগানো উচিত।

বাচ্চাদের শুধু-যে খেলার জন্যেই সময় দেয়া উচিত তা-ই নয়, তাদের গোটা জীবনটাই খেলার রসে চুবিয়ে রাখা প্রয়োজন। বস্তুত, তাদের জীবনটাই হল খেলার সামিল।

কমিউনে আমাদের কাজের যন্ত্রপাতি ছিল একেবারে প্রথম শ্রেণীর আর তাদের সাহায্যে আমরা বানিয়ে ফেলেছিলুম সূক্ষ্ম, যথাযথ যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি ‘লাইকা’

ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় সবকিছু যথাযথ, মাপজোকে একেবারে মাইক্রনের বিচারে সঠিক হওয়ার দরকার ছিল। অথচ এই গোটা কাজটাই ছিল খেলা।

শিক্ষা-বিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞই আমাকে বাতিকগ্রস্ত, খামখেয়ালি বলে মনে করতেন। মনে করতেন ফৌজী কায়দায় রিপোর্ট পেশ করার ধরন সহ সবকিছুই আমাদের সৈন্য-সৈন্য খেলা ছাড়া কিছু নয়।

অথচ বাচ্চাদের সঙ্গে এই ধরনের নাট্যাভিনয় একেবারে অপরিহার্য ব্যাপার। ওদের সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিন আর আপনি দেখবেন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের মতো আপনিও মন খুলে সব কথা বলতে পারছেন ওদের। যে-দলপতি নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে আমার পড়ার ঘরে আসছে সে-ও তার পার্টে চমৎকার অভিনয় করে চলেছে, আর আমিও তখন খেলাটা জীইয়ে রাখছি সাধ্যমতো। শেষপর্যন্ত কমিউন-সদস্যদের ভালোমন্দের জন্যে দায়ী থাকছি আমি, অথচ ওরা মনে করছে যে সে দায়িত্ব ওদের...

আর কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তাদের এই খেলাটাকে আমায় উৎসাহই যোগাতে হোত।

একবার সবাই মিলে আমরা প্রমোদভ্রমণে যাবার পরিকল্পনা করছিলুম। আমাদের মনস্থির করতে হচ্ছিল যে লেনিনগ্রাদ যাব না ক্রিমিয়ায় যাব। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই চাইছিল ক্রিমিয়ায় যেতে, আমি নিজেও চাইছিলুম তাই। কিন্তু আমি লেনিনগ্রাদের সপক্ষে প্রবলভাবে যুক্তি দেখাতে শুরু করলুম। ক্রিমিয়ায় কীই-বা দেখার আছে — এই প্রশ্ন করে আমি নিজেই তার উত্তর দিলুম এই বলে যে ক্রিমিয়ায় আছে খালি রোদ্দুর আর

বালির ওপর খেলাধুলো করা, অথচ লেনিনগ্রাদ গেলে তারা পুতিলভ ধাতুবিদ্যা ও এঞ্জিনিয়রিং কারখানা এবং শীত প্রাসাদ দেখতে পাবে। ছেলেমেয়েরাও সোৎসাহে আমার সঙ্গে তর্কে মেতে উঠল। অবশেষে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা যখন ভোটে দেয়া হল তখন হাত তোলবার সময়ে ছেলেমেয়েরা বারবার আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি সেদিন আমার পার্টে ভালোই অভিনয় করেছিলুম। ছেলেমেয়েরা অভিনয় করল বিজয়ীর ভূমিকায় আর আমি পরাজিতের।

এর তিন দিন পর ছেলেমেয়েরা পরস্পর বলাবলি শুরু করল যে আসলে আমি তাদের 'তাতাচ্ছিলুম' মাত্র, কেননা আমিও সত্যিসত্যি ক্রিমিয়াতেই যেতে চাইছিলুম। এর ফলে ওই আলোচনার মধ্যে অভিনয়ের দিকটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল আর তারা এটা-যে কতখানি উপভোগ করল তা বলার নয়।

তবে এরপরই প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোনো শিক্ষকের পক্ষে বিপদের ঝুঁকি নেয়া ন্যায়সঙ্গত হবে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া দরকার।

বছর-দুই আগে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি পত্রিকায় স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে গোলমাল করে তাদের প্রতি আচরণের প্রশ্নটি নিয়ে একটি আলোচনা ছাপা হয়। তাতে এইমর্মে পরামর্শ দেয়া হয় যে শিক্ষক বা শিক্ষিকার উচিত ওইসব ছেলেমেয়েকে ভালো করে বুঝিয়ে বলা। বলা হয়, শিক্ষক বা শিক্ষিকা চেঁচামেচি না-করে তাদের সঙ্গে শান্ত, মসৃণ গলায় কথা বলবেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিরক্ত হয়েছেন বলে-যে তাদের কিছু বলছেন তা নয়, এটা তাঁর কর্তব্য জ্ঞান করছেন বলেই তিনি তাদের বোঝাতে চাইছেন...

আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা নিতে হলে বলা হয় যে শান্তভাবে কথা বলতে হবে। সত্যিই যদি আপনি আগাগোড়া শান্তভাবে কথা বলে চলেন তাহলে ফল পাবেন কিন্তু সামান্যই। ছাত্র বা ছাত্রীটি আপনি তার সঙ্গে কথা বলার আগে যে-দুষ্টু ছিল সেই দুষ্টুই থেকে যাবে তাহলে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কিন্তু কিছুটা বিপদের ঝুঁকিই নিতুম। আর তখন ম্যাকবেথের সব ক'টা ডাইনী যেন চারপাশ থেকে আমায় ছেঁকে ধরে বলতে থাকত: ও, তাহলে তুমি ঝুঁকি নিচ্ছ, তাই না? ঠিক আছে, আমরাও দেখে নেব একহাত!..

বিপদের ঝুঁকিটা এই যে হঠাৎ আমি গলা চড়িয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠতুম, 'অ্যাই, কী হচ্ছে কী?' আর এর ফলে আমি কিন্তু ইতিবাচক ফলই পেতুম।

লেনিনগ্রাদে গিয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একবার আমি যখন এই বিপদের ঝুঁকি নেয়ার কথাটা বলছিলুম তখন একজন শিক্ষক আমাকে একখানা ভর্ৎসনাসূচক চিরকুট পাঠিয়ে একটি ছেলের কথা জানালেন। ছেলেটি পরীক্ষায় খারাপ নম্বর পাওয়ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনাটা জানিয়ে শিক্ষকটি অসন্তুষ্টভাবে আমার কাছে জানতে চাইলেন যে এরপরও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'বাড়াবাড়ি করা'কে আমি অপরিহার্য বলে মনে করি কিনা।

শিক্ষকটির বক্তব্য শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছিলুম। অবশ্য তাঁর এই প্রতিক্রিয়াটা ঠিক আমার বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল সেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকটির বিরুদ্ধে। কিন্তু সে যাই হোক, শিক্ষকটি কোনোরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলেই-যে ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়েছিল তা নয়। কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে পরীক্ষায় খারাপ নম্বর দেয়াটা যদি শিক্ষক

বা শিক্ষিকার পক্ষে বিপদের ঝুঁকি নেয়া হয় তাহলে এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে সব ছাত্রছাত্রীকেই ভালো নম্বর দিতে হবে নইলে তারা সবাই গিয়ে গলায় দড়ি দিতে পারে। পরীক্ষায় খারাপ নম্বর দিতে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা ভয় পেতে পারেন, কারণ তাতে কিছু পরিমাণে বিপদের ঝুঁকি নেয়া বোঝাতে পারে হয়তো, তবু যতই যাই হোক এ তো সামান্য ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

ছাত্র বা ছাত্রীকে পরীক্ষায় খারাপ নম্বর দেয়া এমন একটা ব্যাপার নয় যার সঙ্গে বিপদের ঝুঁকি জড়িত। যেমন ছাত্র বা ছাত্রীর মাথায় আদরের মৃদু চাপড় দেয়া কিংবা তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলাতেও বিপদের ঝুঁকি নেয়া বোঝায় না, এটাও ঠিক তেমনই ব্যাপার!..

হয়তো এমনও হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট ছেলেটিকে একটু বেশি পরিমাণে মাথায় তোলা হয়েছিল অনবরত তার সঙ্গে বিপদের ঝুঁকি-এড়ানো নরম আচরণ করতে করতে, আর ছেলেটির মধ্যে আত্মহত্যার একটা প্রবণতাও গড়ে উঠেছিল। যে-কোনো লোককে যদি একটানা কয়েক বছর ধরে শুধুমাত্রই শান্ত মসৃণ গলায় সম্বোধন করা যায়, তাহলে (কে বলতে পারে) তার মধ্যে হয়তো আত্মহত্যার একটা তাগিদ জেগেও উঠতে পারে। যদি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শান্ত গলায় কথা কইতে শুরু করে দেন তাহলে ছেলেমেয়েদের-যে তাঁরা কোন অবস্থায় এনে ফেলবেন তা আমার ভাবতেও ভয় করে।

তবে, সৌভাগ্যের কথা, সকলেই কিছু একটা শান্ত, নরম গলায় কথা বলেন না। কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা এখনও আছেন যাঁরা বিপদের ঝুঁকি নেন, ছেলেমেয়েদের কাছে নানা ব্যাপারে দাবি জানান, পরীক্ষায় খারাপ নম্বরও দেন। তবে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে দাবি জানাতে পিছ্-পা হন না। একমাত্র এই ধরনের শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন বলেই স্কুলের আবহাওয়া প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিপদের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারটা হাতে-কলমে শিক্ষকতা করার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করা উচিত।

ক্লাসরুমে বসে আমি হাসি, খোলাখুলি খুশি কিংবা রাগ প্রকাশ করি, কিছুমাত্র বাধা বা সংকোচে না-ভুগে হাসিঠাট্টাও করে থাকি। তামাসা করতে ইচ্ছে হয় যদি তাই-ই করি আমি। আস্তে এক-আধটুকু খোঁচাখুঁচি দিতে ইচ্ছে হয় যদি তাও দিই। এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নয়। গড়পড়তা শিক্ষককে যতটুকু বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় আমার আমলে আমাকে তার চেয়ে বেশি ঝুঁকিই নিতে হয়েছে।

যেমন, ধরুন, কমিউনের সাধারণ সভা কখনও-কখনও কাউকে-কাউকে কমিউন থেকে বের করে দেয়ার প্রস্তাব নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সে-সময়ে প্রাণপণে লড়েছি আমি, ছেলেপিলেদের নানারকম ভয়ও দেখিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কড়া চোখেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে, আর তারপর ফের একবার বহিষ্কারের সপক্ষেই ভোট দিয়েছে। আট বছরে এইভাবে দশ-দশটি ছেলেকে বের করে দিতে হয় আমায়। এর অর্থ ছিল কমিউনের দরজা খুলে দিয়ে বলা: বিরাট পৃথিবীতে তোমার যেখানে খুশি নাক-বরাবর চলে যাও বাপু, বিদায় হও।

এগুলো সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নেয়া ছাড়া কিছুই ছিল না। তবু এইরকম ঝুঁকি নেয়ার দৌলতেই কমিউনে

একটা স্থায়ী, সত্যিকার দাবি আদায়ের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে আমি সক্ষম হয়েছিলুম। আর প্রতিবার প্রত্যেকেই জানত যে ঠিক ওই পরিবেশের বিরুদ্ধেই বিতাড়িত সদস্যটি একেবারে প্রথম দিন থেকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই তাকে বিতাড়নের মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যিকার বিস্ময়ের ব্যাপার যেটি সেটি হল — যারাই তখন কমিউন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তারাই পরে আমাকে চিঠি লিখেছিল।

খুব সম্প্রতি এইরকম একটি ছেলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। ছেলেটিকে ছ'বছর আগে কমিউন থেকে বের করে দিই আর তারপর তার আর কোনো খোঁজখবর পাই নি।

ছেলেটি লিখেছে যে সে এখন সামরিক বাহিনীতে একজন লেফটেন্যাণ্ট, হাসান হ্রদের যুদ্ধে সে কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং এ-উপলক্ষেই সে আমাকে চিঠি লিখতে মনস্থ করেছে। সে আরও লিখেছে: 'আপনি যদি জানতেন আমাকে সে-সময়ে কমিউন থেকে বের করে দেয়ায় আমি কত খুশি হয়েছি।' সে লিখেছে, তার মনে পড়ছে যে সে কী উপদ্রবস্বরূপই-না ছিল এবং কমিউনে সকলের প্রতি কী জঘন্য আচরণই-না করত সে। কমিউন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ঘটনাটা তাকে এইমর্মে ভাবিয়ে তুলেছিল যে সে সত্যিই এত খারাপ ছেলে ছিল কিনা যাকে পাঁচ শো ছেলেপিলে নিজেদের মধ্যে রাখতে অতটা অনিচ্ছুক ছিল। প্রথমটায় সে ভেবেছিল, ফিরে গিয়ে আবার কমিউনে ঢুকতে দেয়ার জন্যে আবেদন করবে। কিন্তু পরে ঠিক করে যে জীবনে নিজের চলার পথ সে চেষ্টা করে নিজেই করে নেবে। আর এখন বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই সে লিখছে,

'এখন আমি একজন লেফটেন্যাণ্ট, যুদ্ধে আমি কৃতিত্বও দেখিয়েছি এবং এই সবকিছু আপনাকে জানানো আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। এটা জানাচ্ছি এইজন্যে যে অতীতে একদিন আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে আপনি যেন আর বিবেকের তাড়না অনুভব না-করেন।'

ছ'বছর কেটে যাওয়ার পর এই চিঠিখানা আমাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছে। ছেলেটির সঙ্গে সকল যোগাযোগ আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর তারপর হঠাৎ এই চিঠি। ও আমাকে আবার চিঠি লিখল আর তা লিখল ঠিক সেই মুহূর্তে যখন ও হাসান হ্রদের যুদ্ধে বিজয়গৌরবের অংশভাক হয়েছে। ওই সময়টিতেই ওর মনে পড়েছে আমার কথা — ওর এই গৌরবের অন্যতম উৎস হিসেবে।

এই গল্পটি ফের একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে কোন কাজের-যে কী ফল তা আগে থেকে জানবার কোনো উপায় নেই। এইজন্যেই বিপদের ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্নটি যথেষ্ট পরিমাণে সযত্ন মনোযোগ নিয়ে বিবেচনা করা দরকার, কেননা তথাকথিত পরের মন বুঝে চলার কৌশল কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষেই নয় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও উপদ্রবস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইউক্রেনের শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিশারিয়েতের সঙ্গে আমি যখন মতদ্বৈধের একটা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ছিলুম সেই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক সম্মেলনে আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে পরের মন বুঝে চলার কৌশল বলতে কী বোঝায় তা সত্যিই আমি জানি কিনা। জবাবে আমি হ্যাঁ বললে আমাকে ওই কথাটির সংজ্ঞানির্ণয় করতে বলা হয়।

আমি তখন বলি যে 'ধরে নিন, আপনাদের মধ্যে কেউ অপর একজনের সঙ্গে দুপুরের খানা খেতে বসেছেন আর

সে-লোকটি আপনার খাওয়ার প্লেটে একদলা থুথু ফেলল। এখন, এরপর, কেউ হয়তো দ্বিতীয় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে সে কী ভেবে অমন কাজ করল এবং সে-লোকটি যে পরের মন বুঝে চলতে জানে না সেকথা তাকে জানিয়ে দেবেন। অথবা অপর কেউ একখানা প্লেট তুলে নিয়ে সেই অভদ্র লোকটির মাথায় ভাঙবেন। এখন, এই দুটো কাজই একই রকম ভালো। এবং এই দ্বিতীয় কাজটিতেও কোনো বিপদের ঝুঁকি জড়িত নেই। কখনও-কখনও কারও-কারও মাথায় এক-আধখানা ফাটা প্লেট ভাঙা যেতে পারে আর তা সেই অপর লোকটির নিজের কাজকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই। ফাটা প্লেট আঠা লাগিয়ে জোড়া দেয়ার চেয়ে এটা বরং ভালো।'

এমন অনেক ঘটনার সাক্ষাৎ অবশ্যই পাওয়া যায় যেখানে পরের মন বুঝে চলার কৌশল আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে চলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যেমন, ধরুন, যে-ছেলে বা মেয়েটিকে আমায় শাস্তি দিতে হবে তার সঙ্গে কোথাও মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু আমি সমস্যাটার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে চাই না, বিপদের ঝুঁকি নিতে ভয় পাই, সেইহেতু আমি সতর্কভাবে 'খুব কৌশলে' সেই ছেলে বা মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলুম। আমি খুব কৌশল খাটিয়ে আমার হাতে যে-সুযোগটা এসেছে তা ছুঁয়ে তেরছাভাবে জ্যামিতির স্পর্শকের ভঙ্গিতে অন্যপথে বেরিয়ে গেলুম আর গর্তের মধ্যে লুকোলুম নিজেকে।

হয়তো আমি ভুল করছি কিন্তু নিজের মতানুসারে চলে যে-ফল আমি লাভ করেছি তাকে মন্দ বলতে পারি না।

আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এর ফলে ফের পূর্বাবস্থায় অধঃপতিত হওয়ার মতো ঘটনা মাত্র একটি ছাড়া আর পাই নি। সেটি ছিল একটি মেয়ের ব্যাপার। মেয়েটির আমি বিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু পরে ফের সে বেশ্যাবৃত্তি শুরু করে।

এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি কোনো এক ধরনের সত্যিকার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি, যেমন আপনারাও তা পেয়েছেন বলে আমি মনে করি।

জোর দিয়েই আমি বলতে চাই যে বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের কাজের — তা সে স্কুলে, স্কুলের বাইরে কিংবা প্রাক্-স্কুল পর্যায়ে যাই হোক-না কেন — তার অন্তর্নিহিত নীতি হওয়া উচিত অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ। এমন কি আট বছর বয়সের ছেলেদেরও আমি কমরেড অমুক বা কমরেড তমুক বলে সম্বোধন করতুম। ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে যখন আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতুম তখন তারা হয়ে যেত পেতিয়া, ভাসিয়া, ইত্যাদি, কিন্তু যৌথের মাঝখানে সভায় অনুষ্ঠানে তাদের ডাকতুম কমরেড কমারভ, ইত্যাদি নামে।

আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদেরও যতটা সম্ভব সম্মান জানানো যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনই ওই একই সঙ্গে তারা যাতে অমুক-অমুক ধরনে আচরণ করে সেটা বেশ কড়াভাবে, স্পষ্ট করে ও এতটুকু লজ্জা না-পেয়ে তাদের কাছে দাবি করাও কর্তব্য। এই 'পরমাশ্চর্য' ব্যাপারটা ঘটানো যে-কোনো লোকের পক্ষেই অনায়াসসাধ্য।

বাবা-মায়েরা সে-সময়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে আমার কাছে এসে উপস্থিত হতেন আর বলতেন আমি নাকি 'পরমাশ্চর্য'

ব্যাপারস্যাপার ঘটাচ্ছি। যেমন, একটি জোড়া বাবা-মায়ের কথা জানি, তাঁরা একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে কমিউনে এসে আমায় বললেন: 'আমরা আমাদের এই ছেলের সঙ্গে এক ছাদের নিচে আর বসবাস করতে পারছি না। ও মুখখারাপ করে, জিনিসপত্রের জন্যে সব সময়ে বায়না করে টাকাপয়সার জন্যে, থিয়েটর বা সিনেমার টিকেটের জন্যে অনবরত ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে, নিজের জামাকাপড়-জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখতে চায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঈশ্বরের দোহাই, ওকে আপনি কমিউনে ভরতি করে নিন!' আমি তখন ছেলেটির দিকে এক-নজর তাকিয়ে দেখলুম, কিন্তু তার পুরোপুরি স্বাভাবিক মুখাবয়বে পশ্চাৎপদতার এতটুকু লক্ষণ নজরে পড়ল না। দেখলুম, দিব্যি সুস্থ সবল ছেলে, সব দিক থেকে তার ক্লাসের সঙ্গীদের সমান স্তরের। তবে? ভাবলুম, একে নিয়ে আমি কী করব?

পরে অবশ্য আমি রাজি হয়ে গেলুম যে সে আমাদের সঙ্গে থাকবে, তবে তাকে রাখব এই শর্তে যে তার বাবা-মা আসচে দু'বছরের মধ্যে আর কমিউনের মাটিতে পা রাখবেন না। সাফ বলে দিলুম, দু'বছরের মধ্যে তাঁদের মোটরগাড়ির পেট্রোলের সামান্য গন্ধটুকুও যেন আমার নাকে না-আসে।

এই ধরনের পারিবারিক পটভূমি থেকে যে-সব ছেলে আসত তাদের সম্পর্কে বাড়ির লোকের প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে এরা নিজেদের পোশাক-আশাক ঠিকমতো গুছিয়ে রাখে না, নিজেদের বিছানা পাততে বা তুলতে চায় না এবং দোকানপাটে যেতে চায় না। তবে কমিউনের দলপতিরা এদের স্বভাবের কয়েকটা এবড়োখেবড়ো কোণ আচ্ছা করে বারকয়েক রগড়ে দেয়ার পরই এদের হাবভাবের পরিবর্তন শুরু হয়ে যেত। কমিউনে মাস-ছয়েক থাকার

পরই প্রথম ছুটিতে এইসব ছেলেপিলেকে আমরা নির্ভয়ে কয়েক দিনের জন্যে বাড়ি যেতে দিতুম।

আর এই দেখেই বাবা-মায়েরা বলতেন যে আমরা নাকি অলৌকিক কান্ডকারখানা ঘটাচ্ছি। অথচ এর মধ্যে মোটেই কোনো অলৌকিক ব্যাপার বা ম্যাজিকওয়ালা জড়িত ছিল না। আসল কথা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের কাছে যখন আচার-আচরণের এটা-ওটা দাবি করা হচ্ছে তখন তা এমনভাবে ও ভঙ্গিতে করতে হবে যাতে ছেলেপিলেরা যিনি বা যাঁরা এইসব দাবি জানাচ্ছেন তাঁর বা তাঁদের কর্তৃত্বের জোর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে না-ওঠে। একমাত্র তা হলেই কোনো ছেলে বা মেয়ে হুকুম তামিল করে আনন্দ পাবে। সে-ও যে কাজের উপযুক্ত এটা বাবা-মায়ের সামনে প্রমাণ করতে পেরে খুশি হবে সে। সেইরকম শিক্ষক বা শিক্ষিকার পক্ষেও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তা যদি তিনি সত্যিই করতে পারেন তাহলে একেবারে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনার দাবি জানালেও বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে তার কাছে যা চাওয়া হচ্ছে তার সবটুকু পূরণ করবে।

পরিশেষে, আমার এই আলোচনায় যদি বিজ্ঞ উপদেষ্টার কিছুমাত্র মনোভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তার জন্যে আবার আমি আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি। বিজ্ঞ উপদেষ্টার পদে আমার কোনো দাবি নেই, আমি শুধু নিজের অভিজ্ঞতায় যতটুকু যা জেনেছি তাই-ই আপনাদের জানালুম মাত্র।

আমার কাজের অভিজ্ঞতা*

কমরেড্‌স, আমি মনে করি আজকের এই সভায় বক্তৃতা নয় পারস্পরিক আলাপের ভিত্তিতেই আলোচনা চালানো দরকার, কেননা আমার অভিজ্ঞতা (আমার যা বলার আছে তার ভিত্তিই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা) আপনাদের থেকে পৃথক হবে। যদিও আমি নিজেও একজন শিক্ষক, রেলওয়ে স্কুলেরই শিক্ষক এবং জনেক রেল-শ্রমিকের ছেলে। কাজেই শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপনাদের অনেকখানি মিল থাকা সম্ভব। তবে আমি সম্ভবত আপনাদের চেয়ে অল্প একটু বেশি ভাগ্যবান।

১৯২০ সালে সোভিয়েত সরকার আমার ওপর নাবালক অপরাধীদের একটি কলোনি দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন। আমি এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলুম বটে, তবে মোটেই কিন্তু এ ভেবে নয় যে আমি একজন দারুণ যোগ্য

---

* মস্কোয় ইয়ারোস্লাভ্‌ল রেলওয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক সভায় ১৯৩৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে প্রদত্ত মাকারেঙ্কোর ভাষণ।

শিক্ষক। বিপ্লবের পরে আমি পোল্‌তাভার একটা স্কুলে কাজ করেছিলুম। সেখানে যাওয়ার পর এমন একখানা দালানে আমাকে স্কুল খুলতে বলা হল যা একই সঙ্গে প্রদেশ অর্থনৈতিক দপ্তরের অফিস ছিল। বাড়িটাতে ঢুকলে সর্বদাই দেখতুম অফিসের নোংরা টেব্‌ল আর মেঝের-ওপর-ছড়ানো সিগারেটের টুকরোয় সেটা আগাপাছতলা বোঝাই, আর মনে হোত বাড়ির ভেতরের হাওয়া যেন প্রধানত নিকোটিন আর ধোঁয়ায় ঠাসা। এইরকম পরিবেশে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে আমি এক-পা বাড়িয়েই ছিলুম। ওই জায়গাটা ছেড়ে কলোনিতে কাজ করতে যাওয়ার কারণ আমার এটাই। গোর্কি কলোনিতে ও পরে ওই একই ছেলেপিলেদের নিয়ে দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনে আমি কাজ করেছি একলাগাড়ে মোট ষোল বছর, আর এই কারণেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলছি। এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁদের একই যৌথ সংস্থায় একটানা ষোল বছর ধরে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটেছে।

১৯৩৫ সালে আমার এই অনন্য অভিজ্ঞতার অবসান ঘটে। অবশ্য আমি তা চেয়েছিলুম বলে নয়, আমার কোনো ত্রুটির জন্যেও নয় তা।*

ওই ষোলটি বছর ধরে আগাগোড়া আমি একই যৌথ সংস্থায় কাজ করে যাই। ওই যৌথে বাসিন্দা বদলেছে এটা ঠিকই, তবে এ-পরিবর্তন ঘটেছে ক্রমে-ক্রমে আর প্রতিষ্ঠিত

---

* ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে মাকারেঙ্কোকে কিয়েভে ইউক্রেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উৎপাদনভিত্তিক কলোনিসমূহের তত্ত্বাবধায়ক দপ্তরে সহকারী ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হয়।

ঐতিহ্য টিকে থেকেছে, পুরুষ থেকে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার হিসেবে বর্তেছে তা। ওই যৌথ সংগঠনে কাজ করার মধ্যে দিয়ে আমার কিছু-কিছু নতুন ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলি সাধারণ সব স্কুলের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করতে ইচ্ছে জাগে। কিন্তু আমি সাধারণ স্কুলের শিক্ষার বিষয়টিকে এই দৃষ্টিতে দেখছি কেন? আমি বলব এটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে ওই যৌথ সংস্থায় আমার কাজের শেষ আট বছরে আমি দেখেছি, ইউক্রেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিচালনাধীন দ্জের্জিন্স্কি কমিউনটি যে-কোনো সাধারণ স্কুলের ছাত্রসম্প্রদায়ের থেকে প্রায় কোনো অংশেই তফাত ছিল না।

কমিউনে একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল চালু ছিল এবং সেখানকার ছেলেমেয়েরা এত তাড়াতাড়ি, প্রায় তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই, স্বাভাবিক ছেলেপিলের ধরনধারণে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিল যে আমাদের দেশের গড়পড়তা স্কুলের বাচ্চাকে যদি স্বাভাবিকতার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত বলে ধরে নিই তাহলে পূর্বোক্ত ছেলেমেয়েদের অতি-স্বাভাবিক আখ্যা দিতে হয়। কাজেই আমার এটা ধরে নেয়ার কোনো কারণ নেই যে আমাকে বিশেষরকম তে-এঁটে একদল ছেলেপিলেকে বাগ মানাতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, আরও অনেক স্কুলের চেয়ে আমাদের কমিউনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ করা সহজতর ছিল। ওখানে কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে আমি এতখানি স্বাধীনতা নিতে সমর্থ হয়েছিলুম যে, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, তৃতীয় বছর থেকেই শুধুমাত্র শিশুলালন ও তদারকির জন্যে আলাদা করে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ না-করেও আমি দিব্যি কাজকর্ম চালাতে পারছিলুম। আমার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই থেকে বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধানের আর কোনো দরকার পড়ে নি।

স্কুলে পড়ানোর কাজটা অবশ্য আপনাদের চেয়ে আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ যে-সব ছেলেমেয়েকে আমার তত্ত্বাবধানে পাঠানো হোত তারা ছিল প্রায়ই কমবেশি পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ে। যেমন দশ থেকে বারো বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র কোনোক্রমে লিখতে-পড়তে জানত, তবে কখনও-কখনও কেউ-কেউ একেবারেই লিখতে পারত না এমনও দেখা যেত। এ-কারণে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে তাদের দশ-বছুরে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম শেষ করিয়ে দেয়া আমার পক্ষে আপনাদের চেয়ে কাজের দিক থেকে কঠিনতর ছিল।

পুরনো ধরনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই ধরনের একটা মনগড়া ধারণা লক্ষ্য করা যেত যে গৃহহীন অনাথ ছেলেপিলে সর্বদাই বেশি চালাক হয়, যাকে বলে রীতি-মতো প্রতিভাবান হয় তারা, অথচ বাস্তবে কিন্তু তাদের স্বাভাবিক বাচ্চাদের চেয়ে সাধারণত একটু কম পটু, নিয়মিত স্কুলে পড়াশুনো চালানোর পক্ষে একটু কম প্রস্তুত বলে দেখা যায়। এর অর্থ, পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করা প্রথমোক্ত ওই ছেলেপিলেদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। তবে ওদের মধ্যে এমন একটা ভালো গুণ ছিল যার সাহায্যে যেমন ওদের পক্ষে তেমনই আমার পক্ষেও উপরোক্ত ওই অসুবিধেগুলো অতিক্রম করাও সম্ভব হয়েছিল। সেটা হচ্ছে এই যে ওদের পক্ষে বাবা-মা'দের সাহায্যের ওপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না, আর তাই সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ওপরই নির্ভরশীল হতে হোত। এ-সম্বন্ধে ওরা নিজেরাই ভালোরকম অবহিত ছিল, তাছাড়া

শিগ্‌গিরই ওরা এটাও বুঝতে শুরু করল যে স্কুল হল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণের প্রথম ধাপ। এটা ওরা বিশেষ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল তখনই, যখন সেই প্রথমবার কমিউনের সদস্যরা স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল ও পরে এই পাশ-করা ছাত্রছাত্রীরা কমিউনে বেড়াতে এল।

এরপর কমিউনের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এটাও উপলব্ধি করল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার পথই হল সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক পথ যা তারা অনুসরণ করতে পারে। এ-ব্যাপারটাতেও তারা আকৃষ্ট হল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসেবে তারা হস্টেলে থাকার জায়গা পাবে ও মাসিক বৃত্তি পাবে।

আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই জ্ঞানতৃষ্ণা গড়পড়তা স্কুলের ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি প্রবল ছিল। এই প্রবল তৃষ্ণাই তাদের সাহায্য করল যে-কোনোরকম কুঁড়েমি কাটিয়ে উঠতে এবং এপথে যতকিছু সমস্যা থাকতে পারে তা অতিক্রম করতে।

কমিউনে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ও মানুষ করে তোলার ব্যাপারে আমার সুযোগসুবিধে আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল, কেননা ওখানকার ছেলেমেয়েরা একটানা পাঁচ, ছয় কি সাত বছর ধরে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমার তত্ত্বাবধানে থাকত। আপনাদের কাজে কি শিক্ষা-সংক্রান্ত কি শিক্ষার অতিরিক্ত অন্যান্য ব্যাপারে একসঙ্গে মাত্র দুটো টার্ম ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে থাকার কথা শোনা যায়। তদুপরি ওই শিক্ষা-সংক্রান্ত উপায়টি এমন একটা কিছু নয় যা নাকি সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পেঁছে দেয়। তবে সেটা এমন একটা ব্যাপার যা তাড়াহুড়ো-ব্যস্ততা

ও হৈচৈ-চেঁচামেচি এড়িয়ে গিয়ে সকলকে খুশি রাখার ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে। শিক্ষা-সংক্রান্ত এই উপায়টির ফলাফল-যে কী দাঁড়াতে পারে তা কখনও বিবেচনা করে দেখা হয় না, ওই ফলাফলের ওপর বিশেষ কোনো গুরুত্বও আরোপ করা হয় না।

অথচ আমি কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত উপায় বলতে ঠিক সে-গুলিকেই বুঝে এসেছি যা সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পেঁছে দেয়... এমন কি এর জন্যে যদি হৈচৈ, ব্যস্ততা (বস্তুত, যত খুশি ব্যস্ততা), ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাও স্বীকার... এক্ষেত্রে আমি অবশ্য অপেক্ষাকৃত সুবিধেজনক অবস্থানে ছিলুম এবং দ্রুত বাঁধা রাস্তা ছেড়ে বিপথে পাড়ি জমাতে পেরেছিলুম। পরিশেষে এই কাজটা আরও একটা কারণে বেশ সহজ হয়ে উঠেছিল, আর সেই কারণটা হল, কমিউনে উৎপাদনের কাজ শুরু করা।

কোনো একটা সময়ে আমি 'কর্ম-প্রক্রিয়া'র সপক্ষে ওকালতি করেছি। আমরা সকলেই তখন বলতুম যে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কর্ম-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের পরিশ্রম করার প্রবৃত্তির স্ফুরণ দেখতে পায়। আমি এ-ও ভাবতুম যে কোনো বাচ্চার মধ্যে কাজের পরিবেশ সম্পর্কে একটা চেতনা জাগানোর জন্যে তাকে একটা কর্ম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। কিন্তু পরে আমি উপলব্ধি করেছি যে প্রতিটি বাচ্চাকে কোনো-না-কোনো উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজে যোগ দিতে শেখানো ও নির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতা আয়ত্ত করতে শেখানো অবশ্যকর্তব্য।

যখন তত্ত্বকথার আলোচনা হোত তখন আমরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, একেবারে দূরে আকাশে ডানা মেলে হাওয়ায় ভাসতুম, কিন্তু হাতে-কলমে কাজের বেলায় কাজের মানটা

হোত খুবই নিচু। আমরা মনে করতুম যে ছেলেমেয়েদের বুঝি প্রয়োজনীয় নানা পেশায় শিক্ষিত করে তুলছি, কিন্তু আসলে আমরা তাদের কেবলমাত্র সেইটুকুই শেখাতুম যাতে তারা কোনোরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে সাময়িক ব্যবহারের উপযোগী বসার টুল বানাতে পারে। ওদিকে আমাদের মেয়ে-দর্জিরা তো অন্তর্বাসের প্যাণ্ট ছাড়া আর কিছু সেলাই করতেই শিখল না। মনে পড়ে, যখন আমার জুতোজোড়া চমৎকারভাবে মেরামত করা হয়েছিল, আমার জন্যে একটা প্যাণ্ট বানানো হয়েছিল আর জোড়াতাড়া দিয়ে একটা টুল খাড়া করে আমাকে উপহার দেয়া হয়েছিল তখন আমি একটু যেন উল্লাস আর গর্বই বোধ করেছিলুম। পরে অবশ্য আমি এই শিক্ষকসুলভ দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিই। আশা করি আপনাদেরও মনে আছে যে ওই কর্ম-প্রক্রিয়াকে শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'সংহত' করে তোলার কথা বলা হোত তখন। নাগাল-এড়িয়ে-চলা এই লক্ষ্যটিতে-যে কী করে পোঁছনো যায় তারই উপায় খুঁজে বের করার জন্যে এককালে আমাদের মাথা ঘামানোর অন্ত ছিল না। তাই গোড়ায়-গোড়ায় ছেলেরা যখন টুল বানিয়েছে আমরা তখন ভেবে আকুল হয়েছি যে এই টুল বানানোর কাজকে তাদের ভূগোল ও অঙ্কের জ্ঞানের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা যায়। আমার মনে আছে, একবার একটি কমিশন কমিউন পরিদর্শনে এসে যখন বসবার টুল আর রুশ ভাষাশিক্ষার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন না তখন কী সাংঘাতিক মনমরা হয়ে পড়েছিলুম। অবশেষে এটা একটা অসাধ্য কাজ বিবেচনা করে আমি এই চেষ্টা ত্যাগ করতে মনস্থ করলুম এবং প্রচার করতে লাগলুম যে এরকম কোনো যোগাযোগ সন্ধান করাই উচিত হবে না।

সেদিনকার সেই সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত অনুমানকে এখন আমি সত্যি বলে সজোরে সমর্থন জানাতে পারি, কেননা ইতিমধ্যে কমিউনে একটি প্রথম শ্রেণীর ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে — যে-ফ্যাক্টরি আমরা নিজ হাতে তৈরি করেছি এবং যা 'লাইকা' ক্যামেরা তৈরি করে চলেছে। এটি একটি বর্ধিষ্ণু ফ্যাক্টরি। একেকটি 'লাইকা' ক্যামেরায় তিন শোটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংযোজিত আছে এবং এটি বানাতে এক মিলি-মিটারের হাজার ভাগের একভাগ অংশও নির্ভুল ও যথাযথ হিসেব করে বানানো দরকার। এ-কাজটা সত্যিসত্যিই এমন সব জটিল প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা আলোকবিদ্যা, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ যন্ত্রাংশ সংযোজনে নির্ভুলতা দাবি করে ও প্রাক্-বিপ্লব রুশদেশে যা আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

ওই ফ্যাক্টরিটিতে কীভাবে কাজ চলত তা চাক্ষুষ করার পর, একমাত্র তার পরই আমি উপলব্ধি করতে সমর্থ হই এ-ধরনের উৎপাদন বলতে আসলে কতখানি বোঝায়। কেননা, আমি দেখতুম নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা, উৎপাদনের মান, স্ট্যান্ডার্ড রেটিংস ইত্যাদি হিসেব, ত্রিশ-চল্লিশ জন এঞ্জিনিয়র, নকশানির্মাণের একটি অফিস, ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে ফ্যাক্টরিটিকে। এর তুলনায় স্কুলে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে কর্ম-প্রক্রিয়ার সংহতির কথাবার্তা কী তুচ্ছ, কী করুণই-না ঠেকে। যাই হোক, অবশেষে কমিউনে দেখা গেল যে স্কুলের শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া ও শ্রমশিল্পগত উৎপাদনের ব্যাপারে যোগদান একসঙ্গে মিলে চারিত্র্যগঠনের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছে, কারণ একই সঙ্গে ওই দু'টি কাজ চালানোর ফলে কায়িক ও মস্তিষ্কপ্রসূত কাজের মধ্যেকার সীমারেখাটা মুছে গেল এবং এর ফলে গড়ে উঠল অত্যন্ত উঁচুদরের দক্ষ যতসব স্ত্রী-পুরুষ।

খার্কভে একবার এমন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যাকে একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করতে আবার অত্যন্ত দক্ষ লেন্স-পালিশওয়ালা হিসেবে কাজ করতেও দেখেছিল্ম। যদিও সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিল তব্ লেন্স-পালিশের কায়দাকান্ন সে ভোলে নি, এ-ব্যাপারে অর্জিত বিদ্যা তখনও তার সবটুকুই আয়ত্তে ছিল। কিশোরকিশোরীরা তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্র্ণ করে ও শ্রমশিল্পে উঁচুস্তরের দক্ষতা অর্জন করে যখন কমিউন ছেড়ে চলে যেত, তখন আমি বেশ ব্ঝতে পারতুম যে তাদের ওই য্গম শিক্ষা অত্যন্ত উপকারে লেগেছে। বেশ গ্র্তর ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কিত পরিবেশ ছিল ঠিক এমনই একটি পটভূমি যা শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজের স্বিধে করে দিয়েছিল। আমাদের সোভিয়েত স্কুলগ্লির পাঠস্চিতে শিল্পোৎপাদনের কাজও যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার জন্যে আমি এখন থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাব। এ-ব্যাপারে বিশেষ করে চেষ্টা চালাব এইজন্যেই যে শিল্পোৎপাদনে ছোট ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ তাদের চারিত্র্যগঠনে দার্ণ স্যোগস্বিধের পথ খ্লে দেয়।

পরিশেষে আমরা এই শিল্পোৎপাদনের অপর একটি দিকের আলোচনায় আসছি, যে-দিকটিতেও কম মনোযোগ দিলে চলবে না। এটি হল এইসব শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভের দিক। দ্জের্জিন্স্কি কমিউন এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ভরতুকি গ্রহণের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে উৎপাদনের কাজ শ্র্ করে দেয়। আর সম্প্রতি দেখা গেল যে কমিউনটি শ্ধ্-যে ফ্যাক্টরিটিকে চাল্ রাখা ও কমিউনে থাকা, খাওয়া, পরা, স্কুল চালানো,

ইত্যাদি সব ব্যাপারের যাবতীয় খরচা বহন করতে সক্ষম হচ্ছে তাই নয়, রাষ্ট্রকেও বছরে পঞ্চাশ লক্ষ রুব্‌ল করে নীট লভ্যাংশ দিতে পারছে। এটা কিন্তু একান্তভাবেই সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে কমিউনটিকে আগাগোড়া চালানো হয়েছে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে।

কল্পনা করুন এই পরিস্থিতিতে আমাদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, হেফাজতে কী পরিমাণ কর্মোদ্দীপনার সুযোগসুবিধে ছিল। যেমন, আমরা ঠিক করতে পারতুম যে কমিউনের পাঁচ শো বাসিন্দা আমরা ভোল্‌গা নদীতে স্টিমারে করে দক্ষিণে বেড়াতে যাব, কিংবা সফর করতে যাব ককেশাস। এর জন্যে আমাদের দরকার পড়ত দু'লক্ষ রুব্‌লের। আর সঙ্গে সঙ্গেই এইমর্মে একটা প্রস্তাব নিতে পারতুম যে ওর পর একমাস ধরে প্রতিদিন প্রত্যেকে আধঘণ্টা করে বাড়তি সময় কাজ করবে আর তাহলেই ওই অতিরিক্ত দু'লক্ষ রুব্‌ল আয় বেড়ে যাবে।

এছাড়া আমাদের ছেলেদের জন্যে নতুন একপ্রস্থ করে স্যুট আর মেয়েদের জন্যে সিল্‌কের আর পশমের পোশাকও আমরা বানিয়ে দিতে পেরেছিলুম। আর থিয়েটরের টিকেট কেনার জন্যে বছরে খরচা করতে পারতুম চল্লিশ হাজার রুব্‌ল। শ্রমভিত্তিক শৃঙ্খলার কাঠামোর মধ্যে এমন সমস্ত ব্যাপার যখন সম্ভব করে তোলা যায়, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যখন তাদের নিজেদের হাতে সম্পদ সৃষ্টি করতে থাকে, যখন গোটা একটা যৌথ সংগঠন একই লক্ষ্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে ওঠে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজে এর চেয়ে জোরালো উদ্দীপনা আর কী কল্পনা করা যায়?

এই বিশেষ ব্যবস্থার অন্যান্য অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত কম সুবিধেজনক দিক নিয়ে আমি এখনই আর আলোচনা

করতে চাই না। পারিশ্রমিকের প্রশ্ন উঠলে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে পারিশ্রমিক মারফত বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাতে পয়সার যোগান দেয়া যায় এটাই পারিশ্রমিকের ইতিবাচক দিক নয়, বরং ইতিবাচক দিক হল এটাই যে পারিশ্রমিক পেলে ছেলেমেয়েরা নিজের-নিজের মাসকাবারি ব্যয়বরাদ্দ হিসেব করে ঠিক করতে পারে এবং এর ফলে তাদের মিতব্যয়ী ও হিসেবি হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আমাদের কমিউনে দেখা গেছে যে প্রতিটি ছেলে বা মেয়ে-সদস্য কমিউন ছাড়ার সময় দু'হাজার রুব্‌ল করে জমাতে পেরেছে।

এবিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে এদেশে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বলতে কেবলমাত্র স্রষ্টা তৈরি করা, আমাদের নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণে প্রবল কর্মশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে সমর্থ সামাজিক দিক থেকে এমন অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষ গড়াই শুধু বোঝায় না। আমাদের শিক্ষা দেয়ার অর্থ এমন সব শিক্ষিত লোক তৈরি করা যাদের নাকি ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হওয়ারও বাধ্যবাধকতা থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে টাকাপয়সা চমৎকার একটা প্রভাব বিস্তারের ও চারিত্র্যগঠনের উৎসও হতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমি শিক্ষাদানের ব্যাপারে এমন বহু সমস্যার উল্লেখ করতে পারি। এটা আপনাদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের কারণেই সম্ভব!

আমি এখনও বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলতে থাকব যে আমাদের স্কুলগুলিতে পূর্বোক্ত ধরনের শিল্পোৎপাদন-সম্পর্কিত কাজকর্ম ঢোকানো উচিত। প্রথম দৃষ্টিতে এটা হয়তো ভয়ঙ্কর আর আজগবি একটা ধারণা বলে মনে হতে

পারে, কিন্তু বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে এর মধ্যে ভয়ঙ্কর কোনো বস্তু নেই। আমাকে যদি এখন একটা স্কুল চালাবার ভার দেয়া হোত তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা সভা ডেকে আমার যে-যে ধ্যানধারণা কার্যকর করব বলে আমি পরিকল্পনা করেছি তার একটা রূপরেখা সেখানে পেশ করতুম, আবার সেইসঙ্গে নিজের মনে হয়তো আকাশপাতাল চিন্তা করতুম যে ওই পরিকল্পনা রূপায়ণের উপায়-উপকরণ আমার যোগাড় হবে কোথা থেকে। দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে আমি কাজ শুরুই করেছিলুম এমন একজন লোকের সন্ধান করার মধ্যে দিয়ে যে-নাকি হাতের কাছে যা পাবে তা কিনতে বা বিক্রি করতে ওস্তাদ, সব কাজের কিছু-না-কিছু সত্যিসত্যিই জানা আছে যার। আর দেখতে-দেখতে অমন লোক পেয়ে গেলুম। লোকটি বলল: 'আমাদের কাজের জন্যি দুই শত জোড়া হাত আছে যারা কাম করতি চায়। তাইলি? আপনের পরোয়াডা কিসির?' প্রথমেই আমাদের কী করতে হবে, আমার এই প্রশ্নের জবাবে লোকটি জানাল যে আমাদের সুতো তৈরি করতে হবে। যখন আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে অমন একটা কাজ হাতে নেয়ার মতো পুঁজিপাটার যোগান দেবার কেউ নেই আমাদের, তখন আমার সেই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞটি ভর্ৎসনা করে বলল যে আমাদের পুঁজির যোগানের কোনো দরকারই নেই কেননা আমাদের শুধু একটা চুক্তিপত্রে সই করার যা ওয়াস্তা, আর তারপরই আমরা কিছু যন্ত্রপাতি ও অন্য উপকরণ কিনে ফেলব। বস্তুত, তাই-ই আমরা করলুম আর তারপর সুতো কাটতে লেগে গেলুম। এর মাত্র ছ'বছর পরেই আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সবসেরা অপ্টিক্যাল কারখানা গড়ে তুললুম, যার দাম বেশ কয়েক লক্ষ রুব্ল হবে।

সুতো কাটা আর কাঠের টুল বানানো দিয়ে আমরা কাজ শুরু করলুম। কিন্তু কাঠের টুল বানানো উচিত কীভাবে? অনেকে বলল যে একখানা চেয়ার বানাতে হলে একজন ছাত্রের তার সব ক'টা অংশই বানাতে শেখা দরকার, তাহলেই সে ভালো মিস্ত্রি হতে শিখবে। কিন্তু অন্যেরা বললে যে একেক জন ছাত্র ওই টুলের একেকটা বিশেষ অংশ মাত্র বানাবে আর এভাবে কাজ করার সপক্ষে ভালো যুক্তিও আছে। একজন 'সংবেদনশীল' শিক্ষক যখন এই একটা কাজ কয়েক জনের মধ্যে আলাদা-আলাদা করে বেঁটে দেয়ার ব্যাপারটা দেখলেন তখন ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে তিনি তো জ্ঞানই হারিয়ে ফেললেন... তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে কোনো একটি ছেলেকে ওইভাবে একটা সহজ কাজের মধ্যে আটকে ফেলে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে আমরা ব্যঙ্গ করতে পারলুম কী করে? এ তো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার! হ্যাঁ, ঠিকই, একেকটি ছেলেকে একেকটি নির্দিষ্ট কাজে আটকে রাখা হচ্ছিল বটে, কিন্তু সে তো কয়েক মিনিটের মধ্যে শ-দুয়েক টুকরো কাঠ কেটে ওই জিনিসটা দু'শোটা করে বানিয়ে ফেলছিল, যৌথ সংস্থার স্বার্থ সে রক্ষা করে চলছিল ওইভাবে। তার বেলা?

শ্রমবিভাগের ব্যাপারটা নিতান্তই অপরিহার্য। আজকালকার দিনে গোটা একখানা চেয়ার একাই বানিয়ে ফেলতে পারে এমন একজন শিল্পী-কারিগরের তেমন প্রয়োজন নেই, যতখানি প্রয়োজন আছে একজন ছুতোরমিস্ত্রির যে নাকি কাঠে খাঁজ কাটা ও ছ্যাঁদা করার যন্ত্র আর লেদ-মেশিন নিয়ে কাজ করতে পারে। যৌথ সংস্থায় ও শিল্পোৎপাদনের কাজে এটাই হল আমার অভিজ্ঞতা।

আমি এখন আপনাদের যা বলছি তার অর্থ কিন্তু মোটেই এ নয় যে আমি অর্থনীতির ব্যাপারে উৎসাহী। না, আগাগোড়াই আমি ছিলুম প্রথমত ও প্রধানত একজন শিক্ষক, আগাগোড়াই ছেলেপিলে মানুষ করার সমস্যা নিয়ে ভাবিত শিক্ষকমাত্র। তবে এটা ঠিক যে আমি এমন কিছু-কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যাদের সঙ্গে বাজারচলতি তত্ত্বগত মতাদর্শের হয়তো বিরোধ আছে। শিশুর মনঃসমীক্ষণ শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তি হওয়া উচিত এমন মতামত, কিংবা শিক্ষাদানের কিছু-কিছু পদ্ধতিকে অন্য সবকিছু থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা এবং বিমূর্তভাবে তাদের কল্পনা করা — চিরদিনই এ-সবের আমি বিরোধিতা করে এসেছি। আমি মনে করি শিশুদের লালনপালনের পদ্ধতি শিক্ষক বা শিক্ষিকার রাজনৈতিক বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে, এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান বা পড়াশুনোর ব্যাপারটা গৌণ। আমার মধ্যে যতকিছু হরেকরকম শিক্ষাদান-পদ্ধতি আপনি জবরদস্তি ঢুকিয়ে দিন-না কেন, তবু আমি কিছুতেই একজন শ্বেতরক্ষী তৈরি করতে পারব না। আপনারাও তা পারবেন না। একমাত্র যে-লোকের অন্তরতম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অমন একটা প্রবণতা আছে সে-ই অমন কাজে সফল হতে পারে।

শিক্ষাদানের দক্ষতাকে অত্যন্ত উঁচু স্তরে তোলা ও নিখুঁত করে গড়া যেতে পারে, একে প্রায় অভ্রান্ত একটি কলাকৌশলে পরিণত করা চলে। দীর্ঘদিন ধরে আমি এটা বিশ্বাস করে আসছি এবং এই বিশ্বাস-যে সঠিক আমার গোটা জীবন সেটা প্রমাণের নানা উপায় সন্ধান করে কেটেছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে কেবলমাত্র পড়ানোর পদ্ধতির মধ্যেই শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা

উচিত হবে না। আরও বেশি করে আমি বিশ্বাস করি যে ছেলেমেয়েদের চরিত্র কেবলমাত্র ক্লাসরুমের মধ্যেই গড়ে ওঠে না, শিশুর জগতের আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি বর্গগজ এলাকাতেও তা গড়ে ওঠার অবকাশ পায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হেফাজতে প্রভাববিস্তারের এমন সমস্ত উপায় থাকা অত্যাবশ্যক যেগুলি এতদূর সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ হবে যে যখনই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিকর প্রভাবের (তা সে যতই সর্বশক্তিমান হোক-না কেন) সম্মুখীন হবে তখনই আপনাদের যাদুপ্রভাবে সেইসব ক্ষতিকর প্রভাব বাতিল হয়ে যাবে এবং চিরকালের মতো তা ছেলেমেয়েদের মন থেকে মুছে যাবে। এ কথার অর্থ এই, কারোরই কখনও এমন ধারণা মনে পোষণ করা উচিত হবে না যে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কাজ একমাত্র ক্লাসরুমেই চলতে পারে। শিক্ষাদানের এই কাজ ছাত্র বা ছাত্রীর গোটা জীবনটাকেই নিয়ন্ত্রিত করবে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় যার ওপর আমি জোর দিতে চাই তা হল শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে সক্রিয় ধরনের হতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি একজনকে সুনির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী আয়ত্ত করানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী, আর তাই আমি ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আগ বাড়িয়ে গিয়ে আমার সমগ্র মানসিক ও শারীরিক শক্তি এই কাজে কেন্দ্রীভূত করি। এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্যে আমাকে উপযুক্ত উপায়-উপকরণ খুঁজে বের করতেই হবে এবং পূর্বোক্ত ওই লক্ষ্যটি, আমি যে-ছাঁচে বা আদর্শে পৌঁছতে চাইছি সেটিকে, আমার চোখের সামনে সর্বদাই জাগরূক রাখতে হবে। এর ফলে 'ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হবে' এ ভয়ে কম্পিত হব না, ব্যক্তিত্বের ক্ষতি যদি হয় তো হোক, তবু আমি আমার সেই লক্ষ্যের অভিমুখে অভিযাত্রা

চালিয়ে যাব। এর অর্থ কিন্তু বিন্দুমাত্র এই নয় যে আমি দুঃখকষ্ট ভোগের সপক্ষে ওকালতি করছি। ব্যাপারটা বরং এর উলটো। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে অনেকরকম দোষত্রুটি, বিশেষ করে শৃঙ্খলা, কাজের মান ও কাজের ধরন বজায় রাখার ক্ষেত্রে দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তির উৎসই হল এই ব্যাপারটা যে আমরা ওই পূর্বোক্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করি না। গৃহহীন অনাথ ছেলেপিলেদের নিয়ে কাজ করার ফলে আমি এই প্রশ্নটির ব্যাপারে মতামত পোষণ করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছি... আমি বুঝেছি যে গোটা ব্যাপারটাই ছিল ছেলেমেয়েদের বিকল স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। গোড়ায়-গোড়ায় আমি ভেবেছি যে যে-সব ছেলেমেয়ে নিয়ে আমায় চলতে হচ্ছে তারা চোর-ছ্যাঁচড়, কুঁড়ের বেহদ্দ ও সামাজিক ঐক্যনাশী ছেলেপিলে বই তো নয়, অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা ছিল এমন সব ছেলেপিলে যারা কেবল স্নায়ুর অতিরিক্ত চাপে ভুগছিল মাত্র। প্রতিটি কথায়, প্রতিটি নড়াচড়ায় তারা আপত্তিতে গরগর করে উঠত, কেউ তাদের কাছাকাছি গেলেই তাদের স্নায়ুগুলো উঠত টানটান হয়ে। আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্ত্বকথাগুলিতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মার্জিত যে-সব কলাকৌশলের কথা আছে অনেকসময় সেগুলি প্রয়োগ করতে গেলেও ওই ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যেত।

বলা হয় যে একেকটা ক্লাসের পাঠ শেষ হবার পর ছেলেপিলেদের খানিকটা চেঁচামেচি করে তাদের মনে জমা আবেগ ইত্যাদির ভাপ মুক্ত করতে দেয়া উচিত (অবশ্য এটা ঠিক যে আপনাদের স্কুলগুলিতে এটার চর্চা করা

হয় না)। কখনও-কখনও কোনো-কোনো বাচ্চার মধ্যে জানলার কাচ ভাঙার একটা ঝোঁক দেখা যায়, কেউ-কেউ আবার বলেন যে বাচ্চার স্বভাবের মধ্যেই নাকি এর তাগিদ নিহিত। এই সমস্ত লোক এ-ও মনে করেন যে বাচ্চাকে কাচ ভাঙা থেকে নিবৃত্ত করতে হলে তাকে অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখা দরকার যাতে অন্য কিছুতে তার আগ্রহ জাগে। যেমন, তাকে গান গাইতে বা নাচতে উৎসাহিত করে তোলা দরকার কিংবা তার রেডিও শোনার আগ্রহ জাগানো প্রয়োজন।

একসময়ে আমি বহু স্কুল পরিদর্শন করেছি। আমার স্নায়ুতন্ত্রও রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, স্নায়ুগুলো আমার সত্যিসত্যিই যেন লোহার তৈরি, তবু যখনই আমি উপরোক্ত ওই নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সত্যিকার হৈ-হল্লায় মুখর কোনো স্কুলে গেছি তখনই আমার মাথা বনবন করে ঘুরে উঠেছে! আর ভাবুন বাচ্চাদের অমন একটা পরিবেশে দশ-দশটা বছর কাটাতে হচ্ছে!

অবশ্য আমাদের আসল মনোভাব যাতে প্রকাশ না-পায় সে-ব্যাপারে আমাদের 'শিক্ষাদানের দক্ষতা' কাজে লাগা উচিত। কখনও-কখনও মানসিক উত্তেজনায় আমাদের ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে উঠতে পারে, রাত্রে আমাদের ঘুম না হতে পারে, কিংবা মনের মধ্যে জমে-থাকা উত্তেজনা বাড়ি ফেরার পর আমাদের পরিবারের লোকজনের ওপর ফেটে পড়তেও পারে। কোনো একটা সময়ে কিছু-কিছু মহলে এরকম একটা ধারণা গভীরভাবে বাসা বেঁধেছিল যে শিক্ষকতা করা মানেই স্নায়বিক চাপে ভোগা এবং এর ফলে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা কালক্রমে স্বাভাবিকভাবেই হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য।

এই সমস্যাটা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন চিন্তা করেছি। কালক্রমে আমি বুঝেছি যে সত্যিকার আদর্শ শৃঙ্খলার পরিবেশ যা হতে পারে তা হল — চেঁচামেচি নয়, হুড়োহুড়িও নয়। ছেলেমেয়েরা যদি দৌড়োদৌড়ি করতে চায় তবে তার জন্যে স্কুলের বাইরে সংলগ্ন উঠোন আছে, আর যদি তারা চেঁচামেচি করতে চায় — তবে তা নৈব-নৈব চ। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও দেখাশোনা, যত্নআত্তি করা দরকার। কেননা, সবকিছু বলাকওয়ার পরেও আমরা হলুম রাষ্ট্রের সম্পত্তির অংশ এবং বাচ্চাদেরও উচিত আমাদের প্রতি যত্ন নেয়া।

আর জানলা ভাঙার কথা উঠলে সেক্ষেত্রে একটিমাত্র পন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে। ছেলেমেয়েদের তেমন ক্ষেত্রে স্পষ্ট করেই বলতে হবে যে কখনোই জানলা ভাঙা চলবে না। জানলা ভাঙার বিকল্প হিসেবে তাদের জন্যে রেডিও বা গ্রামোফোন চালানো হবে না, অথচ সরকারি সম্পত্তিও তাদের ভাঙচুর করতে দেয়া হবে না। আমি কখনোই তাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিতে বা তাদের ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করব না, আর জানলা ভাঙার চেষ্টা না-করলেই তারা বরং ভালো করবে।

যখন কোনো যৌথ সংগঠন উপরোক্ত এই নির্দেশ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে তখন সে-সংগঠন শান্তি, কঠিন নিয়মানুবর্তিতা, যৌথের কে কোন কাজে আছে তার অধিকারের যথাযথ সীমানা ও সংজ্ঞা নির্ণয়, ইত্যাদি অর্জন করতে পারে এবং খ্যাপামিতে মেতে ওঠার অনুমতি কখনোই সে দেয় না। এই সবকিছুই সহজ স্বাভাবিক হতে ও স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে একান্ত অপরিহার্য। এই সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল।

আপনারা যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে যদি তখন কমিউন-পরিদর্শনে যেতেন, তাহলে কখনোই এটা আপনাদের নজরে পড়ত না যে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করছে কিংবা জানলার শার্সি ইত্যাদি ভাঙছে। যৌথ সংগঠনটি এমনিতে কিন্তু ভারি প্রাণচঞ্চল ও হাসিখুশি ছিল, কিন্তু তাই বলে ছেলেমেয়েরা কখনও পরস্পর মারামারি করত না। আমি একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে শিশুর খ্যাপামিতে মেতে ওঠা ও চিৎকার-চেঁচামেচি করার প্রবণতাকে চমৎকারভাবেই আন্তর শান্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। শিক্ষকের প্রজ্ঞা বস্তুটি যে সত্যিই কী সে-সম্পর্কে প্রায়ই আমরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকি এবং এক্ষেত্রে যা আমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয় দেখা যায় তা মোটেই সন্দেহাতীত নয়। আর তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে বস্তুটি কি শিক্ষকের প্রজ্ঞা না সাধারণ মানুষেরই প্রজ্ঞা।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সমুচ্চ নৈতিক মান দাবি করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এদিক থেকে কমিউনের বাচ্চা সদস্যদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তারা এইসব নৈতিক মানের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত ছিল এবং এ-ব্যাপারে আমাকে অনেকখানি পরিমাণে শিক্ষা দিয়েছে তারাই।

যেমন, প্রতিযোগিতার বিষয়টি ধরা যাক... প্রতিযোগিতা চলুক এটা আমিও যথেষ্ট চাইতুম, সমগ্রভাবে যৌথ সংগঠনও তা চাইত। এই প্রতিযোগিতা-যে কোনো দু'টি পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে চলত তা নয়, বরং সব ক'টি ক্লাসে এবং বাহিনীতে ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের সব ক'টি ক্ষেত্রে — যেমন, সৌজন্য প্রদর্শন, সৎ আচরণ, ইত্যাদি

প্রত্যেকটি ব্যাপারেই — প্রতিযোগিতা চালানো ছিল একটা নিয়মিত কৃত্য... এ সম্পর্কে বিষয়ের উল্লেখসূচক কার্ড ও প্রতিযোগিতার লিখিত ফলাফল আমার কাছে থাকত এবং প্রতি মাসে এ-ব্যাপারে সবসেরা বলে স্থিরীকৃত বাহিনীকে ছ'খানা করে থিয়েটরের টিকেট পুরস্কার হিসেবে বিলি করা হোত। তিরিশ জনের একেকটি বাহিনী এই ছ'খানা টিকেট তখন নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিত। এছাড়া প্রতি মাসে একেকটি বাহিনী এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে পায়খানা সাফসুতরো করারও অধিকার পেত।

বস্তুত, ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এইরকম যে দাবিদাওয়ার ছাঁদের যুক্তিটা বিকশিত হতে-হতে শেষপর্যন্ত তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক কতগুলো কাজকর্মের রূপ নিয়েছিল। অর্থাৎ, যারা কাজকর্মে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করত, বলা যেতে পারে, বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন হিসেবেই সবচেয়ে অপ্রিয় কাজগুলো করার দায়িত্ব পেত তারাই। ওখানে আমাদের একটি ভারি চমৎকার কাজের চতুর্থ বাহিনী ছিল। আর একবার গোটা একটা মাস ধরে পায়খানা পরিষ্কার করার ভার পড়ল তাদের ওপর। তাদের কাজ ছিল সব ক'টা পায়খানা প্রথমে একবার বীজাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ধুয়ে তারপর দ্বিতীয়বার ওডিকোলন দিয়ে ধোয়া। কমিউনের সকলেই জানত কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে তারা এই পায়খানা পরিষ্কারের কাজ করত আর পায়খানাগুলো কী ঝকঝকে-তকতকেই না করে তুলেছিল তারা। ফলে ধোয়ামোছার কাজের জন্যে ওই বাহিনীটি সেবার প্রতিযোগিতায় প্রথম হল। যাই হোক, একমাস পায়খানা পরিষ্কারের কাজ করার পর বাহিনীটি ঘোষণা করল যে

পায়খানা পরিষ্কারের কাজটা তারা আরও একমাস চালিয়ে যাবে। তার পরের মাসে তারা ফের একবার কাজটা করার দায়িত্ব নিয়ে নিল। অবশেষে তৃতীয় মাসের শেষে ধোয়ামোছার কাজের জন্যে আমাদের তৃতীয় বাহিনী প্রথম স্থান পাওয়ায় ওই বাহিনীর দলপতি ঘোষণা করল যে এবার তার বাহিনী প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ায় পায়খানা পরিষ্কারের পালাও এবার তার দলের ছেলেদের ভাগে অর্শাল।

অবশ্য ঘটনাটা এইভাবে আমি বর্ণনা করায় নিশ্চয়ই তা হাস্যকর শোনাল। গোড়ার দিকে অবশ্য অন্য সব ধোয়ামোছার কাজের মতো পায়খানা পরিষ্কারের কাজটাও লটারি করে ঠিক করা হোত যে সেটা কাদের ভাগে পড়বে কিন্তু পরে এই কাজটা অন্যান্য ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কমরেডস, ওপরে এই-যে যুক্তির কথা বললুম এ-যুক্তি কিন্তু আমার মনগড়া কোনো কিছু নয়, কাজকর্মের ও নৈতিকতার উঁচু মান থেকেই স্বাভাবিকভাবে এই যুক্তি গড়ে উঠেছিল।

ছেলেমেয়েদের কাছে আসলে কোনোকিছুই দাবি করা চলে না, যতক্ষণ না তাদের ঐক্যবদ্ধ করে সত্যিকার দৃঢ়সংবদ্ধ একটি যৌথ সংগঠন গড়ে উঠছে। আমাকে যদি এখন কোনো ইশকুল চালানোর ভার দেয়া হয় তাহলে প্রথম কাজটিই আমি যা করব তা এই : ইশকুলের সব ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে একত্র করে যেমন বন্ধু বন্ধুকে বলে সেইভাবেই আমি তাঁদের বলব যে আমি পূর্বোক্ত ওইরকম একটি যৌথ গড়তে মনস্থ করেছি। কিছু শিক্ষক যদি আমার এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে রাজি না-হন তাহলে তাঁদের শিক্ষা-সম্পর্কিত যোগ্যতা ও গুণাবলী যা-ই থাক-না কেন

তাঁদের আমি ওই স্কুল ছেড়ে অন্য কোনো স্কুলে যেতে অনুরোধ করব। আর কোনো তরুণী শিক্ষিকা যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে তাঁর বয়স যদি মাত্র আঠারো বছরও হয়ে থাকে তবু তাঁকে বলব: ‘আপনি এখনও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি বটে, তবু আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি কাজ করতে উৎসাহী, কাজেই আপনি থেকে যান এবং কাজ করুন। কী করে কাজ করতে হয় তা আমিই আপনাকে দেখিয়ে দেব।’

সত্যিকার একটি যৌথ গড়ে তোলা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে হবে কোনো ব্যক্তিবিশেষের অহং ভাবে ইন্ধন যোগাতে বা অপর কোনো স্বার্থ হাসিলের মতলবে নয়, সমগ্র যৌথের স্বার্থেই। সত্যিকার শৃঙ্খলাপরায়ণ আচরণ বলতে শৃঙ্খলাবিধানের নিয়মকানুন সর্বদা মেনে চলা এবং এমন কি অপ্রিয় কাজও (সে কাজ তো কাউকে-না-কাউকে করতেই হবে) করতে ইচ্ছুক থাকা বোঝায়।

আমি মনে করি যে কোনো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেবল-যে স্কুলের মধ্যেই পরস্পর সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে তা নয়, স্কুলের বাইরেও তাঁদের পরস্পরের বন্ধু হতে হবে।

আমার এই আলোচনার শেষ অংশটি হচ্ছে বাবা-মা’দের নিয়ে। এক্ষেত্রে রেলওয়ে স্কুলে আমার গোড়ার অভিজ্ঞতা কমিউনে আমার কাজের সম্পূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনে আমার কাজের শেষ পাঁচ বছরে আমার কাছে এমন সব স্কুলের ছেলেমেয়েকে পাঠানো হোত যাদের ঐক্যনাশী ছেলেপিলে গণ্য করে মাস্টারমশাইরা তাদের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এইসব ছেলেপিলেকে অবশ্য গৃহহীন অনাথ ছেলেপিলের চেয়ে বাগ মানানো শক্ত ছিল। গৃহহীন অনাথ ছেলে বা মেয়ের জীবন কমিউনকে, আমাকে ও অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হোত। কিন্তু প্রথমোক্ত ছেলেপিলের বাবা-মা ছিল। কারও-কারও আবার উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসর ও গাড়িওয়ালা বাপ, আরামদায়ক ঘরবাড়ি ও প্রচুর টাকা-পয়সা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এমন একটা বাড়ির ছেলেকে বাড়ির বাইরে রেখে তার চরিত্র সংশোধন সম্ভব করে তোলা একটা দুরূহ ব্যাপার। আর এই ধরনের ছেলেপিলে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার ধারণা জন্মায় যে এদের বাপ-মা'দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা দরকার।

এসব ক্ষেত্রে মামুলি প্রথাসিদ্ধ রীতিতে বাপ-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার অর্থ হল গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাপ-মাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের জানানো যে তাঁদের ছেলে হেন করছে তেন করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বাবা-মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই ভেবে হিমসিম খান যে এমন ছেলেকে নিয়ে বাবা-মা'ই বা কতটুকু কী করতে পারেন। অথচ তিনি মুখে একটা বন্ধুসুলভ ভাব ফুটিয়ে বলবেন যে বাবা-মা আর যা-ই করেন করুন তবে বাচ্চাটাকে তাঁরা যেন না-মারেন। অতঃপর বাবাটি শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসবেন আর কাউকে কোনো কথা না-বললেও, এমন কি স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরে কিছু না-জানালেও, নিজের অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করতে থাকবেন যে ছেলেটাকে আচ্ছা করে ঘা-কতক দিতে পারলে বোধহয় মন্দ হোত না। আমাদের এই সমাজে কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে কাজকর্মের এই

ধরন অন্য যে-কোনো প্রকার ভণ্ডামির মতোই অসহ্য ও অননুমোদনীয়।

বাপ-মায়ের সঙ্গে ছেলের ব্যাপার নিয়ে কথা বলার আরও একটি ধরন প্রচলিত। স্কুলে হয়তো ক্লাসটিচার ও প্রধান শিক্ষক ভালো করেই জানেন যে কোনো একটি পরিবার উপযুক্তভাবে সন্তানলালনে অসমর্থ। তাহলে এরকম ক্ষেত্রে ক্লাসটিচার ও প্রধান শিক্ষক কী করবেন? যদিও তাঁরা এ-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে ছেলেটির বাবা-মা ছেলেটিকে ঠিকভাবে মানুষ করতে অপারগ, তবু সাধারণত তাঁরা যা করে থাকেন তা হল ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে তাঁরা বাপ-মাকে বোঝাতে থাকেন কীভাবে ছেলেকে তাঁদের মানুষ করা উচিত। কিন্তু যে বাবা-মা ছেলেকে আগাগোড়া প্রশ্রয় দিয়ে বিগড়ে দিয়েছেন, দেখা যায় উপদেশ শোনবার বা বোঝবার পাত্র তাঁরা নন। পুনঃশিক্ষাদান এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ, তার ওপর উপরোক্ত ওইসব পরিবারের বাপ-মা'দের ওপর যদি ছেলের চরিত্র-সংশোধনী কাজের ভার দেয়া হয় তাহলে তার ফলাফল ভালোর চেয়ে খারাপই হয় বেশি।

একথার অর্থ অবশ্য মোটেই এ নয় যে বাবা-মায়ের ওপর কোনোরকম প্রভাববিস্তারের দরকার নেই। সবকিছু বলাকওয়ার পরেও এটা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। তবে তাঁদের ওপর প্রভাববিস্তারের সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাঁদের ছেলেপিলের মধ্যে দিয়ে ওই কাজটি করা...

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে বাপ-মা'দের প্রভাবিত করার কাজটি জোরদার করে তুললে ভালোই হয়। যেখান থেকে আমার শিক্ষক-জীবনের সূচনা সেই ক্রিউকভের রেলওয়ে

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাবা-মা'দের সঙ্গেই থাকত। আমি সেখানে এলাকা-ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কতগুলি টিম গঠন করি। প্রতিদিন সকালে সব ক'টি টিম-লিডারকে আমার কাছে রিপোর্ট করতে হোত তাদের প্রত্যেকে যে-যে এলাকায় বাস করে সেই-সেই এলাকায় কী ঘটছে না-ঘটছে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ও টিমের সদস্যরা কে কেমন আচরণ করছে সে-সম্বন্ধে। মাঝেসাঝে টিম নিয়ে পরিদর্শন করা হবে বলে আমি নির্দেশ দিতুম, আর এই পরিদর্শনের কাজে শুধু আমিই নই ক্লাসগুলির মনিটররাও টিমকে সাহায্য করত। স্কুলের উঠোনে আমি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা টিম তখন পরিদর্শনের কাজের জন্যে সার বেঁধে দাঁড়াত আর তারপর টিমের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যে-সমস্ত ফ্ল্যাটবাড়িতে আমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা থাকত সেগুলি ঘুরে-ঘুরে দেখতুম।

লিডারদের মাধ্যমে এই সমস্ত টিম স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে জবাবদিহির জন্যে দায়ী থাকত এবং বাধ্য থাকত ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ সভাগুলিতে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতেও। ছাত্রছাত্রীদের পরিবারগুলির ওপরও এসব টিমের অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। আমি বলি কী, পরিবারগুলির ওপর এই ধরনের শুভ প্রভাববিস্তারের উপায় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা দরকার নিচের এই যুক্তির ধারা অনুসরণ করেই। যুক্তিটি এই: স্কুল হল রাষ্ট্রীয় সংগঠন আর পরিবার হল গৃহ-সংগঠন। অতএব পরিবারগুলিকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, বা শিশুদের মাধ্যম।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17 Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ИБ № 3262

Редактор русского текста *Н. Е. Файн*
Контрольный редактор *В. Л. Коровин*
Художник *В. В. Кулешов*
Художественный редактор *Ю. С. Лылов*
Технические редакторы *Н. И. Касаткина, Е. В. Гоц*
Корректор *А. К. Кожина*

Сдано в набор 8.12.1977. Подписано в печать 23.05.1979
Формат 74Х90 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «бенгали 248/472». Печать высокая.
Условн. печ. л. 20,62+0,36 печ. л. вклеек.
Уч.-изд. л. 26,25. Тираж 1440 экз. Заказ № 750.
Цена 3 руб. 24 коп. Изд. № 25066.

Издательство «Прогресс»
Государственного Комитета
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» Государственного
Комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 121019, пер. Аксакова, 13.

আন্তন মাকারেঙ্কো

সুপরিচিত সোভিয়েত শিক্ষাগুরু ও লেখক আন্তন মাকারেঙ্কোর ক্রিয়াকলাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র স্বীকৃত, দেশবিদেশেও তিনি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন।

ফ্রান্সের একটি শিশুলালন-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রোবের আদর্নুয়ে আ. স. মাকারেঙ্কো-সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্র পড়ে লেখেন, 'শিশুদের মানুষ করে তোলার জন্যে মাকারেঙ্কো যে-বিরাট কাজ করে গেছেন ও সে-কাজে যে-চমৎকার বিবেচনাবুদ্ধি, গভীর জ্ঞান ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের কর্তব্যসাধনে পথনির্দেশ করবে।'

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

মাকারেঙ্কোর শিক্ষা-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বলতে বোঝায় শিক্ষাদানের নিত্য নতুন প্রণালী ও পদ্ধতির সন্ধান, হাতে-কলমে কাজ করে চলেছেন যাঁরা সেইসব শিক্ষকের সামনে উপস্থিত সমস্যাদির (যা এমনিতে অ-সমাধানযোগ্য বলে ঠেকে, তাদের) সৃষ্টিশীল সমাধানের প্রয়াস।

শিশুদের প্রতি তাঁর কড়া চাহিদায়-ভরা ভালোবাসা, তাদের মনস্তত্ত্বে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা আন্তন মাকারেঙ্কোকে অসামান্য এক শিক্ষাগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যৌথ সংগঠনের মধ্যে রেখে শিশুদের মানুষ করে তোলার ব্যাপারে তাঁর গবেষণার ফলাফল এক সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

ব্যক্তিবিশেষের লালনপালন, তাকে মানুষ করে তোলা আন্তন মাকারেঙ্কোর সাহিত্যকর্মেরও মুখ্য বিষয়। বাঙালি পাঠক মাকারেঙ্কোর 'জীবনজয়ের পথে', 'বাঁচতে শেখা' ও 'বাবা-মা'র জন্যে বই' ইত্যাদি রচনাবলীর সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠবেন। বইগুলি বাঙলা ভাষায় মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

এই বইখানি প্রকাশের উদ্দেশ্য হল পাঠক-পাঠিকাদের আন্তন মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আরও বেশি পরিচিত করে তোলা এবং এই অসামান্য শিক্ষাগুরুর জীবন ও কর্মকাণ্ডের ওপর আরও আলোকপাত করা।